# অনন্য আইনস্টাইন

অমূল্যভূষণ গুপ্ত

বুক হোম
৩২ কলেজ রো কলকাতা ৭০০০০৯

ANANYA EINSTEIN

প্রকাশক ঃ
বিশ্বজিৎ মজুমদার
গ্রন্থগৃহ
২২ সি কলেজ রো কলকা

প্রথম প্রকাশ ঃ ১৯৬০

মুদ্রাকর ঃ
হীরালাল মুখোপাধ্যায়
কনটেম্পোরারী প্রিন্টার্স
১৩ কলেজ রো কলকাতা ৯



অনন্য
আইনস্টাইন

"অহংবোধের মুক্তির চেতনা ও পরিমাণের উপরেই মানুষের মূল্যায়ন হয়। পৃথিবীর সব সম্পদ হাতে এলেও মানবজাতির অগ্রগতি ঘটে না। একমাত্র বিশিষ্ট ও স্বতন্ত্র মহাপুরুষেরাই সৎচিন্তা ও সৎকর্মের পথে নিয়ে যেতে পারেন।

অর্থ শুধু স্বার্থসিদ্ধির উপায়, শুধু দুর্দম অপব্যবহারের পথ দেখায়। মুসা, যিশু বা গান্ধী কার্ণেগীর টাকার থলি নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছেন—এ কথা কী কল্পনা করা যায়!"

**আইনস্টাইন**

## ॥ উৎসর্গ ॥

আইনস্টাইনকে

সারা পৃথিবীর বিবেকের মতো যে মানুষটি মনে মনে যাবতীয় আত্মপ্রচার, ভীতি প্রদর্শন, আর নিষ্ঠুরতা সম্পর্কে গভীর ঘৃণা পোষণ করতেন, যাঁকে দেখে সহজেই মনে হত এক অনুভূতিপ্রবণ মানুষ, অবিচার ও হিংসার নাম শুনলে উত্তেজিত হন, যাঁর মতো নিঃসঙ্গ নির্জন জীবনযাপন করতে আর কাউকে দেখা যায় নি, যাঁর মহান হিতৈষণা, পবিত্র সততা, আর সামাজিক চিন্তাধারা বাইরে যেমনই প্রকাশ পাক না কেন আসলে পুরোপুরি নৈর্ব্যক্তিক, যাঁর হৃদয়ে রক্ত ঝরে না, চোখে নেই কান্না, যাঁর বিরল ব্যক্তিত্বের কথা এই পুস্তকের উপজীব্য তাঁরই পুণ্য স্মৃতির উদ্দেশে গ্রন্থটি উৎসর্গীকৃত হল।

# ভূমিকা

মানব সভ্যতার বিকাশ এবং মানবমনীষার যে কয়েক হাজার বছরের স্মৃতিগ্রাহ্য ইতিহাস, সেই ইতিহাসে, মানবমনীষার আকাশে, আইনস্টাইন উজ্জ্বলতম নক্ষত্র। তিনি এ শতাব্দীর প্রবাদপুরুষ। জীবিতকালেই তিনি নানা কিংবদন্তীর নায়ক। তাঁকে ঘিরে দেশকালপাত্র নির্বিশেষে মানুষের সসম্ভ্রম কৌতূহল এবং জনতরঙ্গ নিয়তই উদ্বেলিত—সে জনতরঙ্গের সামিল রাষ্ট্রনায়ক, সম্রাট, বুদ্ধিজীবি, বিজ্ঞানী থেকে অতি সাধারণ মানুষ পর্যন্ত। আচার্য সত্যেন্দ্রনাথ বসুর ভাষায়—"তাঁর তিরোভাবের পরও লোকের তাঁর বিষয় জানবার আগ্রহ অসীম।···বিশ্বে তাঁর বিষয়ে কৌতূহল আজও অটুট।" যদিও আইনস্টাইন মূলত এবং শেষত বিজ্ঞানের এক অনন্য স্রষ্টা এবং দ্রষ্টা—তবু এই একটি বিচিত্র মানুষ প্রসারিত তাঁর সম্পৃক্ততায়, সমকালীন রাজনীতি—ধর্ম—দর্শন—সংস্কৃতি—সংগীত প্রভৃতি নানা বিষয়ে এবং উপরন্তু মানুষের সঙ্গে সমাজের, সমাজের সঙ্গে রাজনীতির, রাজনীতির সঙ্গে বিজ্ঞানের, বিজ্ঞানের সঙ্গে ধর্মের ইত্যাকার নানা জটিল আন্তর সম্পর্কেও তিনি আন্তরিক ভাবেই কুতূহলী। মহৎ বিজ্ঞানী যে মহৎ জীবনশিল্পী এবং সমাজশিল্পীও, অন্তত তাঁর সৎ চিন্তনে এবং সক্রিয় উদ্যমে, এটি আইনস্টাইনের মতো অন্য কোন বিজ্ঞানীর জীবনে এমনতর উজ্জ্বলতায় উৎকীর্ণ নয়।

সোক্রাটিসকে একদা প্রশ্ন করা হয়েছিল, আপনার অনুশীলনের বিষয়বস্তু কি? সোক্রাটিসের উত্তর ছিল—'মানুষ'। বস্তুত এ যুগের সোক্রাটিস আইনস্টাইনের জীবনকৃতি যা কিছু আবর্তিত, তার কেন্দ্রবিন্দু,—মানুষ। তাঁর যা কিছু কীর্তি, যা কিছু ভাবনা—সবই মানুষকে ঘিরে। যা কিছু মানবিক, তার বিজ্ঞান—দর্শন—রাজনীতি—সমাজনীতি—ন্যায়বোধ—সচেতন বিবেক—কল্যাণবুদ্ধি সবেতেই আইন-স্টাইন যুক্ত। - যা কিছু অমানবিক, মানবতা বিরোধী, সেখানে আইনস্টাইন আপোষ-হীন সংগ্রামী, সোচ্চার যোদ্ধা। অথচ আপাতদৃষ্টিতে, তাঁর জীবনীর উপকরণ থেকে, প্রত্যক্ষ দ্রষ্টাদের নানা বিবরণ থেকে অবিন্যস্ত চুল, মোজা বা টাই ছাড়া পোশাক যা ক্রীজহীন এবং চ্যাপলীনের মতো ঢিলেঢালা, আত্মভোলা প্রকৃতি, জাগতিক বিষয়ে উদাসীন অথচ মমত্ববোধে আর্দ্র, যে পক্ককেশ ঋষিপ্রতিম মানুষটির ছবি আমরা পাই

তাঁকে কেমন যেন অলৌকিক লাগে। তিনি কাছের হয়েও যেন অনেক দূরের, আবার অনেক উর্ধ্বলোকের ভাবুক হয়েও যেন অনেক কাছের। এই আপাত বিরোধিতার জন্যেই আইনস্টাইন—আইনস্টাইন।

জার্মান দর্শনশাস্ত্রে একটি বহুব্যবহৃত শব্দ—"ভেল্ট অন শাউ" অর্থাৎ 'বিশ্বছবি'। ব্যক্তি মানুষের কাছে বিশ্ব যে রূপে প্রতিভাত—তাই তার কাছে বিশ্বছবি। বিশ্বছবি স্থাবর নয়, জঙ্গম। এ ছবি গড়ে ওঠে বিজ্ঞানের ধারণায়, দর্শনের তত্ত্বে,—বিবর্তিতও হয়, যখন বিজ্ঞানে নতুন যুগান্তকারী ধারণা দেখা দেয়, যখন দর্শনে নতুন মনন নতুন স্রোতোধারা সংযোজন করে। আইনস্টাইন স্মরণীয় এবং বরণীয় এই অর্থে অবশ্যই যে, তিনি প্রায়-অনড় বলে প্রতীত নিউটনীয় বিশ্বছবির শুধু পরিবর্তন করে এক নতুন বিশ্বছবিই গড়ে তোলেন নি—তাঁর চিন্তাধারা নতুন নতুন মাত্রা সংযোজন করেছে দেশ-বস্তু-কালের ধারণায়। মাত্রা যোজনা করেছে অতি ছোট অতি-পারমাণবিক কণা থেকে অতি বৃহৎ মহাবিশ্বের ধ্যানধারণাতে। চতুর্মাত্রিক বিশ্বের চতুর্থ মাত্রায় যে "কাল" তা যে দ্রষ্টা বা দেশ নিরপেক্ষ নয় এই দুর্দান্ত সাহসিক চিন্তাকে তিনি প্রতিষ্ঠা করেছেন নিখুঁত গাণিতিক যুক্তিতে। শক্তি ও ভরের পারস্পরিক সম্পর্কের এক অতি সরল সূত্রে তিনি উত্তরকালের প্রযুক্তিভিত্তিক বিজ্ঞানকে শুধু এগিয়ে দিয়েছেন তাই নয়, আজকের এই চূড়ান্ত শক্তিসংকটের সীমানায়—শক্তির অমেয় ভাণ্ডারকে সভ্যতার হাতে তুলে দিয়ে তিনি সভ্যতার এক অবিস্মরণীয় প্রমিথিয়ুসও বটেন।

আইনস্টাইনের প্রত্যক্ষ বৈজ্ঞানিক অবদানের একটি দ্রুত সূচী হলো—কৈশিক আকর্ষণের ওপর গবেষণা, আপেক্ষিকতার বিশেষ তত্ত্ব, আলোর দ্যুতির পরম চরিত্র, ব্রাউনীয় গতির রহস্য, আলোক তাড়িত ক্রিয়ার ব্যাখ্যা অনুসারী ফোটন তত্ত্ব, নিম্ন তাপমাত্রা ও আপেক্ষিক তাপের পারস্পরিক সম্পর্ক, আপেক্ষিকতার সার্বিক তত্ত্ব,বোস-আইনস্টাইন সংখ্যায়ন। শেষ জীবনে তাঁর দৃঢ় প্রত্যয় ছিল যে, অনিশ্চয়তাবাদ বলতে কিছু নেই যার পরিপ্রেক্ষিতে তাঁর সেই বিখ্যাত উক্তি ঃ ঈশ্বর পাশা খেলেন না। এবং আরেকটি গভীর প্রত্যয় ছিল তাঁর ঃ অভিজ্ঞতা লব্ধ ক্রিয়াশীল সকল বলই ( মহাকর্ষ, তড়িত-চুম্বক, গুরু মিথস্ক্রিয়া এবং ফেরমি প্রস্তাবিত লঘু মিথস্ক্রিয়া ) একটি তত্ত্বে ( একীভূত ক্ষেত্রতত্ত্বে ) ধরা যাবে যার সন্ধানে তাঁর আমৃত্যু নিরলস অন্বেষণ।

আইনস্টাইনের নামের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িয়ে আছে তাঁর আপেক্ষিকতার তত্ত্ব। এই একটি তত্ত্ব আমূল বিপ্লব ঘটিয়েছে বিজ্ঞানের জগতে যার আজো

প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ অভিঘাত চলছে। তবু বিনা দ্বিধায়, বিনা বিতর্কে, বিনা পরীক্ষায় এ তত্ত্ব গৃহীত হয়নি। এ তত্ত্ব যে নানা দুঃসাহসিক ভবিষ্যদ্বাণী করেছিল গাণিতিক যুক্তিতে, পরীক্ষার কষ্টিপাথরে তা যাচাই হয়েছে অতীতে, আজো হচ্ছে। এর প্রধান যাচাই ছিল, প্রথমত বুধগ্রহের অনুসৃর গতির পরিমাণ সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী ও তার যাচাইয়ে, দ্বিতীয়ত দূর তারা থেকে আসা আলোর বর্ণালীর লাল প্রান্ত ঘেঁষে সরণে, তৃতীয়ত সূর্যের কাছ দিয়ে যাওয়ার সময় আকর্ষিত হয়ে আলোর সরলরেখা থেকে গতি পরিবর্তনে। এডিংটন তৃতীয় পরীক্ষাটি করে উপনীত ফলাফলে আইনস্টাইনের তত্ত্বের নির্ভুলতা প্রমাণ করেন, অনেক আগেই। সম্প্রতি পাল-সারের গবেষণা থেকে বিভিন্ন কম্পাঙ্কের রেডিও তরঙ্গের পরীক্ষা থেকেও আলোক রেখা বা ফোটন কণার বিচ্যুতি আরো নিখুঁতভাবে মেপে দেখা গেছে আইনস্টাইনের তত্ত্ব নির্ভুলতার অগ্নিপরীক্ষায় উত্তীর্ণ।

সাদা বামন তারার যে বিপুলভর, সেখান থেকে আসা আলোর বর্ণালী যে সত্যিই লাল প্রান্তে সরে যায়, এ পরীক্ষা আইনস্টাইনের তত্ত্বকে আবার নতুন করে সত্য বলে প্রমাণিত করেছে। পাউণ্ড ও রেবকা গামা-রে ব্যবহার করে আরো নিখুঁতভাবে ঐ একই পরীক্ষা করে একই সিদ্ধান্তে পৌঁচেছেন। শেপিরো রাডার তরঙ্গ দিয়ে অনুরূপ পরীক্ষা করে দেখিয়েছেন অতিকায় ভরের কাছে ফোটন কণার গতি শ্লথ হয়ে আসে।

সময়ও যে আপেক্ষিক এবং পরম কিছু নয়, আইনস্টাইনের এই দুঃসাহসিক গাণিতিক সিদ্ধান্তও যাচাই করা হয়েছে আধুনিক সূক্ষ্মতম প্রযুক্তি দিয়ে। ১৯৫৯ সালের ৪ঠা অক্টোবর যুক্তরাষ্ট্র থেকে একটি জেট লাইনার পূর্বদিকে যাত্রা শুরু করে পৃথিবী পরিভ্রমণে। বিমানটিতে ছিল চারটি নিখুঁত সময় দেওয়া সিজিয়ম পারমাণবিক ঘড়ি। এক সপ্তাহ পরে আরেকটি জেট পশ্চিমদিকে অনুরূপ যাত্রা শুরু করে। এতেও চারটি অনুরূপ ঘড়ি ছিল। দুটি জেটের ঘড়িকেই মেলানো হয়েছিল যুক্ত-রাষ্ট্রের ন্যাভাল অবজারভেটরীর ঘড়ির সঙ্গে। দেখা গিয়েছিল অবজারভেটরীর ঘড়ির তুলনায় পূর্বের জেটের ঘড়ি ৫৯ ন্যানোসেকেণ্ড ( $৫৯ \times ১০^{-৯}$ সেকেণ্ড ) সময় হারিয়েছে এবং পশ্চিমের জেটের ঘড়ি ২৭৩ ন্যানোসেকেণ্ড সময় লাভ করেছে। এ থেকে বোঝা যায়, পরস্পরের সাপেক্ষে চলমান দুটো অনুরূপ ঘড়ি একই সময় দেয় না। আইনস্টাইনের প্রস্তাবনা ঃ সময় আপেক্ষিক, পরম কিছু নয় ; এর এক আশ্চর্য উজ্জ্বল প্রমাণ—এই পরীক্ষা।

আপেক্ষিকতা তত্ত্ব বাদ দিয়ে আইনস্টাইনের অবদান থার্মোডায়নামিক্সে স্ট্যাটিস-টিক্যাল মেথডের প্রবর্তনা, কোয়ান্টাম তত্ত্বের নানা বিবর্ধন, নিউটনের আলোর কণাবাদ প্রকল্পকে বিবর্তিত করে ফোটনের যথার্থ কণা-তরঙ্গ দ্বৈতরূপের প্রস্তাবনা, পারমাণবিক কণার শক্তি বণ্টনের ক্ষেত্রে বোস-আইনস্টাইন সংখ্যায়নের প্রয়োগ। আজকের সভ্যতায় ইলেকট্রনিক টেকনোলজির বহু শাখাপল্লবে প্রসারিত যে বনস্পতির রূপ তার মূলবীজটি ছিল তাঁরই আলোকতড়িৎ-সংক্রান্ত গবেষণায়, মহাজাগতিক বিশ্বের উৎপত্তি ও তার রূপের যে তত্ত্ব তার পেছনে তাঁরই চিন্তাধারার অবদান, তাঁর ব্রাউনীয় গতির গবেষণার সূত্র ধরে আজো চলছে মহাবিশ্বের জটিল নানা গবেষণা, পরমাণুর Stimulated Emission বা উদ্দীপিত নিঃসরণ সম্বন্ধে তাঁর ধারণাটির প্রযুক্তিগত রূপ আজের লেসার রশ্মি ( পৃঃ ২৪৩. ) এবং তাঁর ভর-শক্তির আন্তপরিবর্তনের সূত্রটি ধরে. যা অনেকেই জানেন, পরমাণু বোমা এবং পারমাণবিক শক্তি।

একথা অবশ্য ঠিক যে, বিজ্ঞানে কোন তত্ত্ব, কোন ব্যাখ্যাই চিরকালের সত্য নয়, অমোঘ অভ্রান্তও নয়। আইনস্টাইনের নানা তত্ত্বও হয়ত কালের বিচারে আরো পরিশীলিত হবে, আরো নিভু্র্লতর তত্ত্ব অগ্রগতি ঘটাবে বিজ্ঞানের জগতে। আইনস্টাইনের তত্ত্বের সীমাবদ্ধতা নিয়ে নানা বিতর্ক চলছে এবং ভবিষ্যতেও চলবে। তবু যত দিন যাচ্ছে তাঁর প্রস্তাবিত তত্ত্বগুলির এক সুষমাময় সৌন্দর্য তত অভিভূত করছে বিজ্ঞানীদের। সে তত্ত্বগুলি কালের ধোপে না টিঁকলেও, আইনস্টাইনের ভাষায় 'বিংশশতাব্দীর সুরুতে কে ভেবেছিল যে পঞ্চাশ বছরে আমরা জ্ঞানের রাজ্যে এতটা অগ্রসর হব'। এই অগ্রসরতা সম্ভব হত না আইনস্টাইনের মতো প্রতিভার আবির্ভাব না ঘটলে। আর কালের নিরিখে তত্ত্বের স্থায়িত্বের প্রশ্নে, সেখানেও তাঁরই উক্তি : I do not want to be right. I only want to know whether I am right.।

তবু বিশেষ জ্ঞানের বা বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে আইনস্টাইনের এই যে মহিমময় বিচরণ যা সমকালের বিজ্ঞানভাবনাকে শুধু ভেঙ্গেচুরে দেয়নি, আগামী উত্তরকালের অনেক কাল পর্যন্ত প্রসারিত হয়ে যা সামগ্রিক বিজ্ঞানকে আশরীর প্রভাবিত করবে, সেখানেই যদি আইনস্টাইন নিজের গণ্ডী টেনে দিতেন, তাহলে তাঁকে ঘিরে দীর্ঘ পঞ্চাশ বছর জনকৌতূহল এমন উদ্বেলিত হ'ত না। কী সেই আকর্ষণ যাতে আইনস্টাইন কিংবদন্তীর নায়ক, জনসাধারণের কাছে শতাব্দীর বিস্ময়? সেকি চ্যভন-এর লিপি আলেখ্যের ( পৃঃ ৫৬ ) ব্যক্তি আইনস্টাইন—

"...আইনস্টাইন ১·৭৬ মিটার দীর্ঘ ও বিস্তৃতস্কন্ধ, সামনের দিকে সামান্য কিছুটা ঝুঁকে চলেন। মাথার ছোট খুলিটি লক্ষণীয় ভাবে চওড়া দেখায়। গায়ের রং কালচে। বৃহদায়তন আবেগময় মুখমণ্ডলের ওপর সরু একজোড়া গোঁফ ( এটি তরুণ বয়সের বর্ণনা, আনুমানিক ১৯০৩ ) আর ঈগলের ঠোঁটের মত বাঁকানো নাক। বাদামী চোখ দুটিতে এক গভীর দেবসুলভ দ্যুতি। কণ্ঠস্বর সুরেলা ও মিষ্টি, যেন ভায়োলিনের অনুরনিত সুরধ্বনি। আইনস্টাইন সুন্দর ফরাসী বলেন, উচ্চারণে সামান্য বিদেশী টান।"

নাকি আরেক অসামান্য মননশীল অক্লান্ত চিন্তাশীল আইনস্টাইন যাঁর—

'প্রকাশিত গবেষণা ২৭৪, অন্য বিষয়ের লেখা ৩৩২। এ ছাড়া প্রিন্সটন বিশ্ববিদ্যালয়ে রক্ষিত ২৮টি ফাইলপূর্ণ অসংখ্য অপ্রকাশিত লেখা যা আজো প্রকাশের অপেক্ষায়; যে অপ্রকাশিত লেখাগুলি প্রকাশের জন্য আমেরিকার ন্যাশানাল সায়ান্স ফাউণ্ডেশনের অনুদান বরাদ্দ হয়েছে ৭,৮৭,৩০০ ডলার, কিন্তু প্রকাশের পরিকল্পনা আজো মতানৈক্যে বিঘ্নিত।'

নাকি সেই আইনস্টাইন—

জীবৎকালেই যাঁর মূর্তি ( ১৯৩০ সালে ) গতাসু শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানীদের মূর্তির প্রত্নশালার অন্তর্ভুক্ত এবং তিনি নিজে তা দেখে গেছেন।

নাকি সেই আইনস্টাইন যাঁর—

শতবার্ষিকীতে (১৯৫৬) ওয়াশিংটনের ন্যাশানাল অ্যাকাডেমী অফ্ সায়ান্সেস এর প্রান্তরে বসা অবস্থায় ১২ ফুট দীর্ঘ অতিকায় ব্রোঞ্জ মূর্তি, যাতে ব্যয় হয়েছে ১·৬ মিলিয়ন মার্কিন ডলার; গাছের ছায়ায় যে মূর্তি কপালে বলিরেখা নিয়ে তাকিয়ে আছে একটি বিন্দু হয়ে ( এবং থাকবে 'যাবচ্চন্দ্রদিবাকরৌ' ), যা দেখে New Scientist পত্রিকা মন্তব্য করেছে—

...Bronze Einstein watches over the Universe.

এই সামগ্রিক বিশ্বের দিকে নিবদ্ধদৃষ্টি যে আইনস্টাইন, সে আইনস্টাইনের মূর্তি, সে আইনস্টাইনের ছবি, সত্যানুসন্ধানী বিজ্ঞানীর—যে বিজ্ঞানীর ধর্ম 'হিরণ্ময় পাত্রের আবরণ উন্মোচন' করে সত্যের অনুসন্ধান। সে আইনস্টাইন মনে করেন—বিশ্বের দুটি রূপ ঃ একটি মানুষের প্রত্যক্ষ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য চেতনাসাপেক্ষ বিশ্ব, merely personal world; অপরটি মানুষের অস্তিত্ব নিরপেক্ষ বিশ্ব, extra-personal world। সে আইনস্টাইন বিশ্বাস করেন—মানব নিরপেক্ষ এক পরম সত্য আছে, থাকবে। এই সব ধারণায় তিনি উপনীত হয়েছেন, প্রাচীন উপনিষদের ঋষিদের

মতো মননশীলতায়, ধ্যানের গভীর অন্তর্লোকে ডুব দিয়ে, যে ধ্যানলব্ধ চেতনা একান্তই তাঁর নিজস্ব, পূর্বসূরীদের ধারণা বা পরীক্ষালব্ধ ফলের সঙ্গে যার যোগ সামান্যই, যে পদ্ধতির নাম বৈজ্ঞানিক পরিভাষায় 'গেডাঙ্কে' বা চিন্তাসমীক্ষা। তাই ধ্যানে স্বজ্ঞালব্ধ জ্ঞানতপস্বী যে আইনস্টাইন তিনি শুধু বিজ্ঞানী নন, বিজ্ঞানী-দার্শনিক।

…"এক মহাজাগতিক অতীন্দ্রিয় চেতনা আমাকে বিজ্ঞানসাধনা ও সত্যান্বেষণে সর্বদা প্রেরণা দিয়েছে। অসীম রূপরহস্যে ভরা দুর্জ্ঞেয় শক্তির আধারস্বরূপ যে বিশ্ব-নিয়ন্তার সুনিয়ন্ত্রিত নিয়ম শৃঙ্খলা বিশ্বচরাচরে নিত্য ব্যক্ত, আমি সে রহস্যের অনুভূতি লাভ করেছি অপরিসীম কৃতজ্ঞতা ও সুতৃপ্ত বিস্ময়ে। এই অমূর্তের অনুসন্ধানই রচনা করেছে আমার ধর্মবোধ, আমার ঈশ্বর।" আইনস্টাইনের কাছে বিশ্বপ্রকৃতির কার্যকারণের সম্পর্কের রহস্যই ঈশ্বর। আইনস্টাইন personal God বা conventional religion-এ বিশ্বাসী ছিলেন না, বিশ্বাসী ছিলেন না সেই ঈশ্বরে যিনি শাস্তিদাতা বা মুক্তিদাতা, কিন্তু ঈশ্বররূপী প্রকৃতি এবং মহাজাগতিক ধর্মভাবনা তাঁকে এক নিগূঢ় এষণায় যুক্ত করেছিল। এ শতাব্দীর শুধু নয়, সর্বকালের শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানী আইনস্টাইন নির্দ্বিধায় ঘোষণা করেছিলেন ঃ আমি বিশ্বাস করি যে মহা-জাগতিক ধর্মীয় ভাবনা হচ্ছে বৈজ্ঞানিক গবেষণার জন্য সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী ও মহত্তম প্রেরণা।…আমাদের এই জড়বাদী যুগে তন্ময়চিত্তে বৈজ্ঞানিক গবেষণায় নিরত ব্যক্তিরাই একমাত্র নিষ্ঠাবান ধর্মপ্রাণ ব্যক্তি।……যারা সত্য এবং বোধিলাভের আকাঙ্ক্ষায় পরিপূর্ণভাবে নিমগ্ন তারাই বিজ্ঞান সৃষ্টি করতে পারে। অবশ্য অনুভূতির এই উৎসমুখ রয়েছে ধর্মের এলাকায়। এরই শাখায় থাকে একটি সম্ভাবনায় বিশ্বাস—এই অস্তিত্বময় জগতের মূলে যে সব কারণ আছে তা যুক্তিসম্মত, যুক্তি দিয়ে তাদের বোঝা যায়। এই বিশ্বাস নির্দ্বিধায় বহন না করলে, আমার মনে হয়, কেউ যথার্থ বিজ্ঞানী হতে পারেন না।…ধর্ম ছাড়া বিজ্ঞান পঙ্গু, আর বিজ্ঞান ছাড়া ধর্ম অন্ধ।'

আইনস্টাইনের প্রায় প্রত্যেক জীবনীকারই তাঁর একক ও নিঃসঙ্গ ভূমিকাটিকে উল্লেখ করেছেন, বিশ্লেষণ করেছেন। বস্তুত, কি বিজ্ঞান চিন্তায়, কি দার্শনিক চিন্তায়, সার্বিক মননশীলতায় তুলনীয় তাঁর কোন সহযাত্রী সমকালীন বিচরণে ছিলেন না বলেই তাঁর নিঃসঙ্গতা, তাঁর একাকীত্ব। তবু সসম্ভ্রম এই নিঃসঙ্গতা ছাপিয়ে, আরেক মানুষ আইনস্টাইন আজীবন আমাদের সচকিত করেছেন তাঁর উজ্জ্বল একটি প্রত্যয়ে, সেটি হল বিজ্ঞানীরা, দার্শনিকেরা সবাই সমাজসত্তার অংশ, প্রত্যেকের একটি

সামাজিক দায়িত্ব আছে। আইনস্টাইন বলেন, "ব্যক্তি যা সে তা-ই এবং তার যে গুরুত্ব তা তার ব্যক্তিত্বের গুণে ততটা নয়, যতটা তার মহান মানবসমাজের একজন হিসাবে। সমাজই মানবজীবনের বাস্তব ও আত্মিক অস্তিত্বকে, জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত অভিচালিত করছে।" আইনস্টাইন বলেন—'প্রতিদিন শতবার আমি নিজেকে স্মরণ করিয়ে দিই আমার অন্তর ও বহির্জীবনের পরিপুষ্টি সম্ভব হয়েছে জীবিত ও মৃত বহুজনের শ্রমের দাক্ষিণ্যে এবং এই জন্যেই গুরুত্ব দিয়ে থাকি, তাদের কাছ থেকে যা নিয়েছি বা এখনো নিচ্ছি, প্রতিদানে আমাকেও তাই দিতে হবে।'

এই যে মানবসমাজ, এ রাষ্ট্র-দেশ-কালের গণ্ডীতে বিচ্ছিন্ন নয়, এ এক নিখিল মানবসমাজ। সেই মানবসমাজকে সুস্থ, সুখী, পরিচ্ছন্ন, বিকশিত করার আত্যন্তিক ইচ্ছাই শুধু নয়, তার অনুসারী নানা কর্মকাণ্ডেও মানুষ আইনস্টাইন বারংবার আমাদের সামনে নানারূপে এসেছেন। এসেছেন তাঁর যৌবনে হিটলার-মুসোলিনীর সঙ্গে ফ্যাসিবাদের সঙ্গে প্রত্যক্ষ পাঞ্জা কষে, যখন তাঁর মাথার মূল্য নির্ধারিত হয়েছে পাঁচ হাজার টাকা! তিনি দেশত্যাগ করেছেন, অথচ আপোষ করেন নি। তিনি অকুতোভয়ে রাষ্ট্রনায়কদের হুঁশিয়ারি দিয়েছেন বুদ্ধিজীবিদের গণতান্ত্রিক স্বাধীনতা দাবী করে —'প্রকৃত সত্যান্বেষীকে শান্তিতে থাকতে দিন।' অন্যদিকে বিজ্ঞানীদের উদ্বুদ্ধ করেছেন 'রাষ্ট্র কর্তৃপক্ষের জবরদস্তির কাছে মাথা নত না করে বিবেকের নির্দেশে চলুন। এ যুগে বৈজ্ঞানিক ও যন্ত্র-কলাবিদদের বিশেষ ধরণের নৈতিক দায়িত্ব আছে।' লীগ অফ্ নেশনসে 'কমিশন ফর ইণ্টেলেকচুয়াল অপারেশনে' তাঁর সাগ্রহ যোগদান ওই বিশ্বশান্তি আর মানবকল্যাণের আর্তিতেই, আবার তার শূন্যগর্ভ অসারতায় বীতশ্রদ্ধ হয়ে সেখান থেকে পদত্যাগও ঐ আন্তরিক সততাতেই।

আইনস্টাইনকে একবার প্রশ্ন করা হয়েছিল ঃ আপনি যে বিজ্ঞানের চিন্তা ছেড়ে মানুষের কল্যাণের চিন্তা করছেন, এতে কি বিজ্ঞানের ক্ষতি হচ্ছে না? কিছু কিছু বিজ্ঞানীর মতে আপনি এটি ঠিক করছেন না।

আইনস্টাইন সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিয়েছিলেন "পৃথিবীর সর্বত্র এখন নানারূপ আন্দোলন হচ্ছে, নানা বিষয়ে জাগরণ হচ্ছে। এই সময়ে আমরা স্বতন্ত্র বা এককভাবে নিজের মতে যদি চলি সেটি ঠিক হবে না। এখন সময় এসেছে সমস্ত জাতির একত্রিত হয়ে মানুষের নানাবিধ সমস্যার সমাধান করবার।"

এই একত্রিত হয়ে, চিন্তা কর্মের স্বাধীনতা বজায় রেখে, এক অখণ্ড বিশ্বমানবিক রাষ্ট্ররূপের কথা তিনি চিন্তা করেছেন। বলেছেন গণতন্ত্রে আস্থার কথা। আবার 'Why Socialism'-এ সাম্যবাদী রাষ্ট্ররূপেও তাঁর গভীর আশ্বাসের আশ্রয় পেতে

চেয়েছেন, লেনিনকে শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেনঃ Men of his type are the guardians and restorers of the Conscience of Mankind.

যুদ্ধ ও শান্তি, ধর্ম ও বিজ্ঞান, রাষ্ট্রীয় ও ব্যক্তিস্বাধীনতা, শিক্ষা, জাতিবৈষম্য, উৎপাদন ব্যবস্থা, পুঁজিবাদ, দারিদ্রের রূপ এবং প্রতিকার, সমাজতন্ত্র—বহু বিচিত্র বিষয়ে তাঁর চিন্তার উৎসার, তাঁর Out of My Later Years, World as I See It গ্রন্থে।

সারা পৃথিবীর সমকালীন শ্রেষ্ঠ মনীষীরা তাঁর সাহচর্যে এসেছেন, তাঁদের থেকে তিনি নিয়েছেন যত, দিয়েছেন আরো বেশী। ভারতীয়েরাও এসেছেন। গান্ধীর শান্তিবাদী ভূমিকা এবং অসহযোগের নির্ভীক ভূমিকায় তাঁর সশ্রদ্ধ উল্লেখ বারবার। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর আলাপ হয়েছে, আলোচনা হয়েছে সত্য-শিব-সুন্দর, ঈশ্বর নিয়ে। আচার্য সত্যেন্দ্রনাথ বসুর নাম তো অবিচ্ছেদ্য ভাবে যুক্ত হয়ে গিয়েছে তাঁর বিজ্ঞান কর্মে। আচার্য নিখিলরঞ্জন সেনও তাঁর কাছে ছাত্র হবার সৌভাগ্য অর্জন করেছেন। যে কথাটি আমরা অল্পই জানি সেটি হল মুক্তিকামী আইন-স্টাইনের পরাধীন ভারতবর্ষের ওপর মমত্ব। আমরা অল্পই জানি, সে যুগের বিপ্লবী-দলের বার্লিন সোসাইটির সভায় আইনস্টাইন উপস্থিত হয়েছিলেন ওই মমত্ব বোধে; মীরাট ষড়যন্ত্র মামলায়, চরম দণ্ডে দণ্ডিত আসামীদের মুক্তির জন্যে দোর্দণ্ড বৃটিশ শাসকদের কাছে আন্তর্জাতিক বুদ্ধিজীবিদের যে স্বাক্ষরিত অনুরোধ পত্র এসেছিল তাঁর প্রথম স্বাক্ষরটির নাম ছিল ভারতপ্রেমিক রোমা রোঁলার, এবং দ্বিতীয় নামটি ছিল অ্যালবার্ট আইনস্টাইনের।

আটজন দণ্ডিত নিগ্রোর মুক্তির জন্যে প্রেসিডেণ্ট হুভারের কাছে যে আবেদন পৌঁছেছিল তারও স্বাক্ষরিত প্রথম নামটি ছিল, অ্যালবার্ট আইনস্টাইনের।

তবু তারপরেও আরেক আইনস্টাইন থাকেন এক উজ্জ্বল মহিমায়, যিনি সকৌতুক, রঙ্গপ্রিয়, পরিহাসে বুদ্ধিদীপ্ত,—ভালোবাসার মানুষ আইনস্টাইন। সেই আইস্টাইনকে আবিশ্ব সাধারণ মানুষ উদগ্র আগ্রহে গ্রহণ করে, নানা টুকরো সংলাপে, নানা টুকরো ঘটনায়। সেই আইনস্টাইনের নামে সংবাদপত্রে বেরোয় "প্রসিদ্ধ সঙ্গীতজ্ঞ অ্যালবার্ট আইনস্টাইনের অতি মনোজ্ঞ বেহালা বাদন। তাঁর মধুর বাজনাতে প্রমাণ হল যে, বেহালা বাজনাতে সত্যই তিনি অদ্বিতীয়।" সেই আইনস্টাইন নিজের বাড়ীর ঠিকানা আর চাবি বারংবার ভুলে যান। সেই আইনস্টাইন, ছোটো মেয়ের স্কুলের অঙ্ক চুপি চুপি কষে দেন। সেই আইনস্টাইন মজার মজার ছড়া লেখেন, ভেংচি কেটে ছেলেদের সঙ্গে খেলা করেন, মজার মজার পোজে ছবি

তুলতে দেন। সেই আইনস্টাইন সহকর্মী বিজ্ঞানী ইনফেল্ডের দারিদ্র্য মোচনে হঠাৎ গ্রন্থ রচনার উদ্দীপনায় মেতে যান। গ্রসমান পরিবারের ঘটনা ( পৃঃ ৩৫ ), এরাটের মার কথা ( পৃঃ ৩৫ ), ফ্রাউলিন ভেগেলিনের কথা ( পৃঃ ৩৮ ), গ্রসমানকে চিঠি ( ···ভগবান যখন গাধা সৃষ্টি করেন তখন সেই সঙ্গে তাকে একটা পুরু চামড়াও দিয়েছিলেন ) ( পৃঃ ৪৭ ), অলিম্পিয়ান অ্যাকাডেমীর কথা ( পৃঃ ৫৩ ), বেসোর মন্তব্য ( পৃঃ ৫৫ )—এসব সাধারণ মানুষের কাছে আইনস্টাইনকে আরো হার্দ্য করে তোলে। শ্রীরামকৃষ্ণের একটি বিখ্যাত উক্তি: 'আমাকে রসে-বশে রাখিস মা, আমাকে শুকনো সন্ন্যাসী করিস নে।' রসে-বশে যে আইনস্টাইন, সে আইনস্টাইন বুঝি আরো অনুপম, আরো কমনীয়, আরো রমণীয়।

আইনস্টাইন সম্বন্ধে আমরা যা জেনেছি, না-জানা-অংশ আরো ঢের বেশী। যে কথা আমি আগে উল্লেখ করেছি, তাঁর সুবিপুল অপ্রকাশিত রচনায় কী আমাদের জন্যে তিনি রেখে গেছেন, তা আমরা এখনো জানিনে। এও জানিনে, তাঁর সম্পূর্ণ মূল্যায়ন কখনো, কোনোদিনও সম্ভব হবে কিনা। আইনস্টাইন মস্তিষ্কে বড়ো, না হৃদয়ে বড়ো এ প্রশ্নও অমীমাংসিত থেকে যাবে। তবু তাঁর পূর্ণতর মূল্যায়নের দায়িত্ব উত্তরকালের। সেই উত্তরকালের মূল্যায়নের দায়িত্ব নিয়ে, পৃথিবীর নানা প্রান্তের নানা ভাষার সঙ্গে বাংলাভাষাতেও আইনস্টাইনের কয়েকটি জীবনী, কয়েকটি মূল্যায়নের সৎ প্রচেষ্টা আমরা পেয়েছি। পেয়েছি শ্রীদ্বিজেশচন্দ্র রায়ের গ্রন্থ, শ্রীরবীন বন্দ্যোপাধ্যায়ের গ্রন্থ, শ্রীমণি বাগচীর গ্রন্থ এবং শতবার্ষিকীতে শ্রীঅমল দাশগুপ্তর গ্রন্থ, শ্রীসাধন দাশগুপ্তের গ্রন্থ। প্রতিটি গ্রন্থই সুলিখিত, যদিও স্বাদে-তথ্যে-উপস্থাপনে তারা প্রত্যাশিতভাবেই ভিন্ন। এই তালিকায় সর্বশেষ গ্রন্থ অধ্যাপক অমূল্যভূষণ গুপ্তের বর্তমান গ্রন্থটি। শ্রীগুপ্ত পদার্থবিদ্যার কৃতী অধ্যাপক, সুলেখক, সুবক্তা এবং সর্বোপরি তাঁর বাংলা ভাষার ওপর স্বচ্ছন্দ কুশলী দক্ষতা, যা প্রায় ঈর্ষণীয় আমার কাছে। প্রগাঢ় আন্তরিকতায় এবং সযত্ন তথ্যচয়নে ও বিশ্লেষণে তিনি যথার্থই আইনস্টাইনের অনন্যতা তুলে ধরেছেন এ গ্রন্থে। লঘু আলাপাচারী আইনস্টাইনকেও এখানে যেমন আমরা পাই, তেমনি পাই গভীরতায় এক মহান বিজ্ঞানীর কীর্তি বিশ্লেষণকেও। গ্রন্থটি উল্লেখ্য সংযোজন, বাংলায় বিজ্ঞানীর জীবনসাহিত্যে। যে আইনস্টাইন বেহালা বাজান, বাজান মোজার্ট ও বাখের সিম্ফনি—তাঁর সমস্ত জীবনই নানা সুরের একটি সুষম সমন্বয়ের হারমনি। শ্রীগুপ্ত সফল হয়েছেন শ্রদ্ধানম্রতার সঙ্গে পরিশ্রমের যুগলবন্দী ঘটিয়ে এই মহাজীবনের হারমনিটিকে সামনে রেখে তাঁর প্রতি এই নম্র প্রণাম নিবেদনে, যা কবির ভাষায় 'নানা সুরের আকুলধারা / মিলিয়ে দিয়ে আত্মহারা /'

একটি নমস্কারে প্রভু, একটি নমস্কারে।' একটিই মাত্র সংশয় আমার এ গ্রন্থে—গ্রন্থটিতে কোন পর্ববিন্যাস করা হয়নি, অবিচ্ছিন্ন একটি ধারায় আলোচনা বয়ে গেছে, যেটি আমার মনে হয় শ্রীগুপ্ত পরবর্তী সংস্করণে পুনর্বিবেচনা করতে পারেন।

আইনস্টাইনের জীবৎকালে পারমাণবিক যুগের সূচনা হয়েছিল। কলসীর দৈত্য ছাড়া পেয়েছিল হিরোসিমা নাগাসাকির বীভৎস গণ-হত্যায়। 'বোতামটি আমিই টিপেছিলাম'—এই আত্মগ্লানি ছিল তাঁর আমৃত্যু। এই অপপ্রয়োগে, এই হিংসায় উন্মত্ত পৃথিবীতে তিনি আরো নিঃসঙ্গ, আরো একক হয়ে গিয়েছিলেন, বিমর্ষ আশাহত হয়ে গিয়েছিলেন—এ বিবরণ তাঁর নিকটচারীদের। তবু দায়িত্ববোধে অবিচল, সংগ্রামী আইনস্টাইন—তখনো শেষবার নেমে এসেছিলেন পথে, পারমাণবিক শক্তির অপপ্রয়োগকে আন্তর্জাতিক সংহতি দিয়ে, বুদ্ধিজীবিদের নৈতিক প্রতিরোধ দিয়ে রুখবার চেষ্টা করেছিলেন। সেই তাঁর শেষ চেষ্টা, মানবজাতির কাছে তাঁর শেষ বিবেকের আবেদন 'পৃথিবীর গভীর···গভীরতর অসুখ' থেকে 'অলখ, অরুণোদয় পরিচ্ছন্ন মানবসমাজে'র উজ্জ্বল বিকাশে উত্তরণ করানোর শেষ চেষ্টা।

১৭ এপ্রিল ১৯৫৫, জীবনের শেষ সূর্যোদয়ের দিনটিতে তিনি শুয়ে শুয়ে শেষ করেছিলেন রাসেলের বিশ্বশান্তির ইস্তাহারের খসড়া লেখাটি, সই করেছিলেন সেই খসড়াটিতে ( পৃঃ ৩২৩ )। সেই আইনস্টাইনের শেষ সই—সমস্ত পৃথিবীর মানুষের জন্য, রেখে যাওয়া শেষ আকাঙ্ক্ষা, শান্তি-সমৃদ্ধি-ভালোবাসা।

আইনস্টাইনের এককালীন সহকর্মী ব্যানেশ হফম্যান ও প্রাক্তন সেক্রেটারী হেলেন ডুকাস আইনস্টাইন শতবার্ষিকীতে, আইনস্টাইনের টুকরো টুকরো কথা গ্রথিত করে একটি বই প্রকাশ করেন 'অ্যালবার্ট আইনস্টাইন—দি হিউম্যান সাইড'। তাতে আইনস্টাইন লিখছেন ঃ

"আমি বিশ্লেষিত হওয়ার চেয়ে অন্ধকারেই থাকতে ভালবাসি"। কিন্তু সে অন্ধকার কি সত্যিই অন্ধকার ? না—সে 'আঁধার আলোর অধিক !'

দেশ-কালের পটধৃত সব কিছুই। ব্যক্তিমানসও। তবু 'আপেক্ষিকতা তত্ত্বে'র পরিপ্রেক্ষিতেই বলা যায়, দেশ বদলে যাবে, কাল বদলে যাবে, বদলে যাবে ব্যক্তি মানসও। তবু বিস্মরণের আকাশে অনেক তারা যখন ধূসর হয়ে আসবে, তখনো একটি তারা ভাস্বর হয়ে থাকবে দেশ-কাল-পাত্রের সীমানা পেরিয়ে, শুভবুদ্ধিতে চেতনাশীল সব মানুষের মনের আকাশে। সে ধ্রুবতারা—বিজ্ঞানী আইনস্টাইন, মানবদরদী আইনস্টাইন, আচার্য আইনস্টাইন।

## ॥ ঋণ স্বীকার ॥

গ্রন্থটি মাধুকরী বৃত্তির ফসল। বহু দুয়ার থেকে এর উপকরণ সংগ্রহ করা। প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ঋণের বোঝাটি তাই বৃহদায়তন ও গুরুভার। স্থানাভাবে সকল ঋণের যথাযোগ্য স্বীকৃতিতে অপারগতার জন্য দুঃখিত। এর মধ্যে যাঁদের ঋণ-সুখভারে আমি সত্যি পীড়িত তাঁরা হলেন ঃ

১। বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের প্রাক্তন সভাপতি ডক্টর ক্ষেত্রপ্রসাদ সেনশর্মা। ইনি তাঁর অনবদ্য ভূমিকার সংযোজনে বইটির গুরুত্ব বহুগুণ বাড়িয়ে দিয়েছেন। লিপির আঁচড়ে আঁচড়ে রূপরেখায় আইনস্টাইনের এত চমৎকার ব্যক্তিত্ব-চিত্রণ করেছেন যে, ভয় হয়, মূলগ্রন্থটি পাঠ করা থেকে পাঠক বিরত না হন।

২। ইণ্ডিয়ান স্ট্যাটিস্টিক্যাল ইনস্টিটিউটের শ্রীশৈলেশ সেনগুপ্ত। যে ঘটনার বিবরণে গ্রন্থটির আরম্ভ ইনি শুধু যে তার উৎসের সন্ধান দিয়েছেন তাই নয়, কার্যত অনুবাদ কার্জটিও নিষ্পন্ন করেছেন।

৩। বন্ধুবর শ্রী অজয় দাশগুপ্ত। লাওৎসের যে কবিতায় গ্রন্থের সমাপ্তি তার অনুবাদ কাজে সাহায্য করা ছাড়াও বইটির সৌকর্যসাধনে ইনি ছিলেন সদা বাঙ্ময়।

৪। শ্রীহীরালাল মুখোপাধ্যায়। মুদ্রাকরের নামাবলীর অন্তরালে এঁর সাহিত্যিক মনভ্রমর মাঝে মাঝেই আমার কানের কাছে গুঞ্জরিত হয়ে উঠেছে। ফলে বহুস্থানে পরিমার্জনার সুযোগ পেয়েছি।

৫। ডক্টর বৈদ্যনাথ হালদার, শ্রীজয়ন্ত দাশগুপ্ত ও ডক্টর দুর্গানারায়ণ ঘোষাল। প্রতিটি ফর্মা পড়ে নিরপেক্ষ সমালোচনা ও আস্বাদনের তৃপ্তিতে পরের ফর্মাগুলোকে আরও ভাল করে তুলতে এই তিন সুহৃদ আমায় উৎসাহ ও প্রেরণা দিয়েছেন।

৬। অসংখ্য পত্রপত্রিকা ও প্রামাণিক যে সব গ্রন্থ থেকে নানা তথ্য, চিত্র, ও ঘটনা সংগ্রহ করেছি তাদের সম্পাদক, লেখক ও প্রকাশক। সংখ্যাধিক্যের জন্য সকলের নাম উল্লেখ করা সম্ভব হল না। যাঁদের নাম না করলে অমার্জনীয় অপরাধ হবে তাঁদের মধ্যে আছেন কুজনেৎসভ, সীলিগ, ইনফেল্ড, ফিলিপ, হফমান, হেলেন ডুকাস, ম্যাক্স বর্ন, আইচেলবার্গ, সেকসল, হুইলার ও হোলটন। আইনস্টাইনের নিজের লেখাগুলোর কথা অনুক্তই থাক।

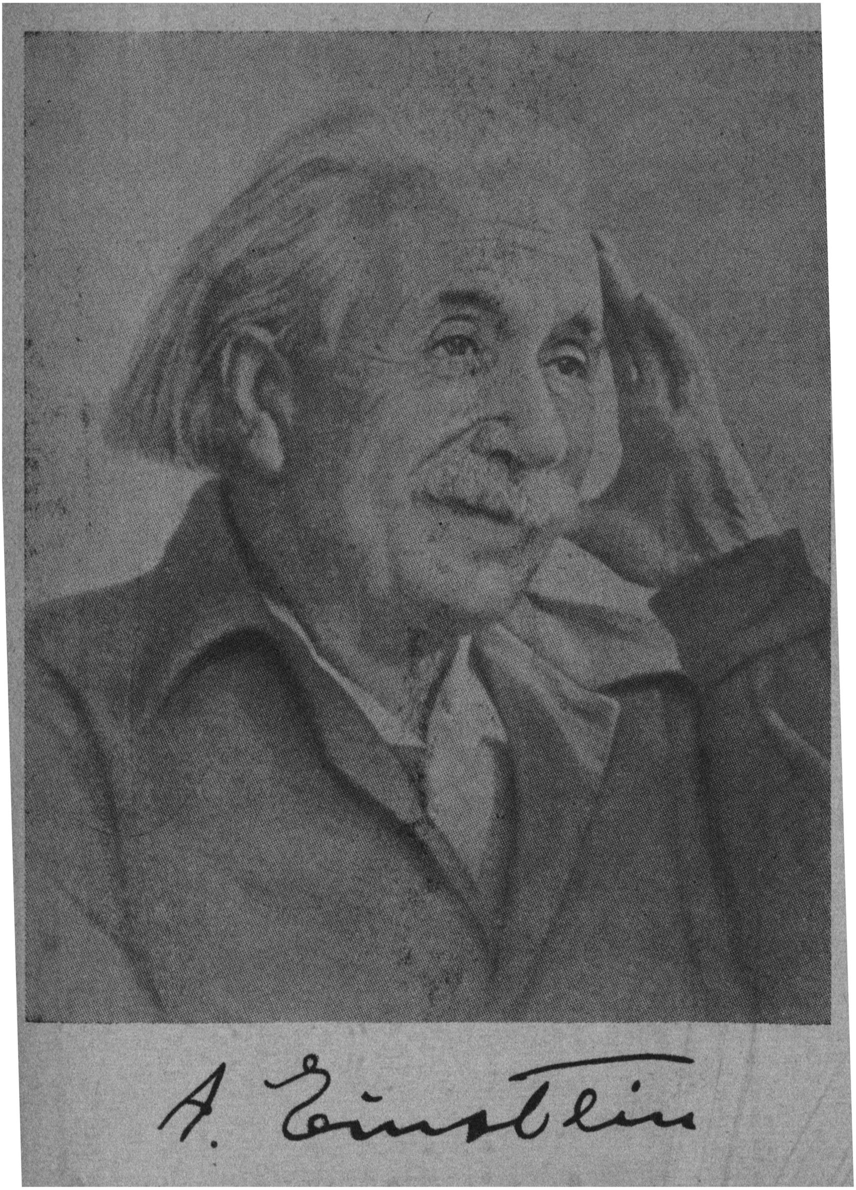
প্রতিভার জগতেও বিস্ময়কর যে বিশ্বতোমুখ প্রতিভা তাঁর সমগ্রজীবন ও বিজ্ঞান-কৃতি একটি মাত্র বই-এ উপস্থিত করা অসম্ভব। সে পণ্ডশ্রমের চেষ্টাও আমি করিনি। মোটামুটি ধারাবাহিকতা বজায় রেখে আইনস্টাইনের জীবন ও নিতান্ত রূপরেখায় তাঁর বিজ্ঞানসাধনা উপস্থাপনের মাধ্যমে তুলে ধরার চেষ্টা করেছি তাঁর অনন্য ব্যক্তিত্বকে। কতদূর সফল হয়েছি জানিনে।

লেখা শুরু করার সময় যাঁর কথা বারবার মনে হয়েছে শেষ করেও তাঁরই কথা মনে পড়ছে। তিনি মহাকবি কালিদাস। 'রঘুবংশ'-এর আরম্ভে কালিদাস লিখলেন—

"ক্বঃ সূর্য-প্রভবো বংশঃ ক্ব চাল্প-বিষয়ামতিঃ।
মন্দঃকবি যশোপ্রার্থী গমিষ্যামুপহাস্যতাম ॥"

কোথায় সূর্যসদৃশ ভাস্বর রঘুবংশ, আর কোথায় অল্পমতি কবি যশোপ্রার্থী আমি কালিদাস। এ যেন ভেলায় চড়ে সমুদ্র পাড়ি দেয়ার হাস্যকর প্রচেষ্টা—"তিতীর্ষুঃ দুস্তরং মোহাদুডুপেনাস্মি সাগরম্।" কালিদাসের কাছে যা ছিল বিনয়ের অভিপ্রকাশ, আমার কাছে তা বজ্রকঠোর বাস্তব। ইতি—

অমূল্যভূষণ গুপ্ত


A. Einstein

লণ্ডনের বিখ্যাত স্যাভয় হোটেল। বহু ভোজসভার সাক্ষী। তেমনি একটি ভোজসভার আয়োজন হয়েছে আজ। আয়োজন করেছেন লণ্ডনের বিদ্বৎ-সমাজ। উদ্দেশ্য এক নিরীহ অধ্যাপককে সম্বর্ধনা জানানো।

সম্বর্ধনা জানানোর রীতি অনুযায়ী শুরু হল বক্তৃতা। মানুষের প্রজ্ঞা ও কর্মকাণ্ডের দুই মূল ধারা ধর্ম আর বিজ্ঞান। বক্তা এই দুয়ের তুলনামূলক বিচারের দ্বারা বক্তৃতার সূচনা করলেন।

'ধর্ম সর্বদাই অভ্রান্ত। ধর্ম প্রতিটি সমস্যার সমাধান করে, জগতের সমস্ত ঝামেলা মেটায়। ধর্ম আমাদের দেয় নিশ্চয়তা, স্থায়িত্ব, শান্তি আর সর্বোপরি পরিপূর্ণতা। আমরা যাকে ভয় করে চলি সেই প্রগতির হাত থেকে এ আমাদের রক্ষা করে। আর বিজ্ঞান! একেবারে আলাদা জিনিস। বিজ্ঞান সব সময়েই ভুলে ভরা। অন্তত দশটা নতুন সমস্যার জন্ম না দিয়ে সে একটা সমস্যারও সমাধান করতে পারে না।'

শ্রোতৃবর্গ বিস্ময়-বিমূঢ়। বক্তা বলে চলেছেন। 'পৃথিবীতে এ পর্যন্ত নাকি মাত্র আটজন শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানী জন্মেছেন। এঁরা হলেন পিথাগোরাস, অ্যারিস্টটল, টলেমি, কোপারনিকাস, গ্যালিলিও, কেপলার, নিউটন এবং আইনস্টাইন। বাকীরা এই আট জন 'মহাজনো যেন গত স পন্থা'-র অনুসরণকারী মাত্র। এই অষ্টকের মধ্যে আবার তিনজন বিশেষত্বের দাবী করতে পারেন। এই ত্রয়ী হলেন টলেমি, নিউটন আর আইনস্টাইন।

'কোপারনিকাস প্রমাণ করলেন টলেমি ভুল। কেপলার প্রমাণ করলেন কোপারনিকাস ভুল। গ্যালিলিও দেখালেন অ্যারিস্টটলের

ভুল। ভুল প্রমাণের ধারাটি এখানে এসে থেমে গিয়েছিল। পরবর্তী দুর্জ্ঞেয় জাগতিক রহস্য মোচনের দায়িত্ব যাঁর উপর বর্তাল তিনি হলেন একজন ইংলিশম্যান ।

'একজন ইংলিশম্যান বলেই নিউটন তাঁর অলোকসামান্য প্রতিভার সঙ্গে এমনভাবে সারল্য আর ভ্রান্তি মিশিয়ে দিতে পারতেন যাতে একটা খরগোসও লজ্জা পেত। ইংলিশম্যান বলেই তিনি এক রেক্টিলিনিয়ার বা ঋজুরৈখিক ব্রহ্মাণ্ডকে স্বতঃসিদ্ধ বলে মেনে নিয়েছিলেন, কেননা 'স্কোয়ার' শব্দটি ইংরেজদের কাছে ন্যায়ের প্রতীক। নিউটন অবশ্যই জানতেন যে, মহাবিশ্ব গতিশীল বস্তুপুঞ্জে গড়া এবং মহাজাগতিক কোন বস্তুই সরলরেখায় চলে না, চলতে পারে না। কিন্তু ইংলিশম্যান কখনো বাস্তব ঘটনায় দমবার পাত্র নয়। নিজের মতবাদকে প্রতিষ্ঠিত করতে তাই তিনি এক মহাবল আবিষ্কার করে বসলেন—যাকে বলে মহাকর্ষ।

'এভাবে রূপায়িত হল এক সম্পূর্ণ বৃটিশ ইউনিভার্স বা বৃটিশ মহাবিশ্ব। নিউটন একে প্রতিষ্ঠিত করলেন ধর্মের মতো পরিপূর্ণভাবে এবং পবিত্রতম বিশ্বাসরূপে। সুদীর্ঘ তিনশো বছর ধরে এ বেঁচে রইল। নিউটনের ধর্মগ্রন্থটি প্রাচ্য দেশের কোন ইন্দ্রজালের বই নয়, একেবারে বাইবেল। জিনিসটি খাঁটি বৃটিশ এবং সত্যিকারের একখানা ব্র্যাড্‌শ। এতে রয়েছে নক্ষত্রলোকের সমস্ত স্টেশন, তাদের দূরত্ব এবং বেগ, গ্রহ-উপগ্রহেরা কখন গ্রহণ লাগার বিন্দুতে পৌঁছবে ইত্যাদি সব তথ্য। প্রত্যেকটি বিষয় নিখুঁত, নিশ্চিত, স্বুস্বয় এবং বৃটিশ।

'তিনশো বছর কেটে যাওয়ার পর আজ মধ্য য়ুরোপে আবির্ভূত হয়েছেন এক নিরীহ তরুণ অধ্যাপক। আমাদের জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের তিনি বলেছেন—ভদ্রমহোদয়গণ, আপনারা যদি গভীরভাবে পরবর্তী সূর্যগ্রহণ পর্যবেক্ষণ করেন তা হলে বুধ গ্রহের অনুসূরের বিচ্যুতি হিসেব করতে পারবেন। কথাটা শোনামাত্র হা-হা করে উঠেছে সভ্যজগৎ—কি সাংঘাতিক কথা! এরপর হয়ত আমরা শুনতে পাব

অধ্যাপক মশাই মহাকর্ষের অস্তিত্ব নিয়েই প্রশ্ন তুলেছেন।'

'অধ্যাপক মৃদু হেসে বলেছেন যে, মহাকর্ষ খুব প্রয়োজনীয় তত্ত্ব এবং প্রায় সব ক্ষেত্রেই চমৎকার ফল দেয়। তবে ব্যক্তিগত-ভাবে এ তত্ত্ব ছাড়াই তিনি এগিয়ে যেতে সমর্থ। তাঁর কাছে ব্যাখ্যা চাওয়া হল, মহাকর্ষ না থাকলে চিরবেগশীল বস্তুজগৎ মহাবিশ্বের বাইরে চলে যেত কি না। তিনি জবাব দিলেন, ব্যাখ্যা অনাবশ্যক। কেননা ব্রহ্মাণ্ড মোটেই ঋজুরৈখিক নয়, বৃটিশ ইউ-নিভার্সের সঙ্গে এর এতটুকু মিল নেই। ব্রহ্মাণ্ডের রূপ কার্ভিলিনিয়র বা বক্ররৈখিক।

'অবশেষে নিউটনীয় বিশ্বের তিরোধান ঘটল।'

বিস্ময়কর তির্যক ভাষণের পর বক্তা থামলেন। বক্তৃতা গুটিয়ে নিয়ে নিরীহ অধ্যাপকের উদ্দেশে ব্যক্তিগত শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করে বললেন :

'এই লণ্ডন শহরে ছোট বড় হরেক রকম গ্রেটম্যানের ছড়াছড়ি। সম্বর্ধনা জানাতে গিয়ে আমরা যখন তাঁদের স্বাস্থ্যপান করি এবং প্রশস্তি গাই তখন তাঁদের ভণ্ডামিগুলো চেপে যাওয়ার পাপ করে থাকি। মনে করুন, নেপোলিয়নের স্বাস্থ্যপান করার প্রস্তাব নিয়ে আমাকে উঠে দাঁড়াতে হয়েছে। তখন যেটা বলা অবশ্য কর্তব্য তা কিন্তু আমি কিছুতেই বলতে পারব না। সে কথাটা হল, মানব-জাতির পক্ষে পরম মঙ্গলজনক হত যদি নেপোলিয়ন আদৌ না জন্মাতেন।

'সৌভাগ্যের বিষয়, এ সভায় মনের ভাব চেপে রাখার অপরাধ আমাদের করতে হবে না। অনেকে আছেন যাঁরা অখ্যাতদের মধ্যে খ্যাতিমান। আবার কেউ কেউ আছেন যাঁরা বিখ্যাতদের মধ্যে বিখ্যাত। আজ তেমন এক প্রতিভাধরকেই আমরা সম্বর্ধনা জানাচ্ছি। নেপোলিয়ন এবং তাঁর মত কীর্তিমানেরা অনেকে সাম্রাজ্য গড়েছেন। কিন্তু দু-চারজন মানুষ এগিয়ে গেছেন আরও বহু দূর। তাঁরা গড়ে

তুলেছেন মহাবিশ্ব এবং সে কাজ করতে গিয়ে একবিন্দু নররক্তে হাত কলঙ্কিত করেন নি।'

একজন নিরীহ অধ্যাপকের সম্বর্ধনা সভায় এই দীর্ঘ অপরূপ তির্যক ভাষণটি যিনি দিলেন সেই মানুষটি আর কেউ নন, স্বয়ং জর্জ বার্নাড শ সংক্ষেপে জি. বি. এস.। আর নিরীহ অধ্যাপকটি যিনি এতক্ষণ বিনম্র-লজ্জায় শ'র ভাষণ শুনছিলেন (কেননা, স্বভাবত পূর্বসূরীদের তিনি সম্মান করতেন, বিশেষ করে নিউটনের প্রতি তাঁর ছিল অপরিসীম শ্রদ্ধা) তিনি হলেন আধুনিক বিজ্ঞানের বিস্ময়কর প্রতিভা আলবার্ট আইনস্টাইন—যাঁর জীবনের প্রতিটি পর্যায় অসাধারণ, অনন্য। যাঁকে দেখে এবং যাঁর সঙ্গে কথা বলে বিশ্বের সর্বকালের শ্রেষ্ঠ অভিনেতা চার্লি চ্যাপলিন বলেছিলেন—'আইনস্টাইন যেন শেকসপীয়রের সৃষ্ট একটি চরিত্র—তেমনি সম্পূর্ণ, তেমনি মৌলিক, কারো সঙ্গে তাঁর তুলনা চলে না—অবিস্মরণীয়ভাবে অনন্য'। স্যাভয় হোটেলের সম্বর্ধনা অনুষ্ঠানে শ'র মূল্যায়নে বোঝা যায়, বিজ্ঞান-দুনিয়ার এই নবীন ফলশ্রুতি সমকালীন সংস্কৃতির পরিমণ্ডলেও কী বিপুল আলোড়নের সৃষ্টি করেছিলেন।

শ'র কথার সূত্র ধরে বিজ্ঞানের ইতিহাসের দিকে একটু পেছন ফিরে তাকানো যাক। পৃথিবীতে মানুষ এসেছে কতদিন? প্রায় দশ লক্ষ বছর। লিখতে শিখেছে প্রায় ছ' হাজার বছর। কৃষি কাজ শিখেছে তারও সামান্য কিছু আগে থেকে। আর বিজ্ঞান? সেতো নেহাত সেদিনের কথা। প্রায় তিনশো বছর। যুক্তিবাদের যা কিছু এতদিন স্কলারের মনোরাজ্যের চার দেয়ালে একাকীত্বের যাতনায় পীড়িত ছিল অকস্মাৎ তা মুক্ত প্রকৃতির সান্নিধ্য লাভ করল। সপ্তদশ শতকে মানুষ প্রথম তাকাল প্রকৃতির দিকে, প্রকৃতি-বিজ্ঞানের দিকে, ব্যবহারিক অভিজ্ঞার দিকে।

অষ্টাদশ শতকে দেখা দিল জনজীবনে যুক্তিবাদী চিন্তাধারার

সরাসরি ও বিপ্লবাত্মক অনুপ্রবেশ। উনিশ শতকের বিজ্ঞান আবিষ্কার করল যে, এই বিশ্ব অসংখ্য জটিল লূতা-তন্তু জালে বিধৃত, এবং ফলে চরিত্রে সে আরও মানবিক হয়ে উঠল। এই শতবর্ষের ইতিহাস বিজ্ঞানী মানুষের বাঁধন ভাঙার ক্রমভঙ্গহীন ইতিবৃত্ত। সেই সঙ্গে পরীক্ষা ও পর্যবেক্ষণের দুই পাখায় ভর করে যাচাই-এর আকাশে মুক্ত বিচরণের ইতিকথা! আপাত ছন্নছাড়া এই বিশ্বে বিজ্ঞান আবিষ্কার করল ছন্দের লীলাময় রূপ—'ছন্দে উঠিছে চন্দ্রমা, ছন্দে কনকরবি উদিছে।'

বিশ শতকে বিজ্ঞান মানুষের আরও কাছে এল। স্বতঃসিদ্ধতার মাধ্যমে সনাতন বিধানরূপে এতদিন যে সব প্রাকৃতিক নিয়ম বিজ্ঞান আবিষ্কার করেছিল ক্রমে তাদের নিকষ কুলীনত্বে মালিন্যের ছাপ ধরা পড়ল। নতুন নতুন সূক্ষ্ম বিধান এসে তাদের স্থান কেড়ে নিল। স্থূল-সূক্ষ্মের দ্বন্দ্ব চিরন্তন। স্থূল সহজ-সরল, চট করে মানসপটে ছাপ ফেলতে পারে। সূক্ষ্ম সর্বদাই জটিল এবং অধরা না হলেও ধরতে সময় লাগে, কষ্ট হয়। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, নবীন ধ্যান-ধারণাগুলোর সূক্ষ্মত্ব ও জটিলতা সত্ত্বেও বিশ শতকের সাধারণ মানুষের কাছে মনে হল যে, বিজ্ঞান ক্রমে স্বতঃসিদ্ধতার উচ্চ মার্গ থেকে নেমে আসছে ধূলার ধরণীতে। মহতো মহীয়ান ঘটনারাজি ঐ আসছে এবং সত্য ও ছন্দের অন্বেষণে বিজ্ঞানের প্রচেষ্টাকে কেউ স্তব্ধ করতে পারবে না—এ বোধ মানুষের মনকে দোলা দিল। অনাগত মানসিক বিপ্লবকে বরণ করতে নতুন আপাতবিরুদ্ধ বিশ্বছবিকে তাঁরা মেনে নিলেন।

বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারার ক্রমবিকাশের মধ্যেও একটা স্ববিরোধিতা লক্ষ্য করা যায়। মানবকেন্দ্রিক ধ্যান-ধারণা থেকে মানুষ যত মুক্ত হয়েছে সে ততই মানবিক হয়ে উঠেছে। এটাই স্বাভাবিক। কেননা, অ-মানবিক বস্তুতে মানুষী বৈশিষ্ট্যের আরোপ এই ধারণার জন্ম দেয় যে, সত্য-জ্ঞানের একমাত্র উৎস মোহান্ত পুরুষের

ভাগবতী আবির্ভাব। নব্য বিজ্ঞান এই ধারণার জাল কেটে বেরিয়ে এল। বস্তুনিষ্ঠভাবে প্রাকৃতিক বিধানে সে যতই প্রবেশ করেছে, ততই সে মানুষের কাছে এসেছে, মানবিক হয়ে উঠেছে। সপ্তদশ শতকের প্রথম দিকে ভূ-কেন্দ্রিক বিশ্বের ধারণা ছিল স্বাভাবিক। কেননা, খুব সরাসরি পর্যবেক্ষণে দেখা যায় সূর্য পৃথিবীর চারদিকে ঘুরছে। আবদ্ধ বৃত্তের দৃষ্টিভঙ্গি এতে প্রকাশিত। কিন্তু গ্যালিলিও যখন তাঁর সৌরকেন্দ্রিক বিশ্বছবি উপস্থাপিত করলেন তখন সরাসরি পর্যবেক্ষণের সঙ্গে তার সংঘর্ষ বাধলেও ইতালীর শহরগুলোর পথে পথে তা নিয়ে মানুষের মধ্যে দেখা গেল প্রাণবন্ত আলোচনা ও বিতর্ক। বিস্ময়ের হলেও ঘটনাটি সত্যি।

বিশ শতকে একজন বিজ্ঞানী প্রতিষ্ঠিত সকল ধারণা এবং স্বতঃসিদ্ধতার সঙ্গে চরম সংঘর্ষে লিপ্ত হয়েও অনায়াসে খ্যাতির চরম শিখরে উঠে যেতে পারেন। বলতে কি, এ যুগের মানসলোক এমন যে, স্ববিরোধিতার রোমান্সকে সে স্বাভাবিকভাবে বরণ করে নেয়, স্বতঃসিদ্ধতার কোন আবেদন সে অনুভব করে না। একে আমরা যুগলক্ষণ বলতে পারি। এ যুগের আরেকটি লক্ষণ হল সাধারণীকরণের প্রতি মানুষের একটা ঝোঁক। বিশেষ বিশেষ পর্যবেক্ষণ এবং তাদের বিশেষ প্রয়োগের ব্যাপার বিজ্ঞানে আজ আর চলছে না। তে হি নো দিবসা গতাঃ। বিজ্ঞানের মূল ধারণাগুলো— দেশ ও কালের ধারণা, বিশ্ব ও তার বিবর্তন, বস্তুর সূক্ষ্মতম কণিকা— বস্তুত সামগ্রিক বিশ্ব-ছবি একদিকে শিল্প ও প্রযুক্তিবিদ্যায়, অন্যদিকে মানুষের চিন্তাধারা ও দৃষ্টিভঙ্গিতে আমূল পরিবর্তন এনেছে, এনেছে যুগান্তর।

কোন বিশেষ সমস্যা থেকে যাত্রা করে যে বিজ্ঞানী আজ বিশ্বের সাধারণ ছবির যত কাছে পৌঁছবেন, তাঁর কাজও মানুষের জরুরী সমস্যাগুলোর তত নিকটবর্তী হবে। আর, ঐ সব সমস্যায় পৌঁছানোর সোজা পথটি নিহিত রয়েছে যুগজীর্ণ পুরাতন চিন্তাধারা

থেকে সরে গিয়ে সবচেয়ে আপাতবিরুদ্ধ বিশ্বধারণায়। মানুষের জীবনের সুদূরপ্রসারী পরিবর্তনের তত্ত্বীয় ভিত্তি যে সব ধ্যানধারণায় প্রোথিত তা মানুষের সরাসরি পর্যবেক্ষণের জগত থেকে অনেক অনেক দূরে। সে সব ধারণায় রয়েছে আলোর ন্যায় প্রচণ্ড বেগ, আছে আলোকবর্ষের মত বিরাট বা সেন্টিমিটারের কয়েক কোটি ভাগের এক ভাগের মতো অতি ক্ষুদ্র দূরত্ব, আর আছে এমন সব সমীকরণ যার কাছে মানুষের সাধারণ বুদ্ধি পরাস্ত।

স্বতঃসিদ্ধতার দুনিয়া আজ দ্রুত বিলীয়মান। আপাতদৃষ্টিতে এক 'পাগলামি'র দুনিয়ার বাসিন্দা হওয়াই যেন যুগলক্ষণ। পরমাণু-বিজ্ঞানী নীলস বোর একদা বলেছিলেন—"This is undoubtedly a mad theory. The only thing is whether it is mad enough to be true." শুধু পদার্থবিদ্যায় নয়, নব্যবিজ্ঞানে আজ পুরাতনী ধারণার বদলে নতুন নতুন পাগলামির আইডিয়া এবং কাজেই আপাতবিরুদ্ধতার আবির্ভাব অবশ্যম্ভাবী। দেশ, কাল ও পদার্থের গঠন সম্পর্কে নব্যবিজ্ঞানের স্বীকৃত কাহিনী 'পাগলামি'তে বায়ুরোগের চরম প্রকাশকেও হার মানায়।

বিজ্ঞানের ইতিহাসে বহু মোড়-ফেরানো ঘটনার কথা আমরা জানি যেখানে প্রতিটি ক্ষেত্রে বিজ্ঞান বরণ করে নিয়েছে 'পাগলামি' ও আপাতবিরুদ্ধ তত্ত্বকে। আর তার ফলেই ঘটেছে তার পরিপুষ্টি বিকাশ ও অগ্রগতি। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই দেখা যায় যে, পাগলামির ডিম ফুটে যা বেরিয়ে আসে তা হল স্বাভাবিক সত্য বা স্বতঃসিদ্ধ। পর্বতশৃঙ্গে পৌঁছানোর পথটি একবার যখন আলোকোজ্জ্বল হয়ে ওঠে, তখন তাকে এত স্বাভাবিক এবং স্বতঃসিদ্ধ বলে মনে হয় যে, প্রাথমিক পাগলামি ও আপাতবিরুদ্ধতার কথা ভাবাই যেন কঠিন হয়ে পড়ে। যে পথ প্রায় সকলের চরণচিহ্নেই লাঞ্ছিত সেই স্বতঃসিদ্ধতার পথকে ছেড়ে দিতে কী পরিমাণ উন্মাদ-সাহসিকতার প্রয়োজন হয়েছিল তখন তা আর ভাবা যায় না।

কিন্তু মজা হল, একবার যখন তত্ত্বের 'স্ববিরোধিতার' খোলস খসে পড়ে এবং তত্ত্ব স্বতঃসিদ্ধ রূপ পায়, তখন 'পাগলামির' মেঘ এসে তত্ত্বের প্রবক্তাকে আবরিত করে। কোন বিজ্ঞানীর জীবনীতে তাঁর বৈজ্ঞানিক কৃতিই শুধু ঝলকিত হয়ে ওঠে না। ঐ জীবনী দেখিয়ে দেয় সময়ের সঙ্গে কি হারে বিজ্ঞানের অগ্রগতি তাঁর বিজ্ঞান কৃতির সঙ্গে যুক্ত এবং তাঁর কাজ কি হারে জ্ঞানভাণ্ডারের বৃদ্ধিকে ত্বরান্বিত করেছে। ঐতিহাসিক দিক থেকে যে কোন বৈজ্ঞানিক আবিষ্ক্রিয়ার ফলাফল পূর্ববর্তী জ্ঞানের স্তরের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। পরবর্তীকালে এমন দিন আসবে যখন ঐ আবিষ্ক্রিয়া একটা সাধারণবোধ্য বিষয়রূপে সমাজে গৃহীত হবে। কিন্তু এর ফলে ঐ আবিষ্ক্রিয়া জ্ঞানের ভাণ্ডারটিকে কতদূর সমুন্নত করে তুলেছিল তার কোন হানি ঘটবে না। এটি যখন আবিষ্কৃত হয়েছিল তার পর থেকে আমরা যতদূরেই এগিয়ে যাই না কেন, জ্ঞানরাজ্যে ঐ আবিষ্ক্রিয়ার দানের তাৎপর্য অবিকৃতই থাকে।

চ্যাপ্টা পৃথিবী থেকে গোলকাকার পৃথিবীতে উত্তীর্ণ হওয়ার তত্ত্ব যেদিন ঘোষিত হল তা সেই প্রাচীন গ্রীসের আমলে যতটা উল্লেখযোগ্য ছিল আজও তাই আছে। বিশ্বরূপের বৈজ্ঞানিক চিত্র কখনও তার বিস্ময় বা তাৎপর্য হারায় না। বিজ্ঞানের ইতিহাসের যুগসন্ধিও তেমনি সর্বদা তাৎপর্যময় থাকে। যখনই বিজ্ঞান কোন নিম্ন থেকে উচ্চস্তরে উত্তীর্ণ হয় তখন তার মধ্যে যে আকস্মিকতা, আপাতবিরুদ্ধতা এবং পাগলামির ছাপ থাকে তার বিস্ময় চিরকালের।

বৈজ্ঞানিকের জীবনের মধ্য দিয়ে আমরা কী দেখি? তাঁর জীবন ও কর্মের প্রিজমের ভিতর দিয়ে আমরা বিজ্ঞানের যুগসন্ধিগুলিকে তাঁর আন্তর জীবন ও বৈজ্ঞানিক মেজাজের আলোয় এবং চারপাশের জগতের সঙ্গে তাঁর সম্পর্কের ফ্রেমে পর্যবেক্ষণ করি। বৈজ্ঞানিক প্রতিভার মূল্যকে মাপতে হয় বৈজ্ঞানিক অগ্রগতির হারের মানদণ্ডে।

মগজময় তথ্য আর সংখ্যার সমাবেশে কখনও প্রতিভার সৃষ্টি হয় না। প্রতিভাধরেরা মানুষের জ্ঞানভাণ্ডারে নতুন জ্ঞানশস্য সঞ্চয় করে রেখে যান। আর এই দানের মধ্যেই নিহিত থাকে তাঁর বৌদ্ধিক এবং আবেগময় জগতের গভীরতা। দৈত্যের কাঁধে ভর করে বামনও অনেক দূর অবধি দেখতে পায়, কিন্তু বামনের বুকে কখনও বিরাটের হৃৎস্পন্দন শোনা যায় না—No giant heart beats in his chest।

কিন্তু আইনস্টাইনের জীবন কাহিনীতে আমরা বিরাটের হৃৎস্পন্দন 'measured beat of a giant heart' পরিষ্কার শুনতে পাই। তাঁর বৈজ্ঞানিক কৃতিত্বের পরিমাণ সম্পর্কে ধারণা করতে গেলে একথা স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, এর আগে কখনও এর চেয়ে স্ববিরোধী বিশ্বছবির আবির্ভাব ঘটে নি যা ঘটল নিউটনীয় ধারণা থেকে আইনস্টাইনের ধারণায় উত্তরণের ফলে। নিউটন যে কর্মকাণ্ডের সূচনা করেন তার পরিপূর্ণতা সাধন এবং সাধারণীকরণই আইনস্টাইনের কাজ, কিন্তু এর ফলে বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে এক অভূতপূর্ব যুগান্তর ঘটে গেল।

দীর্ঘ দুশো বছর ধরে নিউটনের ধ্যানধারণাই বিশ্বের চরম এবং পূর্বনির্দিষ্ট চিত্ররূপে গৃহীত হয়। জগত যেন একটা বিরাট যন্ত্র, সুনির্দিষ্ট যান্ত্রিক নিয়মে সে চলছে। বিরাট ব্রহ্মাণ্ডের গ্রহ-তারকা, ধূমকেতু-নীহারিকা থেকে শুরু করে পথের একটি ক্ষুদ্র ধূলিকণাও ঐ যান্ত্রিক নিয়মের অনুগামী। মনে করা হল, বিজ্ঞানের মূল সমস্যার সমাধান হয়ে গেছে। নিউটনের চিন্তাধারার 'ধ্রুব-সত্যতা' সাধারণ্যে প্রতিষ্ঠিত হল। আলেকজাণ্ডার পোপ লিখলেন :

"Nature and Nature's law lay hid in night
God said, let Newton be ! and all was light."

রাতের অন্ধকারে লুকিয়ে ছিল প্রকৃতি এবং তার বিধান। ভগবান বললেন, আসুক নিউটন এবং অমনি সব কিছু হয়ে উঠল আলোকোজ্জ্বল।

তারপরে এলেন আইনস্টাইন। এলেন তাঁর আপেক্ষিক তত্ত্ব নিয়ে। জড়-জগতের ঘটনা বর্ণনা ও তাদের মধ্যে কার্যকারণ সম্পর্ক নির্ণয়ের জন্য বৈজ্ঞানিক দেশ ও কাল-রূপ কাঠামো বা প্রক্ষেপভূমির পরিকল্পনা করেন। এই কাঠামো যে দর্শক নিরপেক্ষ নয়, দ্রষ্টার গতির সঙ্গে তাঁর পরিকল্পিত দেশ-কাল-ধর্মের যে নিকট ও নিত্য সম্বন্ধ আছে তাই এই নতুন মতবাদের প্রধান কথা। নিউটন এবং পূর্বাচার্যেরা দেশকালের ধর্ম ও মাপকে ব্যক্তি-নিরপেক্ষ এবং স্বতঃপ্রতিষ্ঠ বলে মেনে নিয়েছিলেন। দেশবোধের জন্য ইউক্লিডের জ্যামিতিই ছিল তাঁদের কাছে একমেব অদ্বিতীয়ম্। তাঁরা বিশ্বাস করতেন যে, দূরত্বের এবং কালের মাপকাঠি সব দ্রষ্টার পক্ষে একই। গতিভঙ্গে বা স্থান পরিবর্তনে ওই মাপকাঠির পরিবর্তন তাঁদের বুদ্ধির অগোচর ছিল। আপেক্ষিক তত্ত্বের আবির্ভাবে কোন কোন রসিক তাই আলেকজাণ্ডার পোপের লাইন দুটির সঙ্গে জুড়ে দিলেন :

"But not for long. Let Einstein be! the Devil said
And lo, 'twas dark : the light had fled"

কিন্তু বেশিদিনের জন্য নয়। শয়তান বলল, আসুক আইনস্টাইন এবং দেখা গেল, আলোক পালিয়েছে, চারদিক অন্ধকার।

সরস মন্তব্যরূপে এলেও লাইন দুটি প্রণিধানযোগ্য। এ হল বহুপ্রচলিত ধারণার একটা অভিব্যক্তি। ধারণাটি হল এই যে, নিউটনীয় বলবিদ্যার মূল ধারণার বর্জনের অর্থই হল বস্তুনিষ্ঠ জগতের বৈজ্ঞানিক বোধের বিসর্জন। অন্ধ সনাতনী চিন্তা বৈজ্ঞানিক অগ্রগতির এক একটি ধাপকে সামগ্রিক বিজ্ঞানের সঙ্গে এক করে গুলিয়ে ফেলে। তার কাছে কোন নতুন স্তরে উত্তরণের অর্থই হল সামগ্রিকভাবে বিজ্ঞানের ভেঙে পড়া। এই চিন্তা বিজ্ঞানকে হয় তার পূর্ববর্তী অবস্থায় ফিরিয়ে আনে নতুবা এর পর্যবেক্ষণলব্ধ তথ্যকে বস্তুনিষ্ঠতার আস্থা থেকে বঞ্চিত করে। এ অন্ধ চিন্তা কিছুতেই ধারণা করতে পারে না যে, বস্তুনিষ্ঠ জগতের আসল সত্যরূপ কী, তার ক্রমাগত

অভিব্যক্তিতেই মূলত বিজ্ঞান নিযুক্ত রয়েছে। And the golden book of science has no closed chapter।

এই পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করলে বিজ্ঞানের প্রতিটি বিপ্লব অগ্র-গতির এক একটি স্তম্ভস্বরূপ। নিউটনের বলবিদ্যার মতো আপেক্ষিক তত্ত্ব বিজ্ঞানের ইতিহাসের একটি উল্লেখযোগ্য দিকচিহ্ন। এই তত্ত্ব মানুষের চিন্তার ধারাটিকেই পাল্টে দিয়েছে। শুধু বিজ্ঞানের ইতিহাসে নয়, মানুষের আত্মিক বিকাশের ইতিহাসেও এটি একটি মূল্যবান দিকচিহ্ন। আপেক্ষিক তত্ত্বের প্রায়োগিক উপযোগিতা মানবসমাজের বস্তুগত অবস্থা পরিবর্তনে যথেষ্ট কার্যকরী হয়েছে।

যে যুগে আইনস্টাইন তাঁর তত্ত্বটিকে রূপ দিলেন তা কালের ইতিহাসে এক মহান যুগরূপে চিরচিহ্নিত হয়ে থাকবে। এ যুগ প্রয়োজনীয়তার রাজ্য থেকে মুক্তির রাজ্যে প্রবেশের যুগ। আপেক্ষিক তত্ত্বের আবির্ভাবে প্রমাণিত হল যে, বিজ্ঞান সাবালকত্ব অর্জন করেছে। মানুষকে বিশ্বের কেন্দ্ররূপে ধরার প্রবণতা থেকে তার মুক্তি ঘটেছে। বিশ্বরূপে সে আর চরমত্ব আরোপ করে না।

প্রাচীনকালে মনুষ্যকেন্দ্রিক চিন্তাভাবনার দিনগুলিতে মানুষ 'উপর' 'নীচ' ইত্যাদি শব্দগুলিতে চরম অর্থ আরোপ করত। গোলকাকার পৃথ্বী-ধারণার সঙ্গে এর কোন মিল নেই। প্রাচীন গ্রীসে যখন পৃথিবীর গোলকত্বের ধারণা জনমনে বদ্ধমূল হতে লাগল তখন বোঝা গেল, যে কোন দিক অন্য যে কোন দিকের মতই। 'উপর', 'নীচ' বলে কিছু নেই। অবশ্য, বিশ্বের কেন্দ্ররূপে পৃথিবীর ধারণা তখনও চালু রয়েছে, সে দিক থেকে তখনও পৃথিবীর সাপেক্ষে কোন বস্তুর গতিই চরমগতি বলে ধরা হচ্ছে।

কোপারনিকাস এসে ভূ-কেন্দ্রিক বিশ্বের ধারণা নস্যাৎ করে দিলেন। তিনি হলেন সৌর-কেন্দ্রিক বিশ্বধারণার প্রবক্তা। কিন্তু বিশ্বের কেন্দ্ররূপে সূর্যের অস্তিত্বও বেশিদিন স্থায়ী হল না। ব্রুনো এবং গ্যালিলিওর বিশ্বে না ছিল কোন কেন্দ্র, না ছিল কোন স্থির

নির্দেশক-বিন্দু।

চরম গতির ভূত কিন্তু তখনও মরে নি। কোন বস্তুর চরম বেগ অন্য-নিরপেক্ষভাবে বেঁচেই রইল। উনিশ শতকের শেষ অবধিও মনে করা হত যে, চলমান বস্তুতে আলোকীয় ঘটনাগুলো নিশ্চল বস্তুতে আলোকীয় ঘটনার তুলনায় কিছুটা ভিন্ন। এই ভিন্নতা 'গতি' শব্দটিতে অন্য-নিরপেক্ষ একটা অর্থ আরোপ করল। সমস্ত মহাদেশ ব্যাপী একটা চরম স্থির মাধ্যম ঈথার পরিব্যাপ্ত রয়েছে ধরা হল। আর ভাবা হল যে, স্থির বায়ুর মধ্যে দিয়ে ধাবমান সাইকেল আরোহী যেমন মুখে বায়ুপ্রবাহের ঝটকা খান, স্থির ঈথার ভেদ করে ধাবমান পৃথিবীতেও তেমনি একটা ঈথার-প্রবাহের অস্তিত্ব অনুভূত হবে।

১৯০৫ খ্রীস্টাব্দে একটি গবেষণাপত্রের মাধ্যমে এই ধারণাটিকে নস্যাৎ করে দিলেন আলবার্ট আইনস্টাইন। জার্মান বিজ্ঞান পত্রিকা Annalen der Physik-এ প্রকাশিত প্রবন্ধটির নাম On the Electrodynamics of Moving Bodies ( Elektrodynamik bewegter Korper )। এই প্রবন্ধে আইনস্টাইন পরস্পর সমবেগে গতিশীল বিভিন্ন নির্দেশক তন্ত্র বা কাঠামোয় আলোর বেগের ধ্রুবত্বের কথা ঘোষণা করলেন।

এর কিছু পরে আপেক্ষিক তত্ত্বকে চতুর্মাত্রিক জ্যামিতির গাণিতিক বেশে সজ্জিত করা হল। চিরাচরিত ত্রিমাত্রিক দেশে কোন বিন্দুর অবস্থান তিনটি সংখ্যায় প্রকাশ করা হয়। সময় জ্ঞাপক চতুর্থ আর একটি সংখ্যা 'ঘটনা'র ধারণায় জ্যামিতিক অর্থ আরোপ করল। ঘটনা হল কোন বস্তুকণার কোন ক্ষণে কোন বিন্দুতে অবস্থান। চতুর্মাত্রিক জ্যামিতি এবং চতুর্মাত্রিক দেশ-কালের ধারণা ব্যবহৃত হল এই সব 'ঘটনা'র নিয়ন্ত্রক বিধানের খোঁজে।

১৯০৫ এ আইনস্টাইন বিশেষ আপেক্ষিক তত্ত্বের যে রূপরেখা দিলেন তা থেকে বোঝা গেল, অন্তঃপ্রক্রিয়াগুলো সব বস্তুতে একভাবে ঘটে, বস্তুর সরলরৈখিক সমগতির কোন প্রভাব এতে

পড়ে না। পরে ১৯১৬ সালে আইনস্টাইন তাঁর 'আপেক্ষিক সূত্রটি' ত্বরণযুক্ত গতির ক্ষেত্রে সম্প্রসারিত করেন। তাঁর বাকী জীবন ব্যয়িত হয় একটা একীভূত ক্ষেত্রতত্ত্বের বিকাশে যা থেকে মহাকর্ষীয় এবং তড়িচ্চুম্বকীয় ক্ষেত্র বিশেষ বিশেষ রূপ বলে ধরা দেবে।

কিন্তু প্রশ্ন হল, এই সব অত্যন্ত বিমূর্ত সমস্যাগুলো জনমানসে এত প্রচণ্ড আলোড়ন এবং অনুসন্ধিৎসা জাগিয়ে তুলল কেন? আর কেনই বা এই তৃষ্ণা তত্ত্বের পশ্চাৎপটের নায়ককে জানার তৃষ্ণায় রূপ নিল! এর আগে কোন তত্ত্ব বা তাঁর প্রবক্তাকে ঘিরে এমনটা তো হতে দেখা যায় নি। লোকে আইনস্টাইনের মধ্যে বিশ শতকের বিজ্ঞানকে মূর্তিমান দেখে কেন? দেখা যাক, পরমবিজ্ঞানী আইন-স্টাইনের পতন-অভ্যুদয়-বন্ধুর জীবনের মধ্যে প্রশ্নটির উত্তর নিহিত আছে কি না।

দক্ষিণ-পূর্ব জার্মানীতে আল্পসের সানুদেশে, যেখানে ইলার নদী মিশেছে ডানিয়ুবের সঙ্গে সেখানে, ডানিয়ুবের বাঁ দিকে একটা ছোট্ট শহর আছে। শহরটির নাম উল্‌ম, স্বোয়াবিয়ার অন্তর্গত একটা ছোটখাট বন্দর। উল্‌ম হল একটা প্রাচীন জার্মান শহর। এর জন্ম-ইতিহাস নবম শতকের সঙ্গে যুক্ত। ষোড়শ শতকে এটি ছিল সামরিক দুর্গ বিশেষ। ক্যাথলিক চার্চের বিরুদ্ধে প্রোটেস্টাণ্ট রাজপুত্রদের সংগ্রামে শহরটির একটা বিশেষ ভূমিকা ছিল। নেপো-লিয়নের যুদ্ধ ইতিহাসেও শহরটির পরিচিতি আছে। এখানে মাকের সৈনাপত্যে অস্ট্রিয় সেনাদলের বিপর্যয় ও পরাভব ঘটেছিল। এর ফলে ১৮০৯ খ্রীস্টাব্দের ভিয়েনা শান্তি চুক্তি অনুসারে উল্‌ম উর্তেমবার্গ রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়। ১৮৪২-এ প্রুশিয়ান ইঞ্জিনিয়াররা পুরাতন প্রতিরোধ ব্যবস্থাগুলো আবার গড়ে তোলেন। ফলে ফ্রান্সের দিকে মুখ করে শহরের বারোটি দুর্গ আর টাওয়ার ডানিয়ুবের তীরে সগর্বে মাথা তুলে দাঁড়ায়।

আইনস্টাইনের জন্ম-দশকেও উল্‌মের বাইরের লক্ষণে মধ্যযুগের স্বোয়াবিয় সমাজের চিহ্ন বেশ প্রকট ছিল। ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্য বাইরে থেকে বহু লোক এখানে এসে বাস করত। সরু, সর্পিল পথ, দু-ধারে তিন কোণা ছাদের সব বাড়িঘর। আর পাঁচশো ফুট উঁচু টাওয়ার নিয়ে উদ্ধত মস্তক তুলে দাঁড়িয়ে পঞ্চদশ শতকের গথিক ক্যাথিড্রাল। টাওয়ার থেকে চারপাশের শোভা অপূর্ব দেখায়। টিরল এবং সুইজারল্যাণ্ডের পাহাড়শ্রেণী পর্যন্ত বিস্তৃত দেশের উঁচু নীচু ভূ-ভাগ, স্বোয়াবিয় আল্পসের পবতমালা, দূরে ব্যাভেরিয়া ও উর্তেমবার্গের সমতলভূমি। আর ঠিক পায়ের নিচেই আশেপাশের দুর্গগুলির উষর রূপরেখা, টাউন হল, বাজার, ছোট ছোট ফাউণ্ড্রির কারখানা, আর কতকগুলো কাপড়ের মিল। অধিবাসীর সংখ্যা ত্রিশ হাজার। এঁদের মধ্যে রয়েছেন তাঁতি, ছুতোর, কাঠের মিস্ত্রি, কাপড় ও চামড়ার ব্যবসায়ী, শ্রমিক, শিল্পী, ফাউণ্ড্রিম্যান, মদ-উৎপাদক, উল্‌মের পাইপ-শিল্পী, আরও কত জীবিকার লোক। অধিকাংশই স্বোয়াবিয়ার আদি বাসিন্দা—দুই তৃতীয়াংশ ক্যাথলিক, এক তৃতীয়াংশ লুথারপন্থী। আর বাকী ইতস্ততঃ ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা কয়েক শ' ইহুদী —জাতিগতভাবে যাঁদের কোন বিশেষ মাটির প্রতি টান নেই, অর্থ ও মনীষার আকর্ষণ ও প্রেরণায় যাঁরা ছড়িয়ে পড়েন পৃথিবীর সর্বত্র। তবে জীবনযাত্রায় উল্‌মের বাকী অধিবাসীদের সঙ্গে তাদের কোন পার্থক্য লক্ষ্য করা যেত না।

এই উল্‌ম শহরেই ১৮৭৯ খ্রীস্টাব্দের ১৪ই মার্চ রাতে আইনস্টাইনের জন্ম হয়। জন্মভিটা ১৩৫বি, বানহফস্ট্রাসে। স্ট্রাসে অর্থ জনপথ। জন্মভিটা আজ আর নেই। ১৯৪৫-এ দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় বোমাবর্ষণ আর কামানের গোলায় ভিটাটি ধরাপৃষ্ঠ থেকে চিরতরে লুপ্ত হয়ে গেছে। তারপর থেকে এর আর পুনর্নিমাণ হয় নি। আইনস্টাইনের নামে ১৯২২ খ্রীস্টাব্দে উল্‌মবাসীরা তাঁদের শহরের পশ্চিমপ্রান্তের অনতিপরিচিত একটি রাস্তার নাম রেখেছিলেন

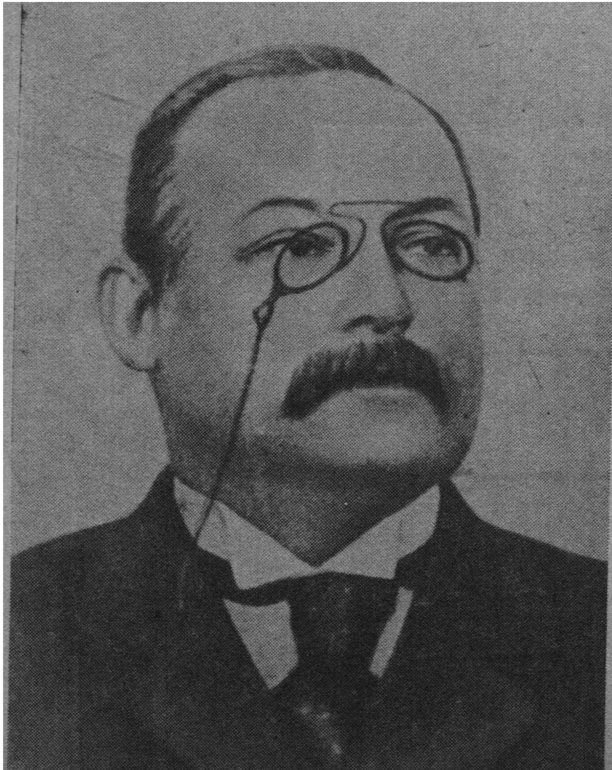
আইনস্টাইন স্ট্রাসে। আর্যামির প্রবল তরঙ্গে ১৯৩৩-এ সেটি হয়ে যায় ফিক্টেস্ট্রাসে। পরে যুদ্ধ শেষে পথটি তার হারানো নাম আবার ফিরে পেয়েছে।

যে পরিবেশে আইনস্টাইন জন্মগ্রহণ করেন তাতে ছোটবেলা থেকে তিনি দুই বিপরীত ঐতিহ্যের সংস্পর্শে আসেন। ছোট-বেলার এই প্রভাব সারাজীবন ধরে তাঁর উপর সক্রিয় ছিল। একটি হল যুক্তিবাদের ঐতিহ্য। জন্মভূমি স্বোয়াবিয়ায় এই ঐতিহ্যের মূল গভীরে প্রোথিত ছিল। অন্যটি হল পুলিশীরাজ্যের অভ্রান্ততায় অন্ধবিশ্বাস। এর উদ্গাতা হলেন সেই সব প্রুশিয়ান অফিসার ও আমলা, যাঁরা সদ্য প্রতিষ্ঠিত সাম্রাজ্যের আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা করতে দক্ষিণ জার্মানীতে এসে জড় হয়েছিলেন। দুই আদর্শগত এবং সামাজিক ঐতিহ্যের বৈপরীত্য অধিবাসীদের কথাবার্তায়ও প্রকাশ পেত। উলমের অধিবাসীদের ভাষায় ছিল সুরেলা স্বোয়াবিয় ইডিয়ম। অনেকদিন ধরে আইনস্টাইনের কথাবার্তায় এই বিশেষ ভঙ্গিটি বজায় ছিল। আর তাঁর দ্বিতীয়া স্ত্রী এলসার কথাবার্তায় সারাজীবন ধরেই ছিল। এলসার কাছে তিনি হলেন 'আলবার্টল', ল্যাণ্ড হল 'ল্যাণ্ডল', আর শহর বা স্টাট হল 'স্টাটল'। এই কোমল আবেগময় ভাষার বিপরীতে ছিল নবাগত প্রুশিয়ানদের কর্কশ ও কাটাকাটা কথা বলার ঢঙ। প্রথম গোষ্ঠীর লোকেরা ছিল উন্নতমনা এবং ধর্মীয় ও জাতীয় সহনশীলতার গৌরববাহী। বিপরীতপক্ষে, প্রুশিয়ানিজম্ শব্দটির সঙ্গে সাধারণভাবে যা জড়িত থাকলেও অনুক্ত থাকত তা হল উগ্র জাতীয়তাবাদ, ধর্মান্ধতা এবং উদ্ধত অসহিষ্ণুতা।

যে গোষ্ঠীতে আইনস্টাইন পরিবার যুক্ত ছিলেন সেখানে ইহুদী এবং খ্রীস্টান নির্বিশেষে হাইনে, শিলার এবং লেসীং সম্মানিত হতেন। এঁদের সৃষ্টিকর্ম বাইবেল বা গসপেলের পাশাপাশি একসঙ্গে বিরাজ করত। বিশেষ, শিলার ছিলেন এঁদের কাছে অত্যন্ত জনপ্রিয়। সম্ভবত, তাঁর লেখায় ঘন ঘন স্বোয়াবিয় ইডিয়মের প্রয়োগই এর

কারণ। সে যাই হোক, আইনস্টাইন ছিলেন তাঁর পরিবেশেব যুক্তি-বাদী ঐতিহ্যেব মূর্ত বিগ্রহ। মহান ও যুক্তিগ্রাহ্য বিশ্বসুষমার পরিচয লাভ কবা ছিল তাঁব জীবনেব উদ্দেশ্য। অবশ্য, তাঁব স্ববিবোধিতাব জগত নিঃসন্দেহে অষ্টাদশ শতকেব ক্লাসিকাল যুক্তিবাদীব কঙ্কালসাব বিশ্বচিত্র থেকে বহু যোজন দূবেব পথ। কিন্তু যুক্তিব স্বনির্ভবতাব অষ্টাদশ-শতকীয বিশ্বাসটি তিনি উত্তবাধিকাব সূত্রে পেযেছিলেন। এই যুক্তিবাদী দৃষ্টিভঙ্গিব সান্নিধ্য, ভলতেযাবেব পবিহাসপ্রিযতা এবং সহনশীলতা, রুশো-উদ্গাত অত্যাচাবেব বিরুদ্ধে প্রতিবোধ স্পৃহা আইনস্টাইনেব পবিবেশে অনাবস্তুব থেকে গিযেছিল। ফলে, প্রাথমিক এ সব ছাপ তাব জীবনেও থেকে যায। পবিবেশে অবশ্য বিরুদ্ধ ঐতিহ্যও ছিল এবং সেকথা আমবা আগেই উল্লেখ কবেছি। লক্ষ্যণীয যে, আইনস্টাইন তাঁব জীবদ্দশায দেখে গেছেন আকাবে এবং আযতনে ঐ বিরুদ্ধ ঐতিহ্য কী ভযঙ্কব রূপ পবিগ্রহ কবেছিল। সভ্যতাব অস্তিত্বেব পক্ষেই তা বিপদেব কাবণ হযে উঠেছিল

আইনস্টাইনেব বাবা হেবমান আইনস্টাইনদেব আদি বাড়ি ছিল দক্ষিণ জার্মানেব এক গ্রামে। কিন্তু ১৮৭১ সাল থেকে উলমেই হেবমানেব বাবা-মা এবং আবও অনেক আত্মীযস্বজন থাকতেন। আলবার্টেব বাবা হেবমানেব গণিতে বেশ ব্যুৎপত্তি ছিল এবং স্টুটগার্টেব কোন জিমন্যাসিযামেব পড়া শেষ কবে এক সময বিশ্ববিদ্যালযে প্রবেশেব তিনি স্বপ্ন দেখতেন কিন্তু বিধি বাম। তা হল না। বাধ্য হযে তাকে ব্যবসায নামতে হল। উল্মে একটি ইলেকট্রিক সবঞ্জামেব দোকান খুললেন হেবমান, অংশীদাব হলেন ছোট ভাই জেকব। ১৮৭৬ সালে হেবমান স্টুটগার্টেব এক ধনী ব্যবসাযীব কন্যা পওলিন কক-কে বিয়ে কবেন এবং উলম শহবে পাকাপাকি বসবাস শুরু কবেন ১৮৭৭-এ। উলম থেকে মাইল পনব দূবে থাকতেন হেবমানেব খুড়তুতো ভাই রুডল্ফ, সঙ্গে থাকত কন্যা এলসা। এলসা ছিল আলবার্টেব সমবয়সী এবং ভবিষ্যৎ স্ত্রী। মায়ের দিক থেকে আত্মীযতা ছিল আবও নিকট।







[illegible] আইনস্টাইন, সঙ্গে বোন মাজা



আরাও স্কুলে আইনস্টাইন



অলিম্পিয়ান অ্যাকাডেমি ( হ্যাবিক্ট, সোলোভিন, আইনস্টাইন )



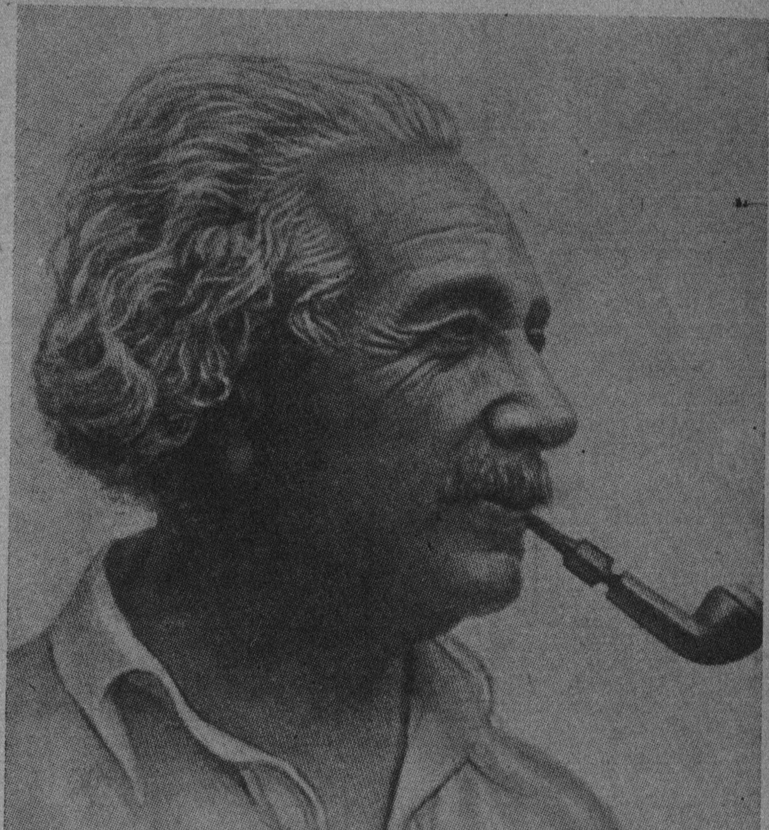
আইনস্টাইন ও মিলেভা



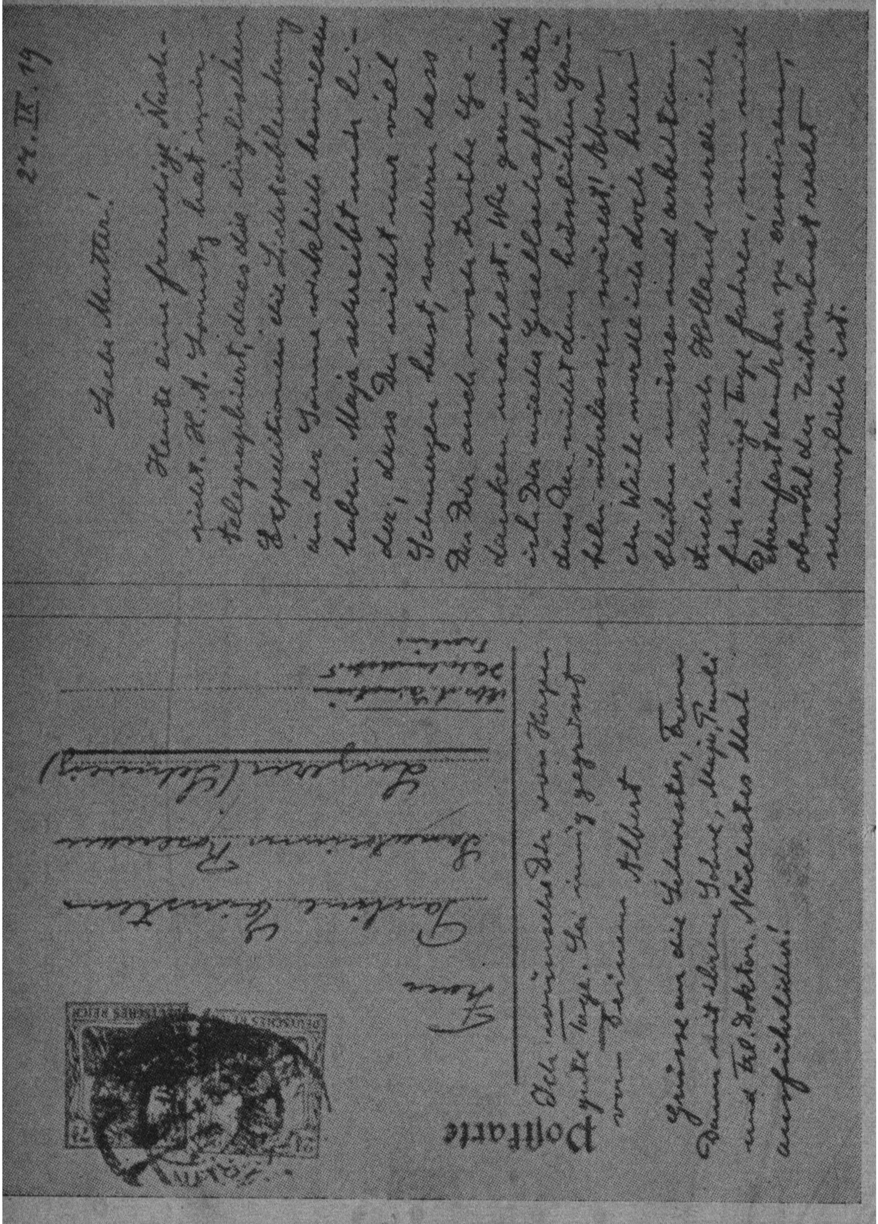
সুইজারল্যান্ড পেটেন্ট অফিসের কর্মী আইনস্টাইন



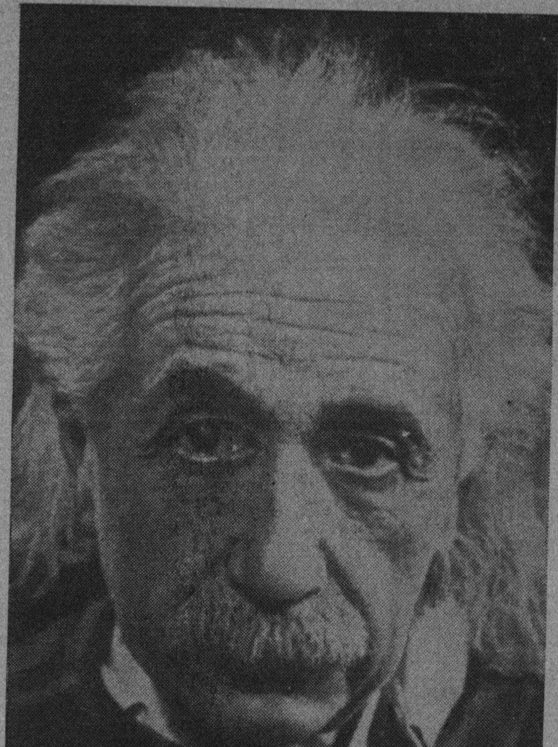
আইনস্টাইন [১৯১৯] ঃ যে বছর সাধারণ আপেক্ষিকতা যাচাই হল



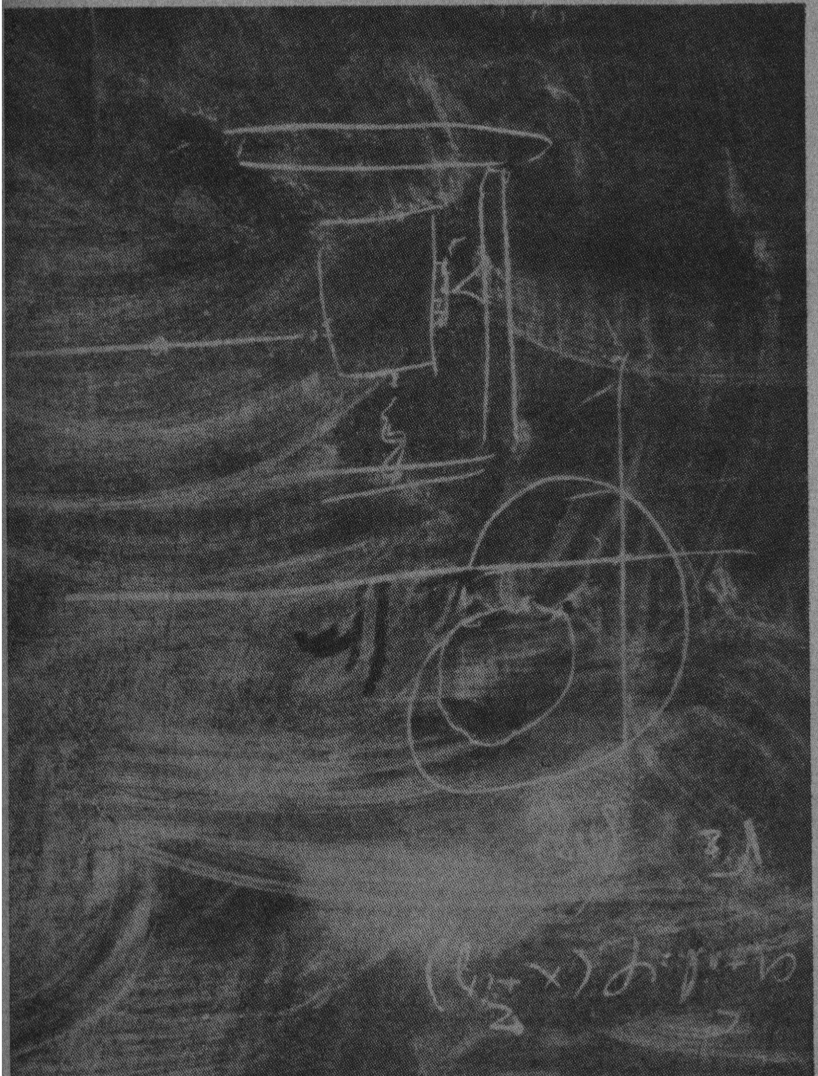
অধ্যাপনাকালে আইনস্টাইন



মা-কে লেখা আইনস্টাইনের চিঠি, ২৭শে সেপ্টেম্বর, ১৯১৯ বিষয়বস্তু ঃ সাধারণ আপেক্ষিকতা যাচাই-এর সংবাদ



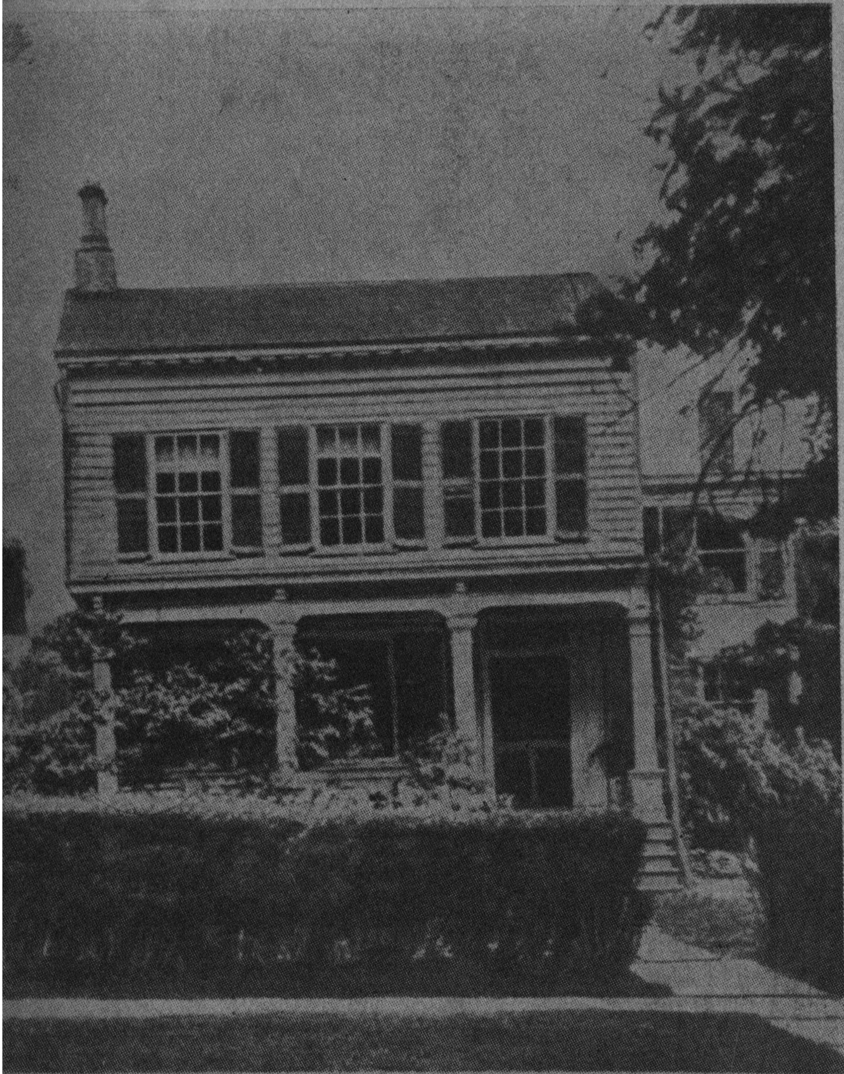
শেষ বয়সে আইনস্টাইন



আইনস্টাইন-বোরের বিখ্যাত তর্কযুদ্ধের স্মৃতি ঃ ব্ল্যাকবোর্ডে আঁকা আইনস্টাইনের আলোকবাক্সের স্কেচ



রবীন্দ্রনাথ ও আইনস্টাইন



প্রিন্সটনে ১১২ মার্সার স্ট্রিটে আইনস্টাইনের বাড়ি

এলসার মা ছিলেন আলবার্টের মাসি।

এদিকে আলবার্ট ক্রমে বড় হতে লাগল। কিন্তু এক বছর বয়স গেল, ছেলেটিতো তেমন কথা বলতে শিখল না। বোকা হবে নাকি শেষটায়। উদ্বিগ্ন হেরমান ডাক্তার দেখালেন। কিন্তু ডাক্তার যাই বলুন, ছেলেকে ঘিরে হেরমানের কত স্বপ্ন। এই উল্‌মে একদা জন্মেছিলেন বিখ্যাত জ্যোতির্বিজ্ঞানী গণিতবিদ্ জোহানেস কেপলার। আইন-স্টাইনের জন্মের আড়াই শো বছর আগে। কাছেই কেপলারের বাড়ি। কত লোক এসে ভিড় করেন বাড়িটি দেখতে। যেন একটা তীর্থ। হেরমান ভাবতেন, আলবার্ট খুব মাথাওয়ালা ছেলে হবে, কেপলারের মতো জগদ্বিখ্যাত হবে! আর তো কথাই আছে 'Ulmense sunt mathematici'—উল্‌মের লোকেরা হল জাত গণিতজ্ঞ।

কিন্তু মুশকিল বাধল ব্যবসা নিয়ে। ছোট শহর উল্‌মে ব্যবসা তেমন জমছে না। ছেলে বড় হচ্ছে, ওর লেখাপড়া আছে। তাই ১৮৮০ সালে আইনস্টাইন পরিবার চলে এলেন বড় শহর মিউনিখে ভাগ্যের অন্বেষণে। প্রথমে হেরমান ও তাঁর ভাই জেকব একটা ইলেকট্রো-কেমিক্যাল ওয়ার্কশপ করলেন, ভাড়াটে বাড়িতে। ব্যবসা বাড়তে লাগল। আলবার্টের যখন পাঁচ বছর বয়স তখন তাঁরা শহরের উপকণ্ঠে সেণ্ডলিঙে উঠে গেলেন—কিনলেন একটা বাগানবাড়ি। সঙ্গে একটা ছোট ফ্যাক্টরিও করলেন। ঐ ফ্যাক্টরিতে তৈরি হত ডায়নামো, আর্কলাইট এবং ইলেকট্রিকের নানা যন্ত্রপাতি। পওলিনের ডাউরির অবশিষ্ট অংশ এই কাজে বিনিয়োগ করা হল।

১৮৮১ সালে আইনস্টাইন পরিবারে জন্ম নিল এক কন্যা। নাম রাখা হল মাজা। প্রায় সমবয়সী দুই শিশু—মাজা আর আলবার্ট। দুজনে খুব ভাব। বাড়ির চারপাশের সুন্দর বাগানটি ছিল তাদের খেলার মাঠ।

দুই সন্তানের মধ্যে যাতে ছোটবেলা থেকেই প্রকৃতি-প্রেম সঞ্চারিত হয় সেজন্য হেরমানও সচেষ্ট ছিলেন। মিউনিখের উপকণ্ঠে ছবির

মতো সুন্দর পল্লী অঞ্চল। সেখানে মাঝে মাঝে প্রমোদভ্রমণে বেরিয়ে পড়া পরিবারের একটা নিয়মে দাঁড়িয়েছিল। পরিবারের বাইরের বহু আত্মীয়স্বজনও এতে যোগ দিতেন। কখন কখন এলসাকে নিয়ে রুডল্‌ফ আইনস্টাইনও সঙ্গী হতেন।

মা পওলিন আইনস্টাইন ছিলেন একজন সঙ্গীতরসিক। তিনি সুন্দর পিয়ানো বাজাতেন ও গাইতেন। তাঁর প্রিয় শিল্পী ছিলেন বিঠোফেন। বিঠোফেনের সোনাটা-ই ছিল পওলিনের সবচেয়ে প্রিয়। সঙ্গীতপ্রিয়তা ও ক্লাসিকাল জার্মান-সাহিত্যপ্রীতির একটা বাতাবরণ আইনস্টাইন পরিবারের অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল।

এদিকে ইলেকট্রিকের ব্যবসা মোটামুটি চলছে। ছোট ভাই জেকব দাদা হেরমানের সঙ্গে থাকতেন এবং ভাইপো আলবার্টকে বড় ভালবাসতেন। জেকব ছিলেন একজন ভাল এঞ্জিনিয়র। গণিতে আইনস্টাইনের অনুরাগ বিকশিত করে তুলতে কাকা জেকবের একটা বিশেষ ভূমিকা ছিল। দু-ভাই একত্রে ইলেকট্রিক ফ্যাক্টরি চালাতেন। হেরমান দেখতেন ব্যবসার বৈষয়িক দিক। আর জেকবের দায়িত্ব ছিল এঞ্জিনিয়ারিং দিকটি দেখার। তবে সফল ব্যবসায়ী বলতে যা বোঝায় তাঁরা কোনদিনই তা ছিলেন না। আইনস্টাইন পরিবার কখনই আর্থিক স্বাচ্ছল্যের দক্ষিণ মুখ দেখেন নি। আলবার্টের বয়স এখন চার-পাঁচ। সবাই বলে ছেলেটির বেশ মাথা, বাপও তাতে খুব খুশি। কিন্তু খেলাধুলোয় মন নেই একটুও, শান্ত ও গম্ভীর প্রকৃতির বালক আলবার্ট বন্ধুদের এড়িয়ে চলে। কেবল একা থাকতে ভালবাসে। একা একাই ঘুরে বেড়ায়। অন্যান্য ছেলেরা যখন উচ্ছল খেলাধুলোয় মত্ত, আলবার্ট হয়তো তখন বসে বসে কি ভাবে! সব ছেলেরা সৈন্য-সৈন্য খেলত, আর এটা ছিল আলবার্টের কাছে একেবারে অসহ্য। জার্মানীর এ-প্রান্ত থেকে ও-প্রান্ত তখন মিলিটারীর ব্যাণ্ডে বেজে-ওঠা সংগীতে মুখরিত। শহরের রাজপথ দিয়ে সৈন্যদল চলেছে কুচকাওয়াজ করে—সঙ্গে

উৎসাহী বালকদের ভিড়, তারাও চলেছে সৈন্যদের তালে তালে। আর সারা ফুটপাত জুড়ে নাগরিকদের ভিড় উপচে পড়ছে, নতুন সাম্রাজ্যের এগিয়ে চলাকে তাঁরা দেখছেন গর্বভরে। সন্তান-সন্ততিদের সামনে নতুন সুযোগের সোনার দুয়ার খুলে যাচ্ছে ভেবে তাঁরা খুশি। বেচারা ছোট্ট আলবার্ট! বাবার হাত দুখানি দিয়ে নিজের চোখ ঢেকে সে কাঁদছে, আর কাতর মিনতি জানাচ্ছে—'আমায় বাড়ি নিয়ে চল, আমায় বাড়ি নিয়ে চল।' এই কলরোল মুখরতায় সে ভীত, তার স্নায়ুজাল পীড়িত।

ইতিমধ্যে একদিন আলবার্ট সর্দিজ্বরে পড়লেন। বিছানা থেকে ওঠা বারণ। ওর বাবা ওকে একটা পকেট কম্পাস এনে দিলেন খেলা করার জন্য। ছেলের যে এ সব জিনিস ভাল লাগে এ কথা বাবা বিলক্ষণ বুঝতেন। কম্পাস নিয়ে নাড়াচাড়া করতে লাগল বালক। যতই নাড়ানো যাক না কেন, কাঁটাটা সব সময় একই দিকে মুখ করে রয়েছে! কিন্তু কেন? বালক আহার নিদ্রা ভুলে গেল। ভ্রূ কুঁচকে রহস্য মোচনের জন্য কতভাবে ভিতরটা দেখতে লাগল। হাজারো প্রশ্ন করল বাবাকে। অনেকক্ষণ কত কি ভাবল আপন মনে।

এই কম্পাসের স্মৃতিকে আইনস্টাইন জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত ভুলতে পারেন নি। ছোটবেলায় এতই মুগ্ধ হয়েছিলেন ব্যাপারটিতে। চুম্বক শলাকার এই আচরণের পশ্চাতে তিনি মানুষের চেয়েও বেশি ক্ষমতাধর গোপন কিছুর অস্তিত্ব উপলব্ধি করেছিলেন।

যথাসময়ে স্কুলে ভর্তি হবার সময় এল। জার্মানীতে প্রাথমিক শিক্ষা পরিচালিত হয় আর্থিক স্তরভেদ অনুযায়ী। বিভিন্ন ধর্মীয় দলের পুরোহিতেরা স্কুলগুলো নিয়ন্ত্রণ করেন। ইহুদীদের স্কুলটি ছিল বাড়ি থেকে বেশ দূরে। তা ছাড়া, স্কুলের বেতন ছিল আইনস্টাইনদের সামর্থ্যের বাইরে। কাজেই একটা ক্যাথলিক প্রাইমারী স্কুলে আল-বার্টকে ভর্তি করা হল ১৮৮৯তে। এখানে কিছুদিন যাতায়াতের পর

দশ বছর বয়সে আলবার্ট ভর্তি হলেন মিউনিখের লুইটপোল্ড জিমন্যাশিয়ামে। এখানকার যান্ত্রিক পরিবেশের সঙ্গে বালকের ঝোঁক বা স্বভাবের কোন মিল ছিল না। কী সব কড়া নিয়মকানুন এ স্কুলটায়! মাস্টারমশাইরা যা বলবেন তাই করতে হবে, যা ভাল লাগবে না তাই পড়তে হবে। মুখস্থ কর আর মুখস্থ কর। শিক্ষা মানে ল্যাটিন আর গ্রীক ব্যাকরণ মুখস্থ করা। ইতিহাস মানে ঘটনাপঞ্জীর এক বিরক্তিকর লিস্টি শেখা। বাড়ি থেকে হাজারো গণ্ডা টাস্ক করে আন, ড্রিল কর, আর শেখ সব দাঁতভাঙা ভাষা। বালক একেবারে হাঁপিয়ে উঠল। সবচেয়ে কড়া হল মাস্টারমশায়েরা। যেন এক একজন মিলিটারি কম্যাণ্ডার। এ সময়কার কথা স্মরণ করে আইনস্টাইন এক সময় লেখেন—'প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের মনে হত সব সার্জেণ্ট, আর জিমন্যাশিয়ামের শিক্ষকেরা হলেন এক একজন লেফটেনাণ্ট।'

আর ছাত্রটি সম্পর্কে মাস্টারমশাইদের কী রিপোর্ট? ছেলেটি একটু মুখচোরা গোছের। কথাও বলে ধীরে ধীরে। প্রশ্নের ঠিক ঠিক জবাব দিতে পারে না। একটু বোকাটে! তা ছাড়া, গ্রীক-ল্যাটিন কিচ্ছু বোঝে না। অঙ্কের মাস্টারমশাইয়ের একটু ভিন্ন মত। অঙ্কে ওর আশ্চর্য মাথা—একেবারে কলেজের ছেলের মতো।

গণিতে, বিশেষ করে বীজগণিতে, আইনস্টাইনের আশ্চর্য ঝোঁক পাঁচ-ছয় বছর থেকেই দেখা গিয়েছিল। এটা হয়ত কাকা জেকবের জন্য। তিনি প্রায়ই বলতেন—'বীজগণিত খুব মজাদার বিজ্ঞান। এতে আমরা নাম-না-জানা ছোট্ট একটা প্রাণী শিকার করতে বের হই। নাম জানা না থাকায় ওকে বলি x (এক্স)। যখন শিকার ধরা পড়ে তখন তার উপরে ঝাঁপিয়ে পড়ি এবং ঠিক নামটি দিয়ে দি।' বীজগণিত বালককে মুগ্ধ করল। দশ বছর না হতেই তার বোঝার গতি এত বেড়ে গেল যে, মাস্টারমশাইদের আর তাকে বোঝানোর ক্ষমতা রইল না। আলবার্ট এখন ঘন ঘন অজ্ঞাতনামা প্রাণী শিকারে

নেমে পড়ে। সহজ সমস্যাগুলোর সমাধানে চিরাচরিত পদ্ধতিগুলি ত্যাগ করে প্রায়ই নতুন পদ্ধতির সন্ধানে বের হয়।

আলবার্টের বয়স তখন বারো। পরের বছর স্কুলে বীজগণিত ও জ্যামিতি পড়া শুরু হওয়ার কথা। সে তো ইতিমধ্যেই বীজগণিতের সঙ্গে পরিচিত। কিন্তু জ্যামিতি সম্পর্কে তখন পর্যন্ত কিছু জানত না! জ্যামিতির একটা পাঠ্যবই যোগাড় করে ফেলল এবং যে কোন স্কুলছাত্রের মতো বইটি নিয়ে পাতা ওল্টাতে লাগল। কিন্তু ব্যাপারটা এত চমৎকার ঠেকল যে, কিছুতেই আর এটা ছাড়তে পারল না। নিজে নিজে আবিষ্কার করল একটার পর একটা ইউক্লিডের উপপাদ্য, বিনা সাহায্যে প্রমাণ করল পিথাগোরাসের থিয়োরেম। তোতাপাখির মত মুখস্থ বিদ্যায় যা আয়ত্ত হয় তা মানুষের কৌতূহলকে পঙ্গু করে দেয়। ইউক্লিডের জ্যামিতির মধ্যে আলবার্ট এমন একটা যুক্তিগ্রাহ্য জগতের সন্ধান পেল যা সুন্দর, সুষমাময় এবং ছন্দোসমৃদ্ধ। জ্যামিতি তাকে মুগ্ধ করল।

জিমন্যাশিয়াম স্কুলের সব স্মৃতিই যে বেদনার এ কথা বলা যায় না। দগ্ধ পাণ্ডুর ঐ মরুক্ষেত্রেও মরুদ্যান ছিল। জিমন্যাশিয়ামে রুয়েস নামে একজন শিক্ষক ছিলেন যিনি ছেলেদের অন্য চোখে দেখতেন। ইনি সযত্নে ছেলেদের কাছে তুলে ধরতেন প্রাচীন সভ্যতার আত্মাকে, সনাতন ও সমসাময়িক জার্মান সংস্কৃতির জীবনের বহমানতাকে। ডেকে ডেকে তাদের বলতেন গ্যেটে, শেকস্‌পীয়ার ও শিলারের কথা। রোমান্টিক আবেগময়তার অপূর্ব কীর্তি Herman and Dorothea পাঠে তিনি যে ভূমানন্দের স্বাদ পেতেন সে কথা আইনস্টাইনের স্মৃতিতে চির জাগরুক ছিল। বালক আলবার্ট এই সব কাহিনীতে উদ্দীপ্ত হয়ে ওঠে। মনীষীদের জীবন কাহিনী তার কিশোর মনের অন্তরে কেমন দোলা দেয়! - যেন এক অদৃশ্য যোগসূত্রে এঁদের মন তার মনের সঙ্গে গাঁথা। সুযোগ খুঁজে খুঁজে আলবার্ট রুয়েসের সঙ্গে আলাপ করত। রুয়েসও বোধ করি বালক আইনস্টাইনের মুখে গ্যেটে, শিলারের

প্রতিচ্ছবি দেখেছিলেন। আইনস্টাইন জীবনে রুয়েসকে ভুলতে পারেন নি। বহু বছর পরে আইনস্টাইন মিউনিখ হয়ে কোথায় যেন যাচ্ছিলেন। তখন তিনি জুরিখের নাম করা অধ্যাপক। ঠিক করলেন, প্রাক্তন শিক্ষক রুয়েসের সঙ্গে একবার দেখা করবেন। কিন্তু পুরনো স্যুটপরা তরুণের নামে রুয়েসের কোন প্রতিক্রিয়া হল না। ভাবলেন, লোকটা বুঝি তাঁর কাছে ধার চাইতে এসেছে। আইনস্টাইনের সঙ্গে খুব খারাপ ব্যবহার করলেন তিনি। অগত্যা দ্রুত স্থান-ত্যাগ করা ছাড়া আইনস্টাইনের কাছে আর কোন বিকল্প ছিল না।

বছরের পর বছর গড়িয়ে গেল। আলবার্টও পাশ করে করে উঁচু ক্লাসে উঠল। বীজগণিতের সমস্যার মধ্যেই দিনগুলির বেশির ভাগ কেটে যাচ্ছিল। সাথী নেই, সঙ্গী নেই, বন্ধু বলতে কেউ নেই। মন ও রুচির দিক থেকে কারো সঙ্গে মিশতে পারে না সে। সবচেয়ে যেটা তার খারাপ লাগে তা হল জাতিতে ইহুদী বলে স্কুলের অধিকাংশ ছাত্র তাকে বিদ্বেষের চোখে দেখে। কিন্তু ওদের খ্রীস্ট ধর্ম তো আলবার্টের খারাপ লাগে না! যীশু তো মহামানব! তবে ইহুদীদের ওরা ঘৃণা করে কেন? সেই আদিম যুগে কিছু ইহুদী খ্রীস্টকে ক্রুশবিদ্ধ করেছিল বলে? এ জন্য কি সব ইহুদীই দায়ী হবে? ইহুদীদের ধর্ম তো খ্রীস্টধর্মের মতোই সুন্দর। স্কুলে সে বাইবেল পড়ে। বাড়িতে পড়ে ইহুদীদের ধর্মগ্রন্থ। অনুসরণ করে ইহুদীদের আচার-আচরণ। কই, কোথায়ও তো সংঘর্ষ বাধে না। তার মা-বাবাও তো কত উদার! কিন্তু যীশুর উপাসক হয়ে খ্রীস্টানরা এত অনুদার কেন? বালকের মাথায় প্রশ্নের ঝড় বয়ে গেল। প্রশ্ন জাগল ধর্ম সম্বন্ধে, প্রশ্ন জাগল জগৎ সম্বন্ধে। নিজ অন্তর্জগতের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ সুষমা খুঁজতে শুরু করল বৃহত্তর বাইরের জগতে। এবং সামাজিক পরিবেশে। তার প্রাথমিক ধর্মীয় মনোভাব শিগগিরই জড়-বিজ্ঞানের ধাক্কায় উবে গেল।

কিন্তু জিজ্ঞাসু মনের কাছে স্কুলের পাঠ্যবই বিশ্বসুষমাকে প্রকাশ করতে পারল না। এর সন্ধান মিলল কিছু জনপ্রিয় বিজ্ঞানের বই-এ। আলবার্টের বয়স তখন এগার। পোল্যাণ্ড থেকে পড়তে আসা এক ডাক্তারি ছাত্র ম্যাক্স টালমে ঘন ঘন আইনস্টাইনের বাড়িতে বেড়াতে আসে। কোন গরিব বিদেশী ছাত্রকে প্রতি শুক্রবার ডিনারে নিমন্ত্রণ করা পরিবারের ঐতিহ্য হয়ে দাঁড়িয়েছিল। বন্ধুহীন আলবার্টের সঙ্গে তার চেয়ে এগার বছরের বড় এই ছেলেটির গভীর বন্ধুত্ব হয়ে গেল। কোথায় যেন এরা পরস্পর মানসিক মিল আবিষ্কার করল। এরা কথা বলে গভীর-গম্ভীর জিনিস নিয়ে। আলবার্টকে নতুন নতুন সব জ্ঞানের কথা শোনায় টালমে। একদিন আলবার্টকে সে এক সিরিজ বই-এর কথা বলল। নাম Popular Books on Natural Science। সম্পাদক আর্ন বার্নস্টাইন। ছ' খণ্ডের বইগুলোতেই রয়েছে প্রাণিবিজ্ঞান, উদ্ভিদবিদ্যা, জ্যোর্তিবিজ্ঞান এবং ভূগোলের সব কথা। সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য হল, বইটিতে বিষয়বস্তুর ক্রমবিন্যাসে তুলে ধরা হয়েছে প্রাকৃতিক ঘটনাবলীর কার্যকারণ ও পারস্পরিক নির্ভরতার সাধারণ ও সার্বজনীন তত্ত্বটি। তারপর আলবার্ট বুকনার-এর Force and Matter বইটি সোৎসাহে পড়ে ফেলল। এই বইটি উনিশ শতকের শেষ দিকে জার্মান কিশোর ও যুবকদের কাছে খুব জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল। বইটির গভীরতা বেশি ছিল না, বিশ্ববৈচিত্র্যের জটিলতা সম্পর্কে লেখকের অজ্ঞানতার ছাপও ছিল। তবু এ বই বহু কিশোর ও যুবককে ধর্মের দিক থেকে বিজ্ঞানের দিকে ফিরিয়ে এনেছিল। আইনস্টাইনের উপরও বইটির প্রভাব পড়ল। এতদিন প্রাথমিক স্কুল আর জিমন্যাশিয়ামের শিক্ষায় বিশ্ব আর জীবনের উৎপত্তি সম্পর্কে সে শুনে এসেছে বাইবেলের সেই পুরনো কাহিনী। আর আধুনিক জ্ঞানের আলোকে বুকনারের ব্যাখ্যায় এই প্রথম শুনল ধর্মীয় কাহিনীর অলীকত্ব এবং বিশ্বের বস্তুনিষ্ঠতার দৃঢ় ঘোষণা। ওল্ড টেস্টামেন্টের ঐতিহাসিক ও আর্টিস্টিক মূল্যবোধের দ্বারা

আইনস্টাইন খুব প্রভাবিত ছিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও বিজ্ঞানের কথাগুলি তাকে মুগ্ধ করল। এই সব বৌদ্ধিক অভিজ্ঞতার ফলে শ্লথ, শান্ত ও দিবাস্বপ্নে মশগুল বালক আলবার্ট সহসা এক স্বাধীন স্কলারে রূপান্তরিত হয়ে গেল। শীঘ্রই যে কোন রকম ধর্মের প্রতি সে বিরূপ হয়ে উঠল। স্থির করল ইহুদী ধর্মীয় সমাজ ত্যাগ করবে, কোন ধর্মীয় সংস্থারই সদস্য থাকবে না। এই সময়ের মনোভাব বর্ণনা করে তিনি বলেছেন—'আমি হয়ে পড়লুম an anti-religious fanatic'।

ইতিমধ্যে ছ' বছর বয়স থেকে আলবার্ট ভায়োলিনে পাঠ নিতে শুরু করে। কিন্তু শিক্ষক নির্বাচনের ব্যাপারে তার ভাগ্য কোন দিন ভাল ছিল না। এক্ষেত্রেও তাই হল। স্কুলের শিক্ষকদের মতো সংগীত শিক্ষকদেরও কেউ তাকে প্রেরণা যোগাতে পারলেন না। দীর্ঘ সাত বছর ধরে সে ভায়োলিন নিয়ে পড়ে রইল শুধুই কর্তব্যজ্ঞানে। কিন্তু সংগীত রাজ্যের সৌন্দর্যে সহসা তার একদিন জাগরণ ঘটল মোজার্টের সোনাটা শুনে। ঐ সোনাটার সৌন্দর্য ও আবেগে সে বিমোহিত হয় এবং নিজের ভায়োলিনে ওগুলো মূর্ত করতে মেতে ওঠে। কিন্তু সাধ ও সাধ্যে চিরবিবাদ। প্রয়োজনীয় দক্ষতা তখনও অবধি সে অর্জন করে উঠতে পারে নি। কাজেই প্রথমে নিজের টেকনিককে সর্বাঙ্গসুন্দর করে তুলতে প্রয়াসী হল। তারপর সত্যি সত্যি একদিন নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গের মতো বেজে উঠল মোজার্ট। সংগীত ছিল আইনস্টাইনের অবসর বিনোদনের প্রিয় সঙ্গী। চোদ্দ বছর বয়স থেকে সে বাড়িতে সব রকম কনসার্টে অংশ নিত। তার জীবনে মোজার্ট ও সঙ্গীতের ভূমিকাটি ছিল বৈজ্ঞানিক বিকাশের ক্ষেত্রে ইউক্লিড ও তাঁর জ্যামিতির ভূমিকার অনুরূপ।

শুধু বিজ্ঞানের—পদার্থ বিজ্ঞানের বই বা ভায়োলিনের সুরমুর্চ্ছনা নয়, তের বছর বয়স থেকে বালক আলবার্টের দার্শনিক বই পড়ার দিকেও ঝোঁক গেল। ঐ বয়সেই সে পড়ে ফেলল হেগেলের ডায়ালেকটিক, কান্টের Critique of Pure Reason। স্বল্পভাষী,

শান্তস্বভাব বালক অবশ্য লৌকিক পড়াশোনায় তেমন কোন উজ্জ্বলতার ছাপ রাখতে পারল না। বস্তুত, তার উত্তরাদির গভীরতা ও সূক্ষ্মতা শিক্ষকদের অগভীর স্থূল মনকে স্পর্শই করল না। বালকের ধীর বাকভঙ্গিমায় সবাই যেন তার উপর বিরক্ত ছিলেন। তবু আলবার্টের দিনগুলো একরকম ভালই কাটছিল। স্নেহপ্রীতি-রিক্ত স্কুলের আবহাওয়ায় যা সে পেত না সেই স্বাচ্ছন্দ্যটি খুঁজে পেত নিজ গৃহের পরিবেশে। বাবা-মা-কাকা আর বোনের সঙ্গে ছিল তার গভীর অন্তরঙ্গতা, টালমের মত রুচিসম্পন্ন মননশীল বন্ধুও ছিল, ছিল মিউনিখের উপকণ্ঠের বাগানবাড়ির নির্জনতা, বড় বড় গাছ, আলো-ছায়ায় আকীর্ণ মনোহর পথ। আর ঐ নির্জনতায় তার মন ও মস্তিষ্কের মধ্যে লীলায়িত ছন্দে চলত গণিতের কোন জটিল সমস্যা, সপ্তর্ষির প্রশ্নের ইঙ্গিত, হেগেলের ডায়ালেকটিক, কেউ যদি আলোর বেগে ছুটে আলোকরশ্মিকে ধরতে যায় তা হলে কি হবে—এই সব হরেক রকম প্রশ্ন। এগুলি তার মন ও বুদ্ধির আকাশে মৌমাছির মতো নিরন্তর ছোটাছুটি করত। বেশ ছিল বালক আলবার্ট। কিন্তু ভাগ্য মন্দ। মানস ও মস্তিষ্কলোক থেকে ঐটুকু বয়সে তাকে নেমে আসতে হল দৈনন্দিন জীবনের রূঢ় বাস্তব মরুক্ষেত্রে, একেবারে জীবন সংগ্রামের মাঝে।

হেরমান আইনস্টাইন কোনদিনই সার্থক ব্যবসায়ী ছিলেন না। মিউনিখে তাঁর ইলেকট্রিক কারখানার অবস্থা দ্রুত অবনতির দিকে যেতে লাগল। তখনকার রাজনৈতিক ও সামরিক অবস্থাও এজন্য অনেকটা দায়ী। লাভ হওয়া তো দূরের কথা, সহসা হেরমান নেমে এলেন আকস্মিক টানাটানির মধ্যে। লোকসান দিতে দিতে শেষ অবধি একেবারে দেউলে হয়ে পড়লেন। অবস্থা এ রকম হল যে, খাবারের সংস্থান বন্ধ হওয়ার উপক্রম। হেরমান স্থির করলেন, ভাগ্যান্বেষণে অন্যত্র চলে যাবেন। ইহুদী তাঁরা, মাটির টান নেই। ইতালীই সব দিক দিয়ে পছন্দসই মনে হল। একদিকে ব্যবসার পক্ষে ইতালী হল

স্বর্গরাজ্য, আর রয়েছে তার বিচিত্র জীবনযাত্রা। এই বৈচিত্র্যের প্রতি হেরমানের ছিল অদম্য আকর্ষণ। তা ছাড়া, পওলিনের কিছু ধনী আত্মীয় ব্যবসায়ে সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। কাজেই ১৮৯৪ সালে হেরমান পরিবার মিউনিখ ছেড়ে ইতালীর মিলানে চলে গেলেন। কাকা জেকবও সঙ্গী হলেন। শুধু আলবার্ট রয়ে গেল মিউনিখে জিমন্যাশিয়ামের পড়াশোনা শেষ করতে। এক বৃদ্ধা মহিলা তাকে খরচ দিয়ে রাখলেন।

প্রথমে আইনস্টাইন ভায়েরা মিলানে ব্যবসায় পত্তনের চেষ্টা করলেন। কিন্তু খুব একটা সুবিধে হল না। অগত্যা উঠে গেলেন পাভিয়ায়। সেখানেও তাই। ফিরে এলেন আবার মিলানে। মিলানে ফ্যাক্টরি খুললেন।

এদিকে পনর বছরের কিশোর আলবার্টের পক্ষে মিউনিখের জীবন দুঃসহ হয়ে উঠল। মা-বাবা ছেড়ে জীবনে এই প্রথম সে একাকী। পারিবারিক জীবনে যে সঙ্গশীলতার আবহাওয়া ছিল, তা এখন আর নেই। টালমে আর আসে না। বাইরের দিকে স্কুলজীবন। সে আরও অসহ্য ও দুর্বিসহ! গণিত ও পদার্থবিজ্ঞানে সহপাঠীদের চেয়ে ঢের বেশি এগিয়ে থাকলেও জিমন্যাশিয়ামে মানিয়ে চলা ক্রমশ তার পক্ষে অসম্ভব হয়ে উঠল। ওখানকার পড়াশোনার ধরন-ধারণ সম্পর্কে তার কঠোর মনোভাব যেন আরও বেড়ে গেল। যে সব বই পড়তে হত তার উপর সে একেবারে খাপ্পা হয়ে উঠল। অবিশ্রান্ত ল্যাটিন আর গ্রীক আউরে যাওয়া, অন্যান্য বিষয়ের অর্থহীন তথ্যবাহুল্য, সর্বোপরি শিক্ষকমণ্ডলী ও কর্তৃপক্ষের 'জ্ঞানীর মূঢ়তা' একেবারে অসহ্য। ছয় মাস এই বিরক্তি ও একাকীত্বের মধ্যে কেটে গেল। স্কুলের ছাত্রসুলভ চালাকিতে উদাসীন এই সিরিয়াস চরিত্রের বালকটির স্কুলেও তেমন বন্ধু জোটেনি। আর, এখন মা-বাবা-বোন-কাকা সবাই দূরে। তাদের জন্য মন কেমন করে। না, আর নয়। সে একবার ঘুরে আসবে মিলান থেকে, এখনই, এই মুহূর্তে। সৌন্দর্যময়ী প্রাকৃতিক ইতালী, ইতিহাস

বিজড়িত ইতালী আলবার্টের রুচি মনকে আহ্বান করল, আকর্ষণ করল মা-বাবা আর ছোট বোন মাজা। কিন্তু ছুটি না পেলে কি করে যাওয়া যায়! আর যে কড়া প্রিন্সিপাল! ছুটি কি দেবেন? এক ডাক্তারের কাছ থেকে সে জোগাড় করল এক সার্টিফিকেট। মানসিক অবসাদের দরুণ ছ' মাসের ছুটি প্রয়োজন। স্কুলের কর্তৃপক্ষ আলবার্টের উদ্দেশ্য বুঝতে পেরেছিলেন। ছুটি চাইতে হল না, তাকেই স্কুল ছেড়ে দিতে বলা হল। কেননা, আলবার্টের স্বাধীন চিন্তা ও চিত্তকে তাঁরা মোটেই ভাল চোখে দেখতেন না। এমন কি আলবার্টের জন্য অন্যান্য ছাত্রদের স্কুলের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ বজায় রাখতে তাঁরা হিমসিম খাচ্ছিলেন।

মিলানের প্রাকৃতিক ও পারিবারিক আবহাওয়ায় আইনস্টাইনের জীবন ভরে উঠল। চারদিকে নেই কোন স্কুলের দেওয়াল, আছে শুধু উদার উন্মুক্ত আকাশ। মুক্তির আস্বাদে জীবনকে সার্থক করে ভরিয়ে তুলল আলবার্ট। ইতালীকে সে ভালবেসে ফেলল। এর প্রাচীন মন্দির, মিউজিয়ম ও আর্ট গ্যালারির সমারোহ, এর রাজপ্রাসাদ এবং ছবির মতো সাজানো পর্ণকুটির, সর্বোপরি এর আনন্দোচ্ছল, অতিথিবৎসল এবং অনাড়ম্বর জনসাধারণ, যাঁরা সমান উচ্ছলতায় কাজ ও আলসেমি করেন, সমান অঙ্গভঙ্গিমায় পরস্পর আনন্দ বিনিময় ও কলহে লিপ্ত হন। এ সবের সে প্রেমে পড়ে গেল। এখানকার সংগীত ও গীতবাদ্য এবং উচ্ছল সুরেলা বাগ্‌ভঙ্গিতে তার মনে হল এ যেন এক নতুন জগত। এখানে নেই জার্মানের সেই পীড়াদায়ক শীতল নিয়মের নিষ্ঠুর নিগড় বা আচার-ব্যবহার ও কথাবার্তার ছাঁচে-মাপা ধরন-ধারণ। ইতিমধ্যে আপেনিয়ান পর্বত পেরিয়ে ঘুরে এল জেনেয়া। যেখানেই গেল সেখানেই মুগ্ধ হল। ঘটল এক অনাস্বাদিতপূর্ব আন্তর-স্বাধীনতার অনুভূতি ও অভিজ্ঞতা। এভাবে ছ'টা মাস দেখতে দেখতে কেটে গেল। প্রকৃতিকে সে ভালবাসল, তার সৌন্দর্য-সন্ধানী মন শিল্পী হয়ে উঠল।

কিন্তু এভাবে আর কতদিন চলবে ? আইনস্টাইন নিজের ভবিষ্যৎ নিয়ে ভাবতে শুরু করল। বাবার ব্যবসা দিন দিন খারাপের দিকে। মিলান ও পাভিয়ায় ইলেকট্রিক ফ্যাক্টরি করতে গিয়ে পরিবারের সমস্ত জমা টাকা নিঃশেষ হয়ে গেছে, অথচ তা থেকে আগম বলতে কিছু নেই। ফলে হেরমান মানসিকভাবে কিছুটা ভেঙে পড়েছেন। ছেলের সম্বন্ধে বিরাট কিছু আর স্বপ্নজাল বোনেন না। অবশেষে ছেলেকে একদিন বলেই ফেললেন, তাঁর পক্ষে খরচ চালানো দুঃসাধ্য হয়ে উঠছে। যত শিগগির সম্ভব আলবার্টকে একটা কিছু চাকরি-বাকরি করতে হবে। বাবার এখন ইচ্ছা ছেলেটি যদি এঞ্জিনিয়র হয় তা হলে মন্দ হয় না। বেশ কার্যকরী শিক্ষা, ইচ্ছা করলে স্বাধীন ব্যবসা খুলতে পারবে। কিন্তু তা কি ছেলে পড়বে ? সে তো আর হেরমানের মতো প্রাকটিক্যাল মানুষ নয়! সে যে নেহাতই মানস ও মস্তিষ্কলোকে বিচরণ করে। এদিকে আলবার্ট ইতিমধ্যে বুঝে গেছে যে, তার মনোমত বিষয় বলতে গণিত আর তত্ত্বীয় পদার্থবিজ্ঞান। কিন্তু মুশকিল হল এতে কি চাকরি-বাকরি জোটানো যাবে ? বাবা-কাকা উভয়েই পরামর্শ দিলেন এঞ্জিনিয়ারিং পড়তে। পরামর্শটি আলবার্টের কাছে খুব যৌক্তিক মনে হল। কারণ জিমন্যাশিয়ামের ডিপ্লোমা ছাড়া কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ দুঃসাধ্য। ঠিক হল, সে একটা টেকনিক্যাল স্কুলে ভর্তি হবে। তবে জার্মান ভাষার মাধ্যমে শেখানো হয় এমন স্কুল হওয়া চাই। জার্মানীতে গিয়ে পড়ার প্রশ্নই ওঠে না। সুইজারল্যাণ্ডের জুরিখ যাওয়া যাক। সেখানে জার্মান ভাষায় পড়াশোনা হয়। জার্মানীর বাইরে সবচেয়ে নাম করা স্কুল হল জুরিখের সুইস ফেডারেল পলিটেকনিক। ১৮৯৫-এর শরৎকালে গটহার্ড এক্সপ্রেসে মিলান থেকে জুরিখে এল আলবার্ট এবং ওখানে ভর্তির আবেদন করল। ভর্তি হওয়ার পরীক্ষাও দিল। পদার্থবিদ্যা আর গণিতে অদ্ভুত ভাল নম্বর পেল, কিন্তু ভাষা আর প্রকৃতি বিজ্ঞানে একেবারে ফেল! তবে আর কি করে ভর্তি

করা যায়। আলবার্টকে ভর্তি করা হল না। পলিটেকনিকের ডিরেক্টর আলবিন হার্জগ গণিতে আইনস্টাইনের পারদর্শিতায় এতদূর মুগ্ধ হলেন যে, তাকে ডেকে বললেন—কাছাকাছি কোন সুইস সেকেণ্ডারী স্কুল থেকে পাশ করে এস, পরের বছর তোমায় ভর্তি করে নেব। কাছেই একটা ছোট সুইস শহর আরাও। সেখানে রয়েছে ক্যাণ্টনাল স্কুল, বেশ ভাল শিক্ষকমণ্ডলী। পঠনপাঠনের পদ্ধতিও খুব প্রগতিশীল। ডিরেক্টর এই স্কুলে ভর্তি হতে আলবার্টকে পরামর্শ দিলেন। হার্জগের পরামর্শে সায় দিলেন পরিবারের শুভাকাঙ্ক্ষী পিতৃবন্ধু গুস্তাভ মেয়ার। ইনি উল্‌ম থেকে ১৮৯৫-এ জুরিখে এসে বসবাস শুরু করেন।

আইনস্টাইনের মন থেকে তখনও মিউনিখের স্মৃতি মুছে যায় নি। আবার সেকেণ্ডারী স্কুলে পড়ার কথায় মন বিষিয়ে উঠল। কিন্তু কি আর করা যায়। চললেন একত্রিশ মাইল দূরে আরাও স্কুলে ভর্তির উদ্দেশ্যে। কিন্তু এক সুখকর বিস্ময় যে তার জন্য সেখানে অপেক্ষারত আলবার্ট তা ভাবতে পারে নি। স্কুলটি বেশ ভাল। মাস্টার-মশায়েরা জাঁদরেল নন, ছাত্রদের সঙ্গে তাঁদের বন্ধুর মতো ব্যবহার। স্বাধীনতা প্রচুর। পদার্থবিজ্ঞান ও রসায়নের ল্যাবরেটরিতে ছাত্ররা স্বাধীনভাবে কাজ করে। প্রাণিবিদ্যার জন্য রয়েছে চমৎকার একটি মিউজিয়ম, সেখানে মাইক্রোসকোপের ছড়াছড়ি। উদ্ভিদবিদ্যার প্র্যাকটি-ক্যাল ক্লাশের জন্য রয়েছে বাগানের ব্যবস্থা। সর্বোপরি শিক্ষকদের পাঠদান ছিল খুব চিত্তাকর্ষী। স্কুলের সিনিয়র ছাত্রেরা নানা সামাজিক সমস্যা নিয়ে প্রায়ই আলোচনা করত। সে সময় দেশত্যাগী বহু বিপ্লবী যুবক সুইজারল্যাণ্ড এসে বাস করত এবং এই ধরনের প্রশ্নে প্রায়ই সুন্দর বিতর্ক হত। আরাও-এ আইনস্টাইন এক বছরের মতো ছিলেন এবং স্বল্পকালীন অবস্থানেই বুঝেছিলেন যে, পণ্ডিতি রুটিনের ধাক্কায় বিধ্বস্ত না হলে এবং মানসিক দিক থেকে প্রগতিশীল ব্যক্তিদের দ্বারা পরিচালিত হলে শিক্ষকতা এক আকর্ষণীয় পেশার রূপ নিতে পারে। আরাও সম্পর্কে আইনস্টাইন স্মৃতিচারণায়

বলেছেন—"ঐ ইউরোপীয় মরুদ্যানে, সুইজারল্যাণ্ডে, এটি হল একটা অবিস্মরণীয় ওয়েসিস।"

ভিনটেলার নামে একজন শিক্ষকের বেশ ভাল লাগল আলবার্টকে ওর বিশেষত্বের জন্য। এঁরই বাড়িতে আইনস্টাইন থাকতে শুরু করল। অধ্যাপকের ছেলেমেয়েদের সঙ্গেই আইনস্টাইন বেশির ভাগ সময় কাটাত। তারা ছিল তার সমবয়সী এবং বন্ধু। আলবার্ট তাদের ঘুড়ি বানিয়ে দিত এবং ওড়াত। সবাই মিলে প্রায়ই পাহাড়ে রাস্তায় বহুদূর বেড়াতে যেত। আলবার্ট এখন বড় হয়েছে, প্রায় ষোল বছর বয়স তার। লাজুক স্বভাবটা অনেক কমে গেছে এখানে এসে। সহপাঠীদের অনেকের সঙ্গে গড়ে উঠেছে বন্ধুত্ব। আলবার্টের বন্ধুত্বের মধ্য দিয়ে আইনস্টাইন ও ভিনটেলার পরিবারের মধ্যেও ঘনিষ্ঠতা বেড়ে ওঠে, পরে ভিনটেলারের ছেলে ও আলবার্টের বন্ধুর সঙ্গে ছোট বোন মাজার বিবাহে গড়ে ওঠে আত্মীয়তা।

১৮৯৬ সালে আইনস্টাইন আরাও-এর পাঠ শেষ করল। সঙ্গে সেকেণ্ডারী স্কুল পাশের সার্টিফিকেট নিয়ে ফিরে গেল জুরিখে। এবারে কিন্তু পরীক্ষা ছাড়াই তাকে জুরিখ পলিটেকনিকে ভর্তি করে নেওয়া হল। আগেরই জানাশোনা মেধাবী ছেলে সে। ১৮৯৬-র অক্টোবর থেকে ১৯০০-র আগস্ট পর্যন্ত চার বৎসর আলবার্ট পলিটেকনিকে পদার্থবিজ্ঞান ও গণিত বিভাগে পড়াশোনা করে। কিন্তু জুরিখ অ্যাকাডেমির লেবরেটরিতে যে সব যন্ত্রপাতি আছে আইনস্টাইনের কাছে তা যথেষ্ট বলে মনে হয় না। এখানে যা পড়াশোনা হয় তার চেয়ে অনেক দূর এগিয়ে আছে সে। আরও উচ্চতর পদার্থবিজ্ঞান এবং গণিতের আবহাওয়া চাই তার। কিন্তু তা বলে জ্ঞানের অন্যান্য বিষয়েও তার ঝোঁক কম ছিল না। গণিত ও পদার্থবিজ্ঞান ছাড়া দর্শন, ইতিহাস, অর্থবিদ্যা এবং সাহিত্যে কয়েকটি বিশেষ পাঠক্রম নিয়েছিল। অত্যন্ত ব্যগ্রতার সঙ্গে সে এ সময় দর্শন ও প্রকৃতি বিজ্ঞান পড়তে থাকে—শোপেনহাওয়ার,

ডারউইন, হিউম, বার্কলে প্রচুর পড়ল।

মূল বিষয় পদার্থবিজ্ঞান ও গণিতের ক্লাশ সে অবশ্য কদাচিৎ করত। পদার্থবিজ্ঞানের অধ্যাপক ছিলেন ওয়েবার—ইলেকট্রিক এঞ্জিনিয়ারিং-এর একজন খ্যাতিমান বিশেষজ্ঞ। কিন্তু তত্ত্বীয় পদার্থ-বিজ্ঞানে আইনস্টাইনের জ্ঞানভাণ্ডারে তিনি কিছুই যোগ করতে পারেন নি। নিজের চেষ্টায় আইনস্টাইন এ ব্যাপারে অনেক দূর এগিয়ে ছিল। ম্যাক্সওয়েল, কিরকফ, বোলৎজমান এবং হার্ৎজের তত্ত্বীয় পদার্থবিজ্ঞান সংক্রান্ত গবেষণার একটা আবেদন আইনস্টাইন সর্বদাই অনুভব করত। এবং নিজের চেষ্টায় যতদূর সম্ভব এঁদের কাজের সঙ্গে পরিচিত ছিল। তার এই প্রাথমিক আগ্রহ পদার্থবিদ্যা আর গণিতে প্রায় সমান সমান ছিল এবং তত্ত্বীয় পদার্থবিজ্ঞানের কয়েকটি মূল সমস্যাকে কেন্দ্র করে এই আগ্রহটি আবর্তিত হত। গণিত অধ্যাপকদের মধ্যে ছিলেন বিশ্রুতকীর্তি অ্যাডলফ হারউইৎজ এবং হেরমান মিনকাওস্কি। কিন্তু তাঁদের লেকচারও আইনস্টাইনের কাছে ভাল লাগত না। পরবর্তী-কালে আইনস্টাইনের আপেক্ষিক তত্ত্বকে একটা সুসংসহত গাণিতিক রূপদানে মিনকাওস্কি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নিয়েছিলেন। কিন্তু তিনি আপেক্ষিক তত্ত্বের ভবিষ্যৎ জনককে কখনও নিজের ক্লাসে উপস্থিত থাকতে দেখেন নি। তাই আপেক্ষিক তত্ত্ব যখন প্রথম প্রকাশিত হল তখন মিনকাওস্কি মন্তব্য করেছিলেন—'জুরিখ পলিটেকনিকের এই ছাত্রটির কাছ থেকে এ জিনিস আমি ভাবতে পারি না।'

এ সময় অঙ্কের ক্লাশের একটি ছাত্র মার্শেল গ্রসমানের সঙ্গে তার খুব বন্ধুত্ব হয়। ইনি ভবিষ্যতে একজন বিজ্ঞানী হিসাবে নাম করেছিলেন। এবং পরে সাধারণ আপেক্ষিক তত্ত্বের গাণিতিক রূপায়নে বন্ধুকে যথেষ্ট সাহায্য করেন। এই গ্রসমান মিনকাওস্কি ও উচ্চতর গণিতের অন্যান্য শাখার অধ্যাপকদের লেকচার সযত্নে ক্লাশে টুকে নিত। গ্রসমানের নোট দু'মাস ধরে মুখস্থ করে আইনস্টাইন

পরীক্ষা বৈতরণী পার হল। এভাবে ক্লাশ করা থেকে মুক্তি পাওয়ার ব্যাপারটি আইনস্টাইনের কাছে খুব উপভোগ্য ছিল। নিছক পরীক্ষায় পাশ করার জন্য পড়াশোনা তার কাছে ছিল মূর্তিমতী বিভীষিকা।

এ সম্পর্কে পরবর্তীকালে আত্মজীবনীমূলক লেখাতে তিনি উল্লেখ করেছেন—'এই অত্যাচারের কুফল এত সুদূরপ্রসারী হয়েছিল যে, ফাইনাল পরীক্ষা পাশের পর এক বছর পর্যন্ত কোন বৈজ্ঞানিক সমস্যা নিয়ে চিন্তা করতেও আমার কাছে বিস্বাদ লাগত। তবে সত্যের খাতিরে বলব, অন্য বহু অঞ্চলের তুলনায় সুইজারল্যাণ্ডে সত্যিকারের বৈজ্ঞানিক আবেগ নষ্ট করে দেয় এমন অত্যাচারের হাতে কমই পড়তে হয়েছে। সেখানে ছিল মোট দুটি পরীক্ষা; এ বাদে যে কেউ আপন খুশিমতো কাজ করতে পারত। আর বন্ধু থাকলে তো কথাই নেই। যেমন, আমার একজন ছিল। সে নিয়মিত ক্লাশ করত এবং মনোযোগের সঙ্গে ক্লাশের আলোচ্য বিষয় বুঝে নিত। ফলে, কেউ ইচ্ছা করলে, পরীক্ষার কয়েক মাস আগে পর্যন্ত যে কোন বিষয়ে স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারত। এই স্বাধীনতা আমি যথেষ্টই ভোগ করেছি এবং……এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট পাপকে আমার লঘু বলে মনে হয়েছে। আধুনিক শিক্ষাদান পদ্ধতি যে অনুসন্ধিৎসার পবিত্র ও সুকুমার বৃত্তিটিকে এখনও গলা টিপে একেবারে মেরে ফেলতে পারে নি তা আমার কাছে একটা মিরাকল। কেননা, বাইরের উদ্দীপনা ছাড়াও, অনুসন্ধিৎসার নরম চারাগাছটির বৃদ্ধির পক্ষে স্বাধীনতার বড় প্রয়োজন, এর অভাবে ও ক্রমে শুকিয়ে মারা যায়……জোর করে দায়িত্বের ভার চাপিয়ে অনুসন্ধানের আনন্দ মনে ফুটিয়ে তোলা যাবে কিংবা জ্ঞানচক্ষু উন্মীলন করা যাবে, এটা ভাবা মস্ত ভুল। চাবুক হাতে জোর করে অনবরত খাওয়ানোর চেষ্টা করলে শিকারী বন্য জন্তুরও অবশেষে খাদ্যে অরুচি জন্মানো অসম্ভব নয়।'

সুইজারল্যাণ্ডের অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয় শহরের মতো জুরিখও ছিল একটি আশ্রয়স্থল। নানা দেশের ছাত্র, বিপ্লবী দেশত্যাগী এবং

জাতীয় বা সামাজিক অত্যাচারের শিকার স্বদেশীয় যুবক-যুবতীরা এখানে এসে জুটত। ছাত্রদের সকলেই অবশ্য বিপ্লবী ছিল না, তবে এদের অধিকাংশ গণতান্ত্রিক মতাদর্শে বিশ্বাসী ছিল। মহান রাজনৈতিক ও বৈজ্ঞানিক মেজাজের এমন এক সামাজিক পরিবেশ জুরিখে ছিল যে, নিছক বিজ্ঞানেই যাদের কৌতূহল সীমিত তারাও এর দ্বারা প্রভাবিত না হয়ে পারত না। আলবার্টের এখন বয়স বাড়ছে। মস্তিষ্ক-জগৎ যতটা বিপুল বিস্তৃতিতে প্রসারিত হচ্ছিল সামাজিক জগতে অতটা না হলেও এ সময় আলবার্ট বেশ সামাজিক মানুষ বলে পরিচিত ছিল। দেশত্যাগী ছাত্রদের অনেকে এখন তার বন্ধু। এদের মধ্যে ছিল অস্ট্রিয়ো-হাঙ্গেরির সার্বিয়া থেকে আসা একটি মেয়ে—মিলেভা মারিক।

মিলেভা ছিলেন আইনস্টাইনের সহপাঠী, সিরিয়াস প্রকৃতির বিনম্র স্বল্পভাষী মেয়ে। তবে খুব একটা চালাক-চতুর বা আকর্ষণীয় নয়। জ্ঞান অর্জনের প্রবল স্পৃহায় সে এসেছিল সুইজারল্যাণ্ডে, পলিটেকনিক থেকে শিক্ষণ সার্টিফিকেট নিতে। বুদ্ধির দিক থেকে সে ছিল সাধারণ স্তরের, গণিতে বিশেষ কোন দক্ষতা ছিল না। আইনস্টাইনের সাহায্য না পেলে শেষ পর্যন্ত তার হয়ত সার্টিফিকেট পাওয়া হত না। এক বিষয়ে উভয়ের মধ্যে একটা মিল ছিল। দুজনেই বিখ্যাত পদার্থবিদ্‌দের কাজ অত্যন্ত মনোযোগ দিয়ে পড়তে ভালবাসত। তা ছাড়া, নিজের আইডিয়াগুলো বলার জন্য আইনস্টাইন সব সময়ে একজন বন্ধু বা সঙ্গীর প্রয়োজন বোধ করত। শ্রোতা হিসেবে মিলেভা খুব একটা সাড়া দেবার মতো ছিল না, তবু আইন-স্টাইনের তাতেই চলত। সারা জুরিখে এমন কেউ ছিল না যে বুদ্ধিমত্তায় আইনস্টাইনের সমকক্ষ হতে পারে। বস্তুত, সব দিক দিয়ে সমকক্ষ বন্ধু তাঁর কোনদিন জোটে নি। কিংবা, জীবনে এমন কোন মেয়ের সাক্ষাৎ তিনি পান নি যে বিদ্যাবত্তার পশ্চাৎপট ছাড়া শুধুই সৌন্দর্যে তাঁকে আকৃষ্ট করতে পারে। সে যাই হোক, পড়াশোনার

সহযোগী মিলেভা ক্রমে আইনস্টাইনের মানসিক সহযোগী হয়ে পড়ল। অ্যাকাডেমিতে পড়তে পড়তেই তারা সিদ্ধান্ত করে ফেলে পরস্পরকে বিয়ে করবে।

ছাত্রাবস্থায় আইনস্টাইন সর্বদাই বিপদগ্রস্ত সহপাঠীদের আন্তরিক সাহায্যের জন্য এগিয়ে আসতেন। এ সময় একদিন মার্গারেট নামে জীববিজ্ঞানের এক ছাত্রী ফিজিক্স অধ্যাপকের অবাস্তব ও অকেজো কার্যপদ্ধতি নিয়ে তাঁর সঙ্গে তিক্ত বাদানুবাদে লিপ্ত হয়ে পড়ে। বাদানুবাদ যখন তুঙ্গে সে সময় ছাত্রীটি হঠাৎ দেখতে পেল মোটাসোটা শিক্ষকের পেছন থেকে এক জোড়া অত্যুজ্জ্বল চোখ তার উপর নিবদ্ধ। চোখ জোড়া যেন বলছে—"তোমার সম্বিৎ ফিরুক।" অধ্যাপক রাগে স্থান ত্যাগ করলে আইনস্টাইন উত্তেজিত বিদ্রোহিনাকে পরামর্শ দিলেন এখন থেকে প্রত্যেকটি লেকচারের ল্যাবরেটরি নোট সে যেন আইনস্টাইনকে দিয়ে দেয়। সেগুলো বাড়ি নিয়ে আইনস্টাইন তার হয়ে প্রকৃতই গ্রহণযোগ্য কিছু ফলাফল বের করে দেবে। এত চমৎকারভাবে আইনস্টাইন এই কাজটি করলেন যে, পরবর্তী চেক-আপে মেয়েটির নোটবুক দেখে বিস্মিত অধ্যাপক সোৎসাহে চাৎকার করে উঠলেন—"তা হলে দেখছ একটু যত্ন নিলে, আমার অকেজো ও অবাস্তব পদ্ধতি সত্ত্বেও, কাজের কাজ কিছু করা যায়।"

ঘটনার সময় ছাত্রীটি দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে বলেছিল যে, তুলনামূলকভাবে আইনস্টাইনের অবস্থা ভাল। কারণ যোগ্য অধ্যাপক ওয়েবারের অধীনে তবু কিছু অগ্রগতি সম্ভব, কিন্তু তার অধ্যাপকের কাজের ধরনধারণ একেবারে সেকেলে। উত্তরে আইনস্টাইন যা বললেন তা বড়ই মজার—"What the one teaches is not right; but what the other teaches is not right either."

এ সময় আইনস্টাইনের ঘনিষ্ঠ বন্ধুদের অন্যতম ছিল মার্শেল গ্রসমান, লুই কলরোস এবং জেকব এরাট। মিলেভার মতো এরাও

ছিল পলিটেকনিকে আইনস্টাইনের সহপাঠী, ১৮৯৬-এর ছাত্রদল। জুরিখে লেকের ধারে থালভিল গ্রামে মা-বাবার সঙ্গে থাকত গ্রসমান। ভবিষ্যতে বৈজ্ঞানিক হিসেবে গ্রসমান খুব নাম করে-ছিলেন। প্রথম সাক্ষাতের কয়েক দিন পরেই খাবার টেবিলে গ্রসমান তার মা-বাবাকে বলেছিল—"এই আইনস্টাইন একদিন খুব মস্ত লোক হবে।" গ্রসমানের বাড়িতে আইনস্টাইন বন্ধুর সঙ্গে গানবাজনা ও নানা আলোচনায় সময় কাটাত। এ সময় তার রসজ্ঞানেরও পরিচয় মেলে। একদিন গ্রসমানের ছোট ভাইকে আইনস্টাইন বললেন—"I suppose you think you can run ?" বিস্মিত বালক উত্তর করল—"Yes, why not ?" আইনস্টাইন তখন তার কানটি ধরে বলল—"No, you couldn't, your big ears set up too much wind resistance."

আর জেকব এরাট থাকত তার মায়ের কাছে। এরাটের পাশে আইনস্টাইন প্রায়ই লেকচার শোনার সময় বসত। এরাটের মা খুব বুদ্ধিমতী ছিলেন এবং আইনস্টাইনকে নিজের ছেলের মতোই ভালবাসতেন। লেখাপড়ায় এরাট গ্রসমানের মতো অত চকচকে ছিল না। ফাইনাল পরীক্ষার দিন যত এগিয়ে এল, এরাট তত নার্ভাস হয়ে পড়ল। একদিন এরাটের মা আইনস্টাইনকে বললেন যে, তাঁর ছেলে পরীক্ষার চিন্তায় একেবারে ভীত হয়ে পড়েছে। শুনে আইনস্টাইন শান্তকণ্ঠে মন্তব্য করল—"ওর এতটা ভয়ের কী আছে ? হয় তুমি এটা জান, নয়তো জান না। ব্যাপারটা তো একে-বারে পরিষ্কার।" একটা মজার ঘটনার কথা এরাটের মার মুখে প্রায়ই শোনা যেত। একবার খুব সর্দি-কাশি নিয়ে আইনস্টাইন এরাটের বাড়িতে এসে ওঠে। গলায় স্কার্ফ জড়ানো। আসলে ওটা ছিল একটা বড় টেবিল ক্লথ ! যে ঘর ভাড়া নিয়ে আইনস্টাইন থাকত সেই ঘরের দেরাজে ওটা রাখা ছিল। বাড়িওয়ালির ছিল কাপড় ইস্ত্রির ব্যবসা। ইস্ত্রি করার সময় গান শুনতে তার খুব ভাল লাগত। অনেক সময়

আইনস্টাইনকে ক্লাশ কামাই করেও তাকে গান শোনাতে হত। সে সময়ে মেট্রোপোল কাফে-তে বন্ধুবান্ধবদের জমাট আড্ডা বসত। কখন কখন এমন কি ঐ আড্ডা বর্জন করেও মহিলাকে ভায়োলিন বাজিয়ে শোনাতে হত।

আইনস্টাইন তার পিতৃবন্ধু উল্‌মের গুস্তাভ মেয়ার পরিবারেও দেখা করতে যেত। কয়েক বছর পরে একবার আইনস্টাইন তাঁদের লিখেছিলেন—"উলমে আপনারা ছিলেন আমার মা-বাবার ঘনিষ্ঠ বন্ধু। পরে ১৮৯৫-র শরৎকালে আমি যখন জুরিখে এলাম এবং পরীক্ষায় ব্যর্থকাম হলাম তখন আপনারা আমায় উদারভাবে সাহায্য করেছিলেন। আপনাদের গৃহের আতিথেয়তার দরজা সারা ছাত্রজীবন ধরেই আমার কাছে অবারিত ছিল। এমন কি, ইউট্‌লিবার্গ থেকে নোংরা জুতো পরে এলেও সে দরজা বন্ধ হত না।"

কখন কখন আইনস্টাইন যেত তাদের এক দূর-সম্পর্কের আত্মীয় আলবার্ট কারের বাড়িতে। এঁরা বাড়িতে কনসার্ট দিতেন। মিসেস কারের ছিল মিষ্টি গলা। আইনস্টাইন তাঁর সঙ্গে সঙ্গত করতেন।

জুরিখে আইনস্টাইনের ছাত্রাবস্থার একটি সুন্দর লেখনীচিত্র এঁকেছেন প্রাইমারী স্কুলশিক্ষক সুশান মার্কওয়াণ্ডার। এঁর মায়ের কাছেই জুরিখে আইনস্টাইন থাকতেন। তিনি লিখেছেন—"...সন্ধ্যায় বাড়িতে গানের আসর বসত। আমাদের ভায়োলিনবাদক ছিলেন আইনস্টাইন। তিনি প্রায়ই মোজার্টের সুর তুলতেন, আর আমার কাজ ছিল সাধ্যমত পিয়ানোয় সঙ্গত করা। পিয়ানো সোনাটার যে সব কপি আইনস্টাইন আমায় বন্ধুর প্রতি ভালবাসার স্মারক হিসেবে উৎসর্গ করেছিলেন সেগুলো আজও আমার কাছে আছে। বাজাতে গিয়ে আমার যে সব ভুলচুক হত সেগুলোর প্রতি তিনি খুবই ধৈর্যশীল ছিলেন। বেশি অসন্তুষ্ট হলে বলতেন—"Struck again like the donkey on the mountain" এবং নিজের 'বো'

দিয়ে দেখিয়ে দিতেন পিয়ানোর ঠিক কোথায় আমার বাজান উচিত। তারপর দুজনে আবার আনন্দে বাজিয়ে চলতাম। আমাদের ওপর-তলায় থাকতেন এক বিধবা মহিলা। একদিন তিনি মা'র কাছে অনুমতি চাইলেন তাঁর দুই মেয়ে নিয়ে ড্রইং-রুমে এসে আমাদের বাজনার রেয়াজ শুনবেন। কিছুটা ইতস্ততঃ করে মা রাজি হলেন। তিন সঙ্গীতপ্রেমিক এসে সোফায় বসলেন। বাজনা শুনছেন, আর সেই সঙ্গে চলছে তাঁদের সেলাই কাঠির কটাকট শব্দ। মাঝে মাঝে ভুলে সেলাই-এর ফোঁড় পড়ে যাওয়ার হা-হুতাশ আমাদের বাজনায় বিঘ্ন সৃষ্টি করছিল। গতিক দেখে আইনস্টাইন গম্ভীরভাবে আমায় বাজনা বন্ধ করতে বলে নিজের ভায়োলিন কেসে পুরে ফেললেন। সিনিয়রতম আগন্তুক বললেন—"কি হল, এত তাড়াতাড়ি আজ শেষ হয়ে গেল ?" ব্যঙ্গাত্মক উত্তরে আইনস্টাইন জানালেন—"আপনাদের কাজে বিরক্ত করব এ কথা স্বপ্নেও আমরা ভাবিনি।"

"কখন কখন আইনস্টাইন বন্ধুদের নিয়ে জুরিখ লেকে নৌকো চালাতেন। সঙ্গে আমাকেও নিতেন। এখনও মনে পড়ে যখন বাতাস বন্ধ হয়ে যেত এবং ঝরাপাতার মতো নৌকোর পাল চুপসে যেত তখন আইনস্টাইন একখানা নোটবুকে কত কী লিখতেন। আবার যেই বাতাস বইতে শুরু করত অমনি পাল তুলে নৌকো চালু করতেন। কখনও বা অধ্যাপক স্টার্নের সঙ্গে একত্রে বাজনায় মাততেন। স্টার্নের বাড়িতে আইনস্টাইন সর্বদাই স্বাগত আগন্তুক ছিলেন। এ সময় একদিন আইনস্টাইন এবং অন্য একজন পদার্থবিদের মধ্যে বেশ হৃদয়গ্রাহী বিতর্ক জমে ওঠে। বিতর্কের মাঝে ঐ পদার্থবিদ্ আইন-স্টাইনের তত্ত্বীয় ভিত্তিগুলোকে কিছুটা আক্রমণাত্মক ভঙ্গিতে আঘাত করছিলেন। কিন্তু আইনস্টাইন নির্বিকার। আহারান্তে নিজের ভায়োলিনটি দেখিয়ে বললেন—"Now we can go into the music room and play what you like so much—Handel"। (জার্মান 'হাণ্ডেল' কথাটি দ্ব্যর্থক। একটা অর্থ হল ঐ

গীতিকারের নাম; আর বহুবচন অর্থে "তর্ক বিতর্ক")।

"বাড়িতে প্রায়ই আমরা গল্পগুজব করতাম এবং হাইনের Harzreise উচ্চস্বরে পড়তাম। একদিন গ্রীষ্মকালে ব্যালকনির দরজা বন্ধ করে তিনি সবে ভায়োলিন আনতে চলেছেন এমন সময় পাশে এক বাড়িতে পিয়ানোয় মোজার্টের সোনাটা শুনতে পেলেন। জিজ্ঞাসা করলেন—"কে ঐ পিয়ানো বাদক? তুমি চেন?" আমি বললাম—"এক পিয়ানো শিক্ষিকা পাশেই থাকেন। তিনি হয়ত বাজাচ্ছেন।" ভায়োলিনটি বগলদাবা করে, টাই বা কলার কিছুই না পড়ে, ছুটে বেড়িয়ে গেলেন। আমি চীৎকার করে বললাম—"হের আইনস্টাইন, ওভাবে আপনি যাবেন না।" তিনি হয় আমার কথা শুনতে পেলেন না, নয়ত শুনেও না শোনার ভান করলেন। কয়েক সেকেণ্ড পরে গেট খোলার শব্দ শোনা গেল, তারপরেই মোজার্টের সোনাটার সঙ্গে ভায়োলিনের বাজনা। ফিরে এসে আইনস্টাইন বললেন—"সত্যি ছোট্ট প্রবীণ মহিলাটি সুন্দর বাজাচ্ছিলেন। আমি প্রায়ই গিয়ে ওঁর সঙ্গে বাজাব।" কয়েক ঘণ্টা পরে ঐ মহিলা ফ্রাউলিন ভেগেলিন এলেন। সঙ্কোচে সভয়ে জিজ্ঞাসা করলেন—"এই extra ordinary" তরুণের নাম কি? আমরা তাঁকে এই বলে আশ্বস্ত করলাম যে, তরুণটি একজন নিরীহ ছাত্র। তিনি জানালেন যে, অজানা-অচেনা সঙ্গীতজ্ঞ তরুণটি যখন তাঁর ঘরে সোজা ঢুকে গিয়ে বললে "Go on playing" তখন তিনি চমকে ওঠেন।

"...কেতাদুরস্ত লোক বা অফিসিয়াল সোসাইটি ছিল তাঁর কাছে দু-চোখের বিষ। পারতপক্ষে তিনি এ সবের সঙ্গে নিজেকে যুক্ত করতেন না। যেদিন আবহাওয়া বেশ ভাল থাকত সেদিন বারান্দায় একা একা বসে পাইপ টানতেন। সেই সঙ্গে দেখতেন সূর্যাস্ত বা আকাশের তারা। আমার মা-কে বড় একটা বিরক্ত করতেন না। মাঝে মাঝে—না প্রায়ই, বাড়ির দরজার চাবি হারিয়ে ফেলে গোলমাল বাধাতেন। এমন কি গভীর রাতে, যখন ভাবাই যায় না, দরজার

বেল বেজে উঠল, আর নীচ থেকে "It's Einstein. I've forgotten my key again" চীৎকার। মা'র ঘুম ভেঙে যেত। কিন্তু আইনস্টাইনের সহজ সরল প্রকৃতি এবং আবেগময়তার এমন একটা অপ্রতিরোধ্য আবেদন ছিল যে, মা-র রাগ বেশিক্ষণ থাকত না। লম্বা ছুটির পরে মিলান থেকে যখন ফিরতেন তখন পরিপাটিহীন বেশে উসখো-খুসকো ভাবে দরজায় ঠায় দাঁড়িয়ে থাকতেন, আর বলতেন—"Will you have me back again or are you going to chuck me out ?"

জুরিখে থাকা কালে আইনস্টাইন বিজ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গে ধ্রুপদী-সঙ্গীত চর্চাও করত। প্রায়ই গীতিনাট্য দেখতে প্রেক্ষাগৃহে যেত। সব সময় অবশ্য টিকিট কেনার পয়সা থাকত না। তখন নির্জনে ভায়োলিনে সুরের তরঙ্গ তুলত। অবসর ভরে উঠত সুরে। আর তার স্নিগ্ধ প্রলেপে কেটে যেত মানসিক অবসাদ। বিজ্ঞান ও সুর তো ছিল তার মস্তিষ্ক ও অন্তরলোকের। কিন্তু প্রতিদিনের জীবন ?

সে ছিল বেঁচে থাকার প্রচেষ্টায় ক্লিন্ন ও ক্লিষ্ট এক বেসুরো সাধারণ জীবন। হাতে পয়সাকড়ি একেবারেই ছিল না। বাবার পক্ষে টাকা পাঠান অসম্ভব। ব্যবসা ক্রমে খারাপ হতে হতে তখন একেবারে চরম পর্যায়ে। নিজেদের আহার জোটানোই মুশকিল, ছেলেকে টাকা পাঠাবেন কোত্থেকে ? শুধু জেনোয়ার কয়েকজন আত্মীয়ের দয়ায় পড়াশোনাটুকু কোনমতে চলছিল। এঁরা আলবার্টকে মাসিক একশ' ফ্রাঙ্ক পাঠাতেন। তাঁরা কি তখন জানতেন যে, শুধু আত্মীয়তার খাতিরে কত বড় এক প্রতিভাকে সামান্য জলসিঞ্চন করে তাঁরা মুকুলিত হতে দিচ্ছেন ! ঐ টাকা থেকে আবার প্রতিমাসে বিশ ফ্রাঙ্ক করে আলবার্ট সরিয়ে রাখত সুইস নাগরিকত্ব পাওয়ার প্রয়োজনীয় ফি-বাবদ। এ সামান্য টাকায় পড়াশোনা, থাকা-খাওয়া চলত না। কখন কখন ছাত্র পড়িয়ে টাকা পয়সার অভাব মেটাতে চেষ্টা করত। জুরিখের এই পাঠ্যাবস্থায় প্রচণ্ড দারিদ্র্যের মধ্যে আইনস্টাইনের

দিনগুলো কেটেছে। পরবর্তীকালে তাঁকে যে বহুদিন ধরে পাকস্থলীর গণ্ডগোলে ভুগতে হয় এখান থেকে তার সূত্রপাত।

১৯০০ খ্রীস্টাব্দের শরৎকালে একুশ বছর বয়সে স্টেট পরীক্ষায় পাশ করে আইনস্টাইন ডিপ্লোমা পেলেন, গ্রাজুয়েট হলেন। মিলেভা বাদে বন্ধুরা সবাই ডিপ্লোমা পেলেন। মিলেভা আরও এক বছর থেকে গেল। ডিপ্লোমার আশা অবশ্য তার ছিল না, কেননা তখনকার নিয়ম অনুসারে মেয়েদের শুধু একটা সার্টিফিকেট দেওয়া হত। মিলেভা সার্টিফিকেট পেলেন ১৯০১-এর অগাস্টে।

গ্রাজুয়েট হওয়ার পর আইনস্টাইনের প্রধান চিন্তা হয়ে দাঁড়াল একটি চাকরি জোগাড় করা। এতদিন তো আত্মীয়দের দয়ায় চলল। এখন তিনি ডিপ্লোমা পেয়েছেন, পড়াশোনার আপাতত ইতি। এখন শুধু নিজের জীবনধারণের জন্য টাকা চাওয়া যায় না। ইতিমধ্যে জেনোয়া থেকে মাসিক ভাতা আসা বন্ধ হয়ে গেছে। একটা কাজ চাই-ই চাই। তবে, এমন কাজ চাই যাতে অন্নসংস্থান হয় এবং সেই সঙ্গে প্রচুর অবসর পাওয়া যায় বৈজ্ঞানিক গবেষণার।

লেখাপড়ায় আইনস্টাইন খুবই ভাল ছিলেন। পরীক্ষায় তাঁর প্রমাণও দিয়েছিলেন। ছয় পয়েন্ট স্কেল অনুসারে তাঁর নম্বর হল : তত্ত্বীয় পদার্থবিজ্ঞান ৫, ব্যবহারিক পদার্থবিজ্ঞান ৫, থিয়োরী অব ফাংশান ৫·৫, জ্যোতির্বিদ্যা ৫, থিসিস ৪·৫ ; গড় ৪·৯১। পদার্থবিদ্যা ও গণিতে আইনস্টাইনের গভীর জ্ঞানের কথা অ্যাকাডেমির অধ্যাপক মহলে অজানা ছিল না। দু-একজন দায়িত্বশীল অধ্যাপক তাঁকে বলেও ছিলেন যে, গ্রাজুয়েট হওয়ার পর তাঁকে ঐ অ্যাকাডেমির সহকারী পদে নেওয়া হবে।

মিলান থেকে ১৯০০ খ্রীস্টাব্দের ২৩শে সেপ্টেম্বর আইনস্টাইন তাঁর শিক্ষক অধ্যাপক হারউইৎজ-কে চিঠি দিয়েছিলেন—"আমার বন্ধু এরাট লিখেছে যে, আপনার আগের সহকারী ডক্টর ম্যাটার

সম্প্রতি ফ্রাউনফেণ্ড জিমন্যাশিয়ামে অধ্যাপক পদে যোগ দিয়েছেন। তাই অত্যন্ত সম্ভ্রমের সঙ্গে জানতে চাইছি আমার পক্ষে আপনার সহকারী হওয়ার কি কোন সুযোগ আছে? এ রকম একটা প্রশ্নে আপনাকে এই ছুটির মধ্যে বিব্রত করার ইচ্ছে আমার ছিল না। কিন্তু আমি জুরিখ নাগরিকত্বের জন্য আবেদন করেছি এবং সেটা পাওয়া নির্ভর করছে একটি নির্দিষ্ট চাকরি থাকার ওপর।"

প্রথম দিকে ধারণা হয়েছিল যে, আইনস্টাইনের ইচ্ছা পূরণ হতে চলেছে। তার প্রমাণ অধ্যাপক হারউইৎজ-কে লেখা আইনস্টাইনের আর একটি চিঠি। আগের চিঠির মাত্র তিন দিন পরে ২৬শে সেপ্টেম্বর মিলান থেকেই এটি লেখা হয়েছিল। —"আপনার সহৃদয় চিঠিখানার জন্য সকৃতজ্ঞ ধন্যবাদ। জেনে খুশি হলাম যে, প্রার্থিত পদটি আমার পাওয়ার সম্ভাবনা আছে।"

কিন্তু শেষ অবধি তা হল না। আইনস্টাইনকে পলিটেকনিকে রাখা হল না। তাঁর ভাগ্যবান বন্ধুরাই শুধু এ সুযোগ পেলেন। ফিডলারের অধীনে গ্রসমান, রুডিওর অধীনে এরাট এবং হারউইৎজ-এর অধীনে কলরোস। তত্ত্বীয় বা পরীক্ষামূলক পদার্থবিজ্ঞানে পলি-টেকনিকে গবেষণা করার যে স্বপ্ন আইনস্টাইন কিছুদিন ধরে দেখছিলেন তা চিরতরে রুদ্ধ হয়ে গেল।

অসাধারণ প্রতিভাধর বলে খ্যাতি এবং পরীক্ষায় ভাল ফল সত্ত্বেও পলিটেকনিকে আলবার্টের চাকরি হল না কেন? এর পেছনে অনেক কারণ ছিল। একে তিনি ছিলেন জাতিতে ইহুদী। ইহুদী-বিদ্বেষ য়ুরোপে চিরকালই প্রবল। স্বার্থের প্রশ্নে এ বিদ্বেষ আরও প্রকট হয়ে ওঠে। ইহুদীদের প্রতিভা খ্রীস্টান য়ুরোপিয়ানদের কাছে অসহ্য। তা ছাড়া, অধ্যাপক ওয়েবারের ক্লাশ-লেকচারে আলবার্ট কখনও যোগ দেন নি। ওয়েবারের লেকচার আইনস্টাইনের একদম পছন্দ হত না। তিনি ছিলেন পদার্থবিজ্ঞানের পুরাতন ধ্যান-ধারণার অনুরাগী। হেলমহোলৎজ-এর পর পদার্থবিজ্ঞানে যা কিছু

অগ্রগতি হয়েছে তিনি তাকে মোটেই আমল দিতেন না। কাজেই আইনস্টাইনের কাছে ওঁর ক্লাস করার অর্থ পুরনো পদার্থবিজ্ঞানে মাস্টার হওয়া, আধুনিক ও ভবিষ্যত পদার্থবিজ্ঞান সম্পর্কে একেবারে অজ্ঞ হয়ে থাকা। বড় আশা ছিল ম্যাক্সওয়েলের তড়িচ্চুম্বকীয় তত্ত্ব সম্পর্কে ওয়েবারের কাছ থেকে সুনির্দিষ্ট কিছু শিখবেন। কিন্তু সে আশা পূরণ হল না। নিজেই স্বাধীনভাবে সেগুলো শিখতে শুরু করলেন। এজন্য ওয়েবার প্রায়ই আইনস্টাইনকে কথা শোনাতেন— "আইনস্টাইন, খুবই চালাক ছোকরা তুমি। কিন্তু তোমার একটা বড় দোষ হল কি জান? অন্যে তোমায় কিছু জানাবে এ তুমি কখনই হতে দেবে না।" আইনস্টাইনের প্রতি ওয়েবার কেমন যেন বিদ্বিষ্ট ছিলেন। ডিপ্লোমা পরীক্ষার মাত্র তিন দিন আগে ওয়েবার অভিযোগ করলেন যে, Heat Transference-বিষয়ে কাজের জন্য আইন-স্টাইন regulation paper ব্যবহার করেনি। বিষয়টি আইন-স্টাইনের ভাল লাগত না। সমস্ত বিষয়টি আবার টুকে দেবার জন্য ওয়েবার বারবার পীড়াপীড়ি করতে লাগলেন।

শুধু ওয়েবারই নন, আরও কিছু অধ্যাপকের সঙ্গে তাঁর গোলমাল লাগত। কারণ ঐ একই। আইনস্টাইনের স্বাধীনতাপ্রিয়তা। অধ্যাপক পার্নেটের ল্যাবরেটরিতে কাজ করতে গিয়ে তাঁর সঙ্গে আইন-স্টাইনের বিবাদ বাধে। কি পরীক্ষা করতে হবে এবং কেমন করে করতে হবে তা লিখে সব ছাত্রকেই একটা চিরকুট দেওয়া হত। আইনস্টাইন সেটা পড়ে ফেলে দিতেন এবং তারপর নিজের মত করে কাজ করতেন।

এতে ক্রুদ্ধ হয়ে পার্নেট একদিন তাঁর সহকারীকে বলেন—"What do you make of Einstein? He always does something different from what I have ordered."

সহকারী উত্তরে জানান—"He does indeed, Herr Professor. But his solutions are right and the methods

he uses are always of great interest."

সব অধ্যাপকেরাই এ সব বলাবলি করতেন। আইনস্টাইনেরও এ কথা অজানা ছিল না। একদিন তিনি তাঁর অধ্যাপককে 'হের প্রফেসর' না বলে 'হের ওয়েবার' বলে সম্বোধন করেছিলেন। এ দুর্বিনয় একেবারে অমার্জনীয়, চরম অশোভন! এমন ছেলের কি চাকরি হওয়া সম্ভব?

বাধ্য হয়ে আইনস্টাইন পলিটেকনিকের বাইরে চাকরির খোঁজ করতে লাগলেন। জুরিখের সুইস ফেডারেল মানমন্দিরের ডিরেক্টার প্রফেসর আলফ্রেড ভোলফার তখন সৌরকলঙ্ক নিয়ে গবেষণা করছেন। তাঁর হয়ে কিছু গণনার কাজ করে দিয়ে যৎসামান্য রোজগার হত, আর বাকি সময় কাটিয়ে দিতেন পাকা চাকরির খোঁজে জুরিখের রাস্তা চষে। বেকার অবস্থায় দারিদ্র্যের বেড়াজালে চরম অনিশ্চয়তা ও নিরুৎসাহের মধ্যে অতিকষ্টে আইনস্টাইন দিন গুজরান করতে লাগলেন। সুইস নাগরিক হলে চাকরির ব্যাপারে সুবিধা হবে বলে তাঁর ধারণা হল। ১৯০১-এর একুশে ফেব্রুয়ারি তিনি সুইস নাগরিকত্বের অধিকার পেলেন। এজন্য তাঁকে কম কাঠ-খড় পোড়াতে হয় নি। সঞ্চিত সব অর্থ গেল, কর্মকর্তারা শত-সহস্র বিচিত্র সব প্রশ্ন করলেন—স্বাস্থ্য কেমন, পিতামহের চরিত্র কেমন ছিল, মদ খাওয়ার অভ্যেস আছে কি না এবং আরও কত কী। নতুন নাগরিক অবশ্য প্রয়োজনে মিলিটারি সার্ভিসে যোগ দেওয়ার হাত থেকে রেহাই পেলেন। কারণ, মেডিক্যাল পরীক্ষায় ধরা পড়ল তিনি ফ্ল্যাটফুট ও ভ্যারিকোস ভেন-এ ভুগছেন। মেডিক্যাল বোর্ডের সিদ্ধান্তে আইনস্টাইন ক্ষুণ্ণ হলেন। মিলিটারি সার্ভিসের বদলে এখন তিনি ক্রমাগত মিলিটারি ট্যাক্সে পীড়িত হতে লাগলেন।

যে বছর আইনস্টাইন সুইস নাগরিকত্ব লাভ করলেন সেই ১৯০১ খ্রীস্টাব্দটি তাঁর জীবনে আরও একটি কারণে স্মরণীয়। এ বছর তাঁর প্রথম মৌলিক গবেষণা প্রবন্ধ Annalen der Physik পত্রিকায়

কাজ। যদিও এ সময় ল্যাবরেটরির অভাবে বিজ্ঞানচর্চার সুযোগ তেমন মিলছিল না, তবু কাগজ-কলমের সাহায্যে গাণিতিক সমস্যা নিয়ে মাথা ঘামানোর বিস্তর সময় তিনি পেতেন। ফলে কাজটি ছিল তাঁর একেবারে মনের মতো। ছেলে দুটিও ভাল। জানতে চায়, বুঝতে চায়, শিখতে চায়। বিশেষ ছোট ছেলেটি খুবই উৎসাহী। ছাত্রদের দিকে চেয়ে আইনস্টাইন নিয়মে-বাঁধা রুটিনী পড়াশোনার যে অত্যাচারে একদিন নিজে পীড়িত হয়েছিলেন তা থেকে তাদের মুক্তি দিতে চাইলেন। পঠন-পাঠনকে জীবন্ত ও চিত্তাকর্ষক করে তোলার আপ্রাণ চেষ্টা করলেন। নিয়োগকর্তা ডক্টর জেকব নুয়েসের কাছে প্রস্তাব দিলেন যে, ওদের ওপর যেন কোন বাধানিষেধ আরোপ করা না হয়। ওরা যাতে সব সময় তাঁর কাছে থেকে পড়াশোনা করতে পারে সে ব্যবস্থা করতে পারলে ভাল হয়। প্রস্তাব শুনে নুয়েস তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠলেন। স্কুল মাস্টার নুয়েসের সন্দেহ হল। বোধহয় প্রাইভেট টিউটর ছেলেদের ভাগিয়ে নেবার মতলব করছে! আইনস্টাইনকে খুব স্বাধীনচেতা বলে নুয়েসের মনে হল এবং তক্ষুনি তিনি তাঁকে কাজ থেকে বরখাস্ত করলেন। এ রকম হিতে বিপরীতের ঘটনা আইনস্টাইন আশা করতে পারেন নি। মস্তিষ্ক ও মানসলোকচারী বৈজ্ঞানিক শিল্পীর কাছে ব্যাপারটা রহস্য হয়ে রইল।

আইনস্টাইন আবার বেকার হলেন এবং নেমে এলেন পথে। একেবারে কপর্দকহীন। দেখলেন শিক্ষকতা পেশার দরজা তাঁর কাছে অবরুদ্ধ। কিন্তু কিছুতেই এর কারণ তাঁর মাথায় ঢুকল না। মনে মনে প্রশ্ন করলেন—দেশের সাধারণ বেকারত্বই কী এর কারণ। নাকি যেহেতু তিনি সুইস নাগরিক হয়েও সুইস নন তাই এমন হচ্ছে! না কি এ ব্যাপারে তিনি একেবারে অকর্মণ্য বলে!

তবে শ্যাফহাউসেনে এসে আইনস্টাইনের একটা লাভ হল। আইনস্টাইন ও হ্যাবিক্টের মধ্যে প্রগাঢ় বন্ধুত্ব গড়ে উঠল। দিনের পর দিন নানা বিষয়ে তাঁদের মধ্যে আলোচনা হত। একত্রে ভায়োলিনে

ডুয়েট করতেন। ভবিষ্যত বৈজ্ঞানিক গবেষণা নিয়ে পরস্পর আলোচনা করতেন। যত দিন গেছে বন্ধুত্ব তত বেড়েছে। পরে বার্ন-এ গিয়ে তা আরও গাঢ় হয়।

ভবিষ্যতের শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক যখন চরম দারিদ্র্যের মুখোমুখি তখন তাঁর জীবনদেবতা অন্তরাল থেকে তাঁকে বাঁচিয়ে রাখার বন্দোবস্তও করছিলেন। ১৯০২-এর বসন্তকালে আইনস্টাইন আবার মিলানে ফিরে এলেন। সেখান থেকে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে কর্মখালির সংবাদ চেয়ে চিঠি দিতে লাগলেন। এদিকে জুরিখের সহপাঠী মার্শেল গ্রসমান তাঁর বাবাকে বলে পেটেণ্ট অফিসে চাকরির পাকাপাকি বন্দোবস্ত করে ফেললেন। বার্নের কনফিডারেট পেটেণ্ট অফিসের ডিরেক্টার ফ্রেডরিখ হালের ছিলেন গ্রসমানের বাবার বন্ধু। গ্রসমানের বাবা হালেরের কাছে একটা চিঠি দিলেন—"সত্যিকারের একটি প্রতিভা-বান ছেলে কপর্দকহীন হয়ে সুইজারল্যাণ্ডের পথে পথে ঘুরে বেড়াচ্ছে। যদি সম্ভব হয়, ওর একটা অর্থ-উপার্জনের ব্যবস্থা করে দাও।"

এদিকে ১৯০২-র এপ্রিলে আইনস্টাইন গ্রসমানকে একটি চিঠি লেখেন—"প্রিয় মার্শেল, কাল তোমার চিঠিখানা পেয়ে তোমার একাগ্রতা ও সহানুভূতিতে মুগ্ধ হলাম। এক পুরনো হতভাগ্য বন্ধুকে তুমি এখনও ভোল নি। তুমি ও এরাটের চেয়ে আরো ভাল বন্ধুর কথা আমি কল্পনা করতে পারি না। বলা বাহুল্য, চাকরিটি পেলে আমি যার-পর-নাই খুশি হব। যে কোন বিশ্ব-বিদ্যালয়ে একটা সহকারী লেকচারার পদের খোঁজে তিন সপ্তাহ পিতৃগৃহে কাটিয়ে দিলাম। আমি নিঃসন্দেহ যে, ওয়েবারের চক্রান্ত না থাকলে এ রকম পদ আমি অনেক আগেই পেতোম। তবু আমি কোন সুযোগই ছাড়ছি না। আর, আমার রসজ্ঞানও একেবারে উবে যায় নি।......ভগবান যখন গাধা সৃষ্টি করেন তখন সেই সঙ্গে তাকে একটা পুরু চামড়াও দিয়ে দিয়েছিলেন।

এখানে এখন বসন্তকাল এবং চারদিকে বাসন্তিক শোভা। এমন হাসিমাখা মুখে পৃথিবী চেয়ে থাকে যে, নীলাকাশকে এড়িয়ে যাওয়া মুশকিল। তা ছাড়া, সঙ্গীতের আসরগুলো আমায় টকে-যাওয়া থেকে বিরত রাখছে। আর বিজ্ঞানের ব্যাপারে বেশ কয়েকটি অপূর্ব আইডিয়া মাথায় এসেছে। কিন্তু আইডিয়ার ডিম ফুটে বাচ্চা বেরুতে আরও কিছুদিন সময় লাগবে।”

ইতিমধ্যে গ্রসমানের বাবার চিঠির ফল ফলেছে। আইনস্টাইন হঠাৎ হালেরের কাছ থেকে একখানা প্রীতিভরা চিঠি পেয়েছেন। তাতে বার্নে গিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করার আহ্বান আছে। সুইজারল্যাণ্ডের রাজধানী বার্ন মস্ত বড় শহর। আইনস্টাইন পেটেণ্ট অফিস খুঁজে বের করলেন এবং ডিরেক্টার হালেরের সঙ্গে তাঁর সুদীর্ঘ ইণ্টারভিউ হল। লিখিত পরীক্ষাও দিতে হল। অভিজ্ঞতা না থাকা সত্ত্বেও শান্ত প্রকৃতির যুবকটিকে দেখামাত্র হালের সন্তুষ্টচিত্তে পেটেণ্ট পরীক্ষকের চাকরিটি দিতে মনস্থ করলেন। তৃতীয় শ্রেণীর টেকনিক্যাল এক্সপার্টের পদ। মাইনে ছিল যৎসামান্য। বছরে ৩৫০০ ফ্রাঙ্ক। তা হোক, মাথা গুঁজবার ব্যবস্থা তো হল। আইনস্টাইন বার্নে চলে এলেন এবং ১৯০২-এর ২৩শে জুন নতুন পদে যোগ দিলেন।

১৯০২-এর গ্রীষ্মকালের মাঝামাঝি থেকে শরতের প্রথম অবধি আইনস্টাইনকে মিলানে থাকতে হল। তাঁর বাবা তখন মৃত্যুশয্যায়। ভগ্নমনোরথ পিতাকে শেষ বিদায় জানাতে আইনস্টাইন একেবারে ভেঙে পড়লেন। জীবনে এত বড় ধাক্কার অভিজ্ঞতা আগে আর হয় নি।

মাসান্তে আইনস্টাইন এখন যে সামান্য বেতন পান তাতে অনাড়ম্বর জীবনযাত্রা চলে যায় বটে, তবে পরিবার নিয়ে সংসার চালানোর মত অর্থ তার ছিল না। কিন্তু সেই সার্বিয়ান মেয়ে মিলেভাকে বিয়ে করার কথা দিয়েছেন তিনি। তা তো রাখতে হবে। হেরমানের অসুস্থতার জন্য আলবার্ট ও মিলেভার বিয়ে পিছিয়ে যায়।

হেরমান তখনও এ বিয়েতে মত দেন নি। মৃত্যুশয্যায় শায়িত পিতার ইচ্ছার বিরোধিতা করা আলবার্টের কাছে অশোভন ঠেকে। তিনি অপেক্ষা করেন। মৃত্যুর ঠিক আগে হেরমান ছেলের বিয়েতে মত দেন। ১৯০৩-এর ৬ই জানুয়ারী স্থানীয় এক রেস্তোরাঁয় বিবাহ সম্পন্ন হল। বার্নের নতুন বন্ধুবান্ধবদের তিনি এ উপলক্ষে ভোজ দিলেন। নব দম্পতির 'ওয়েডিং ট্রিপ' হল রেস্তোরাঁ থেকে বাড়ি ফেরা। ফিরে দেখলেন ফ্ল্যাটের চাবি হারিয়ে ফেলেছেন।

পেটেণ্ট অফিসের চাকরিটি ছিল একেবারে রুটিনে বাঁধা। খুব খাটতে হত তাঁকে। বলতেন 'Cobbler's job'—'এ যেন মুচির কাজ।' কিন্তু এ কাজকে তিনি মোটেই ঘৃণা করতেন না। বরং একে তিনি গবেষণার পক্ষে আশীর্বাদ বলে মনে করতেন। আর কাজটিও মন্দ লাগত না। পেটেণ্টের জন্য স্তূপীকৃত আবেদনপত্রের মধ্যে তিনি ডুবে যেতেন। আবেদনপত্রগুলোয় থাকত আবিষ্কারকের ধ্যানধারণার বিশদ বিবরণ, সবই অপরিচিত টেকনিক্যাল শব্দের মাধ্যমে। আইনস্টাইনের কাজ ছিল সেগুলো থেকে আবিষ্ক্রিয়ার মূল কথাটি বেছে নিয়ে সরলভাবে আবার নতুন করে লেখা। উদ্দেশ্য, উপরওয়ালা বুঝতে পারবেন কোন্‌টি পেটেণ্ট পাওয়ার যোগ্য, কোন্‌টি নয়। এর মাধ্যমে আইনস্টাইন তাঁর ভাবনাকে কাজে লাগাতে পেরে বেশ খুশি ছিলেন। টেকনিক্যাল যন্ত্রপাতি সম্পর্কে তাঁর গভীর আগ্রহ ছিল এবং কখন কখন আবেদনের স্তূপ থেকে এমন এক-আধটার সন্ধান পেতেন যা সত্যি প্রশংসার দাবী রাখে। এজন্য চাকরিটি বেশ চিত্তোদ্দীপক হয়ে উঠেছিল।

সবচেয়ে বড় কথা হল, মুচির কাজ তিন-চার ঘণ্টার মধ্যেই শেষ হয়ে যেত। তারপর শুরু হত একান্তই নিজের কাজ—পদার্থবিজ্ঞানের সমস্যা নিয়ে চিন্তাভাবনা। ছেঁড়া কাগজের টুকরোয় তিনি তাঁর গাণিতিক কাজকর্মগুলো সমাধা করতেন। হঠাৎ কেউ তাঁর অফিসঘরে

ঢুকলে ওগুলো ড্রয়ার খুলে ঝটপট ভেতরে ঢুকিয়ে দিতেন। এভাবে অবসরের ফাঁকে ফাঁকে সুশৃঙ্খলায় আত্মপ্রকাশ করত তাঁর প্রতিভাদীপ্ত মস্তিষ্কের ক্রিয়া। মৃত্যুর কয়েকমাস আগে এক আত্মজীবনীমূলক লেখায় তিনি মন্তব্য করেন—"পেটেন্টের বিবরণ লেখা ছিল আমার কাছে আশীর্বাদের মতো। এতে পদার্থবিদ্যা সম্পর্কে চিন্তা করার সময় ও সুযোগ আমি পেয়েছিলাম। তা ছাড়া, আমার মত লোকের পক্ষে এ রকম একটা প্র্যাকটিকাল পেশা ছিল মুক্তির মতো। অ্যাকাডেমিক বৃত্তি যুবকদের জবরদস্তি বৈজ্ঞানিক হতে বাধ্য করে এবং একমাত্র যাঁরা দৃঢ়চরিত্র তাঁরাই ওপর-ওপর বিশ্লেষণের লোভ সংবরণ করতে পারেন।"

বার্নে আইনস্টাইনের জীবনের সঙ্গে উলসথর্পে নিউটনের জীবনের তুলনা করা চলে। ১৬৬৫-১৬৬৭ খ্রীস্টাব্দে প্লেগ মহামারীর সময় নিউটন কেম্ব্রিজ ছেড়ে উলসথর্পে আসেন। ডিফারেনসিয়াল ক্যাল-কুলাস, সার্বজনীন মহাকর্ষ এবং সাদা আলোর বর্ণালী বিশ্লেষণের মূল্যবান গবেষণাগুলো নিউটন এই উলসথর্পে থাকাকালীনই শেষ করেন। আইনস্টাইনও তেমনি তাঁর বার্নীয় জীবনে আবিষ্কার করেন ব্রাউনীয় গতিতত্ত্ব, ফোটন তত্ত্ব এবং বিশেষ আপেক্ষিকতা—যে তেপায়ার উপর তাঁর বৈজ্ঞানিক জীবনের একটি বড় অংশ দাঁড়িয়ে। গবেষণার জন্য বার্নের অনুকূল পরিবেশের এই হল সবচেয়ে বড় প্রমাণ।

কিন্তু একথা বলা প্রয়োজন যে, বিজ্ঞানের ইতিহাস সাধারণত বৈজ্ঞানিক গবেষণার জন্য প্র্যাকটিকাল পেশার প্রয়োজনীয়তার কথা যা আইনস্টাইন উল্লেখ করেছেন, তা স্বীকার করে না। বরং বলতে গেলে বিরোধিতাই করে। বর্তমান যুগে পদার্থবিজ্ঞানের অধিকাংশ আবিষ্ক্রিয়াই ঘটেছে পেশাদার বিজ্ঞানীদের দ্বারা। এঁরা বৈজ্ঞানিক পেশার পক্ষে আচরণীয় সব স্তরের ভেতর দিয়ে যথাবিধি গেছেন। তাই আপেক্ষিক তত্ত্বের বিকাশের পক্ষে বিশেষ অনুকূল বলে বার্নের যে পরিবেশের কথা আইনস্টাইন মুক্তকণ্ঠে স্বীকার

করেছেন তা সম্ভবত শুধু তাঁর পক্ষেই প্রযোজ্য। বিজ্ঞানের ইতিহাসের সঙ্গে এ কথার সঙ্গতি নেই। কার্যত বার্নীয় ট্রাডিশন তাঁর সারাজীবন ধরেই চলেছিল। গবেষণার জন্য যে সব সমস্যা তিনি গ্রহণ করতেন তাদের সম্ভাব্য ফলাফলের মূল্য নিয়ে মাথা ঘামাতেন না। এটি মোটেই তাঁর ভাবনার বিষয় ছিল না। তবে জীবনের প্রথম দিকে এক প্র্যাকটিকাল পেশাকে বরণ করে নেওয়ায় আইনস্টাইন অভঙ্গ মনোযোগের সঙ্গে নিজের পছন্দমতো বৈজ্ঞানিক সমস্যা নিয়ে পড়ে থাকতে পেরেছিলেন। কথাটা সত্যি।

যা হোক, আইনস্টাইনের দিনগুলি মন্দ চলছিল না। সংসারের ফাঁকে ফাঁকে সৃজনী প্রতিভার নিরন্তর দীপ্তি। একটা বাড়ির উপর-তলার একখানা ঘর, সামান্য রান্নাবান্না, ধর্মের গোঁড়ামি নেই, স্ত্রী ক্যাথলিক খ্রীস্টান।

বার্ন জীবনের প্রথম দিকে আইনস্টাইন প্রাইভেট ট্যুইশনি করে রোজগার করার সিদ্ধান্ত নেন। স্থানীয় কাগজে ঐ মর্মে বিজ্ঞাপন দেন। "জুরিখ পলিটেকনিকের পি. এইচ. ডি. আলবার্ট আইনস্টাইন ঘণ্টায় তিন ফ্রাঙ্ক নিয়ে পদার্থবিদ্যার পাঠ দেন।" বিজ্ঞাপন দেখে যে ক'জন সাড়া দেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন জনৈক মওরিস সোলোভিন। পদার্থবিদ্যায় উৎসাহী রুমানীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের এক ছাত্র। ছাত্র ও শিক্ষক দুই-ই তরুণ। শীঘ্রই তাঁরা পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট হলেন। উভয়ের মধ্যে গভীর ও স্থায়ী বন্ধুত্ব গড়ে উঠল। সোলোভিন তাঁর কাছে লেখা আইনস্টাইনের চিঠিগুলো দিয়ে স্মৃতিচারণ করে ১৯৫৬ সালে একটি বই লেখেন।

বিশ্ববিদ্যালয়ে সোলোভিন পড়তেন দর্শন, সাহিত্য, গ্রীক, গণিত, পদার্থবিজ্ঞান আর ভূ-বিদ্যা। সেই সঙ্গে মেডিক্যাল ফ্যাকাল্টিতে গিয়ে লেকচার শুনতেন। প্রকৃতির একটা পূর্ণাঙ্গ ছবি গড়ে তোলার উপায় হিসেবে তত্ত্বীয় পদার্থবিজ্ঞানেও তিনি অনুরক্ত ছিলেন।

আইনস্টাইনের ঘর পর্যন্ত বিস্তৃত আধা-অন্ধকারাচ্ছন্ন করিডরটিতে

প্রথম যে বস্তু মওরিস সোলোভিনের দৃষ্টি আকর্ষণ করে তা হল, যিনি তাঁকে ঘরে নিয়ে গেলেন তাঁর লক্ষ্যণীয় দুই আয়তোজ্জ্বল চোখ। উভয়ের প্রথম পরিচয়েই বোঝা গেল, মতামত ও অনুরাগের দিক থেকে দু-জনের মধ্যে এক অদ্ভুত অভিন্নতা রয়েছে। কাজেই পাঠ শীগগিরই রূপ নিল পরস্পরের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে সুদীর্ঘ আলোচনায়। কিছুদিন পরে গণিতে আরও পড়াশোনা করতে কনরাড হ্যাবিক্ট বার্নে এসে এই আড্ডায় যোগ দিলেন।

কাজ ও পড়াশোনার পর প্রত্যহ তিনজনের মিলন ঘটত। তাঁরা বেড়িয়ে পড়তেন অনেক দূর হেঁটে বেড়াতে। কখনও বা জমায়েত হতেন নিজেদের কারও ফ্ল্যাটে। নৈশাহারের পর চলত আলোচনা বা পড়া। পড়তেন মিল, স্পিনোজা এবং হিউমের লেখা দর্শন, মাকের লেখা নতুন বই, আঁভেনারিয়স ও পিয়ার্সন, অ্যাম্পিয়রের পুরনো বই Essai sur la Philosophie de Science, হেলম্‌হোলৎজের গবেষণাপত্র, রিমানের বিখ্যাত বক্তৃতা Sur les Hypotheses qui servent de base a la geometry, ডেডেকিণ্ড এবং ক্লিফোর্ডের গাণিতিক সঙ্কলন, পঁয়েকারের La Science et L' hypothese এবং আরও অনেক অনেক বই। যেমন সোফোক্লিসের Antigone, র‍্যাসিনের Andromache, ডিকেন্সের Christmas Carols, সারভাঁতের Don Quixote এবং অন্যান্য কালজয়ী বিশ্বসাহিত্য।

বইগুলোর বেশ কিছু সকলেরই আগে পড়া। তবু আবার সবাই মিলে একসঙ্গে পড়তে ভালবাসতেন। কখন কখন কোন বিশেষ পৃষ্ঠা বা অনুচ্ছেদ নিয়ে এমন জীবন্ত আলোচনা শুরু হত যে, গভীর রাত অবধি তার নিষ্পত্তি হত না। এমন কি পরবর্তী কয়েকদিন ধরে তা চলত।

মিলেভা বার্নে না আসা পর্যন্ত তিন বন্ধু একত্রেই খাওয়া-দাওয়া করতেন। সাধারণত ডিনারে থাকত সসেজ, চীজ, ফল এবং

মধু দিয়ে চা। আইনস্টাইন খুব বেশি পাঠ দিতে পারতেন না। ফলে আয়ও ছিল তথৈবচ। এ নিয়ে আইনস্টাইন রসিকতা করে বলতেন —'এর চেয়ে পথে পথে ভায়োলিন বাজালেও বেশি রোজগার হত।' এ সত্ত্বেও তিন বন্ধু একত্রে বেশ সুখেই ছিলেন। পুরনো সেই দিনের কথা স্মরণ করে, এপিকিউরাসের উক্তি উদ্ধৃত করে, সোলোভিন লিখেছেন—"সানন্দ দারিদ্র্যের চেয়ে ভাল ভাগ্য আর কী হতে পারে?"

এই তিন তরুণের আড্ডা তিন বছর স্থায়ী হয়েছিল। তাঁরা এই আড্ডার নাম রেখেছিলেন 'অলিম্পিয়ান অ্যাকাডেমি'। এ সব যৌবনোচ্ছল দিনগুলো আইনস্টাইনের স্মৃতিতে এক দুরপনেয় স্বাক্ষর রেখে যায়। জীবনসায়াহ্নে ১৯৫৩ সালে তিনি সোলোভিনকে লিখেছিলেন :

'হে অমর অলিম্পিয়ান অ্যাকাডেমি

'তোমার স্বল্পস্থায়ী জীবনে স্পষ্টতা আর যুক্তিতে ছেলেমানুষির যে আনন্দ, তা তুমি উপভোগ করেছ। জটিল ও জাঁকাল বৃদ্ধা ভগ্নীদের ব্যঙ্গ করার জন্যই তোমার সদস্যেরা তোমায় প্রতিষ্ঠিত করেছিল। বহু বছর ধরে সরাসরি দেখার সুযোগে বুঝেছি কী ঠিকই না আমরা করেছিলাম।

'তোমার তিন সদস্য এখনও আগের মতোই প্রগাঢ় বন্ধুত্বে আবদ্ধ। কিছুটা নিষ্প্রভ হয়ে এলেও তোমার নিখাদ, উজ্জ্বল আলোকপ্রভা এখনও নিঃসঙ্গতার মুহূর্তগুলো ভাস্বর করে তোলে। কেননা তাদের সঙ্গে তুমি কিন্তু অতিবাড়ন্ত লেট্যুসের মত বুড়িয়ে যাওনি।

'তোমার প্রতি আমাদের আস্থা ও অনুরাগ অতি-আলোকিত শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত থাকবে। ইতি—

বর্তমানে তোমার একমাত্র করেসপণ্ডিং সদস্য

আ. আ.

প্রিন্সটন

3. IV. 53"

'অলিম্পিয়ান অ্যাকাডেমি'র সঙ্গে 'জটিল, জঁাকাল বৃদ্ধা ভগ্নীদের' তুলনার মধ্যে যেন কিছুটা বিষণ্ণতার সুর বাজছে। দীর্ঘকাল বিদ্বজ্জনের সঙ্গ-সাযুজ্যের পর আইনস্টাইনের চিন্তা চলে গেছে বার্নের সেই ভারমুক্ত দিনগুলোর দিকে যেখানে আইনস্টাইন মুক্তির নিঃশ্বাস ফেলতেন। বিদগ্ধ জন-সঙ্গের জঁাকাল সম্ভ্রমতার প্রতি আইনস্টাইন চিরকালই বিদ্রোহী ছিলেন।

আইনস্টাইনের বার্নীয় জীবনে 'অলম্পিয়া'র গুরুত্ব ছিল অপরিসীম। সদস্যদের 'অলিম্পিয়ান অ্যাকাডেমির' সভায় নিমন্ত্রণ জানাতেন আইন-স্টাইন স্বয়ং-সভাপতি হিসেবে। একবার এক পোস্টকার্ডে এই উদ্দেশ্যে চিঠি গেল হ্যাবিক্টের কাছে। তাঁকে সম্বোধন করলেন "laziest writer among all mortals" বলে, চিঠির শেষে নিজের সই "A. Ritter von Steissbein, President of the Academy. ১৯০৪ সালের ১৪ই এপ্রিল হ্যাবিক্টকে লেখা চিঠিটিও এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য : "I shall receive you with pleasure and high spirits······ — we have kept these bottled for a propitious occasion—at No. 49 Kramgasse, second floor··· We are expecting a baby in a few weeks."

সেই আকাঙ্ক্ষিত শিশু—আইনস্টাইনের প্রথম সন্তান-ভূমিষ্ঠ হলেন ১৯০৪ এর ১৪ই মে। নাম রাখা হল হান্স আলবার্ট। জুরিখ পলিটেকনিকে পড়াশোনা শেষ করে ১৯৩৭ সালে আলবার্ট জুনিয়র চলে যান কালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে হাইড্রোলিক্সের অধ্যাপক হয়ে।

অলিম্পিয়ান অ্যাকাডেমি প্রসঙ্গে আরও একজনের উল্লেখ করতে হয়। ইনি হলেন মাইকেল এঞ্জেলো বেসো—একজন ইতালীয় এঞ্জিনিয়র। বেসোর স্ত্রী অ্যানা হলেন আরাও স্কুলের অধ্যাপক ভিনতেলারের মেয়ে। ঘটনাক্রমে, বার্নের আর এক অধিবাসী ছিলেন পল ভিনতেলার—অ্যানার ভাই এবং আইনস্টাইন-ভগ্নী মাজার ভবিষ্যৎ স্বামী। ১৯০৪ সালে বেসো বার্নের পেটেণ্ট অফিসে কাজ

করতে আসেন এবং আইনস্টাইনদের আড্ডায় ভিড়ে পড়েন। পেটেন্ট অফিসে চাকরি পেতে বেসোকে আইনস্টাইন সাহায্য করেন। কাজের পর প্রায়ই দু-জনে হেঁটে বাড়ি ফিরতেন।

বেসো প্রসঙ্গটি একটু দীর্ঘায়ত করা যাক। দর্শন, সমাজবিজ্ঞান, কারিগরী বিদ্যা, গণিত এবং পদার্থবিজ্ঞানে বেসো ছিলেন জ্ঞানের এক মহাকোষ। বেসো সহজেই আইনস্টাইনের যোগ্য সঙ্গী হয়ে উঠলেন। উভয়ে একত্রে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে দীর্ঘ আলোচনা করতেন। অনেক বছর পরে, বেসো সম্পর্কে আইনস্টাইন মন্তব্য করেন—'নতুন আইডিয়া বিকাশের পক্ষে সারা ইউরোপে এর চেয়ে ভাল সাউণ্ডিং বোর্ড আর ছিল না।' এ সম্পর্কে বেসোর মন্তব্যও বেশ প্রণিধানযোগ্য — 'আমি চড়াই পাখি। ঐ ঈগল, আইনস্টাইন, আমায় উঁচু থেকে উঁচুতে নিয়ে যেত। সেখানে গিয়ে চড়াই আরও একটু উঁচুতে ডানা ঝাপটাতে পারত মাত্র।' (Einstein, the eagle, carried me, the sparrow to lofty heights. Up there the sparrow could flutter a little higher.)

রিলেটিভিটি আইডিয়ার প্রথম প্রকাশের ইঙ্গিতটি বেসোর মন্তব্যের মধ্যে রয়েছে। এটি যে বিজ্ঞানে নবযুগের সূচনা করবে এ কথা বেসো তৎক্ষণাৎ বুঝতে পেরেছিলেন। সঙ্গে সঙ্গে এ সম্পর্কে কিছু নতুন বিষয়ের প্রতি তিনি আইনস্টাইনের দৃষ্টিও আকর্ষণ করেন। উভয়ে রিলেটিভিটি নিয়ে প্রায়ই ব্যাপক ও দীর্ঘ আলোচনা করতেন। ঐ সব আলোচনা যে কতদূর মূল্যবান ছিল তা আইনস্টাইনের সেই বিখ্যাত গবেষণাপত্র 'On the Electrodynamics of Moving Bodies'-এর শেষ অনুচ্ছেদ থেকে জানা যায়। সেখানে আইনস্টাইন লিখছেন—"পরিশেষে উল্লেখ করতে চাই যে, এখানে আলোচিত প্রশ্নের ব্যাখ্যায় আমার বন্ধু ও সহকর্মী এম. বেসো ছিলেন আমার অনুগত সহকারী। বহু মূল্যবান পরামর্শের জন্য আমি তাঁর কাছে ঋণী।"

ছাত্র-পড়ানোর বিজ্ঞাপন দেখে সোলোভিনের মতো আরও একজন আইনস্টাইনের কাছে এসেছিলেন। ইনি লুসিয়েন চ্যভন। পরে ইনিও আইনস্টাইনের বন্ধু হয়ে যান। এঁর বাড়ি ছিল ফরাসী সুইজারল্যাণ্ডে। আর চাকরি করতেন বার্নের ডাক ও তার বিভাগে। ওঁর অফিসটি ছিল পেটেন্ট অফিসের দালানের একতলায়। এখানে উল্লেখযোগ্য, চ্যভন আইনস্টাইনকে তার-বিভাগে একটা ভাল মাইনের চাকরি করে দেওয়ার জন্য খুব চেষ্টা-চরিত্র করেছিলেন। চাকরিটা হলে পদার্থবিজ্ঞানের ইতিহাস কী হত কে জানে! যাই হোক, পদার্থবিজ্ঞানে চ্যভনের বিশেষ অনুরাগ ছিল, বিশ্ববিদ্যালয়ে লেকচারও শুনতেন এবং এ বিষয়ে আইনস্টাইনের কাছ থেকেও পাঠ নিয়েছেন। এঁর সৌজন্যে আমরা দুটো মূল্যবান বস্তুর অধিকারী হয়েছি—পুরনো একটা ফোটোগ্রাফের পেছনে লেখা পদার্থবিজ্ঞানে তাঁর পুরো নোটটি এবং আইনস্টাইনের একটি লিপি-আলেখ্য। চ্যভনের লিপি-আলেখ্যের অংশবিশেষ এই রকম—"আইনস্টাইন ১.৭৬ মিটার দীর্ঘ ও বিস্তৃত-স্কন্ধ, সামনের দিকে সামান্য কিছুটা ঝুঁকে চলেন। মাথার ছোট খুলিটি লক্ষ্যণীয়ভাবে চওড়া দেখায়। গায়ের রঙ কালচে। বৃহদায়তন আবেগময় মুখমণ্ডলের ওপরে সরু এক জোড়া গোঁফ, আর ঈগলের ঠোঁটের মতো বাঁকানো নাক। বাদামি চোখ দুটিতে এক গভীর দেবসুলভ দ্যুতি। কণ্ঠস্বর সুরেলা ও মিষ্টি, যেন ভায়োলিনের অনুরণিত সুরধ্বনি। আইনস্টাইন সুন্দর ফরাসী বলেন, উচ্চারণে সামান্য বিদেশি টান।"

মিলেভা বার্নে এলে আইনস্টাইন সংসারী হয়ে পড়লেন। কিন্তু বন্ধু-বান্ধবদের আসা-যাওয়া এবং আড্ডা ঠিক আগের মতই রইল। মিলেভা ছিলেন একজন মনোযোগী নিয়মিত শ্রোতা, তবে আক্ষরিক অর্থেই শ্রোতা—একেবারেই মুখ খুলতেন না।

সোলোভিন লিখেছেন—তাঁরা বন্ধুরা প্রাণভরে তর্কবিতর্ক আর ধূমপান শেষে আইনস্টাইনের ভায়োলিন শুনতেন অথবা বেরিয়ে পড়তেন হেঁটে অনেক দূর বেড়াতে। সঙ্গে চলত আবার আলোচনা ও

তর্কবিতর্ক। একবার এভাবে মাঝরাতে তাঁরা বার্নের দক্ষিণ শহরতলীর গার্টেন পাহাড়ের চূড়ায় এসে উঠলেন। মাথার উপরে নক্ষত্রখচিত আকাশ তাঁদের চিন্তাস্রোতকে জ্যোতির্বিজ্ঞানের খাতে বইয়ে দিল। আর নতুন শক্তি পেয়ে আলোচনাও জীবন্ত হয়ে উঠল। সারারাত তাঁরা সেখানেই রইলেন, প্রত্যক্ষ করলেন প্রত্যূষের সূর্যোদয়। পশ্চাতের দিকচক্ররেখা থেকে আসছিল সৌরকিরণ। ক্ষীণ দৃশ্যমান আল্পসের রূপরেখাটি ক্রমে আলতো-করে-বোলানো সবজে-হলুদ রঙে স্পষ্ট হয়ে উঠল। চোখের সামনে জেগে উঠল পর্বতসঙ্কুল দেশের বিরাট রূপটি। সকাল হল। তরুণের দল চললেন কাছেই একটা ছোট্ট রেস্তোরাঁয়। কফি খেলেন। সকাল ন'টা নাগাদ সবাই নেমে এলেন সমভূমিতে। শ্রান্ত, ক্লান্ত কিন্তু পরম তৃপ্ত। কখন কখন তাঁরা হেঁটে চলে যেতেন আঠার মাইল দূরে 'টান' শহরে। পৌঁছতে পৌঁছতে দুপুর গড়িয়ে যেত। আল্পসকে চারপাশে রেখে তাঁরা আলোচনা করতেন পৃথিবীর উৎপত্তির ইতিহাস, পর্বতের সৃষ্টি আর ভূ-তত্ত্ব। 'টান' শহরেই তাঁরা লাঞ্চ খেতেন। লেকের ধারে সারাদিন ধরে চলত ক্যাম্পজীবন। রাতের ট্রেনে আবার ফিরে আসতেন বার্নে।

এই বোহেমিয় জীবনের আরও কিছু কিছু ব্যক্তিগত ঘটনার উল্লেখ করেছেন সোলোভিন। সেগুলো আইনস্টাইনের বার্ন জীবনের উপর অনেক আলোকপাত করে।

আলোচনাকালে আইনস্টাইন খুব ধীরে ধীরে এবং নিম্নস্বরে কথা বলতেন। সময়ে সময়ে চিন্তাক্রান্ত হয়ে একেবারে স্তব্ধ হয়ে যেতেন। নিজ চিন্তার আবরণে এমন পরিপূর্ণভাবে জড়িয়ে পড়তেন যে, পরিপার্শ্বের অস্তিত্ব তাঁর কাছে লুপ্ত হয়ে যেত। একবার আইনস্টাইনের জন্মদিন। সোলোভিন ও হ্যাবিক্ট কিছু 'ক্যাভিয়ার' নিয়ে এসেছেন। ক্যাভিয়ার হল মাছের ডিমে তৈরি এক ধরনের পিষ্ট এবং নোনতা খাবার। এর আগে আইনস্টাইন কখন ক্যাভিয়ার আস্বাদ করেন নি। এদিকে সবাই মিলে তখনও আলোচনা চলছে। বিষয়বস্তু :

পদার্থের জাড্য ধর্ম। আলোচনার শেষে তাঁরা যখন খাবার টেবিলে বসলেন তখন আইনস্টাইন বিষয়টি নিয়ে এতই তন্ময় হয়ে গেছেন যে, আহার্য বস্তুটি যে কি তা না জেনেশুনেই ক্যাভিয়ার গলাধঃকরণ করলেন। বন্ধুরা তখন হাসিতে ফেটে পড়ছেন। ব্যাপারটা বুঝতে না পেরে আইনস্টাইন বিস্ফারিত চোখে তাঁদের দিকে তাকালেন। এক মুহূর্ত চুপ করে থেকে বললেন—"সুকুমার বা সূক্ষ্ম রসের কোন ব্যাপারে এই গেঁয়োটাকে নেওয়া ঠিক নয়। আমি কিছুতেই ঐ সব রস আস্বাদন করতে পারি না।"

আর একটা গল্প হল এই রকম। বহু বিখ্যাত সংগীতজ্ঞ প্রায়ই বার্নে আসতেন এবং সেই সব আসরে এই তিন বন্ধু উপস্থিত থাকতেন। একবার শহরে এলেন এক চেক অর্কেস্ট্রা পার্টি। সোলোভিন প্রস্তাব করলেন—সবাই মিলে যাওয়া যাক। এদিকে তখন হিউমের দর্শন নিয়ে গভীর আলোচনা চলছে। আইনস্টাইন পরামর্শ দিলেন—তা হলে বরং সোলোভিনের ওখানে গিয়ে জমায়েত হওয়া যাক। পরদিন সোলোভিনকে ঐ অর্কেস্ট্রার একখানা টিকিট ধরিয়ে দেওয়া হল। সে-ও তাই নিয়ে চলে গেল অর্কেস্ট্রায়। যাওয়ার আগে বন্ধুদের জন্য রাতের খাবার তৈরি করে রেখে গেল। কড়া সিদ্ধ ডিম। ঐ রকম সিদ্ধ ডিম বন্ধুরা খুব পছন্দ করত। আর সেই সঙ্গে রেখে গেল বন্ধুদের উদ্দেশে ল্যাটিনে লেখা একটা চিরকুট। 'Amicis carissimis ova dura et salutem—প্রিয় বন্ধুদের জন্য: কড়া সিদ্ধ ডিম আর নমস্কার।' আইনস্টাইন ও হ্যাবিক্ট খাবারের সদ্ব্যবহার করলেন। যতক্ষণ না ঘরের বাতাস ধোঁয়াটে হয়ে উঠল ততক্ষণ ধরে পাইপ টানলেন। শেষে উঠে পড়লেন এবং রেখে গেলেন ল্যাটিনে লেখা একটা চিরকুট। 'Amica carissimo fumm spissum et salutem—প্রিয় বন্ধুর জন্য: প্রচুর ধোঁয়া আর নমস্কার।' পরদিন সকালে সোলোভিন এলে কঠোর মুখভঙ্গি করে আইনস্টাইন তাঁকে অভ্যর্থনা জানালেন—"হতভাগা! কোন্ সাহসে

তুই আমাদের অ্যাকাডেমিক আলোচনাসভাকে বিকিয়ে দিচ্ছিস বাজনদারদের কাছে? বর্বর, মাথামোটা কোথাকার! আর একবার এভাবে পালিয়ে দেখ, অ্যাকাডেমি থেকে বের করে দেব।" তারপর তাঁরা আবার হিউম নিয়ে পড়লেন, রাত-দুপুর গড়িয়ে গেল; তারপর তাঁরা উঠলেন।

১৯০৫ সালে এই তিন তরুণের আড্ডায় ভাঙন ধরল। প্রথমে হ্যাবিক্ট বার্ন ছাড়লেন, পরে সোলোভিন। পরের বছর মে মাসে আইনস্টাইন সোলোভিনকে লিখলেন—"তুমি চলে যাওয়ার পর আর কারো সঙ্গে মিশিনি। এমন কি বাড়ি ফেরার পথে বেসোর সঙ্গেও আর বরাবরের মত কথাবার্তা হয় না।" তারপর লিখলেন ১৯০৫-এ প্রকাশিত আপেক্ষিকতার উপর তাঁর গবেষণাপত্রের প্রতিক্রিয়া কী হল সেই সম্পর্কে। সবশেষে ছাব্বিশ বছরের স্কলার লিখলেন—'I am approaching the age when one deplores the revolutionary spirit of youth (যৌবনের বৈপ্লবিকতা নিয়ে যে বয়সে লোকে হা-হুতাশ করে আমি ক্রমে সেই বয়সের দিকে এগুচ্ছি)।'

এর কিছুদিন পরে আইনস্টাইন হ্যাবিক্টকে একখানা চিঠি দেন। ওতে ব্রাউনীয় গতি, ফোটন বা আলোককণা এবং আপেক্ষিকতা সংক্রান্ত গবেষণা-পত্রের উল্লেখ দেখা যায়। এ সময় আইনস্টাইন Annalen der Physik পত্রিকার সেই ঐতিহাসিক সংখ্যাগুলোর জন্য অধীর আগ্রহে প্রতীক্ষা করছেন।'

"প্রিয় হ্যাবিক্ট,

আমাদের মধ্যে একটা সসম্ভ্রম তুষ্ণীম্ভাব বিরাজ করছে, আর যে তুচ্ছ কিচিরমিচিরে আমি সেটা ভাঙছি তাতে মনে হচ্ছে তার অমর্যাদা ঘটাচ্ছি। কিন্তু পৃথিবীতে যাঁরা বড় তাঁদের ভাগ্যে কি সর্বদাই এমন হয় না? কি নিয়ে তুই এখন ব্যস্ত? প্রস্তরীভূত তিমি কোথাকার! পানসে বিস্বাদ এক টুকরো আত্মা! ···জানিনা কি বলে তোকে সম্বোধন করব? শতকরা সত্তর ভাগ ক্রোধ, আর ত্রিশ ভাগ

করুণাভরা আর কিই বা তোকে ছুড়ে মারতে পারি। ইস্টারের ছুটিতে আসিস নি বলে পেঁয়াজ আর রসুনের টুকরো ভর্তি একটা টিন যে পাঠাইনি সেজন্য ঐ পরের ত্রিশ পার্সেন্টকে তোর ধন্যবাদ দেয়া উচিত। এখন পর্যন্ত তোর পেপারগুলো পাঠাস নি কেন? হতভাগা! তুই কি জানিস না যে, আমি হলাম সেই দেড়-জন লোক যারা ওটা আনন্দ ও উৎসাহ নিয়ে পড়বে? কথা দিচ্ছি, ওগুলোর বদলে আমি তোকে আমার চারটে কাজ পাঠাব। প্রথমটা খুব তাড়াতাড়ি পেয়ে যাবি। কেননা লেখক-কপিটা আমি পেয়ে যাচ্ছি বলে আশা করছি। এটা হল বিকিরণ ও আলোক-শক্তি সম্পর্কে। এ কাজটা অত্যন্ত বৈপ্লবিক; নিজে পড়েই দেখিস। অবশ্য তোর কাজটা যদি তুই আমায় প্রথম পাঠাস। দ্বিতীয় কাজটায় রয়েছে তরল দ্রবণের ব্যাপন এবং অন্তঃঘর্ষণ থেকে পরমাণুর সঠিক সাইজ নিরূপণের পদ্ধতি নিয়ে আলোচনা। তৃতীয়টিতে প্রমাণ করা হয়েছে যে, তাপের আণবিক তত্ত্বানুসারে ১/১০০০ মিমি সাইজের কণা যদি কোন তরলের অভ্যন্তরে ভাসমান থাকে তা হলে তরল-অণুর তাপীয় গতির ফলে ঐ কণাগুলো দৃশ্যত অস্থিরভাবে ইতস্ততঃ নাচানাচি করবে। জীববিজ্ঞানীরা ভাসমান কণার এ রকম গতি সত্যি সত্যি দেখেছেন। তাঁরা একে ব্রাউনীয় আণবিক গতি বলে থাকেন। আর চতুর্থ কাজটি গড়ে তোলা হয়েছে গতিশীল বস্তুর ইলেক্‌ট্রোডায়নামিক্সের ধারণার উপর ভিত্তি করে। এটি দেশ ও কালের ধারণাকে একেবারে পাল্টে দিচ্ছে। এ কাজের নিছক কাইনেমেটিক অংশটি তোর ভাল লাগবে…। তোর আলবার্ট আইনস্টাইন তোকে স্বাগত জানাচ্ছে। এই সঙ্গে আমার স্ত্রীর এবং এক বছরের ছোট্ট পাখির প্রীতিমুগ্ধ শুভেচ্ছা রইল।"

কয়েক মাস পরে পেটেন্ট অফিসে একটা চাকরি দেখার পরামর্শ দিয়ে আইনস্টাইন হ্যাবিক্টকে আর একটি চিঠি দেন। উদ্দেশ্য, বন্ধুকে কাছে পাওয়া আর হারানো দিনগুলোর যে সুখস্মৃতি আইনস্টাইনকে

পীড়া দিচ্ছিল তার হাত থেকে মুক্তি। চিঠিতে রিলেটিভিটি থিয়োরী এবং পদার্থবিদ্যার অন্যান্য কিছু কিছু সমস্যা নিয়ে অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক সব মন্তব্য ছিল।

আইনস্টাইন লিখলেন— "তুই বড্ড সিরিয়াস হয়ে গেছিস! তোর ঐ ভয়ঙ্কর বিচালিপাত্রে নিঃসঙ্গতাই এই কাণ্ড করছে। হালেরকে যদি তোর জন্য চাকরির কথা বলি এবং তোকে গুম করে পেটেন্ট অফিসে নিয়ে আসি তা হলে কেমন হয়? আসবি তো? মনে রাখিস, এটা পেলে দৈনিক আট ঘণ্টা কাজের পর আট ঘণ্টা আলসেমির জন্য থাকছে। প্লাস একটা পুরো রোববার। তোকে পেলে কী মজাই না হবে! বন্ধুর সান্নিধ্যে তোর পুরনো প্রফুল্লতাও দ্রুত ফিরে পাবি। আমার 'মূল্যবান' সময় নষ্টের কথা নিয়ে মাথা ঘামাতে হবে না। সোৎসাহে চিন্তা-ভাবনা করার মতো কোন কিছুই এখন হাতে নেই।"

এদিকে কিন্তু আইনস্টাইন তখন আর ঝাঁকড়া-ঝাঁকড়া চুল, পাগলাটে মত দেখতে, অন্যমনস্কভাবে পথ চলেন আর কি যেন ভাবেন—সে ধরনের সাধারণ মানুষ হিসেবে পরিচিত নন। পদার্থবিজ্ঞানে নবযুগের বার্তাবাহী তাঁর গবেষণাপত্রগুলো ইতিমধ্যে প্রকাশিত হয়েছে এবং প্লাঙ্ক, ভাইন প্রমুখ বিশ্ববিশ্রুত পদার্থবিজ্ঞানীদের উচ্চ প্রশংসা পেয়েছে। তবু কিন্তু তাঁর মাথায় নিজ জীবনের গতিপথ নিয়ে কোন ভাবনা প্রবেশ করেনি। তিনি তখনও হ্যাবিক্টের চিন্তায় বিভোর। এই হলেন আইনস্টাইন। খ্যাতির সিংহদুয়ারের প্রান্তে দাঁড়িয়েও নিজের তৎকালীন অবস্থাতেই পুরোপুরি খুশি—'আট ঘণ্টা পেটেণ্ট অফিসে কাজ, প্লাস আট ঘণ্টা আলসেমি অর্থাৎ বৈজ্ঞানিক কাজ করার সময়।'

হ্যাবিক্টের কাজে লাগতে পারে এমন বিষয়েরও উল্লেখ চিঠিটিতে আছে। যেমন বর্ণালী সমস্যা। তিনি লিখছেন—"আমার মনে হয়, এসব ঘটনাবলী এবং এর আগে যেগুলো নিয়ে কাজ হয়েছে তাদের

মধ্যে কোন সরল যোগসূত্র নেই। ফলে এখন পর্যন্ত এই বর্ণালী সমস্যার সাফল্যের কোন ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে না।"

সব শেষে আইনস্টাইন লিখলেন বিশেষ আপেক্ষিকতা থেকে উদ্ভূত সেই যুগান্তকারী সিদ্ধান্তের কথা। বস্তুর ভর তার শক্তির সমানুপাতী হবেই। আপেক্ষিক তত্ত্বের সব অনুসিদ্ধান্তের মধ্যে এটিই মানুষের জীবন, কার্যাবলী ও সভ্যতার উপর সব চেয়ে বেশি প্রভাব-প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছে। হ্যাবিক্টের কাছে লেখা তাঁর এই চিঠিটিতে কোন তারিখ দেয়া নেই। মনে হয়, ১৯০৫-এর সেপ্টেম্বরে চিঠিটা বার্ন থেকে ডাকে ফেলা হয়। কেননা, এ সময়েই Annalen der Physik পত্রিকায় শক্তি ও ভরের সমানুপাতিত্ব সম্পর্কে তাঁর গবেষণাপত্রটি তিনি পাঠান।

এদিকে খ্যাতির দ্বারপ্রান্তে উপস্থিত আইনস্টাইনের জীবনযাত্রা কেমন চলছে একটু দেখা যাক। ১৯০৫-এর জুন মাস। আইন-স্টাইনের বয়স তখন ছাব্বিশ। এ সময়ে তিনি একদিন Annalen der Physik পত্রিকার অফিসে গিয়ে সম্পাদকের হাতে একখানা প্রবন্ধ দিয়ে বললেন—'দেখুন, স্যার, আপনার কাগজে ছাপবার মতো হলে অনুগ্রহ করে ছাপবেন।' নেহাৎ নিরীহ অনুরোধ। লেখাটা ছাপা হল এবং সঙ্গে সঙ্গে বিজ্ঞান জগতে এক অভূতপূর্ব আলোড়নের সৃষ্টি হল। শুধু যে খুব উঁচুদরের গবেষণাপত্র তা-ই নয়। এ তো বিদ্রোহ, এ যে বিপ্লব! এত দিনের প্রতিষ্ঠিত সমস্ত বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারার মোড় ফিরিয়ে দিচ্ছে এই প্রবন্ধ—অকাট্য যুক্তির সংঘাতে, অপ্রতিহতভাবে। তাই স্বভাবত রচনা ছেড়ে এবার খোঁজ পড়ল রচনাকারের, কার লেখা এই প্রবন্ধ? কে এই আইনস্টাইন? বিপ্লবের প্রাথমিক ধাক্কাটি যাঁদের মহলে প্রথম আছড়ে পড়ল তাঁরা হলেন পদার্থবিজ্ঞানী ও গণিতবিদ্। জনসাধারণের ঔৎসুক্যের জাগরণ আরও কয়েক বৎসর ধরে অপেক্ষা করল। আইনস্টাইন ক্রমে বৈজ্ঞানিক মহলে খ্যাতিমান হয়ে উঠলেন, সেই সঙ্গে ঈর্ষিতও। কেননা তাঁর

বিদ্রোহধর্মী থিয়োরী বহু মহারথীকে ভাবিয়ে তুলল। বহু পত্র-পত্রিকায় বিরূপ সমালোচনাও হল। লণ্ডনের বিখ্যাত 'টাইমস্' মন্তব্য করল—"A patent clerk in Berne has attacked time-honoured theories and has put forth new theories of the Universe understood only by a few high priests." কিন্তু যাঁকে নিয়ে এত ভাবনা তাঁর দিনগুলো কাটছে সেই পেটেণ্ট অফিসে যাতায়াত করে, হ্যাবিক্টের জন্য পেটেণ্ট অফিসে চাকরির চেষ্টায় আর 'আলসেমিতে'। এসব বিরূপ মন্তব্যে বিব্রত স্ত্রীর প্রশ্নের উত্তরে বলতেন—'পৃথিবীতে নতুন কিছুর প্রবর্তককে একাকী পথ চলতে হয়।' যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চল রে!

তবে তাঁর ডাক শুনলেন অনেকেই, এলেনও কেউ কেউ। কেননা, ভস্মাচ্ছাদিত বহ্নি আর কতদিন লুকনো থাকবে? কতদিন অজানা-অপরিচিত থাকবেন এই মহাবিদ্রোহী? দেশ, কাল, বস্তু আর বিশ্বজগৎ—প্রতিটি প্রতিষ্ঠিত ধারণার মূলে যিনি কুঠারাঘাত করলেন তাঁর সৃজনীপ্রতিভা আর কতদিন ব্যস্ত থাকবে 'জুতো সেলাই'এর কাজে? মূল্যবান রচনাটি প্রকাশিত হওয়ার পরও বছরের পর বছর আইনস্টাইন যাতায়াত করেছেন ঐ পেটেণ্ট অফিসের কাজে। কিন্তু আইনস্টাইনের রচনা ও তার তাৎপর্য বিজ্ঞানীশ্রেষ্ঠ ম্যাক্স প্লাঙ্কের দৃষ্টি এড়াল না। কোয়ান্টাম থিয়োরীর জনক বিশ্ববিশ্রুত প্লাঙ্ক চিঠি লিখলেন পেটেণ্ট অফিসের অপরিচিত এক কর্মচারী আইন-স্টাইনকে তাঁর কাজের সাহস ও মৌলিকতার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করে। আর একজন শ্রুতকীর্তি উদীয়মান জার্মান বিজ্ঞানী ম্যাক্স ফন লাওয়ে বার্লিন থেকে নিজেই চলে এলেন বার্নে—আইনস্টাইনের সঙ্গে দেখা করে অভিনন্দন জানাতে। এক রেস্তোরাঁয় বসে আলাপ করতে করতে ফন লাওয়ে সবিস্ময়ে বললেন—"আপনার বয়স যে এত কম তা আমার ধারণা ছিল না।"

— আমার বয়স ছাব্বিশ।

— মাত্র ছাব্বিশ! আর এই বয়সে আপনি পরীক্ষা-নিরীক্ষার সাহায্য ছাড়া শুধু মাত্র গণিতের সাহায্যেই বিশ্বরহস্য এত গভীর ভাবে উপলব্ধি করেছেন যা এতকাল আমাদের ধারণার বাইরে ছিল।

অধ্যাপক উইটকোস্কি মন্তব্য করলেন—"এতদিন পরে বিজ্ঞান-জগতে এক নতুন কোপারনিকাসের আবির্ভাব ঘটল।

বিশিষ্ট পদার্থবিজ্ঞানী ভিলহেলম ভাইন দূত পাঠালেন বার্নে—একমাত্র উদ্দেশ্য রিলেটিভিটি থিয়োরীর বিখ্যাত উদ্ভাবকের সঙ্গে সাক্ষাৎ করা। দূতের নাম জ্যাকব জোহান লব। মিনকাওস্কির ছাত্র লব অধ্যাপক ভাইনের অধীনে স্নাতক হন। বিকিরণ তত্ত্বের জন্য অধ্যাপক ভাইন ১৯১১ সালে নোবেল পুরস্কার পান। ভাইন পরিচালিত এক সেমিনারে লব আপেক্ষিক তত্ত্বের উপর একটি রিভিউ-ধর্মী প্রবন্ধ পাঠ করেন। পাঠান্তে বিষয়বস্তুর আলোচনাকালে তুমুল বিতর্কের সৃষ্টি হয় এবং অনেক ব্যাপারে সিদ্ধান্তে আসা কঠিন হয়ে পড়ে। তখন অধ্যাপক ভাইন লবকে আইনস্টাইনের সঙ্গে সাক্ষাতের পরামর্শ দেন।

সোলোভিন ও হ্যাবিক্টের বার্ন ত্যাগের পর দু-বছর ধরে আইন-স্টাইন তত্ত্বীয় পদার্থবিজ্ঞানে আলোচনায় অংশ নিতে পারেন এমন কাউকে খুঁজে পান নি। লবের মধ্যে তিনি এমনি একজন সঙ্গী খুঁজে পেলেন এবং এর পর থেকে তাঁর জীবনে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা হল। লব ও আইনস্টাইনের পরস্পর সাক্ষাৎ ও আলোচনার ফলশ্রুতি তড়িচ্চুম্বকত্বের উপর যুক্তনামে প্রকাশিত কয়েকটি গবেষণা-পত্র। কিন্তু কোন কিছুই আইনস্টাইনের সরল জীবনযাত্রা ও চরিত্র-মাধুর্যে পরিবর্তন আনতে পারল না। ঠাণ্ডা এক ফ্ল্যাট বাড়িতে হাঁটু মুড়ে স্টোভ-জ্বালাতে ব্যস্ত আইনস্টাইনকে খুঁজে বের করেছিলেন লব। হপ্তার পর হপ্তা ধরে দিনান্তে পেটেন্ট অফিসে লব আইনস্টাইনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতেন। তারপর দু'জন একত্রে ফিরতেন আইন-স্টাইনের ফ্ল্যাটে, আর আলোচ্য যা কিছু থাকত পথ চলতে চলতেই

সেরে নিতেন। লবের স্মৃতিকথায় একবার বার্নে দু'জনের একত্রে অপেরায় নাটক দেখার উল্লেখ পাওয়া যায়। নাটকটি ছিল ওয়াগনারের Gotterdammerung। নাটকটি দেখতে দেখতে আইনস্টাইন সোৎসাহে লবকে ফিসফিস করে বললেন—"ভগবান আমায় ক্ষমা করুন, ওয়াগনারের সঙ্গে রুচিতে আমার বিস্তর প্রভেদ। কিন্তু সিগ্‌ফ্রিডের মৃত্যুদৃশ্যে বিড়ম্বিত ভাগ্যের প্রতি বীরের অকুতোভয় মানসিকতার পুনরুল্লেখ ব্যাপারটি এক কথায় চমৎকার।"

১৯০৭-১৯০৯ এর বছর ক'টিতে আইনস্টাইন বহু শীতের সন্ধ্যা কাটিয়েছেন পাঁচজন সঙ্গী নিয়ে ভায়োলিন বাজিয়ে। নিজে ছাড়া, দলে ছিলেন একজন উকিল, একজন গণিতজ্ঞ, একজন বই-বাঁধাইকারী এবং জেলের এক ওয়ার্ডেন। তাঁরা বাজাতেন হেডন, মোজার্ট ও বিঠোফেন। সঙ্গীতজ্ঞদের কেউ কখনও সন্দেহ করেনি তাঁদের সঙ্গীটি কে?

এদিকে পারিবারিক ক্ষেত্রে কিছুটা অশান্তির পদধ্বনি শোনা যাচ্ছিল। পরিবারে সংখ্যাবৃদ্ধি ঘটায় ব্যয়ও বাড়তে লাগল। কিন্তু এতে বিচলিত হওয়ার পাত্র আইনস্টাইন ছিলেন না। তাঁর বেতন বেড়ে যখন ৪৫০০ ফ্রাঙ্ক হল তখন আইনস্টাইন মন্তব্য করেছিলেন—"এত টাকা পয়সা দিয়ে আমরা কি করব?" ওদিকে মিলেভার সংসার চালানোই দুষ্কর হয়ে পড়েছে। কিন্তু মিলেভার বড় চিন্তা অর্থাভাব নয়। দু'জনের স্বভাবের বিস্তর ফারাকই হল আসল সমস্যা। সোলোভিন ও হ্যাবিক্ট বাড়িতে প্রায়ই আসতেন। ব্যাপারটিতে মিলেভা খুশিই ছিলেন। কিন্তু তাঁদের বেড়ানো, বাইরে খাওয়া-দাওয়া, বাড়িতে কনসার্টের ব্যবস্থা করা এবং বহু বন্ধু-সমাগম মিলেভার মোটেই ভাল লাগত না। আইনস্টাইনের বৈজ্ঞানিক কাজকর্মগুলোও ক্রমে ক্রমে তাঁর কাছ থেকে দূরে সরে যেতে লাগল। অস্থিসন্ধির যক্ষা ও নিউ-রাসথেনিয়া রোগে তিনি ভুগছিলেন। এসব রোগ সত্ত্বেও তাঁর মানসিক গঠনে কোন উন্নতি দেখা গেল না। বরং সেই সঙ্গে দ্রুত তাঁর মধ্যে দেখা দিল এক ধরনের ঈর্ষা ও সন্দেহ। শেষে অবস্থা এমন হল যে,

আইনস্টাইনের সহজ-সরল আচার আচরণ এবং ভুলো-মনের কারণেও তিনি বিরক্ত হতেন। ক্রমে উভয়ের মধ্যে মানসিক ছাড়াছাড়ি শুরু হল। এটা বাইরে ফুটে বেরতে অবশ্য আরও কিছুদিন লাগল। সেটা ঘটল তাঁদের বার্ন ছাড়ার কিছু পরে।

১৯০৬ খ্রীস্টাব্দে বার্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে তত্ত্বীয় পদার্থবিজ্ঞানের এক অধ্যাপক-পদ সৃষ্টি করা হয় এবং ঐ পদে ৫৪ বৎসর বয়স্ক বার্ন-নিবাসী পল গ্রানার যোগদান করেন। ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ে পরীক্ষামূলক পদার্থবিদ্যার অধ্যাপক ছিলেন ফরস্টার। মাঝে মাঝে আলোচনার উদ্দেশ্যে আইনস্টাইন গ্রানারের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতেন। গ্রানার ছিলেন পেটেন্ট অফিসে আইনস্টাইনের সহকর্মী ডঃ জোসেফ সাওটার-এর ঘনিষ্ঠ বন্ধু। তাঁর কাছ থেকে আইনস্টাইনের অসাধারণ বৈজ্ঞানিক মেধা সম্পর্কে তিনি অবহিত ছিলেন। এই সাওটার-ই আইনস্টাইনকে পরামর্শ দিয়েছিলেন—"Send your thesis to Zurich. It would be a child's play for you to get a doctorate there"। এই যোগাযোগের ফলে ১৯০৭ সালের শরৎকালে আইনস্টাইন বার্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে তত্ত্বীয় পদার্থবিজ্ঞানের ফ্যাকাল্টিতে যোগদানের জন্য আবেদন করেন। সঙ্গে থিসিস হিসেবে ১৯০৫ সালে প্রকাশিত আপেক্ষিক তত্ত্বের মূলকথা সংবলিত নিবন্ধটি পাঠিয়ে দেন। পরবর্তীকালে এ সম্পর্কে গ্রানার উল্লেখ করেছেন—"আমি তাঁর প্রবন্ধটি পেলাম। ঐ সময়ে সামগ্রিক তত্ত্বটি আমার কাছে খুবই সমস্যামূলক (বিতর্কমূলক!) ঠেকেছিল। ফ্যাকাল্টিও কাজটিকে 'যথেষ্ট নয়' বলে ঘোষণা করলেন। সমসাময়িক অধিকাংশ পদার্থবিজ্ঞানীও তত্ত্বটিকে কম-বেশি স্পষ্ট করেই 'গ্রহণের অযোগ্য' বলে মনে করতেন। তা ছাড়া, বিধি অনুসারে হাতে-লেখা থিসিস জমা দেয়ার কথা।" সবচেয়ে বড় বাধা হয়ে দেখা দিলেন অধ্যাপক ফরস্টার। তিনি বললেন—যেখানে অধ্যাপক গ্রানার রয়েছেন সেই স্পেশালিস্ট

বিভাগে আরো একজন Privatdozent নিয়োগ করার কী প্রয়োজন? ছাত্রসংখ্যাও ত আধ-ডজনের বেশি নয়। তিনি আইনস্টাইনের প্যামপ্লেট 'The Electrodynamics of Moving Bodies' ফিরিয়ে দিলেন, সঙ্গে কিছুটা গ্রাম্য মন্তব্য—"I can't understand what you have written here."

মন্তব্যটিতে আইনস্টাইন অত্যন্ত বিরক্ত হলেন এবং ক্ষণিকের জন্য অ্যাকাডেমিক জীবন গ্রহণের আইডিয়া পরিত্যাগ করলেন। "পেটেণ্ট অফিসের সীমিত জগতে বেশ আছি, চাইনে সম্মান, চাইনে গৌরব।" পরে অবশ্য তাঁর মতের পরিবর্তন ঘটে। ১৯০৮-এর ১১ই ফেব্রুয়ারী অধ্যাপক গ্রানারকে এক চিঠিতে লেখেন—"লাইব্রেরীতে আপনার সঙ্গে কথাবার্তা বলে এবং কিছু বন্ধুবান্ধবের পরামর্শে আমি পূর্ব-সিদ্ধান্তের পরিবর্তন করে বার্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশের জন্য ফের আবেদন করেছি। এই মর্মে আমি ডীনের কাছে একটা থিসিসও পাঠিয়েছি। আবেদনপত্র গৃহীত হলে, যে সময়টুকু শিক্ষকতায় দেব তা যাতে বৃথা না যায় সে বিষয়ে আমি খুব সজাগ। তাই অন্তত কিছু ছাত্রের কৌতূহল জাগ্রত এবং বর্ধিত হয় এমন পাঠক্রমই দিতে চাই। সবচেয়ে ভাল হয়, যদি আপনার তুটো ক্লাশের পরিপূরকরূপে আমার লেকচার পরিবেশন করা সম্ভব হয়।" গ্রানার রাজি হলেন এবং ১৯০৮-০৯ সেশনের শীতকালে আইনস্টাইন তাঁর প্রথম বার্ন-লেকচার দিলেন। বিষয়ঃ 'বিকিরণ তত্ত্ব' বা Theory of Radiation। শ্রোতা ছিল মোট চারজনঃ তু-জন ছাত্র—শাওফিন এবং শেঙ্কার, আর বেসো এবং ম্যাক্স স্টার্ন। স্টার্ন পরে জুরিখে Inventors Institute স্থাপন করেন ও শিক্ষকরূপে প্রবাদপুরুষে পরিণত হন। একমাত্র স্টার্ন ছাড়া আর কেউ গ্রীষ্মকালীন সেশনের জন্য আইনস্টাইনের কাছে ছাত্ররূপে নাম লেখাল না। ফলে নতুন Privatdozent স্টার্নকে একটা পোস্টকার্ড লিখে জানিয়ে দিলেন যে, তিনি আর লেকচার দেবেন না। তবে বিশ্ববিদ্যালয়ের বাইরে যে কোন সমস্যা নিয়ে

আলোচনা করতে তিনি সর্বদাই প্রস্তুত।

এ সময়ে আইনস্টাইনের বোন মাজা বার্ন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ম্যাট্রিক পাশ করেন এবং একদিন ভাই-এর লেকচার শোনার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। তাঁর ক্লাশঘরটি দেখিয়ে দেয়ার জন্য পোর্টারকে বললে সে উত্তর করল—"কি বলছেন? ঐ Scarecrow (কাকতাড়ুয়া) আপনার ভাই! না বললে কিছুতেই বিশ্বাস করতাম না।" অবশ্য আইনস্টাইন কোনদিনই পোশাক-পরিচ্ছদে কেতাদুরস্ত ছিলেন না। যা হোক, ভাই-বোন পরস্পরকে কাছে পেয়ে খুব খুশি হলেন।

১৯০৯-এর গোড়ার দিকে এক অপরিচিত ভদ্রলোক আকস্মিক ভাবে আইনস্টাইনের এক লেকচারে যোগ দেন। ইনি হলেন জুরিখের ফিজিক্স ইনস্টিটিউটের ডিরেক্টার প্রখ্যাত অধ্যাপক আলফ্রেড ক্লাইনার। যৌবনে ফিজিক্সের জন্য ডাক্তারি প্র্যাকটিশ ছেড়েছিলেন, আর আজ এসেছেন এক উদীয়মান তরুণ গবেষকের পদার্থবিজ্ঞানে অ্যাকাডেমিক দক্ষতা যাচাই করতে। খুব মন দিয়ে আইনস্টাইনের বক্তৃতা শুনলেন। আহামরি কিছু নয়। এ সময় আইনস্টাইন খুব একটা ভাল লেকচার দিতে পারতেন না। নিজেই এক চিঠিতে এ কথা লিখেছেন বন্ধু লব-কে—"ঐসব দিনগুলোতে আমি খুব চমৎকার বক্তৃতা করতে পারতাম না। এর কারণ, কিছুটা আমার ভালভাবে প্রস্তুত না হয়ে যাওয়া আর কিছুটা হল 'ভবিষ্যতে কি কি আবিষ্কার করতে হবে' এই শর্তের দরুন একটা স্নায়বিক পীড়া।" জুরিখের লোকদের কাছে শিক্ষকতায় নিজের দক্ষতা প্রকাশের উদ্দেশ্যে তিনি তাঁদের Physics Society-তে একটা লেকচার দিলেন। এ বক্তৃতাটি খুব চমৎকার উৎরেছিল এবং এর ফলে বরফ গলতে শুরু করে। পরে অধ্যাপক ক্লাইনারের সঙ্গে প্রতি-সাক্ষাৎকারে আরও যোগাযোগ ঘটে। এ সময় জুরিখে আইনস্টাইন এরাট পরিবারের অতিথি হতেন। বার্নে ফিরে এসে বন্ধু এরাটকে চিঠি দিলেন। তারিখ ১৫ই ফেব্রুয়ারী, ১৯০৯।

"……যে ক'টা দিন তোদের সঙ্গে কাটিয়ে এলাম ফিরে এসে তার সুখস্মৃতি রোমন্থন করছি। এমন একটা সুখকর ও আরামদায়ক আশ্রয় খুঁজে পাওয়ায় আমার যার-পর-নাই ভাল হল। অজানা লোকেদের মধ্যে ঘুরে বেড়ানোর চেয়ে ভয়ঙ্কর অবস্থা খুব কমই আছে। সবচেয়ে বেশি আনন্দ পেয়েছি যে, এরাট-মা'র সঙ্গে আমি আবার বসতে পেরেছি। ছেলেবেলায়, তখনও আমি 'ডিমের' মধ্যে, আমার প্রতি কী সদয়ই না তিনি ছিলেন। জুরিখে একত্রে বসে গল্পগুজব করার সব রকম সম্ভাবনা আবার দেখা দিয়েছে। কারণ, আমাদের কঠোর বন্ধু ক্লাইনার—যাঁর সঙ্গে শুক্রবার দিন আমি দেখা করলাম—অত্যন্ত সহৃদয়তার সঙ্গে আমার 'পরীক্ষা' পাশের কথা প্রকাশ করেছেন। ইঙ্গিত দিয়েছেন যে, শীগগিরই কিছু একটা ব্যবস্থা পাকছে। অভিশপ্ত টাকাকড়ির দরুন এখানে থাকতে বাধ্য না হলে, মনে হচ্ছে, এই শরৎকাল থেকে আমার ভবিষ্যৎ বেশ উজ্জ্বল। যদি তাই হয়, তবে মা-কে নিয়ে আগামী বসন্তকালে অবশ্য এখানে আসিস। আমি অফিস থেকে ঐ সময় ছুটির ব্যবস্থা করে রাখব।"

এর অল্পদিন পরে, ১৯০৯-এর ২৮শে এপ্রিল, আইনস্টাইন কনরাড হ্যাবিক্টকে খবর দিলেন—"জুরিখ বিশ্ববিদ্যালয়ের চাকরিটা যে পাচ্ছি সে সম্পর্কে আমি এখন অনেকটা নিশ্চিত।"

ক্লাইনারের সঙ্গে আইনস্টাইনের যোগাযোগের অনেক আগেই বিশিষ্ট বিজ্ঞানী হেরমান আরন ক্লাইনারকে আইনস্টাইন সম্পর্কে বলে রেখেছিলেন। তার ফলে ক্লাইনার ১৯০৫ সালেই আইনস্টাইনের হয়ে জুরিখ বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপকের চাকরির জন্য ডীনের কাছে লিখেছিলেন। লিখেছিলেন আইনস্টাইনের থিসিস 'A New Definition of Molecular Dimensions' সম্পর্কেও। "এই থিসিসের অন্তর্ভুক্ত ভাবনারাজি এবং গণনাসমূহ উদ্গতিবিদ্যার সবচেয়ে কঠিন বিষয়গুলোর অন্যতম। এ ধরনের কাজে তিনিই শুধু সাহস করতে পারেন যিনি গাণিতিক জ্ঞান ও ভৌত সমস্যাবলী বিষয়ে পূর্ণ

জ্ঞান ও অনুশীলনীর অধিকারী।” তবে “আইনস্টাইনের কাজটির মূল প্রতিপাদ্য ডিফারেন্সিয়াল সমীকরণের বিশ্লেষণ। কাজেই প্রকৃতিতে গণিতধর্মী এবং বিশ্লেষণাত্মক মেকানিক্সের” অন্তর্গত। এজন্য ক্লাইনার আইনস্টাইনের থিসিস সম্পর্কে দ্বিতীয় একজন এক্সপার্টের মতামত নিতে বললেন। এ প্রসঙ্গে তিনি তাঁর সহকর্মী অধ্যাপক বার্কহার্ড-এর নাম প্রস্তাব করেন। থিসিস পরীক্ষা করে বার্কহার্ড রায় দিলেন— “তাঁর বিশ্লেষণ প্রমাণ করে সংশ্লিষ্ট গাণিতিক পদ্ধতি-গুলোয় তাঁর সুগভীর দক্ষতা।”

ফিলজফিক্যাল ফ্যাকাল্টির কিছু সদস্যের বিরোধিতা সত্ত্বেও জুরিখ থেকে অনুকূল বায়ু বইতে লাগল এবং এর ফলে আইনস্টাইন বার্ন ছাড়তে উৎসাহ পেলেন। ভবিষ্যতে বৈজ্ঞানিক গবেষণায় পুরোপুরি আত্মনিয়োগের উদ্দেশ্যে আইনস্টাইন পেটেন্ট অফিসের পদে ইস্তফা দিলেন অক্টোবর ১৫, ১৯০৯। তাঁর ঠিক উপরওয়ালা জানতে চাইলেন অতঃপর তিনি কী করবেন। আইনস্টাইন সবিনয়ে জানালেন যে, তিনি জুরিখ বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপকের পদে যোগ দিচ্ছেন। উত্তর শুনে বিস্মিত ভদ্রলোক চীৎকার করে উঠলেন— “দেখুন, মিস্টার আইনস্টাইন, এ কখনও সত্যি হতে পারে না। আমি আপনাকে মোটেই বিশ্বাস করি না। এ অত্যন্ত বদ রসিকতা।” বিখ্যাত সুইস ঔপন্যাসিক অটো ভির্জ ১৯০৮-১৯২৬ সাল অবধি পেটেন্ট অফিসে চাকরি করতেন। তিনি ছিলেন এই ঘটনার অন্যতম সাক্ষী।

এর দিন কয়েক আগে আরও একটা মজার ঘটনা ঘটল। অধ্যাপক আইনস্টাইনের জবানীতেই বলা যাক। “একদিন বার্নের পেটেন্ট অফিসে একজন এসে আমার হাতে একটা বড় খাম দিলেন। ওর ভেতরে ছিল সুন্দর এক পাতা কাগজ, আর তাতে ছবির মতো সুন্দর অক্ষরে কিছু লেখা। যতদূর মনে পড়ে ল্যাটিনে লেখা। বোধ হল, ব্যক্তিগত কোন কিছু নয় এবং তেমন দরকারীও নয়। কাজেই

বাজে কাগজের ঝুড়িতে ওটা ফেলে দিলাম। পরে জানলাম, ওটা ছিল ক্যালভিন উৎসবের নিমন্ত্রণ পত্র, আর সেই সঙ্গে ওতে লেখা ছিল একটা ঘোষণা যে, জেনিভা বিশ্ববিদ্যালয় আমাকে সম্মানসূচক ডক্টরেট উপাধি দেবে। ওদিকে ওখানকার লোকেরা আমায় একেবারে নিশ্চুপ দেখে আমার কাছে লোক পাঠালেন—আমারই বন্ধু এবং ছাত্র জেনিভার লুসিয়েন চ্যভন। সে তখন বার্নে থাকত। কোন রকম ব্যাখ্যা না দিয়েই সে আমায় জেনিভা যেতে পীড়াপীড়ি করল। কেননা, না গিয়ে নাকি উপায় নেই। কাজেই নির্দিষ্ট তারিখে আমি ওখানে গিয়ে পৌঁছলাম। যেখানে উঠলাম সেই হোটেলের রেস্তোরাঁয় সন্ধ্যায় জুরিখের কয়েকজন অধ্যাপকের সঙ্গে সাক্ষাৎ হল। এবং আমরা কয়েকজন একত্রে রইলাম। এঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য বার্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের ফার্মাসিউটিক্যাল মেডিসিনের অধ্যাপক আলেক্স-জাণ্ডার সিরস্। বড় সুরসিক লোক। প্রত্যেকেই জানালেন তাঁরা কেন এসেছেন। আমায় চুপচাপ দেখে সবাই প্রশ্ন করতে লাগলেন এবং বাধ্য হয়ে বললাম এ ব্যাপারে আমি কিছুই জানি না। কিন্তু অন্যেরা জানতেন এবং সে কথা তাঁরা আমায় জানালেন। পরদিন তাঁদের সঙ্গে নাকি মিছিল করে যেতে হবে। আমার সঙ্গে ছিল স্রেফ একটা স্ট্র-হ্যাট এবং দৈনিক পরনের এক প্রস্থ স্যুট। আমি প্রস্তাব করলাম যে, আমায় এ থেকে বাদ দেয়া হোক। কিন্তু কেউ রাজি হল না। অগত্যা আমায় নিয়েই উৎসব হল। সে এক মজার কাণ্ড!

"উৎসবের সমাপ্তি ঘটল হোটেল ন্যাশানাল-এ গিয়ে। সেখানে আমার জীবনের সবচেয়ে জঁাকাল ব্যাঙ্কোয়েট দেখলাম। আমার পাশে বসেছিলেন জেনিভার একজন সেনেটর। তাঁকে বললাম—"জানেন, এখানে ক্যালভিন থাকলে এখন কী করতেন?" তিনি বললেন—জানি না। এবং জিজ্ঞাসা করলেন আমি ঠিক কী বলতে চাইছি। আমি উত্তর দিলাম—"এই বিলাস-বৈভবের পাপের দরুন

একটা বিরাট শূল তৈরি করে আমাদের সবাইকে শূলে চড়াতেন এবং পরে প্রত্যেককে পুড়িয়ে মারতেন। তারপর থেকে ভদ্রলোক আর একটা কথাও আমার সঙ্গে বলেন নি। এভাবেই আমার কাছে ঐ চমৎকার উৎসবের স্মৃতির সমাপ্তি ঘটল।"

ঘটনাটি ঘটেছিল জেনিভা বিশ্ববিদ্যালয়ের ৩৫০-তম প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে। ১৯০৯ সালের ৭ই জুলাই থেকে ৯ই জুলাই। বিশ্বের নানা দিগ্দেশ থেকে মাননীয় অতিথিরূপে দুই শতাধিক বিদ্বজ্জনের সমাবেশ ঘটেছিল। কিন্তু আবহাওয়া ছিল দুর্যোগপূর্ণ। ঐ তিন দিন বৃষ্টির আর বিরাম ছিল না। স্ট্র-হ্যাট পরিহিত আইনস্টাইন ছিলেন মিছিলের অন্যতম আকর্ষণ। যাঁদের সম্মানসূচক ডক্টরেট উপাধিতে ভূষিত করা হয়েছিল তাঁদের মধ্যে ছিলেন মাদাম কুরী, ভাইলহেলম ওস্টাল্ড, আলফ্রেড ভার্নার, আর্নস্ট শলভে প্রমুখ প্রথিতযশা বিজ্ঞান কুলতিলকেরা। আইনস্টাইনের জীবনে সম্মানসূচক ডক্টরেট এই প্রথম। যিনি এই ব্যবস্থা করার জন্য ধন্যবাদ পাওয়ার যোগ্য তিনি হলেন জেনিভা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিদ্যার অধ্যাপক চার্লস ইউজেন গুয়ে। জুরিখের বিশিষ্ট তরুণ গবেষকটিকে তিনি বিলক্ষণ জানতেন। কারণ, ১৮৯৪ থেকে ১৯০০ অবধি তিনি ফেডারেল পলিটেকনিকে অধ্যাপনা করেছেন। পরে আইনস্টাইনের তত্ত্বের উপর কিছু গবেষণাপত্রও প্রকাশ করেন।

যা হোক, ওদিকে অধ্যাপক ক্লাইনার জুরিখ বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিভাগের পঠন-পাঠনকে আধুনিক করার প্রয়াসে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে বুঝিয়ে ১৯০৯ সালে তত্ত্বীয় পদার্থবিজ্ঞানের একটি অধ্যাপক পদের ব্যবস্থা করলেন। তাঁর ইচ্ছা তাঁরই সহকারী ডঃ ফ্রেডরিখ অ্যাডলারকে ঐ পদে অ্যাসোসিয়েট অধ্যাপকরূপে নিয়োগ করেন। অ্যাডলার ছিলেন অস্ট্রিয়ার সোশ্যাল ডেমক্র্যাট পার্টির প্রতিষ্ঠাতার ছেলে। জুরিখে এসেছিলেন এক বন্ধুর সঙ্গে ১৮৯৭-এ। ইচ্ছে ছিল বিশ্ববিখ্যাত অধ্যাপক ভার্নারের অধীনে তত্ত্বীয় রসায়নে

পড়াশোনা করবেন। অ্যাডলার ছিলেন ভিয়েনার গ্রাজুয়েট এবং গ্রীক জানতেন না বলে অস্ট্রিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের দুয়ার তাঁর কাছে অবরুদ্ধ ছিল। শেষ অবধি অ্যাডলার অবশ্য পদার্থবিজ্ঞানই অধ্যয়ন করলেন। কেননা, তাঁর মনে হল এর ফলে তাঁর দার্শনিক জ্ঞানভাণ্ডারটি আরও পরিপুষ্ট হবে। উনি থাকতেন ৩৭ নং পেস্টালোজিস্ট্রাসে। কিছুদিন আগে ঐ বাড়িতে থাকতেন বিশিষ্ট মার্কসীয় বিপ্লবী রোজা লুক্সেমবার্গ। ১৯১৯ সালের প্রথম দিকে বার্লিনে এঁকে হত্যা করা হয়। তেজস্বিনী চরিত্রের এই মহিলার প্রতি আইনস্টাইন অগাধ শ্রদ্ধা পোষণ করতেন। জার্মানীতে প্রোলেতারিয়েতদের জন্য সংগ্রামের উদ্দেশ্যে ইনি জুরিখ ছেড়ে বার্লিনে যান। আইনস্টাইন বলতেন—"She was far too good for this world"।

বিশ শতকের আরম্ভের ঠিক মুখে অ্যাডলার ও আইনস্টাইনের মধ্যে এক দীর্ঘ কথোপকথনের সূত্রপাত ঘটে। আইনস্টাইন জানতেন অ্যাডলার তখন ডক্টরেট থিসিসের জন্য কাজ করছেন। বিষয়বস্তু হল: Specific heat of Chromium। আইনস্টাইন সোৎসাহে প্রশ্ন করলেন—'কোন্ প্রকল্পের ভিত্তিতে আপনি কাজ করছেন?' 'কোন প্রকল্প নয়, সরাসরি পরীক্ষার সাহায্যে আমি এটা প্রতিষ্ঠিত করতে চাইছি'—উত্তর দিলেন অ্যাডলার।

এরপর থেকে এই দুই সহকর্মী প্রায়ই পেশাগত বিতর্কে জড়িয়ে পড়তেন। অ্যাডলার চাইতেন নিজের মতবাদ জবরদস্তি অন্যের উপর চাপাতে। Analytical mechanics-এ অধ্যাপক মিনকাওস্কির বক্তৃতায় এঁরা একত্রে অংশ গ্রহণ করতেন। যত দিন গেছে অ্যাডলার ততই শ্রেণীসংগ্রামের প্যাশানে তেতে উঠেছেন। এ ভাবটি তিনি পেয়েছিলেন পিতৃসূত্রে। পক্ষান্তরে, আইনস্টাইন গবেষণা জগতের গাম্ভীর্যে ক্রমে স্থিতধী হয়ে ওঠেন। রাজনীতিতে অনীহা ছিল তাঁর মজ্জাগত। সে সময়ে এবং পরবর্তীকালে তিনি প্রায়ই বলতেন—"How an intelligent man can subscribe

to a party. I find it a complete mystery"। একজন বুদ্ধিমান ব্যক্তি যে কি করে পার্টির অনুগত থাকতে পারে তা ছিল তাঁর কাছে এক চিররহস্য।

কিন্তু 'নিয়তি কেন বাধ্যতে'। নিয়তি-নির্দেশে বিপরীত মেরুর এই দুই ব্যক্তির মধ্যে প্রগাঢ় বন্ধুত্বের সৃষ্টি হল। অ্যাডলার ছিলেন মাক-এর ভাবশিষ্য। গুরু-নির্দেশিত কাঠামোর মধ্যে ইনি মূল ভৌত বিষয়গুলোর ব্যাখ্যায় নিযুক্ত থাকতেন, আর কিছুটা শ্লেষ করে হার্ৎজ এবং আইনস্টাইনের মেকানিক্সকে বলতেন—"beautiful ideal mechanics"।

অধ্যাপক ক্লাইনার যখন অ্যাসোসিয়েট অধ্যাপক পদে অ্যাডলারের নিয়োগ প্রস্তাব করেন তখন কর্তৃপক্ষ এই মনোনয়নের প্রতি অত্যন্ত অনুকূল ছিলেন। কিন্তু ফ্রেডরিখ অ্যাডলার স্বেচ্ছায় আইনস্টাইনের জন্য সরে দাঁড়ালেন। নিঃস্বার্থ এবং বস্তুবাদী দৃষ্টিভঙ্গি থেকে কর্তৃপক্ষকে জানালেন যে, এ পদে একজন বিশিষ্ট তত্ত্বীয় বিজ্ঞানীর নিয়োগ বাঞ্ছনীয়। এবং সে বিচারে আইনস্টাইন তাঁর চেয়ে অনেক বেশি যোগ্য। ১৯০৯ সালের ৭ই মে আইনস্টাইন জুরিখ বিশ্ববিদ্যালয়ে অ্যাসোসিয়েট অধ্যাপক নিযুক্ত হলেন। বিশ্ববিদ্যালয় কাউন্সিল তখনও ঠিক বুঝে উঠতে পারেন নি যে, তত্ত্বীয় পদার্থবিদ্যার সর্বশ্রেষ্ঠ প্রবক্তারূপে যিনি শীঘ্র বিশ্বে প্রতিষ্ঠিত হবেন সেই অনন্য প্রতিভা-ধরকেই তাঁরা নিয়োগপত্র দিলেন। নিয়োগপত্র পাওয়ার সংবাদ পেয়ে আইনস্টাইন মাকে চিঠি লিখলেন—"তোমার ছেলে এখন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক, আর পেটেন্ট অফিসের কেরানি নয়।"

শালজবুর্গ এবং শায়ার্সে গ্রীষ্মের ছুটি কাটিয়ে আইনস্টাইন জুরিখে এলেন ১৯০৯-এর অক্টোবরের প্রথম দিকে। সঙ্গে স্ত্রী-পুত্র আর সংসারের জিনিষপত্র। বাসা ভাড়া করলেন ১২নং মৌশনস্ট্রাসে, ঠিক অ্যাডলারের ফ্ল্যাটের ওপরতলায়। দু-জনের ছেলেমেয়েদের চীৎকার-চেঁচামেচি থেকে বাঁচতে দুই বন্ধু প্রায়ই চিলেকোঠায় চলে যেতেন। সেখানে

নির্ভাবনায় চলত তাঁদের পারস্পরিক আলোচনা আর পড়াশোনা।

কিন্তু পড়াশোনায় অ্যাডলারকে বেশি দিন ধরে রাখা গেল না। রাজনীতির সাইরেন তখন তাঁর কানে নিরন্তর সুধা ঢেলে চলেছে। সোশ্যাল ডেমক্র্যাট কাগজ Volksrecht-এর প্রধান সম্পাদক পদে যোগ দিয়ে অ্যাডলার সাংবাদিকতাকে বৃত্তিরূপে গ্রহণ করলেন। বন্ধুকে এ থেকে বিরত করতে আইনস্টাইন কতই না কাতর আবেদন জানালেন—"Be a little patient, you will certainly be my successor in Zurich one day"। কিন্তু সব চেষ্টা ব্যর্থ হল। জুরিখে দু'বছর পড়াশোনা করে ১৯১২ সালে অ্যাডলার অস্ট্রিয়ান সোশ্যাল ডেমক্র্যাট পার্টির সম্পাদক নিযুক্ত হলেন। পরের ইতিহাস খুব দুঃখাবহ। ১৯১৬-র ২১শে ডিসেম্বর অ্যাডলার অস্ট্রিয়ার প্রধানমন্ত্রী গ্রাম স্টুর্গক্-কে ভিয়েনায় গুলি করে হত্যা করেন। এ সময়ে বন্ধুর সাহায্যে দাঁড়াতে আইনস্টাইন বিন্দুমাত্র দেরি করেন নি। ১৯১৭-র ১৪ই এপ্রিল ভিয়েনা কোর্টে অ্যাডলারকে আইনস্টাইন চিঠি দিলেন। অনুরোধ: অ্যাডলার যেন তাঁর মামলায় সাক্ষ্য দিতে অবশ্যই আইনস্টাইনের নাম প্রস্তাব করেন। তা হলে, অ্যাডলারের নির্দোষ চরিত্র সম্পর্কে তিনি সওয়াল করতে পারবেন। শেষ অবধি তা আর হয় নি। তবে এ সময় অ্যাডলার ও আইনস্টাইনের মধ্যে বহু উল্লেখযোগ্য ও চিত্তাকর্ষক চিঠিপত্রের আদান-প্রদান হয়। ১৯১৭-র মে-তে অ্যাডলারের প্রাণদণ্ডের আদেশ হল। পরে অবশ্য দণ্ডাদেশ কমিয়ে আঠার মাস সশ্রম কারাদণ্ডের ব্যবস্থা হয়। রাজনৈতিক ডামাডোলে মুক্তির আগে পর্যন্ত অ্যাডলার জেলে বসে লোরেনৎস ও আইনস্টাইনের স্থিতিবিদ্যা (kinematics) নিয়ে প্রবন্ধ রচনায় ব্যস্ত ছিলেন। ১৯২০ সালে প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয়। নাম দেয়া হয় Local time, System time, Zone time (Ortzeit, Systemzeit, Zonenzeit)। আইনস্টাইনের মতে, নিবন্ধটি বড় 'shaky foundations' উপর দাঁড়িয়ে। কিন্তু এতে

কারাকক্ষে বন্ধুর সময় কাটাতে কষ্টের লাঘব হয়েছিল—একথা ভেবে আইনস্টাইন খুশি ছিলেন। অ্যাডলার প্রসঙ্গে আমরা আবার পরে ফিরে আসব।

অধ্যাপকরূপে নিয়োগের আগে প্রফেসর ক্লাইনার বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে (Board of Philosophical Faculty II) আইনস্টাইন সম্পর্কে যা লিখেছিলেন তা বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। ক্লাইনার লিখলেন—

"আইনস্টাইন বর্তমান কালের সর্বাগ্রগণ্য তত্ত্বীয় পদার্থবিজ্ঞানীদের অন্যতম। আপেক্ষিক তত্ত্বের উপর তাঁর কাজ প্রায় সর্বজনস্বীকৃত। গ্যাস তত্ত্ব, ব্রাউনীয় গতি প্রভৃতি তাঁর পূর্ববর্তী কাজগুলোও স্বীকৃতির শিরোভূষণ লাভ করেছে। আইডিয়ার উপস্থাপন, অন্বেষার সূক্ষ্মতা এবং বিষয়ের একেবারে মূলে প্রবেশের অনুপম দক্ষতায় তাঁর প্রতিটি কাজ বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত। স্পষ্টতা আর স্টাইলের পরিচ্ছন্নতাও সেই সঙ্গে উল্লেখ করার মত; প্রকাশের জন্য, অনেক ক্ষেত্রে, তিনি নিজের ভাষা নিজেই সৃষ্টি করে নিয়েছেন। মাত্র তেত্রিশ বছর বয়স্ক ব্যক্তির পক্ষে এগুলো স্বাধীন চিন্তা ও পরিপক্ব ধী-শক্তির সুস্পষ্ট লক্ষণ। তাঁর লেখাগুলোতে একাধারে সত্যের জন্য আপোষহীন প্রচেষ্টা এবং চরম বস্তুনিষ্ঠার পরিচয় মেলে। ব্যক্তিগত উচ্চাকাঙ্ক্ষা বলতে তাঁর কিছুই নেই। বিজ্ঞানের সঙ্গে সম্পর্ক নেই এমন কোন আলোচনা বা বিতর্কে তিনি কখন জড়িয়ে পড়েন না।

"শিক্ষক হিসেবে আইনস্টাইন কেমন হবেন এ সম্পর্কে শেষ কথা বলার সময় সম্ভবত এখনও আসে নি। চিন্তার সূক্ষ্মতা এবং ছাত্রদের প্রতি কর্তব্য পালনের আন্তরিক সঙ্কল্প তাঁর বক্তৃতার বিষয়বস্তুকে পরিচ্ছন্ন এবং পারম্পর্যময় করে তোলে। এই গুণের জন্য তাঁর বক্তৃতা বিষয়সমৃদ্ধ হয় এবং শোতৃবর্গকে মন্ত্রমুগ্ধ করে রাখে। একমাত্র ভবিষ্যৎ ঘটনাবলীই প্রমাণ করবে যে, তাঁর বক্তৃতা ছাত্রদের মনের অন্দরমহলে প্রবেশ করে, নাকি শুধু উপরের স্তরেই থেকে যায়?

বক্তার শব্দরাজি তাঁদের মানসপটে গেঁথে যায়, না বক্তার মস্তিষ্কের তাৎক্ষণিক চিন্তাসম্ভারকে প্রকাশ করে মাত্র। শিক্ষক হিসেবেও ডঃ আইনস্টাইন যে খ্যাতির উজ্জ্বল স্বাক্ষর রাখবেন এ বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ। বুদ্ধির দীপ্তি আর বিজ্ঞানমনস্কতায় তিনি এতই অনন্য যে, শিক্ষকতার কলাকৌশল অবলীলায় আয়ত্ত করে ফেলবেন।"

ওদিকে 'নিয়োগকর্তা' ক্লাইনার সম্পর্কে আইনস্টাইনও ব্যক্তিগত এক পত্রে লবকে তাঁর মতামত জানালেন। লিখলেন—

"আমাদের ইনস্টিটিউটের প্রধান, অধ্যাপক ক্লাইনার, খুব একটা উঁচুদরের পদার্থবিদ্ নন, কিন্তু ব্যক্তি-হিসেবে এক কথায় চমৎকার। আমাকে তিনি বড় ভালবাসেন। বৈজ্ঞানিক খ্যাতি আর ব্যক্তিত্বের বিরাটত্ব সব সময় এক সঙ্গে পাওয়া যায় না। আর আমার কাছে "a harmonious man is worth more than the most subtle composer of formulae".

জুরিখ বিশ্ববিদ্যালয়ে সরকারীভাবে আইনস্টাইনের যোগদানের তারিখ ১৯০৯ সালের ১৫ই অক্টোবর। আয় বলতে বার্ষিক সাড়ে চার হাজার ফ্রাঙ্ক বেতন, আর সেই সঙ্গে কিছু লেকচার-দক্ষিণা। কিন্তু এ সত্ত্বেও সংসার চালাতে আইনস্টাইন হিমসিম খাচ্ছিলেন।

একদিন স্ত্রী মিলেভা যখন রান্নায় ব্যস্ত তখন আইনস্টাইন হঠাৎ বলেই ফেললেন—"আচ্ছা, বল ত, আমরা কেন খরচ কুলতে পারছি না? পেটেন্ট অফিসে ত এ রকম বেতনই পেতাম।"

স্ত্রী উত্তর দিলেন—"এখন সংসার বড় হয়েছে। তা ছাড়া, তুমি ত আর পেটেন্ট অফিসের কেরানি নও, রীতিমত বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক। তাই অতিথি-অভ্যাগতদের আপ্যায়ন, একটু ভাল পোশাক-আশাক, এখন সবই করতে হচ্ছে। কাজেই খরচ কুলবে কি করে?"

কি করে রোজগার বাড়ানো যায় ভেবেও আইনস্টাইন কিছুই সুবিধে করতে পারলেন না। মাঝে মাঝে সুইজারল্যাণ্ডের বাইরে গিয়ে বক্তৃতা দিয়ে আয় বাড়ানোর চেষ্টা করতেন মাত্র। হঠাৎ একদিন

একটা আমন্ত্রণ পত্র হাতে এল। সময়টা ১৯১০ সালের গ্রীষ্মকালের প্রথম দিক। পত্রটি এসেছে প্রাগের জার্মান বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। পত্রে লেখা—"প্রিয় প্রফেসর আইনস্টাইন, আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে আপনাকে অধ্যাপক হিসেবে পেলে আমরা ধন্য হতাম।" বেতনের পরিমাণটাও যেমন বেশি ছিল, পদটাও ছিল তেমনি সম্মানের। একেবারে পদার্থবিজ্ঞানের প্রধান অধ্যাপক। আইনস্টাইন জুরিখ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তাঁকে ছেড়ে দেয়ার অনুরোধ জানালেন। খবরটা পেয়ে জুরিখ বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে ছেড়ে দেয়ার বদলে তাঁর বেতন হাজার ফ্রাঙ্ক বাড়িয়ে দিলেন। অবশ্য শেষ অবধি জুরিখ বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে ধরে রাখতে পারেনি। জুরিখ বিশ্ববিদ্যালয়ের আবহাওয়া তাঁর ভাল লাগছিল না। তাই বিশ্ববিদ্যালয়কে দ্বিতীয়বার অনুরোধ করলেন তাঁকে ছেড়ে দিতে। শেষ অবধি অনুরোধ গৃহীত হল এবং সেটা ১৯১১ সালের ১৫ই এপ্রিল।

সে যা হোক, নীচের তালিকা থেকে জুরিখ বিশ্ববিদ্যালয়ে আইন-স্টাইনের অধ্যাপনার কাজ সম্পর্কে একটা ধারণা পাওয়া যাবে।

১৯০৯-১০ ঃ

| শীতকালীন টার্ম | | ছাত্র সংখ্যা |
|---|---|---|
| মেকানিক্স | ৪ ঘণ্টা | ১৭ |
| তাপ-গতিবিদ্যা | ২ ঘণ্টা | ১৯ |
| সেমিনার | ১ ঘণ্টা | ১২ |

১৯১০ ঃ

| গ্রীষ্মকালীন টার্ম | | |
|---|---|---|
| মেকানিক্স | ৩ ঘণ্টা | ১৫ |
| কাইনেটিক থিয়োরী | ২ ঘণ্টা | ২৪ |
| সেমিনার | ১ ঘণ্টা | ১৪ |
| লেবরেটরীর কাজ (অধ্যাপক ক্লাইনারের সঙ্গে) | প্রত্যহ | ১১ |

১৯১০-১১ :

| শীতকালীন টার্ম | | ছাত্র সংখ্যা |
|---|---|---|
| ইলেকৃট্রিসিটি ও ম্যাগনেটিজম | ৪ ঘণ্টা | ২৩ |
| তত্ত্বীয় পদার্থবিদ্যা (নির্বাচিত অংশ) | ২ ঘণ্টা | ১০ |
| সেমিনার | ১ ঘণ্টা | ৭ |
| লেবরেটরীর কাজ (অধ্যাপক ক্লাইনারের সঙ্গে) | প্রত্যহ | ১২ |

জুরিখ বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি তাঁর প্রথম উদ্বোধনী বক্তৃতা দিলেন ১৯০৯ সালের ১১ই ডিসেম্বর। নতুন অধ্যাপক বক্তৃতার বিষয়রূপে নির্বাচন করলেন The role of Atomic theory in Modern Physics : 'আধুনিক পদার্থবিজ্ঞানে পরমাণুতত্ত্বের ভূমিকা'। সব রকম অলঙ্কারের ঔজ্জ্বল্যবর্জিত তাঁর রুটিনী বক্তৃতাগুলো শ্রোতার মানসপটে যে ধারণা রেখে যেত তা হল স্বাভাবিক স্বাধীনতা এবং বিষয়বস্তুর নিয়ন্ত্রণে বক্তার অনন্যসাধারণ পারঙ্গমতা। তিনি কদাচিৎ বক্তৃতা লিখে আনতেন। কিন্তু সরস টীকা-টিপ্পনী ও মন্তব্যের মাধ্যমে প্রায়ই বক্তৃতার একঘেয়েমি দূর করে দিতেন। জ্ঞানস্পৃহাকে ছাত্রের মধ্যে সঞ্চারিত করে দেয়াই শিক্ষকের প্রধান কাজ—এই ছিল তাঁর ধারণা। তোতা-পাখির মতো বৈজ্ঞানিক কিছু রাবিশ ছাত্ররা আওড়ে যাবে—এ ব্যাপারটিকে তিনি অত্যন্ত ঘৃণা করতেন। আর এখানেই ছিল সুইজার-ল্যাণ্ডের শিক্ষাপ্রণালীর ব্যর্থতা। মিউনিখে 'জিমন্যাশিয়ম' স্কলার হিসেবে আইনস্টাইন নিজেও এই অত্যাচারের শিকার হয়েছিলেন।

১৯০৯ এর শীতকালীন টার্মে আইনস্টাইন তাপ-গতিবিজ্ঞানের উপর প্রথম লেকচার দেন। অন্যতম শ্রোতা ছিলেন অ্যাডলফ ফিশ। ইনি আরাও ক্যাণ্টনাল বিদ্যালয় থেকেই আইনস্টাইনকে চিনতেন। যে সময়ের কথা বলা হচ্ছে তখন ভেটিনজেনে তিনি স্কুল-শিক্ষকতা

করছিলেন। আইনস্টাইনের প্রথম বক্তৃতা সম্পর্কে ফিশের মন্তব্য এখানে উদ্ধৃত করা হল: "এই বক্তৃতায় অধ্যাপক আইনস্টাইন ছাত্রদের মূল্যবান ও নতুন কিছু দেবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করেন। বন্ধু ও সহকর্মী এরাটকে নিয়ে তিনি কখন কখন স্টেশন অবধি আমার সঙ্গে আসতেন। ক্লাশে বারবার জিজ্ঞেস করতেন তাঁর বক্তব্য সবাই ঠিকমত বুঝতে পেরেছে কিনা। বিরতির পর ছাত্রছাত্রীর দল তাঁকে ঘিরে ধরত ও নানা প্রশ্ন করত। ধৈর্যের সঙ্গে তিনি সেগুলো শুনতেন এবং বন্ধুত্বপূর্ণ মনোভাবের সঙ্গে প্রত্যেকটির উত্তর দিতেন। ছাত্র-শিক্ষকে এ ধরনের সখ্য-সংযোগ সে সময়ে ছিল নেহাতই বিরল ঘটনা এবং কল্পনার বাইরে।"

এ সময়ের আর এক শ্রোতা হলেন হান্স টানার। জুরিখ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইনি ম্যাট্রিক পাশ করেন এবং পরে ১৯১৮ থেকে ভিনটাতুর টেকনিক্যাল স্কুলে পদার্থবিজ্ঞান ও গণিতে অধ্যাপনা করেন। তিনি লিখছেন: "১৯০৯ থেকে ১৯১১—এই দু-বছর অধ্যাপক আইনস্টাইনের অধীনে আমার কাজ করার সৌভাগ্য হয়েছিল। তিনি তখন জুরিখ বিশ্ববিদ্যালয়ে তত্ত্বীয় পদার্থবিজ্ঞানের অধ্যাপক। ছাত্র-সংখ্যার দিক থেকে আমরা তখন কয়েকজন মাত্র ছিলাম। সেজন্য ছাত্র-শিক্ষকে একটা ব্যক্তিগত সম্পর্কের পরশ ছিল। দেখতাম, তাঁর পোশাক-আশাকে কেমন যেন দৈন্যের ছাপ—মাপে খাটো ট্রাউজার, লোহার চেনের ঘড়ি ইত্যাদি। এজন্য ক্লাশে প্রথম যখন চেয়ারে এসে বসতেন তখন সবাই সন্দিগ্ধ থাকতাম কেমন বা পড়াবেন। কিন্তু মাত্র কয়েকটি বাক্য উচ্চারণ করার সঙ্গে সঙ্গে (ধন্যবাদ দিই তাঁর গতানুগতিক পদ্ধতিতে লেকচার দেয়ার রীতি-বর্জনকে) তিনি আমাদের মন জয় করে নিতেন। তারপর থেকে তিনি ছিলেন সদা ছাত্রানাং হৃদয়ে সন্নিবিষ্টঃ। লেকচার-স্ক্রিপ্ট বলতে তাঁর সঙ্গে থাকত এক চিলতে কাগজ। সাইজে ভিজিটিং কার্ডের মত। আমাদের তিনি কী কী বলবেন তা ঐ কাগজে আঁকিবুকিতে লেখা থাকত। বিষয়বস্তুর সব কিছু স্বয়ং ধীরে

ধীরে বিকশিত করে তুলতেন। ফলে তাঁর কাজের টেকনিক সম্পর্কে আমরা বেশ কিছুটা অন্তর্দৃষ্টি লাভ করতাম।

"কায়দা-দুরস্ত বক্তৃতার তুলনায় এ ধরনের লেকচার আমরা খুব পছন্দ করতাম। আর হৃদয়গ্রাহিতার দিক থেকে এগুলোর আবেদন ছিল সুগভীর। কিন্তু অস্বীকার করব না, একটা বেদনার দিকও ছিল। তা হল : বেশ বুঝতে পারতাম যে, যারা শুনছে সেই ছাত্র ও আর যিনি বলছেন সেই শিক্ষকে বোধির দিক থেকে রয়েছে একটা দুস্তর ব্যবধান— 'great gulf'। বৈজ্ঞানিক ফলাফলের প্রাথমিক প্রাপ্তি কি ভাবে ঘটে সেই চূড়ান্ত ব্যক্তিক-পদ্ধতিও তাঁর বক্তৃতা থেকে আমরা আবছা আবছা বুঝতাম। আর প্রতিটি লেকচারের শেষে মনে হত ওগুলো ত আমরা নিজেরাই করতে পারতাম। তা ছাড়া, সবচেয়ে বড় সুবিধে ছিল কোন অংশ বুঝতে না পারলে বক্তৃতার মাঝেই তাঁকে জিজ্ঞেস করা চলত। কিছুদিন পরে অবশ্য এই ভেবে সবাই কেমন ভীত হয়ে পড়লাম যে, পাছে বোকার মতো কোন প্রশ্ন করে ফেলি! আর সেই থেকে বক্তৃতার মাঝে তাঁকে প্রশ্ন করাও আমাদের বন্ধ হয়ে গেল। তবে বিরতির সময় সর্বদা আমরা তাঁকে নিজেদের মধ্যে পেতাম। স্বাভাবিক আবেগে তিনি আমাদের দু-এক জনকে অত্যন্ত বন্ধুভাবে জড়িয়ে ধরতেন আর বিষয়বস্তু নিয়ে ক্রমাগত আলোচনা করে চলতেন।

"১৯০৯-১৯১১ : এ সময়ে আইনস্টাইনের সব ক'টি বক্তৃতায় আমি উপস্থিত ছিলাম। প্রতিটি বক্তৃতা ছিল সমান হৃদয়গ্রাহী। মনে পড়ে (অবশ্য স্মৃতি যদি আমায় না ঠকায়) আমরা সবাই তাঁর সামগ্রিক বক্তব্য পুরোপুরি গ্রহণ করতে পারতাম। কখন কখন কেউ হয়ত ক্লাসিকাল বলবিদ্যার কোন প্রশ্নের অবতারণা করল। বিষয়টি অন্য শিক্ষকের কাছে আমরা আগেও পড়েছি। কিন্তু আইনস্টাইন যখন তা নিয়ে আবার আলোচনা করতেন, তখনই প্রথম উপলব্ধি করতাম যে, বিষয়বস্তুর অনালোচিত (কাজেই অনালোকিত) আরও

অনেক দিক রয়েছে। অন্যান্য বিষয়েও আইনস্টাইনের আলোচনা মনে হত যেন এক একটা সম্পূর্ণ নতুন থিসিস। আর আমরাও হাঁ-করে সাগ্রহে তা শুনতাম। যেমন বহু-আলোচিত 'প্লাঙ্কের কোয়ান্টাম বলবিদ্যা'।

"যতদূর মনে পড়ে, সারা টার্মের মধ্যে, পড়াতে গিয়ে আইনস্টাইন একবারই শুধু আটকে গেছিলেন। বক্তৃতার মাঝখানে হঠাৎ থেমে গিয়ে বললেন—'There must be some silly mathematical transformation which I can't find for the moment. Can one of you, gentlemen, see it?' স্বভাবত আমরা কেউ-ই পারলাম না। বললেন—"ঠিক আছে, সিকি পৃষ্ঠা মত বাদ রেখে দাও। সময় নষ্ট করব না। উত্তরটা হল এই··"। মিনিট দশেক পরে হঠাৎ বক্তৃতার মাঝে নিজেই আবার থেমে গেলেন। বললেন—'I've got it.'। যে জটিল বিষয়বস্তু ধীরে ধীরে তিনি আমাদের কাছে বিকশিত করে তুলছিলেন তার মাঝে একই সঙ্গে তাঁর মন সেই বিশেষ গাণিতিক রূপান্তরণ বা transformation-এর ব্যাপারটা নিয়েও চিন্তা করছিল। এই হলেন আইনস্টাইন, এক্ষেত্রে একা, একেবারে একা, অনন্য আইনস্টাইন।

"কিন্তু তাঁর সঙ্গে আমরা সম্পূর্ণ ঘনিষ্ঠ হয়ে পড়তাম আলোচনার সময় এবং আলোচনার পরে। এটা ঘটত সপ্তাহে একবার—সন্ধ্যে আটটা থেকে রাত দশটা। যে কোন একটা বিষয় নিয়ে ছাত্রদেরই আলোচনার সূত্রপাত করতে হত। কিন্তু আমাদের জ্ঞানের দীনতা সম্পর্কে তিনি কিছুতেই সচেতন হতে দিতেন না। শেষে বলতেন: 'আমার সঙ্গে কে কে 'কাফে টেরাসে' যাচ্ছ?' সেখানে গিয়ে আবার চলত ঐ আলোচনা।

"শুরু হত পদার্থবিজ্ঞান আর গণিত দিয়ে। তারপর ক্রমে ক্রমে তা মোড় নিত অন্যান্য নানা বিষয়ের দিকে। একবার আলোচনাকালে কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে তিনি আমার উদ্দেশে মন্তব্য করলেন—

'মনে হচ্ছে তুমি দ্বিধাগ্রস্ত শিক্ষাবিদ ফ্রেডরিখ ভিলহেলম ফয়র্স্টারের খপ্পরে পড়েছ।'

"কি করে জানলেন, হের প্রফেসর?"—আমি উত্তর দিলাম।

'আমার বন্ধু, আর তোমার শিক্ষক, মার্শেল গ্রসমানের কাছ থেকে।'

"ফয়র্স্টারকে আপনি দ্বিধাগ্রস্ত শিক্ষাবিদ বলছেন কেন? আপনি কি ব্যক্তিগতভাবে তাঁকে জানেন? বা আপনি কি তাঁর কোন লেখা পড়েছেন? সত্যি কথা বলতে কি, একজন চমৎকার শিক্ষক এবং সাহসী ব্যক্তি হিসেবে আমি তাঁকে শ্রদ্ধা করি।"

"একথা শুনে তিনি বললেন—'তুমি কি ওঁর কোন লেখা আমায় পড়াতে পার?'

"এই অপ্রয়োজনীয় ঘটনাটি প্রমাণ করে যে, কোন মতামতকে তন্নিষ্ঠ দৃষ্টিভঙ্গিতে যাচাই করতে তিনি সর্বদা প্রস্তুত ছিলেন, তা সে যত অপরিপক্ক ছাত্রের কাছ থেকেই আসুক না কেন। অধ্যাপক এফ. ডব্লিউ. ফয়র্স্টার প্রাশিয়ান জঙ্গীবাদের বিরুদ্ধে বছরের পর বছর অকুতোভয়ে সংগ্রাম করেছেন এবং বর্তমানে নিউইয়র্কে দুঃখ ও দারিদ্র্যের মধ্যে দিন কাটাচ্ছেন।

"আরো একটা অভিজ্ঞতার কথা বলি। একদিন বেলেভিউপ্লাজ-এ এক কাফে-তে আমরা অনেকক্ষণ বসে আলোচনা করছি। ওদিকে কাফে বন্ধ হবার সময় হয়ে এসেছে। কাফে ছেড়ে বেরুচ্ছি এমন সময় আইনস্টাইন বললেন: 'কেউ কি আমার সঙ্গে আমার বাড়ি যাবে? আজ সকালে প্লাঙ্কের কাছ থেকে একটা গবেষণাপত্র পেয়েছি। ওটায় অবশ্য কোথায়ও একটু ভুল আছে। আমরা তা হলে এক সঙ্গে ওটা পড়তাম।' শুনে আমি ও আমার বন্ধু কার্ল গল তাড়াতাড়ি চললাম আমাদের মহামান্য শিক্ষকের সঙ্গে জুরিখবার্গে তাঁর বাড়ি।

"নিজের ঘরে ঢুকে উনি প্লাঙ্কের প্যামপ্লেটখানা আমাদের পড়তে

দিয়ে বললেন—'দেখ ত, ভুল খুঁজে পাও কিনা! ততক্ষণ আমি কফি তৈরি করে আনি।'

"কী মনঃসংযোগ আর উচ্চাকাঙ্ক্ষা নিয়েই না আমরা কাজে মন দিলাম। মিনিট পনের পরে ধূমায়িত কফির ট্রে নিয়ে গৃহস্বামী এলেন এবং জিজ্ঞেস করলেন—

'কি হল, ভুল খুঁজে পেয়েছ?'

"আমি বললাম—'হের প্রফেসর, বোধ হয় আপনারই ভুল হচ্ছে। কাজটিতে কোন ভুল নেই।'

'হ্যাঁ, নিশ্চয়ই আছে। কেননা তা না হলে এটা আর এটা, ওটা আর ওটা হত।'

"তিনি আমাদের যা বললেন তা হল মাত্রা-সংক্রান্ত (dimensions) একটা সাধারণ তথ্য। সেটিই তাঁর জোরালো পয়েন্ট। ফর্মুলার পশ্চাৎপটের ভৌত-বিষয়বস্তুকে তিনি তৎক্ষণাৎ ধরে ফেলেছিলেন। আর আমরা ওটা দেখছিলাম নেহাত একটা বিমূর্ত ফর্মুলা হিসেবে। পাঁচ মিনিট পরে ব্যাপারটা বুঝতে পেরে আপশোষে মাথা চুলকাতে লাগলাম। কী আহাম্মক আমরা! ভুলের উৎসটাই ধরতে পারলাম না!

"আমি বললাম—'তা হলে বার্লিনে প্রফেসর প্লাঙ্ককে চিঠি লিখে তাঁর ভুলের কথাটা জানিয়ে দি।'

'আইডিয়াটা মন্দ নয়। তবে, উনি ভুল করেছেন এমন কথা আমরা লিখব না। রেজাল্টটা ত শুদ্ধ। ত্রুটি শুধু প্রমাণটায়। আমরা কেবল লিখব সঠিক প্রমাণটা কি রকম হবে। আসল কথা হচ্ছে—বিষয়বস্তু, অঙ্ক নয়। অঙ্কে ত সব কিছুই প্রমাণ করা যায়।' এই ছিল অঙ্কের প্রতি তাঁর মনোভাব।

"বিজ্ঞান বিষয়ের প্রদর্শক হিসেবেও তিনি ছিলেন অননুকরণীয়। আজও মনে পড়ে, মাত্র কয়েকটি কথা আর ভাস্করসুলভ ভঙ্গিমায় কী সুন্দরভাবেই না বুঝিয়ে দিয়েছিলেন যে, সময়-ও আপেক্ষিক! বুঝিয়ে-

ছিলেন যুগপত্তা-র বস্তুনিষ্ঠ অস্তিত্ব এবং দ্রষ্টার গতির উপর অতিক্রান্ত সময়-এর নির্ভরশীলতা। আমার মতে, বিজ্ঞানী হিসেবে এখানেই আইনস্টাইনের বিরাটত্ব। ট্রাডিশনের বাঁধা পথ ছেড়ে যে কোন সমস্যার মুখোমুখি হওয়ার ক্ষমতা ছিল তাঁর অসাধারণ। এবং এটি তিনি করতেন সমালোচনা করে আনন্দ পেতে নয়—বুঝবার ব্যক্তিগত প্রয়োজন থেকে এবং সব কিছু সুষ্ঠুভাবে ব্যাখ্যার নিছক তাগিদে। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে যে সব ধ্যান-ধারণা সত্য বলে চলে আসছিল তিনি এভাবে অনায়াসে তাদের বর্জন করতে পেরেছিলেন।

"আমার সঙ্গে আইনস্টাইনের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ঘটে ডক্টরেট-এর বিষয়বস্তু নির্বাচন নিয়ে। আইনস্টাইন জুরিখে আসার আগে অন্যান্য শিক্ষকদের সঙ্গে পরীক্ষামূলক কিছু কিছু কাজ আমি করেছিলাম। কিন্তু উনি বিশ্ববিদ্যালয়ে লেকচার দিতে শুরু করলে ঐ সব কাজ করার উৎসাহে আমার ভাঁটা পড়তে থাকে। বিষয়বস্তুর নির্বাচন ব্যাপারে একদিকে দেখলাম প্রত্যেকের ব্যক্তিগত গুণপনার প্রতি তাঁর কী গভীর শ্রদ্ধা, আর অন্যদিকে প্রমাণ পেলাম সমগ্র বিজ্ঞান ক্ষেত্রে তাঁর কী অনন্যসাধারণ দখল! অন্য শিক্ষকদের সম্পর্কে এ কথা ভাবাই চলে না। অন্যান্য অধ্যাপকেরা শুধু নিজ নিজ বিশেষ ক্ষেত্র থেকে বিষয়বস্তু নির্বাচন করে দিতেন। আর আইনস্টাইন পছন্দ করে নেওয়ার জন্য আমার কাছে এক তাড়া বিষয়বস্তু উপস্থিত করে সেগুলো নিয়ে ক্লাশে আলোচনা করলেন। সব শেষে বললেন—'I think you could have a try at that. Something interesting is sure to come out of it'। আমার বিশ্বাস, তিনি প্রথমে নিশ্চিতভাবে বুঝতে চাইছিলেন আমার পক্ষে কোন্‌টা সবচেয়ে সুবিধাজনক হবে।

"ছুটি শুরু হওয়ার কিছুদিন আগে তিনি প্রাথমিক পড়াশোনার জন্য আমায় একটা গ্রন্থপঞ্জী দিলেন। তারপর কিছুদিন আমি ইচ্ছে করে তাঁর সঙ্গে দেখা করলাম না। হঠাৎ একদিন রাস্তায়

দেখে আমায় কাছে ডাকলেন। জিজ্ঞাসা করলেন—'কিহে, পড়াশোনা কেমন চলছে ?'

"হের প্রফেসর, ও বিষয়ে কাজ করা আমার মত বোকার দ্বারা হবে না। আমি ওর বিন্দু-বিসর্গ কিছুই বুঝতে পারছি না।

'এস, আমার সঙ্গে চল দেখি। অনেক আগেই আমার কাছে আসা উচিত ছিল। জান, কখন কখন অতি সামান্য ব্যাপারও আটকে যায়। আমার কাছে এলে তখুনি হয়ত ওটা বুঝিয়ে দিতে পারতাম। আর বোলৎজমানের যে বইটা তোমায় পড়ার জন্য সুপারিশ করেছিলাম ওটা বেশ কঠিন। অনেক বড় বড় পদার্থবিদও পড়ে বুঝতে পারেন না।' আমি বেশ বুঝলাম যে, এভাবে তিনি আমায় উৎসাহ দিচ্ছিলেন।

"পরদিন তাঁর বাড়ি গেলাম। তিনি তখন পড়ার ঘরে বসে। সামনে গাণিতিক ফর্মুলার নামাবলীতে মোড়া একগাদা কাগজপত্র। ডান হাতে কী যেন লিখছেন। বাঁ হাত দিয়ে ধরে আছেন ছোট ছেলে এডুয়ার্ডকে। আর অদূরে বড় ছেলে আলবার্ট ইট নিয়ে খেলছিল—মাঝে মাঝে তার প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছিলেন। 'মিনিট কয়েক অপেক্ষা কর, প্রায় শেষ করে এনেছি'—এই বলে তিনি ছেলে দুটিকে কিছুক্ষণ আমার জিম্মায় রেখে কাজ করতে লাগলেন। তাঁর মনঃসংযোগ করার অপূর্ব ক্ষমতার সামান্য এক ঝলক পরিচয় লাভের সৌভাগ্য হল।

"আমার থিসিস যখন প্রায় অর্ধেক শেষ করে এনেছি—বিষয়বস্তু : গ্যাসের গতিকতত্ত্ব—তখন আইনস্টাইনের ডাক এল প্রাগ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। তাঁর সহকারী হিসেবে আমায়ও তিনি সঙ্গে যেতে অনুরোধ করলেন। ওখানে সহকারীর দক্ষিণা ছিল নেহাত সামান্য। যেহেতু আমি অতি অল্প বেতনে কাজ করতাম এবং পড়াশোনার খরচ নিজেকে চালাতে হত সেজন্য বাধ্য হয়ে, দুঃখিত অন্তরে, তাঁর আমন্ত্রণকে উপেক্ষা করতে হল।

"কয়েকদিন পরে নিজেই আমাকে তাঁর বাড়িতে ডাকলেন। বললেন—'তোমার জন্য আমি একটা ব্যবস্থা করেছি। বাস্‌লে-তে অধ্যাপক হাগেনবাখ একজন সহকারী খুঁজছেন। যাও, এখুনি প্রফেসর ক্লাইনারকে গিয়ে বল।'

"কয়েকদিন পরে রাস্তায় আবার আমাদের দু-জনের দেখা। বললেন—'সব কিছু ঠিক আছে, ত।'

"না। সব গোলমাল হয়ে গেছে। হাগেনবাখ এমন একজন সহকারী খুঁজছেন যিনি ইতিমধ্যে পি. এইচ. ডি. করেছেন এবং পরীক্ষামূলক কাজে বেশ দক্ষ। আমার ত কোনটাই নেই।

'ওতে কিছু অসুবিধা হবে না' —বললেন আইনস্টাইন। 'শোন, এটা কিন্তু তোমায় পেতেই হবে। এই হল তোমার পক্ষে ঠিক কাজ। না হলে তোমারও আমার দশা হবে। পাছে ভেঙ্গে যায় ভয়ে কোনদিনই যন্ত্রপাতি নাড়াচাড়ার সাহস হল না।'

"কিন্তু ছাত্রদের যা কিছু দেখাতে হবে তার সব ত আমি এখনও করে উঠিনি।

'সেটা মোটেই জরুরী নয়। তোমায় শুধু ভাবতে হবে : এটা যদি আমি দেখে নি, তা হলে করেও দেখাতে পারব।'

"উনি দ্রুতপদে আমায় নিয়ে কাছেই একটা স্টেশনারী দোকানে চললেন। সেখান থেকে কাগজ আর খাম কিনলেন এবং আমরা দু-জনে চললাম পোস্টাফিসের উদ্দেশে। উনি তখুনি বাস্‌লে-তে অধ্যাপক হাগেনবাখকে একটা চিঠি লিখে ডাকে ফেললেন। কি লিখেছিলেন আমি জানি না। কিন্তু তিন দিনের মধ্যে চাকরিটা আমি পেয়ে গেলাম। তাঁর সুপারিশ সত্ত্বেও যা আশঙ্কা করে-ছিলাম তাই ঘটল। বাস্‌লে-তে আমি সব কিছু গোলমাল করে ফেললাম এবং ডক্টরেটের ব্যাপারটাও কিছুদিনের জন্য পেছিয়ে গেল। অবশ্য ওটা আমার জুটে গেল খুব সহজে। কেননা আইনস্টাইন আমায় বিষয়টিতে তালিম দিয়ে ভালভাবে প্রস্তুত

করে দিয়েছিলেন।

"বাসলে বিশ্ববিদ্যালয়ে এমন কোন শিক্ষক ছিলেন না যিনি আমার কাজের বিচার করতে পারেন। তাই আমায় বলা হল ওটা প্রাগে আইনস্টাইনের কাছে পাঠাতে। ওটা পেয়ে অধ্যাপক (আইনস্টাইন) ত খুব সন্তুষ্ট। কারণ তিনি ভেবেছিলেন আমি বুঝি গবেষণার কাজকর্ম একেবারে ছেড়ে দিয়েছি। সামান্য কিছু পরিশিষ্ট যোগ করার উপদেশ দিয়ে ওটাকে থিসিস হিসেবে জমা দিতে বললেন। কিন্তু জুরিখ থেকে উনি চলে যাওয়ার পর বৈজ্ঞানিক গবেষণায় আমার উৎসাহ ক্রমশ কমে আসে। এবং শেষ অবধি আমি স্কুলশিক্ষক হওয়ার সিদ্ধান্ত করে ফেলি।

"আমি যখন এই সিদ্ধান্তের কথা তাঁকে জানিয়ে সাগ্রহে উত্তরের অপেক্ষা করছি তখন উনি লিখলেন—'There were plenty of good physicists but far too few capable teachers. If ever I wanted a recommendation I had only to approach him. He himself had only got on through recommendations.'

"কথাগুলো কিন্তু শূন্যগর্ভ শব্দমাত্র ছিল না। ১৯১৮ সালে এক সহকর্মী মারফত মনোমত একটা চাকরির সংবাদ পেলাম। কিন্তু পেলাম এমন সময় যে, আর আইনস্টাইনের কাছ থেকে সুপারিশ আনার সময় নেই। চাকরির কথাটা জানলাম একেবারে আবেদন করার শেষ দিনে। পরে ওঁকে আমি একটা চিঠি দিলাম। লিখলাম যে, আমার দক্ষতা সম্পর্কে কেউ জানতে চাইলে তিনি যেন আমার হয়ে সুপারিশ করেন। পরে জেনেছিলাম, আইনস্টাইন তৎক্ষণাৎ বার্লিন থেকে সিলেকশান বোর্ডের কাছে এই মর্মে টেলিগ্রাম করেন যে, তাঁরা যেন আমার সম্পর্কে লেখা তাঁর চিঠি পৌঁছান পর্যন্ত সিদ্ধান্ত নেয়া থেকে বিরত থাকেন। অন্যকে সাহায্যের জন্য এই 'undemonstrative readiness' বা বে-জাহির ব্যগ্রতা আইনস্টাইন চরিত্রের অন্যতম

বৈশিষ্ট্য। বছর কয়েক পরে একবার পদার্থবিদদের এক সম্মেলনে (Congress of Physicists) দেখলাম তিনি কয়েকজন অত্যন্ত বিশিষ্ট বিজ্ঞানীর সঙ্গে আলাপ করছেন। আমায় দেখতে পেয়ে তৎক্ষণাৎ ছুটে এলেন এবং বগলদাবা করে নিয়ে গেলেন ঐ সব বিশিষ্ট ব্যক্তিদের কাছে। পরিচয় দিতে গিয়ে বললেন—'This is my first and only successful Swiss candidate for a doctorate.'। ডক্টরেটের জন্য আমার প্রথম ও একমাত্র সফলকাম সুইস ছাত্র ।

নুরেমবার্গের ডঃ লাডউইগ হপফ ছিলেন আইনস্টাইনের সহকারী। মহদাশয় এই ভদ্রলোক অধ্যাপক আর্নল্ড সোমারফেল্ডের কাছে গ্র্যাজুয়েট হন এবং যতদিন সোমারফেল্ড জীবিত ছিলেন ততদিন তাঁর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রাখতেন। সোমারফেল্ডের প্রতি আইন-স্টাইনের ছিল প্রগাঢ় শ্রদ্ধা। এই সোমারফেল্ডের উৎসাহে হপফ ১৯০৯-র শরৎকালে সালজবুর্গের Natural Science Congress-এ যোগ দেন। এখানে দুই নবীন গবেষক—হপফ ও আইনস্টাইন—পরস্পর বন্ধুত্ববন্ধনে আবদ্ধ হন এবং এর পরিণতি জুরিখে এঁদের সম্মিলিত গবেষণা। ১৯১০-এ এঁরা বিকিরণ তত্ত্বের উপর যুগ্ম গবেষণা প্রকাশ করলেন Annalen der Physics পত্রিকায়। হপফ শুধু যে, একজন দক্ষ গণিতজ্ঞ ছিলেন তা নয়, খুব ভাল পিয়ানোও বাজাতেন। তাই কাজের পরেও উভয়ের মিলন ঘটত সঙ্গীতের আসরে।

এ সময় আইনস্টাইন কাগজে-কলমে দৃপ্ত দ্বন্দ্বযুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছেন তাঁর বিভিন্ন সহকর্মীর সঙ্গে। অন্যান্য অনেকের মধ্যে ছিলেন প্লাঙ্ক, নার্নস্ট, স্টার্ক এবং ম্যাক্স আব্রাহাম। এই শেষোক্ত বিজ্ঞানী ম্যাক্সওয়েলের তড়িৎতত্ত্বকে পূর্ণতা দেন এবং বিশেষ করে গতিশীল ইলেকট্রনের সমস্যা ও চলমান দর্পণে আলোর প্রতিফলন নিয়ে গভীর গবেষণায় প্রভূত খ্যাতি অর্জন করেন। আব্রাহাম ছিলেন প্লাঙ্কের ছাত্র এবং পরবর্তীকালে তাঁর সহকারী। জুরিখের ঐ ছোট্ট বাড়িতে

আইনস্টাইন এঁর সঙ্গে বহু রাত কাটিয়ে দিয়েছেন আলোচনা আর আলোচনায়। এ সময় একবার তিনি হপফ-কে লেখেন—"He himself strongly opposes the theory of gravitation in the static field."

অধ্যাপক হয়েও কিন্তু আইনস্টাইন বরাবরের মত লৌকিকতার আচরণমুক্ত উদার মানুষই রয়ে গেলেন। ১৯১০-এর ২৮শে জুলাই তাঁর দ্বিতীয় ছেলে এডুয়ার্ডের জন্ম হয়। দ্বিতীয় পুত্রসন্তান লাভে আইনস্টাইন ও মিলেভা উভয়েই খুব খুশি। কিন্তু ছেলের জন্য ত দোলনা চাই। খোঁজ পড়ল পুরণোটির। 'আলবার্ট, দোলনাটা খুঁজে বের কর দেখি। আমার কিন্তু ঠিক মনে আছে, এখানে আসার সময় ওটা আনা হয়েছিল। চিলেকোঠাটা একবার খুঁজে দেখো। ওটাকে ওখানেই পাবে।'

সরু সিঁড়ি বেয়ে আলবার্ট চিলেকোঠায় উঠলেন। মিলেভার কথাই ঠিক। দোলনা ওখানে পাওয়া গেল। কিন্তু শত চেষ্টাতেও দোলনার তোশক খুঁজে পেলেন না আলবার্ট। শুধু দোলনাটা স্ট্যাণ্ডে খাটিয়ে দিলেন শোবার ঘরে। বললেন— 'Here's the bare bones, but no matress.'

ঘরকন্নার এ সব কাজ মিলেভার পছন্দ নয়। দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন—'তা হলে আমায় একটা নতুনই করিয়ে নিতে হবে! আলবার্ট, কাল কিছু পশমের ছাট এনে দেবে ত। পুরণো বালিশের ওয়ারে কভার করে নেব।'

'ঠিক আছে! দশটার লেকচার আর এগারটার লেকচারের মাঝের সময়টুকুতে কিনে নেব।'

পরদিন সকাল সাড়ে দশটা নাগাদ দেখা গেল শ্রমিকের পোশাকের মতো গাঢ় নীল রঙের শার্ট গায়ে জুরিখের বড় রাস্তা দিয়ে আইনস্টাইন চলেছেন, পিঠে পশমের ছাটের বস্তা। বন্ধু ফ্রেডরিখ চলেছে তাঁর সংবাদপত্র অফিসে, আলবার্টকে ছাড়িয়ে চলে গেল, চিনতেই পারল না।

"হেই ফ্রেডরিখ"—চীৎকার করে উঠলেন আলবার্ট। "Are you blind ? Or are you thinking about politics ?"

ডাক শুনে ফ্রেডরিখ থামলেন, একবার আইনস্টাইনের দিকে তাকিয়ে একেবারে হাসিতে ফেটে পড়লেন। বললেন— "অধ্যাপক আইনস্টাইন, ক্ষমা করো, ভাই। আমি তোমায় কাগজ-কুড়ুনে বলে ভুল করেছিলাম। দেখো, ছেলেরা আবার না দেখে ফেলে। তবে আর তোমায় সম্মান করবে না।"

ঘটনাটা মিলেভাকে বলতে বলতে উত্তেজিত হয়ে আইনস্টাইন চীৎকার করে উঠলেন—"কেন, কেন সম্মান করবে না! Must a professor always be dressed like a peacock ? Does it affect his brain ?

যখন বাড়ি বদলাতেন, যৌবনেই হোক বা বেশি বয়সেই হোক, নিজের আসবাবপত্র টানাগাড়ি করে নিজেই বয়ে আনতেন।

বুদ্ধিগত চিত্তবিনোদনের জন্য তিনি প্রায়ই একটি কাফে-তে বন্ধুদের খোঁজ করতেন। একদিন বিকেলে জেনিভার গুস্তাভ ফেবিয়ারের সঙ্গে তিনি গণিত নিয়ে আলোচনা করছেন। আলোচনাকালে গণিতের অনমনীয় নিয়মাদি সম্পর্কে তাঁর অনাস্থার কথা তিনি অত্যন্ত দৃঢ়ভাবে জানাচ্ছিলেন। টেবিলের উপর পরপর পাঁচটি ম্যাচকাঠি সাজিয়ে জিজ্ঞেস করলেন—"যদি প্রতিটি কাঠির দৈর্ঘ্য আড়াই ইঞ্চি হয় তা হলে এই পাঁচখানা কাঠির মোট দৈর্ঘ্য কত হবে ?" ফেবিয়ার তৎক্ষণাৎ উত্তর করলেন—"কেন, সাড়ে বার ইঞ্চি !" আইনস্টাইন বললেন—"ও তো আপনি বললেন! আমার কিন্তু এতে যথেষ্ট সন্দেহ আছে।" Car moi, je ne crois pas a la mathematique…….

একদিন সন্ধ্যায় তিনি সাইকোথেরাপিস্ট অধ্যাপক ডঃ কার্ল গুস্তাভ জুং-এর লেকচার শুনে ফিরলেন। লেকচার তাঁর মোটেই ভাল লাগেনি। কিন্তু হপফ মারফৎ একদিন এই "explorer of the unconscious"-এর বাড়ি গিয়ে তিনি সাক্ষাৎ করলেন। প্রকৃতিগত

দৃঢ়তা সত্ত্বেও হপফ ছিলেন মনঃসমীক্ষণ-এর একজন বিশিষ্ট সমর্থক। জুং তখনও আন্তর্জাতিক খ্যাতি অর্জন করেন নি। পরবর্তীকালে তিনি একবার বলেন—"অধ্যাপক আইনস্টাইন বেশ কয়েকবার এ বাড়িতে ডিনারে এসেছেন। একবার ডিনারে ডঃ অ্যাডলফ কেলার এবং আর একবার বিখ্যাত মনঃসমীক্ষক এবং আমার প্রাক্তন প্রধান অধ্যাপক ইউজেন ব্লিউলার উপস্থিত ছিলেন। এ হল সেই সময়ের কথা যখন আইনস্টাইন তাঁর প্রথম রিলেটিভিটি থিয়োরী-কে বিকশিত করে তুলছেন। তিনি আমাদের কাছে তাঁর তত্ত্বের মূলকথা ব্যাখ্যা করছিলেন। আমরা গণিত-না-জানা মনঃসমীকক্ষের দল। কাজেই তাঁর যুক্তিগুলো অনুধাবন করা খুব মুস্কিল হচ্ছিল। অবশ্য যা বুঝেছিলাম প্রভাবিত হবার পক্ষে তাই যথেষ্ট ছিল। বস্তুত, তাঁর চমৎকার দীপ্যমান চিন্তাশক্তির সারল্য এবং সততা আমায় মুগ্ধ করল এবং আমার নিজস্ব চিন্তাধারাও বহুলাংশে প্রভাবিত হয়ে পড়ল। দেশ-কালের সম্ভাব্য আপেক্ষিকতা এবং মনের উপর তার নির্ভরশীলতার কথা আইনস্টাইনই প্রথম আমায় ভাবতে উৎসাহিত করেন।

"এই প্রেরণার ফলে, তিরিশ বছরেরও অধিক কাল পরে, বিশিষ্ট পদার্থবিজ্ঞানী ওলফগ্যাং পাওলি-র সঙ্গে আমার যোগাযোগ ঘটে এবং আমার Psychic Synchronization তত্ত্বের উদ্ভব হয়। আইনস্টাইন জুরিখ ছাড়লে তাঁর সঙ্গে আমার সম্পর্কেরও ইতি ঘটে। মনে হয় না তিনি আমায় আর মনে রেখেছিলেন। সে যা হোক, গণিতজ্ঞ এবং মনোবিদদের ধ্যান-ধারণার বৈপরীত্যের চেয়ে বেশি বৈপরীত্যের কথা সম্ভবত কেউ ভাবতে পারেন না। একটির অবস্থান পরিমাণগত ক্ষেত্রের সর্বোচ্চ বিন্দুতে, আর অন্যটি হল গুণগত ক্ষেত্রের শেষ কথা।"

এ সময় আইনস্টাইন আর যাঁর সঙ্গে গভীর বন্ধুত্বে আবদ্ধ হন তিনি হলেন 'গ্যাস ও স্টীম টারবাইনের জনক' লরেল স্টোডোলা।

তত্ত্বীয় ও প্রায়োগিক এঞ্জিনিয়ারিং-এর প্রধান অধ্যাপকের পদ থেকে ১৯২৯-এ স্টোডোলা অবসর গ্রহণ করেন। আইনস্টাইন তখন এক পত্রিকায় কৃতজ্ঞচিত্তে তাঁর উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধা জানিয়ে লিখেছিলেন :

"স্টোডোলা যদি রেনেসাঁর যুগে জন্মাতেন তা হলে হয় এক মহান চিত্রকর নয়ত ভাস্কর হতেন। কারণ, কল্পনা এবং সৃষ্টিধর্মী প্রতিভাই ছিল তাঁর ব্যক্তিত্বের চালিকাশক্তি। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে এ রকম ব্যক্তিরাই সাধারণত বিজ্ঞানের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছেন। এ ক্ষেত্রেই এ যুগের সৃষ্টির আকুতি সবচেয়ে শক্তিশালীরূপে প্রকাশ পেয়েছে। এবং সাধারণ লোকে যা মনে করেন তার চেয়েও বেশি অভিপ্রকাশের সুযোগ পেয়েছে আবেগচঞ্চল সৌন্দর্যচেতনা। বহু বছর ধরে সফলকাম শিক্ষকরূপে তিনি তাঁর ছাত্রদের মধ্যে মহৎ ভাবপ্রবণতা সঞ্চারিত করেন। যখনই তাঁর কথা বা কাজের উল্লেখ করা হত তখন তাঁর ছাত্রদের কারো চোখ আনন্দে স্ফুলিঙ্গায়িত না হয়ে থাকতে পারত না।

"সৃষ্টিধর্মী প্রতিভা যদি এ কাজের প্রধান উৎস হয়, তা হলে অন্যদিকে তার শক্তিটি নিহিত ছিল জ্ঞানের জন্য অতৃপ্ত বাসনা আর বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারার অসাধারণ স্পষ্টতায়। জুরিখ বিশ্ববিদ্যালয়ে তত্ত্বীয় পদার্থবিজ্ঞানের নবনিযুক্ত শিক্ষকরূপে এ পংক্তি ক'টির লেখক যখন তাঁর লেকচার কক্ষে লম্বা লম্বা পদক্ষেপে দীর্ঘদেহী মহান স্টোডোলাকে প্রবেশ করতে দেখতেন—অংশত বিজ্ঞানের এ শাখার বিকাশ সম্পর্কে পরিজ্ঞাত হতে আর অংশত জ্ঞানান্বেষণ এবং যা জানা আছে তার মূল্যায়নে—তখন একদিকে তিনি যেমন খুব খুশি হতেন তেমনি সেই সঙ্গে স্বাভাবিক কারণে ভীত হয়ে পড়তেন। সহকর্মীর বক্তৃতা শেষে স্টোডোলা এমন সব গূঢ় প্রশ্ন করতেন যা ছিল আলোচ্য বিষয়বস্তুর সঠিক ও প্রাণবন্ত সমালোচনা।

"তাঁর সঙ্গে আলোচনায় যদি কোন কিছু আলোচনাকারীকে পীড়িত করত, তা হল স্টোডোলা চরিত্রের গভীরে প্রোথিত বিনয়নম্রতা।

মেজাজের কোমলতা এবং মৃদুতার সঙ্গে তাঁর মনের শক্তি এবং নমনীয়তা কেমন একটা অদ্ভুত বৈপরীত্যে যুক্ত ছিল। জীবকুলের যন্ত্রণা তাঁকে অত্যন্ত পীড়িত করত। বিশেষ, মানুষ নিজেই যেখানে এ যন্ত্রণার কারণ। আমাদের যুগের সামাজিক সমস্যা সম্পর্কে তিনি গভীরভাবে সচেতন ছিলেন। এক নিঃসঙ্গ ব্যক্তিরূপে, সমস্ত ব্যক্তিতাবাদীর মতো তিনিও মানুষের উপর মানুষ যে ভয়ঙ্কর নিপীড়ন চালায় সেজন্য একটা দায় অনুভব করতেন। এবং সাধারণের শোচনীয় অবস্থার প্রতিকার করার অক্ষমতা তাঁকে খুবই পীড়া দিত। অসাধারণ সফলকাম এবং ছাত্রপ্রিয় এই জ্ঞানপ্রবরের সংবেদনশীলতা তাঁকে আরও বেদনাদায়কভাবে নিঃসঙ্গ করে তুলেছিল।

"যা হোক, তাঁর সমৃদ্ধি ও প্রাচুর্যময় প্রকৃতি তাঁকে এর ফলে অনেক কিছু পাইয়েও দিয়েছে। প্রতিদানে তিনি পেয়েছেন সঙ্গীতের প্রতি তাঁর ভালবাসা জিইয়ে রাখতে, আর দুই কন্যার উপর মমতাময়ী বাৎসল্য ঢালতে। নিজ হৃদয়কন্দরের সব ঐশ্বর্য তিনি দুই মেয়ের উপর বিলিয়ে দিয়েছিলেন। সম্প্রতি কন্যা হেলেনকে তিনি হারিয়েছেন। প্রচণ্ড শোকের মুহূর্তে যেভাবে তিনি মৃত্যু-সংবাদটি (obituary) লেখেন তা তাঁর বিরল আত্মিক সুষমাই প্রকাশ করে। বিস্ময়কর এ মানুষটির আত্মিক ঐশ্বর্য যেন দুঃখের সময়ই বিশেষভাবে প্রকাশ পেত।"

এ সময়ে আইনস্টাইন আর যাঁদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হন তাঁদের অন্যতম হলেন অধ্যাপক হারউইৎজ ও তাঁর পরিবার পরিজন। শান্ত প্রকৃতির এই দার্শনিক অধ্যাপক FIT-তে এসেছিলেন ১৮৯২-এ। এর আগে তিনি কনিংগসবার্গে চব্বিশ বছর বয়স থেকে অ্যাসোসিয়েট অধ্যাপক হিসেবে কাজ করতেন। অনুকরণযোগ্য স্পষ্টতা এবং যথাযথতার সঙ্গে তিনি এখানে ছাত্রদের ডিফারেন্সিয়াল ক্যালকুলাসের রহস্যমোচন এবং থিয়োরী অব ফাংশানের মূলনীতিতে দীক্ষা দিতেন। হারউইৎজের সঙ্গে আইনস্টাইনের প্রথম পরিচয়

FIT-তে ছাত্ররূপে।

বহু বছর দুরন্ত ও দুর্বিসহ বৃক্করোগে তিনি ভুগেছেন। কিন্তু তখনও বীরত্বের সঙ্গে চালিয়ে গেছেন তাঁর শিক্ষকতার কাজ। শেষ অবধি অবস্থা এমন হল যে, নিজের বাড়িতে সেমিনার নিতেন। গণিতের বহু শাখা তাঁর কাজে সমৃদ্ধ হয়েছে। সুযোগ পেলেই সামাজিক আমোদ-প্রমোদ থেকে তিনি পালিয়ে বাঁচতেন। সোজা চলে যেতেন বিশেষজ্ঞ সহকর্মীদের সঙ্গে সোৎসাহে ও সক্রিয়ভাবে বৈজ্ঞানিক সমস্যাদি নিয়ে বিতর্ক করতে। তাঁর ছিল প্রচণ্ড রসবোধ এবং সঙ্গীতপ্রীতি। সঙ্গীতকে দেখতেন গণিতের পরিপূরকরূপে। নিজেও খুব ভালো পিয়ানো বাজাতে পারতেন। প্রায়ই তাঁর বাড়িতে চেম্বার মিউজিক চলত। বর্তমান শতাব্দীর মুখে প্রায় প্রত্যহ ঐতিহাসিক স্টার্নের সঙ্গে হারউইৎজ-এর সাক্ষাৎ হত। একদিন স্টার্ন তাঁর কাছে মন্তব্য করেন—"হারউইৎজ, আপনি কি জানেন, পদার্থবিজ্ঞানের ছাত্রদের মধ্যে একজন খুব ভাল বেহালাবাদক আছে। তার নাম আলবার্ট আইনস্টাইন।" বছর কয়েক পরে আইনস্টাইন বার্ন থেকে সপরিবারে জুরিখ এলে দুজনে একত্রে প্রায় প্রতি রবিবার নিয়মিত সঙ্গীত চর্চা করতেন। আইনস্টাইন সাধারণত তাঁর স্ত্রী এবং দুই ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে আসতেন। হলে ঢোকামাত্র মন্তব্য শুনতে পেতেন—"Here comes Einstein with the whole chicken run." ঐ এলেন আইনস্টাইন, তাঁর ছানাপোনা সঙ্গে নিয়ে।

এ সময় আইনস্টাইন ছিলেন প্রকট নাস্তিক এবং সব রকম ধর্মীয় সমস্যার প্রতি পুরোপুরি উদাসীন। একদিন শান্তভাবে হারউইৎজ-কে বললেন—"কাল সার্বিয়া থেকে ছুটি কাটিয়ে আমার স্ত্রী দুই ছেলে নিয়ে ফিরেছেন। জানেন এর ফলাফল? ওরা সব ক্যাথলিক হয়ে গেছে। আমার কাছে অবশ্য it's all the same।"

একদিন এক লেকচারের পর হারউইৎজ আইনস্টাইনের সঙ্গে জুরিখবার্গ দিয়ে হেঁটে উপরে উঠছেন। কথায় কথায় সহকর্মীকে

বললেন—"আমার মেয়ে ইভকে আজ ইস্কুলে একটা অঙ্ক কষতে দিয়েছিল। ও ওটা বুঝতেই পারেনি। মনে হয়, গার্লস হাইস্কুলে ওঁরা ছাত্রীদের কাছ থেকে বড় বেশি দাবি করছেন।"

দুপুরে খাবারের পর অধ্যাপক হারউইৎজ-এর দরজায় বেল বেজে উঠল। দরজা খুলে হারউইৎজ-গিন্নি সবিস্ময়ে দেখলেন দুয়ারে স্বয়ং অধ্যাপক আইনস্টাইন দাঁড়িয়ে। ফিসফিস করে আইনস্টাইন মিসেসকে বললেন—"ব্যস্ত হবেন না। আপনার স্বামীকে বিরক্ত করতে আসিনি। আমি জানি আহারান্তে তাঁর একটু দ্বিপ্রাহরিক ঘুমের দরকার। আমি এসেছি ইভ-এর কাছে, ওকে একটা অঙ্ক বুঝিয়ে দেব।" মিসেস সহাস্যে আইনস্টাইনকে নিয়ে গেলেন মেয়ের কাছে। আইনস্টাইন চলে গেলে মা মেয়েকে বললেন—'অঙ্কটা বুঝলি ? উত্তর মিলেছে ?' মেয়ে সলজ্জভাবে স্বীকার করল—"না, ঠিক মতো মেলেনি মনে হচ্ছে।"

খবরের কাগজ বা সাময়িক পত্র পড়ে আইনস্টাইন কখনও সময় নষ্ট করতেন না। এমন কি জুরিখেও তিনি বন্ধুবান্ধব নিয়ে সঙ্গীতের আসর বসাতে কিংবা আলোচনা বা সরস টীকা-টিপ্পনী করতেই বেশি ভালবাসতেন। একবার বহু বছর বাদে এক অধ্যাপক-কন্যাকে দেখে আইনস্টাইন শুভেচ্ছা জানাতে গিয়ে বাবার দিকে ভেংচি কেটে হেসে বললেন—"ওকে দেখতে এখন বেশ হয়েছে, তাই না! আগে দেখাত ঠিক যেন একটা plant-louse !" আর একবার তাঁর এক সঙ্গী উভয়ের পরিচিত এক ব্যক্তির নৈতিক অধঃপতনে খুব রাগ দেখালে তিনি মৃদুভাবে কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলেন—"As far as I'm concerned I prefer silent vice to ostentatious virtue."

এ রকম গল্প আরও অনেক আছে। একবার দক্ষিণ আমেরিকা ভ্রমণকালে, বুয়েনস এয়ার্সে তাঁকে La Prensa ছাপাখানাটি দেখান হয়। এটি ছিল ছাপাখানা জগতের চূড়ান্ত কথা, এখানকার যন্ত্রপাতি এক কথায় "the last word in technical skill"। স্বভাবত

ছাপাখানার মালিক তাঁর কাছ থেকে কিছু প্রশংসা-বাক্য আশা করছিলেন। তাই বললেন—"কিছু বলুন।" উত্তরে আইনস্টাইন বললেন— "চমৎকার! একমাত্র যার অভাব চোখে পড়ছে তা হল ছাপাখানা থেকে যা সব বেরুচ্ছে তা পড়ার মেশিন।"

একবার ১৯৫২ সালে এক সুইস পত্রিকার কাছ থেকে 'শ্রেষ্ঠ পাঠক কে?'—এ ধরনের এক প্রশ্নের উত্তরেও অনুরূপ মন্তব্য করেছিলেন। বলেছিলেন—"যে লোক শুধু খবরের কাগজ এবং, বড় জোর, সাময়িক লেখকদের বইপত্র পড়ে তাকে দেখে আমার সেই সব ক্ষীণদৃষ্টি লোকদের কথা মনে হয় যারা চশমা পড়তে লজ্জা পায়। যুগের বিচার এবং ফ্যাশানের ওপরেই সে পুরোপুরি নির্ভরশীল। তা ছাড়া আর কিছু সে দেখতে বা শুনতে পায় না। আর, অন্যের চিন্তাভাবনা বা অভিজ্ঞতার সমর্থনে পুষ্ট নয় এমন যে স্বাধীন চিন্তা, তা যখন সবচেয়ে ভাল তখনও অপেক্ষাকৃত দুর্বল এবং একঘেয়ে। বুদ্ধিতে দাপ্তিমান এবং সেই সঙ্গে পরিচ্ছন্ন মেজাজ, স্টাইল আর সুরুচিবোধ—এমন ব্যক্তির দেখা শতাব্দীতে অতি অল্পই মেলে। তাঁদের কাজের সঞ্চয়ই মানব সমাজের সবচেয়ে মূল্যবান সম্পদ। প্রাচীন যুগের কিছু লেখক আমাদের অত্যন্ত ধন্যবাদার্হ। যে কুসংস্কার এবং অনিশ্চয়তা মধ্যযুগীয় লোকদের অস্তিত্বকে পাঁচ শ' বছরেরও বেশি অন্ধকারাচ্ছন্ন করে রেখেছিল তা থেকে যে তারা ক্রমে নিজেদের মুক্ত করতে পেরেছে সে তাঁদের জন্যই। বর্তমান কালের অযথা গর্বকে ভুল প্রমাণ করার পক্ষে এটিই যথেষ্ট।"

জ্ঞানতত্ত্বের ক্ষেত্রকে ব্যাপকতর করার উদ্দেশ্যে নিজ চিন্তাধারায় মহাকর্ষকে গ্রহণ করে ১৯০৯ সাল থেকেই অধ্যাপক আইনস্টাইন ত্বরণযুক্ত কাঠামোতেও তাঁর 'আপেক্ষিকতাবাদকে' সম্প্রসারিত করছিলেন। জুরিখের বছরগুলিতে তিনি যে সব বৈজ্ঞানিক ক্রিয়াকর্ম করেন তাদের মধ্যে অন্যতম—The Theory of Opalescence of Homogeneous Fluids and Fluid Mixtures in the

Neighbourhood of Critical State' এবং 'Connection Between Elastic Behaviour and Specific Heat in Solids with Monoatomic Molecules.

যাকে তিনি বলতেন তাঁর 'favourite egg' তাকে তা দিয়ে ফোটাতেই এ সময়ে তিনি তাঁর শক্তির প্রায় সবটা ব্যয় করছিলেন। সেটি হল The Light Quantum Problems। লবের কাছে পাঠানো এ সময়েরস ব কটি রিপোর্টে বারবার বিষয়টির উল্লেখ দেখা যায়। একবার উল্লেখ পাওয়া যায় যে, আর্নল্ড সোমারফেল্ড এসে পুরো এক সপ্তাহ আইনস্টাইনের সঙ্গে কাটালেন। উদ্দেশ্য "আলোক কণার সমস্যা এবং রিলেটিভিটির কিছু কিছু খুঁটিনাটি বিষয়বস্তু নিয়ে আলোচনা। তাঁর উপস্থিতি ছিল আমার কাছে এক আন্তরিক আনন্দের ব্যাপার। পরিসংখ্যান ব্যবহারের ব্যাপারে তিনি আমার মনোভাব অনেকখানি মেনে নিয়েছেন।"

আর একবার, ১৯১০-এর মার্চে, তিনি লিখলেন— "কোয়াণ্টাম থিয়োরী আমার কাছে এখনও সত্য। আপেক্ষিক তাপ সংক্রান্ত বিষয়ে আমার পূর্ব-অনুমান চমৎকারভাবে সত্যি মনে হচ্ছে। নার্নস্ট এসে কিছুদিন আমার সঙ্গে ছিলেন। আর রুবেন এখন ব্যস্ত আছেন ব্যাপারটির পরীক্ষামূলক যাচাই-এর কাজে। তা হলে, শীগগিরই জানতে পারব আমরা ঠিক কোথায় রয়েছি। কোয়াণ্টার ব্যাপারে আমি ইতিমধ্যে কিছু চিত্তাকর্ষক বিষয়ের সন্ধান পেয়েছি। কিন্তু জিনিসটা এখনও পুরো প্রস্তুত হয় নি। অগ্রগতি কিছুটা মন্থর। কারণ, অন্যান্য আবশ্যিক কাজকর্ম আমায় পদার্থবিজ্ঞানের অন্যান্য ক্ষেত্রকেও পুঙ্খানুপুঙ্খ নিরীক্ষণ করতে বাধ্য করে। এ সত্ত্বেও এই আবশ্যিক কাজকর্ম আমার কাছে বড় প্রীতিপ্রদ।" তারপর ১৯১০-এর ৪ঠা নভেম্বর এল সেই সুখকর ঘোষণা—"বর্তমানে আমার সবচেয়ে বড় আশা যে, বস্তুত আলোক কোয়াণ্টা ছাড়াই বিকিরণ সমস্যা সমাধান করে ফেলব। কী সাজে বিষয়টা প্রকাশ পাবে তা ভেবে

আমি অবিশ্বাস্য রকম কৌতূহলী হয়ে পড়েছি। বর্তমানরূপে 'এনার্জি প্রিন্সিপল'-কে আমাদের ছাড়তে হবে।" কিন্তু এর কিছুদিন পরেই শুরু হল 'শীতল জলের বর্ষণ'। লিখলেন—"বিকিরণ সমস্যা সমাধানের প্রচেষ্টায় আরো একটি ব্যর্থতা। শয়তান আমার সঙ্গে দুষ্ট খেলা খেলছে।"

জুরিখে থাকতে আইনস্টাইন খুব আনন্দ পেতেন। ১৯১১ সালের ১৭ই জানুয়ারী চ্যভনকে লেখা এই পংক্তি ক'টি তার প্রমাণ। "চাকরিটি আমার কাছে বড় আনন্দ ও সার্থকতা এনে দিয়েছে। আমার আগেকার থিয়োরীগুলোও ক্রমশ বেশি করে স্বীকৃতি লাভ করছে। এবং আমার প্রচেষ্টা এখনও সার্থকতার মুকুটে ভূষিত হচ্ছে। স্কুলমাস্টারিও আমায় খুব আনন্দ দেয়। এর বড় কারণ হল, আমি দেখি আমার ছাত্ররা তাদের কাজকে প্রকৃতই উপভোগ করে।"

একই সুরে ১৯০৯-র নববর্ষে ডঃ লবকে লিখেছিলেন—"যেহেতু আমার লেকচারগুলো আমি অত্যন্ত গুরুত্বসহকারে গ্রহণ করি, সেজন্য ওগুলোর প্রস্তুতিতে আমায় অনেকক্ষণ ব্যস্ত থাকতে হয়। হপ্তায় ছ'ঘণ্টা এবং একটা সান্ধ্য ক্লাশ—শোনায় অল্প, কিন্তু আসলে এক বিরাট ব্যাপার……। আমার নতুন কাজে আমি খুব খুশি। ছাত্রদের সঙ্গে আমার সম্পর্কও খুব ভাল। আশা করি, এদের মধ্যে কাউকে কাউকে প্রেরণা জোগাতে পারব। এদের কয়েকজনকে আমি ডক্টরেট হতে উৎসাহিত করছি। আমাদের ইনস্টিটিউটের ডিরেক্টর, অধ্যাপক ক্লাইনার, অত্যন্ত সদাশয় ব্যক্তি। তিনি আমায় বন্ধুভাবে দেখেন এবং ভুলেও কখন মনে আঘাত দেন না।"

সহপাঠী মার্শেল গ্রসমানের সঙ্গে দীর্ঘস্থায়ী নিবিড় বন্ধুত্ব এ সময়ে আইনস্টাইন-জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। দুই বন্ধুর সহযোগিতায় গড়ে ওঠে 'সাধারণ আপেক্ষিক তত্ত্ব'। তলের তত্ত্ব বা theory of surfaces গ্রসমানের অবদান। বন্ধু আইনস্টাইনকে তিনি স্পষ্টই বললেন যে, আধুনিক পদার্থবিজ্ঞানের ভিত্তি হিসেবে গণিতযন্ত্রের

ব্যবহার আজ অপরিহার্য হয়ে পড়েছে। বস্তুত, তিনিই প্রথম আইনস্টাইনকে ক্রিস্টোফেলের মূল্যবান গবেষণা সম্পর্কে জানান। ক্রিস্টোফেল ছিলেন গাণিতিক পদার্থবিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠাতা তথা প্রথম ডীন। গ্রসমান ও আইনস্টাইনের চিন্তা এবং চেষ্টার সংহতিতে ১৯১৩-য় জুরিখের Natural Science Society Quarterly পত্রিকায় একটি গবেষণা নিবন্ধ প্রকাশিত হয়। ঐ নিবন্ধের প্রথম ছ' পৃষ্ঠা আইনস্টাইনের লেখা; আর পরবর্তী ছ' পৃষ্ঠা গ্রসমানের। প্রথম ছ' পৃষ্ঠায় আছে মহাকর্ষ তত্ত্বের বস্তুগত ভিত্তির কথা, শেষ ছ' পৃষ্ঠায় রয়েছে মহাকর্ষ তত্ত্বের গাণিতিক বিমূর্ততা নিয়ে আলোচনা।

জটিল গাণিতিক সমস্যা নিয়ে বন্ধুর সঙ্গে আলোচনা করতে আইনস্টাইন গ্রসমানের কাছে প্রায়ই আসতেন ঠিক লাঞ্চের পরে। বেচারা গ্রসমান তখন সবে প্রভাতী লেকচার দিয়ে ক্লান্ত হয়ে বাড়ি ফিরেছেন। এ ধরনের ব্যাপারে আইনস্টাইন নিয়মনিষ্ঠ অধ্যাপক-গৃহিনীদের কাছে কখন কখন আতঙ্কের কারণ হয়ে ওঠেন। কেননা, তিনি এলে প্রায়ই গভীর রাত কেটে যেত তীব্র বুদ্ধিগত দ্বন্দ্বযুদ্ধে। গ্রসমান দম্পতী তখন থাকতেন জুরিখের হেরেনবার্গস্ট্রাসে। তাঁদের বাড়িতে কাজ করত এক অবিবাহিতা বয়স্কা স্ত্রীলোক। এসেছিল সাফহাউসেন থেকে। প্রতিদিন সন্ধ্যায় আইনস্টাইন এসে বেল বাজালে ঐ মহিলা সিঁড়ি দিয়ে নেমে সামনের দরজা খুলে দিত। বিব্রত আইনস্টাইন একদিন বন্ধুকে বলেই ফেললেন—"ভাই, দরজাটা বরং খুলে রেখ। বৃদ্ধা বেচারাকে তা হলে আর ব্যতিবস্ত করতে হয় না।"

গ্রসমানের জন্ম বুদাপেস্টে। ১৮৭৮-র ৯ই এপ্রিল। আইনস্টাইনের সঙ্গে FIT-থেকে ১৯০০ সালে গ্র্যাজুয়েট হন। পরে ১৯০৭-এ ঐ FIT-তে ফিডলারের স্থলাভিষিক্ত হন। পড়াতেন Descriptive এবং Projective জ্যামিতি। বড় হৃদয়গ্রাহী এবং উদ্দীপক লেকচার দিতেন। কী সুন্দরভাবেই না বোঝাতেন এঞ্জিনিয়ারিং বিজ্ঞানের সঙ্গে বিষয়টির সম্পর্ক। এর আগে দু-জায়গায় স্কুল-শিক্ষকতা

করেছেন। স্বাস্থ্যের জন্য ১৯২৭-এর অক্টোবরে অকালে অধ্যাপকপদ থেকে অবসর নিতে বাধ্য হন। এক যন্ত্রণাদায়ক পীড়ার শিকার হয়ে মহান-হৃদয় এই বিজ্ঞানীর বুদ্ধির দীপ্তি ক্রমশ স্তিমিত হয়ে আসে। শেষ অবধি তিনি মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েন—৭ই সেপ্টেম্বর, ১৯৩৬। শুধু বিজ্ঞানী হিসেবে নন, প্রশাসকরূপেও তাঁর যথেষ্ট খ্যাতি ছিল। তিনি ছিলেন Swiss Mathematicians' Society-র অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা এবং সভাপতি।

এ সময়ে আর যাঁরা আইনস্টাইনের ঘনিষ্ঠ ছিলেন তাঁদের অন্যতম হলেন অধ্যাপক এমিল জুরখার এবং হাইনরিখ জাঙ্গার। দীর্ঘ ছত্রিশ বছর জুরখার জুরিখ বিশ্ববিদ্যালয়ে ফৌজদারী এবং সাধারণ আইন বিষয়ে অধ্যাপনা করেন। আর জাঙ্গার ছিলেন ফোরেনসিক মেডিসিনের অধ্যাপক ও বিখ্যাত 'শক ট্রিটমেণ্ট'-এর প্রবর্তক। বয়সে জাঙ্গার আইনস্টাইনের চেয়ে পাঁচ বছরের বড় ছিলেন। কিন্তু অন্যের প্রতি প্রগাঢ় সহমর্মিতা এবং সর্বদা পরের কাজে লাগার মানসিকতার দরুন শীঘ্রই ইনি পিতার ভূমিকায় অবতীর্ণ হন। তাঁর সম্পর্কে আইনস্টাইনের উক্তিও বিশেষ উল্লেখযোগ্য— "বস্তুনিষ্ঠ এবং মনোবিদ্যাগত পরিস্থিতি সম্পর্কে তাঁর ছিল প্রায় নির্ভুল বোধশক্তি ও আশ্চর্য গঠনধর্মী প্রতিভা, সেই সঙ্গে এক ধরনের রুচিসম্পন্ন রসবোধও ছিল। কার্যত অনন্ত বিষয়ে তাঁর অনুরাগ ছিল। মনুষ্যচরিত্র এবং বিষয়-ব্যাপারে যথেষ্ট অভিজ্ঞ ও বিচারবোধপুষ্ট হলেও, কী আশ্চর্য, ঐ ব্যাপারগুলিতে তাঁর পেশাগত জ্ঞান ছিল খুবই অপ্রতুল। আনুষ্ঠানিক লজিকের মূল্য যে বেশি নয় তিনি যেন ছিলেন তাঁর জ্বলন্ত সাক্ষী। কারণ, বিষয়বস্তুকে কী করে স্বচ্ছ এবং তীক্ষ্ণভাবে দেখতে হয় তা তিনি জানতেন। তবু কখন কখন তিনি তাঁর চিন্তাধারা এত বিভ্রান্তভাবে প্রকাশ করতেন যে অনেক ঝাড়াই-বাছাই ও যোগ-বিয়োগ করে তবে তার পাঠোদ্ধার করা সম্ভব হত। সংক্ষেপে বলতে গেলে, তাঁর মতো মজাদার লোক আমি খুব কমই দেখেছি।"

নিজের বৌদ্ধিক পরিতৃপ্তির জন্য আইনস্টাইন ঘন ঘন দেখা করতেন বিশিষ্ট ইতিহাসবেত্তা অধ্যাপক আলফ্রেড স্টার্নের সঙ্গে। ইনি ফ্রাঙ্কফুর্টের গণিতজ্ঞ মোরিশ আব্রাহাম স্টার্নের ছেলে। জার্মান ঐতিহাসিক রাঙ্কে এবং মমসেনের এই বিজ্ঞানমনস্ক ও ন্যায়পরায়ণ ছাত্রটি পিতৃসূত্রে অতিথিবাৎসল্য এবং শিল্পপ্রীতি অর্জন করেন। FIT-তে ছাত্রদের ইনি যা শেখাতেন তা হলঃ পূর্ণগর্ভ জ্ঞান এবং চেষ্টার সাহায্যে নিজের অহং-কে জয় কর, ঘটনাকে অবিকৃত রেখে তাকেই কথা বলতে দাও, আর ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে চিন্তা করতে শেখ। এই জাত-ডেমোক্র্যাট পদার্থবিজ্ঞানের উপর কিরকফ ও হেলমহোলৎজের লেকচার শুনতেন। ফলে আইনস্টাইনের সঙ্গে বিশেষজ্ঞের সমস্যা নিয়েও তিনি সোৎসাহে এবং দক্ষতাসহকারে আলোচনা করতেন। প্রফেসর স্টার্নের অন্যতম কীর্তি দশ খণ্ডে লেখা ভিয়েনা কংগ্রেস থেকে শুরু করে ফ্রাঙ্কো-প্রাশিয়ান যুদ্ধের শেষ অবধি অর্থাৎ ১৮১৫ থেকে ১৮৭১ পর্বের ইউরোপের ইতিহাস। কাজেই রাজনৈতিক মতাদর্শে স্টার্ন ছিলেন এক অসাধারণ স্পষ্ট লেখক। এই কারণে তাঁর সান্নিধ্যের জন্য আইনস্টাইন লালায়িত ছিলেন। এরূপ একজন ব্যক্তির সাহচর্যে কারও সময় নষ্ট হবার কথা নয়।

এই দুই মহান ব্যক্তিত্বের সম্পর্কটি যে কত গভীর ও আন্তরিক ছিল তা এই বৃদ্ধ ঐতিহাসিকের প্রতি আইনস্টাইনের লেখা এক অভিনন্দন পত্র থেকে বোঝা যায়। পত্রের তারিখটি হল ২০শে নভেম্বর, ১৯২৬।

"বন্ধু বান্ধবদের কাছ থেকে জানলাম আপনি নাকি শীঘ্রই আপনার আশিতম জন্মবার্ষিকী পালন করতে চলেছেন। এমন দিনেই বলা যায়— "I am devoted to you and think you with affection"। অন্য সময়ে হলে কথা ক'টি অদ্ভুত শোনাত। তা হলে হয় এটা স্বতঃস্পষ্ট নয়তো সত্যি নয়। বলা বাহুল্য, আপনার ক্ষেত্রে এটা স্বতঃস্পষ্ট। ছাত্র হিসেবে আমার সবচেয়ে সুন্দর সময়গুলো আমি

আপনার পারিবারিক বৃত্তে কাটিয়েছি। সেই ফেলে-আসা দিনগুলোর দিকে প্রায়ই আমি আনন্দে ফিরে ফিরে তাকাই। আমার সবচেয়ে পুলক-জাগানো স্মৃতি অবশ্য ছিল (এবং এখনও আছে) 'the sight of a good man' যিনি এক দীর্ঘ, সুখকর এবং ফলবান জীবনে তাঁর যৌবনে স্থিরীকৃত লক্ষ্যে উপনীত হতে পেরেছেন। এত চমৎকার ভাবে নিজ জীবনকে সিদ্ধির বন্দরে উত্তীর্ণ করতে আর কেউ পেরেছেন কিনা আমি জানি না, বিশেষ যে যুগে প্রাত্যহিক জীবনের মূল্যবোধ এত বিশৃঙ্খলভাবে পরিবর্তনশীল।"

১৯১১ সালের প্রথম দিকে ভিয়েনা থেকে সুইস প্রেস জানতে পারে যে, আইনস্টাইন পূর্ণ অধ্যাপকরূপে প্রাগের জার্মান বিশ্ববিদ্যালয়ের তত্ত্বীয় পদার্থবিজ্ঞানে যোগ দিচ্ছেন। সুইস বিজ্ঞানের পক্ষে খবরটি এক মর্মান্তিক আঘাত। অধ্যাপক লিপিশের অবসর গ্রহনের পর বহু দিন ধরে পদটি খালি পড়ে ছিল। এ পদে আইনস্টাইনের নিয়োগের কথাও চলছিল বেশ কিছুদিন ধরে। কিন্তু আইনস্টাইন জাতিতে ইহুদী। এই অজুহাতে মাসের পর মাস অনর্থক কালহরণ করা হচ্ছিল। এর পেছনে হাত ছিল মাক-এর দুই ছাত্রের —অ্যাণ্টন লামপা এবং জর্জ পিক।

ভৌতবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে মানের কিছুমাত্র অবনতি ঘটুক জুরিখ বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ তা মোটেই চাইতেন না। ফলে আইনস্টাইনের পদচিহ্ন ধরে দ্রুতলয়ে ফ্যাকাল্টিতে একের পর এক প্রতিভাধর প্রতিনিধিরা এলেন। বোঝা গেল, পদার্থবিজ্ঞানের জগতে আধুনিক বৈপ্লবিক পরিবর্তনে জুরিখ বিশ্ববিদ্যালয় নিজস্ব ভূমিকা পালন করতে বিশেষ আগ্রহী। ১৯১১-তে এলেন পিটার ডিবাই। পরে FIT-তে রাসায়নিক পদার্থবিজ্ঞানে গবেষণা করে ইনি বিশ্ববিশ্রুত হন। তাঁর গবেষণার প্রধান বিষয়বস্তু ছিলঃ Electric and Magnetic Characteristics of Molecules and Ions। তা ছাড়া, রঞ্জনরশ্মির ব্যবহারে পদার্থের অন্তর্গঠন সম্পর্কেও তিনি আমাদের জ্ঞানকে

বিকশিত করেন। ১৯১২-তে এলেন ম্যাক্স ফন লাওয়ে। আগেই বলা হয়েছে, কেলাসের সাহায্যে রঞ্জনরশ্মির সমবর্তনের জন্য ইনি বিশ্বখ্যাতি অর্জন করেন। তা ছাড়া, Theory of Electromagnetism and Optics-এর ক্ষেত্রেও তাঁর উল্লেখযোগ্য অবদান আছে। অর্ধশতাব্দী আগে ১৮৬৪-তে এই জুরিখ বিশ্ববিদ্যালয় থেকেই ভিলহেলম রোয়েন্টগেন গ্র্যাজুয়েট হয়েছিলেন। থিসিসের বিষয় ছিল: The Study of Gases। তাঁর ডক্টরেট থিসিসের মূল্যায়নে বলা হয় যে. এই গবেষণার মাধ্যমে তিনি যে মেধার পরিচয় দিয়েছেন তা গাণিতিক পদার্থবিজ্ঞানে তাঁকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছে।

১৯১১ সালে মার্চের শেষে আইনস্টাইন জুরিখ ছেড়ে প্রাগে এলেন। প্রাগে অবশ্য আইনস্টাইন খুব বেশিদিন ছিলেন না। মাত্র আঠারো মাস। ১৯১১-র অগাস্টে আবার ফিরে যান জুরিখে। দ্বিতীয়বার বিদেশীদের মধ্যে মানিয়ে নিতে মিলেভাকে খুব বেগ পেতে হয় এবং প্রাগ থেকেই এঁদের দাম্পত্য জীবনে লক্ষ্যণীয় চিড় ধরতে থাকে।

যা হোক. চাকুরির খাতিরে অফিসিয়াল প্রয়োজনে আইনস্টাইনকে অস্ট্রো-হাঙ্গেরীয় নাগরিক হতে হল। মধ্য-য়ুরোপের প্রাচীনতম বিশ্ব-বিদ্যালয় প্রাগ। স্থাপিত ১৩৪৮ খ্রীস্টাব্দে। আইনস্টাইন এখন সেই প্রাচীনতম বিশ্ববিদ্যালয়ের শ্রেষ্ঠ মনীষীদের অন্যতম। আইনস্টাইন প্রাগে আসার প্রায় তিন দশক আগে ১৮৮১-তে জাতীয়তাবাদী কলহের পরিণতি হিসেবে প্রাগ বিশ্ববিদ্যালয় ভেঙে দুটো হয়ে যায়। প্রাগের জার্মান বিশ্ববিদ্যালয় আর চেক বিশ্ববিদ্যালয়। রিলেটি-ভিটির জনক অধ্যাপনা করতেন প্রথমটিতে। আর আইনস্টাইন প্রাগ ছাড়লে ঐ পদে তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন বিজ্ঞানী ফিলিপ ফ্রাঙ্ক—আইনস্টাইনের অন্যতম জীবনীকার। আইনস্টাইনের প্রাগ জীবনের একটি মজাদার কাহিনী তিনি আমাদের উপহার দিয়েছেন। সেটি এই—"সব অস্ট্রিয় স্টেট-অফিসিয়ালদের মতো আইনস্টাইনকেও

সরকারী ইউনিফর্ম জোগাড় করে নিতে হয়। ইউনিফর্মটি দেখতে অনেকটা পশ্চিম-য়ুরোপের নৌ-অফিসারদের পোশাকের মতো—ত্রিকোণাকার টুপি, কোট আর ট্রাউজার। কোটে এবং ট্রাউজারে আবার চওড়া সোনালি পটি লাগানো। পোশাকের আর একটি অংশ হল একটা গরম কোট—মোটা কালো কাপড়ের, সঙ্গে একটা ড্যাগার বা ছোরা। চাকুরিতে যোগদানকালে শপথ গ্রহণের অনুষ্ঠানে বা অস্ট্রিয়-রাজের সামনে উপস্থিত হতে অস্ট্রিয় অফিসারদের এই ইউনিফর্ম পড়তে হত। আইনস্টাইন অবশ্য কেবল চাকুরিতে যোগ দিতে শপথ নেবার সময়ে এটা পরেছিলেন। ইউনিফর্মটির দাম কিন্তু বেশ। প্রাগ ছাড়ার পর এটা আর কোন কাজে লাগবে না বলে মাত্র অর্ধেক দামে উনি আমার কাছে ওটা বিক্রি করে দেন। আমিও শুধু একবার সেটি ব্যবহার করি। ঐ একই কারণে। চাকুরিতে যোগ দেওয়ার শপথ নিতে। আইনস্টাইনের ( বড় ) ছেলের বয়স তখন আট হবে। ইউনিফর্মটি আমার হস্তান্তরের আগে সে বায়না ধরল—'পাপা, হাতছাড়া করার আগে তুমি এটা পরে একদিন আমার সঙ্গে জুরিখের রাস্তা দিয়ে হাঁটবে।"

আইনস্টাইন রাজি হলেন। বললেন—"ঠিক আছে, বড় জোর না হয় ওরা আমাকে ব্রাজিলের একজন অ্যাডমিরাল বলে মনে করবে।"

প্রাগের জার্মান বিশ্ববিদ্যালয়ে তখন প্রধান গ্রন্থাগারিক ছিলেন ডঃ ফেলিক্স ভেলৎস। একজন বিশিষ্ট দার্শনিক। তাঁর স্মৃতিচারণায় যে আইনস্টাইনকে আমরা দেখি তাঁর পরনে মলিন বেশবাস, শুধু মলিন নয়—অবিন্যস্ত। মাথায় এক রাশ অবাধ্য কোঁকড়ানো চুল, আর চমকে ওঠার মতো আশ্চর্য-উজ্জ্বল দুই চোখ। একবার অধ্যাপক আইনস্টাইনের সম্মানে এক বিলাসবহুল অভ্যর্থনার আয়োজন করা হয়। শ্রমিকদের মতো গাঢ় নীল রঙের শার্ট পরে তিনি ঐ অনুষ্ঠানে এলেন। পোর্টার তাঁকে গেটে আটকে দিল। সে তাঁকে বাতি সারানোর ইলেকট্রিক মিস্ত্রী বলে ভুল করেছিল। হেসে আইনস্টাইন

তার ভুল শুধরে দিয়ে ঢুকে পড়লেন। স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে ডঃ ফেলিক্স আরও বলছেন—"আমার মানসচক্ষে কাফের সেই টেবিলের ঢাকনাটি এখনও আমি দেখতে পাই। ওর ওপরেই ত তিনি আমাদের দেখাচ্ছিলেন যে, আমরা সকলেই অসীমের 'অধিকারী'। আমাদের স্বীকার করতে হল যে, একজন তুচ্ছ-ক্ষুদ্র মানুষ যদি টেবিলের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত অভিমুখে চলতে থাকে এবং প্রতি পদক্ষেপে ক্রমাগত ক্ষুদ্রতর হয়ে পড়ে তা হলে অসীম সময়েও তার পথ ফুরবে না। আমার কাছে এটি অনবচ্ছেদ বস্তুর অসীমত্ব বা infinity of the continuum-এর এক সুন্দর অভিপ্রকাশ বলে বোধ হল।"

আর একবার এক অনুষ্ঠানে নির্ধারিত বক্তৃতার বদলে আইনস্টাইন ভায়োলিনের উপর বক্তৃতা করাই শ্রেয় মনে করেন। গাড়িটানা ঘোড়ার অসীম ধৈর্য নিয়ে তিনি এ সময় রিলেটিভিটি তত্ত্বের সাধারণী-করণ এবং মহাকর্ষের নতুন তত্ত্বের অনুসন্ধানে ব্যস্ত ছিলেন। বস্তুত এ ব্যস্ততার সূত্রপাত সেই ১৯০৬ থেকে। তাঁর পূর্বতন সহকারী লব-কে তিনি ১৯১১-র ১০ই অক্টোবর এক চিঠিতে লেখেন—"প্রচণ্ড খাটছি, কিন্তু সফলতা খুব একটা হচ্ছে না। মাথায় যা কিছু এসেছিল তা আবার কেঁচে গণ্ডুষ করতে হচ্ছে। Ponderomotive বলের প্রশ্নে আমি সদুত্তর পেয়ে গেছি। যেখানে $\epsilon$ এবং $\mu$ কে ধ্রুবক ধরা চলে সেক্ষেত্রে আব্রাহাম-ই ঠিক। কিন্তু স্থায়ী চুম্বকনের বেলায় ওঁর সূত্র মোটেই খাটে না। সর্বক্ষেত্রে প্রযোজ্য সাধারণ সমাধান বলে কিছু নেই···। আপেক্ষিকতার ভিত্তিতে মহাকর্ষকে প্রতিষ্ঠিত করতে বড্ড বেগ পেতে হচ্ছে। মনে হয়, আলোর বেগের ধ্রুবত্বের নীতি মহাকর্ষীয় বিভবের স্পেশ ধ্রুবকগুলোর ক্ষেত্রেও খাটবে।"

একদিন সকালে তাঁকে দেখা গেল সানন্দে এবং গভীর মনোযোগে জুরিখ-থেকে-আসা কি একটা দেখছেন। ওটি এসেছে অধ্যাপক ম্যাক্স ফন লাওয়ের কাছ থেকে। আবেগে উত্তেজিত হয়ে তখুনি হপফ-কে লিখে পাঠালেন (১২ই জুন, ১৯১২): "লাওয়ে আমায় এক্স-রশ্মির

অপবর্তনের একটা ফোটোগ্রাফ পাঠিয়েছেন। It's the most wonderful thing I have ever seen। প্রত্যেকটি পৃথক অণু কর্তৃক এই অপবর্তনের ফলে পদার্থের অণুগুলোর প্যাটার্ন বা অণুসজ্জাটি প্রকাশিত হয়ে উঠেছে। ফোটোগ্রাফগুলো কী পরিষ্কার! তাপীয় উত্তেজনার কোন রকম চিহ্ন নেই।"

আইনস্টাইনের প্রাগ-জীবনের স্মৃতিচারণ আরও অনেকে করেছেন। ধরা যাক, ওয়সিফ ডায়মণ্ডের কথা। তিনি লিখেছেন—"তাঁর বৃহদায়তন, অস্বাভাবিক, প্রায় অতিবিস্তৃত, চকচকে সাদা কপালটি দেখে প্রথমে আমি একেবারে বিস্মিত হয়ে যাই। কপালের নিচেই উল্লেখযোগ্য এক জোড়া চোখ—বাদামি রঙের, সুস্থির, বুদ্ধিদীপ্ত এবং প্রশান্ত। ঠিক সিরিয়স ছেলেমেয়েদের চোখের মতো শান্ত। কপালের তুলনায় চোখ ছুটো অনেক অনেক কচি, আর মাথার চুল একেবারে সাদা। মুখখানা কেমন যেন কোমল, শান্ত এবং বিষণ্ণ—অত্যন্ত উৎসাহী ছেলে-মেয়েদের মুখে যেমনটি দেখা যায়।"

পরিচিতদের অনেকেই উল্লেখ করেছেন যে, তাঁর প্রশান্ত, গভীর, চিন্তামুক্ত, শিশুসুলভ হাসির কথাটি ভোলা যায় না। বিশিষ্ট গণিতজ্ঞ জেরহার্ড কোভালেভস্কি আইনস্টাইনের উদ্বোধনী বক্তৃতা শুনতে উপস্থিত ছিলেন। সেই বক্তৃতা তাঁর উপর এমন এক সুদূর-প্রসারী প্রভাব রেখে যায় যে, জীবনে তিনি তা ভুলতে পারেন নি। এ সম্পর্কে কোভালেভস্কি নিজেই লিখেছেন—"সেদিন Natural Science Institute-এর সবচেয়ে বড় অডিটোরিয়মটি নির্দিষ্ট সময়ের অনেক আগেই প্রাগের সমস্ত বুদ্ধিজীবিতে কানায় কানায় ভরে ওঠে। বাইরে থেকে দেখতে আইনস্টাইন ছিলেন একেবারে সাদাসিদে ও ভড়ংহীন। ফলে শ্রোতৃবর্গের সমস্ত হৃদয় মুহূর্তে কেড়ে নিতেন। ইহ-জীবনের বস্তুকে তিনি দেখতেন উচ্চতর এক মানসভূমি থেকে। সাধারণ মানুষের কাছে যা অতি মূল্যবান তাঁর কাছে তা ছিল নিতান্ত অর্থহীন। যে কোন রকম অলঙ্করণকে

তিনি ঘৃণা করতেন। কথা বলতেন প্রাণের আবেগ ও স্পষ্টতা নিয়ে। কখনও তাতে অহং জড়িয়ে পড়ত না। বস্তুত, তাঁর বক্তব্য ছিল স্বাভাবিকতায় ভরপুর আর প্রায়ই তাতে থাকত প্রাণদ রসিকতা।"

অবসর সময়ে প্রায়ই ভায়োলিন নিয়ে উপস্থিত হতেন ফ্রাউ বার্থা ফান্টার বিরাট বৈঠকখানায়। ফান্টা ছিলেন এক অত্যন্ত সংস্কৃতিসম্পন্না মহিলা। জিওনিস্ট দার্শনিক হুগো বার্গমানের নেতৃত্বে এখানে চলত চেম্বার মিউজিক, আর গভীর রাত অবধি পড়াশোনা। পড়া হত কান্টের Critique of Pure Reason, হেগেলের Phenomenology এবং ফিক্টের Doctrine of Science। বিশেষ করে হিউমের যুক্তিলব্ধ-প্রায়োগিক সুস্পষ্টতা আইনস্টাইনকে মুগ্ধ করত। এ সব সন্ধ্যায় আর যাঁরা উপস্থিত থাকতেন তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ডঃ ফেলিক্স ভেলৎস, ফ্রাঁজ কাফকা (তৎকালে এক অপরিচিত লেখক), বাগদত্তাসহ তাঁর গুণমুগ্ধ সাহিত্যিক-বন্ধু ম্যাক্স ব্রড, আর মোহিনী স্ত্রী নিয়ে বিজ্ঞানী ফিলিপ ফ্রাঙ্ক।

এমনি এক সন্ধ্যায় পুরাতন টাউন মার্কেটের বিখ্যাত Unicorn Pharmacy-র মালিক হের ফান্টা-ও উপস্থিত। গল্প হচ্ছিল প্রাগের প্রবাদপুরুষ শিক্ষক সেলিগমান কান্টর সম্পর্কে। গল্প করছিলেন অধ্যাপক কোভালেভস্কি। কান্টর এতো গরীব ছিলেন যে, এক জোড়া মোজাও জোটাতে পারতেন না। জুতো ছিল সাকুল্যে এক জোড়া। জুতো জোড়া যাতে চট করে নষ্ট না হয় সেজন্য জুতো হাতে করে খালি পায়ে রাস্তা দিয়ে হাঁটতেন। খালি পায়েই অডিটোরিয়মে ঢুকতেন, উঠতেন বক্তৃতা-মঞ্চে এবং বক্তৃতা দেয়ার টেবিলের পাশে জুতো জোড়া সাবধানে রেখে শুরু করতেন লেকচার।

কান্টের উপর আলোচনার সময় আইনস্টাইন প্রায়ই আশ্চর্য আশ্চর্য সব সংজ্ঞা দিতেন। তাঁর ছিল আন্তর স্বাধীনতা। জ্ঞানান্বেষণে তিনি পুরাতন প্রকল্প-কে কালজীর্ণ ও অচল মনে হলে নিষ্ঠুরভাবে ছুঁড়ে ফেলে দিতে সতত প্রস্তুত ছিলেন। তা দেখেই ম্যাক্স ব্রড তাঁর

উপন্যাস 'Tycho Brahe's Path to God'-এ মুক্তমন স্কলারের মডেল হিসেবে আইনস্টাইনকে গ্রহণ করেন। সে স্কলার প্রয়োজনে তাঁর গবেষণা আবার একেবারে গোড়া থেকে শুরু করেন, যাকে বলে ভ্রূণাবস্থা থেকে।

ম্যাক্স ব্রড প্রাগে আইনস্টাইনের সঙ্গে প্রায়ই একত্রে সঙ্গীত-চর্চা করতেন। আলবার্ট বেহালায় মোজার্টের সোনাটা বাজাতেন আর ব্রড তাঁর সঙ্গে পিয়ানোয় সঙ্গত করতেন। ১৯৪৯-এ ব্রড সুইজারল্যাণ্ড থেকে প্রকাশিত তাঁর নতুন উপন্যাস 'Galileo in Prison' পাঠালেন আইনস্টাইনকে। জানতে চাইলেন তাঁর মতামত। বইটি সম্পর্কে অভিমত জানিয়ে আইনস্টাইন তাঁকে যে চিঠি দেন সেটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এতে রিলেটিভিটি সম্পর্কে পরোক্ষ ইঙ্গিত রয়েছে। চিঠিটি বেশ দীর্ঘ। প্রাসঙ্গিক অংশবিশেষ এই রকম।

"গ্যালিলিও-র প্রায় এক তৃতীয়াংশ পড়ে ফেলেছি। সাধারণত যাকে 'ইতিহাস' আখ্যা দেয়া হয় সেই ইতিহাসের স্রষ্টা যে সব ব্যক্তিত্বে তাঁদের কাজকর্ম সম্পর্কে এত গভীর অন্তর্দৃষ্টি একজন কিভাবে আয়ত্ত করতে পারেন তা দেখে বিস্মিত হয়েছি। বিশেষ করে বহু প্রাচীনকালের ব্যাপার-স্যাপারের প্রশ্নে বিষয়টি আমার কাছে আরও দুঃসম্ভব এবং অর্থশূন্য মনে হয়েছে।

"গ্যালিলিও সম্পর্কে আমার ধারণা অবশ্য সম্পূর্ণ অন্য রকম। এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে, সত্যের অনুসন্ধানে অতি অল্পলোকই তাঁর মতো আত্মনিবেদন করেছেন। কিন্তু যা আমার কাছে ধাঁধাঁ তা হল, তাঁর মতো পরিপক্ক মনের অধিকারী কেন এত প্রতিকূলতার বিরুদ্ধেও নিজের আবিষ্কৃত সত্যকে কতকগুলো সংকীর্ণমনা ও গণ্ডূষ জলের শফরীর মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করাকে এত গুরুত্বপূর্ণ ও প্রয়োজনীয় মনে করলেন। সত্যিই কী এতটা করার দরকার ছিল! জীবনের শেষ বছরগুলো কেন যে এভাবে তিনি নষ্ট করলেন! বস্তুত, তাঁর পক্ষে জোর করে সত্য ঘোষণা করার কোন প্রয়োজন ছিল না। কেননা,

সত্যসন্ধী সকলের কাছেই গ্যালিলিও-র যুক্তিগুলো পৌঁছে গেছিল ; আর ঐ সব যুক্তিতে দীক্ষিত ব্যক্তিমাত্রেই জানতেন যে, পরে ওগুলো 'ঠিক নয়' বলে তাঁর যে সরকারী ঘোষণা তার কারণ নিছক জবরদস্তি। তা ছাড়া, পরিণতবয়স্ক গ্যালিলিও-র সরল, বৌদ্ধিক স্বাধীনতা সম্পর্কে আমার যা ধারণা তার সঙ্গে তাঁর বিনা প্রয়োজনে রোমে গিয়ে সিংহের গুহায় মাথা ঢোকান, আর যাজক ও রাজনীতিক-দের সঙ্গে বাগযুদ্ধে লিপ্ত হওয়া খাপ খায় না।

"যা হোক, আমি কিন্তু রিলেটিভিটি থিয়োরীর সমর্থনে এ রকম পন্থা অবলম্বনের কথা ভাবতেও পারিনা। আমার চিন্তা হবে এই ধরনের : আমার তুলনায় সত্য অনেক বেশি শক্তিশালী। রোগা ঘোড়ায় চড়ে তরোয়াল হাতে তাকে রক্ষার চেষ্টা করা একান্তই হাস্যকর ও অসার। বইটিতে পারিপার্শ্বিকের যে অদ্ভুত বর্ণনা পড়লাম তা মনে খুব দাগ কেটেছে। গ্যালিলিও সম্পর্কে সামান্য যেটুকু জানা যায় তা সম্বল করে তাঁর কাজকর্মের এমন জ্বলন্ত এবং বিশ্বাস্য বিবরণ কেবলমাত্র সহজ প্রেরণা বশে আবার তুলে ধরা, সন্দেহ নেই, যথেষ্ট শক্তির প্রয়োজন...... ।"

বার্নে থাকতেই ভিয়েনীয় পদার্থবিদ পল এরেনফেস্টের সঙ্গে আইনস্টাইনের পরিচয় ছিল। ১৯০৭ সালে আইনস্টাইন Annalen der Physik-এ ইলেকট্রনের উপর এরেনফেস্টের গবেষণা নিয়ে একটা ছোট্ট প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। এরেনফেস্ট প্রাগে এলেন আইন-স্টাইনের কাছে। ১৯০৭-১৯১২ অবধি উনি ছিলেন সেণ্ট পিটারসবার্গে। সঙ্গে ছিলেন তাঁর রাশিয়ান স্ত্রী—পদার্থবিদ তাতিয়ানা আফানাস্ভেভা। একদল তরুণ পদার্থবিজ্ঞানী নিয়ে এরেনফেস্ট ওখানে কর্মচঞ্চল এক বিজ্ঞানীর জীবন যাপন করছিলেন।

গোটিনঞ্জেনের বিশ্ববিশ্রুত গণিতজ্ঞ ডেভিড হিলবার্ট এবং বিশিষ্ট পদার্থবিজ্ঞানী লাডউইগ বোলৎজমানের অন্যতম দক্ষ ছাত্র হলেন এই এরেনফেস্ট। পাগল হয়ে যাওয়ার আশঙ্কায় বোলৎজমান শেষ পর্যন্ত

আত্মহত্যা করেন। আত্মহত্যার কিছু আগে এরেনফেস্ট এই, এবং সম্ভবত শেষ, শক্তিশালী ক্লাসিকাল পদার্থবিদের কাছে ভিয়েনায় গ্র্যাজুয়েট হন। হয়ত সারাজীবন তিনি সেন্ট পিটার্সবার্গেই কাটিয়ে দিতেন। কিন্তু এক অ-নামা ইহুদী এবং অস্ট্রিয় নাগরিক হিসেবে ওখানকার পলিটেকনিকে তাঁর পক্ষে মাত্র এক বছর শিক্ষকতা করা সম্ভব হয়েছিল।

সেন্ট পিটার্সবার্গ ছেড়ে যখন প্রাগে এলেন তখন প্রায়ই উনি আইনস্টাইনের সঙ্গে গভীর ও আবেগময় আলোচনায় ব্যস্ত থাকতেন। তখন তাঁর ধারণা ছিল না যে, অতি গুরুত্বপূর্ণ একটি পদ তাঁর জন্য অপেক্ষা করছে। ফিলিপ কোম্পানীর কাজকর্মের ব্যাপ্তি ঘটায় লিডেনের ডাচ বিশ্ববিদ্যালয় বেশি সংখ্যায় পদার্থবিজ্ঞানের ছাত্র নিতে শুরু করে। এতদিন ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ে পদার্থবিজ্ঞানের প্রধানের পদ অলঙ্কৃত করছিলেন বিশ্ববিশ্রুত বিজ্ঞানী হেনড্রিক অ্যান্টন লোরেনৎস—সেই লোরেনৎস যাঁর নাম পদার্থবিজ্ঞানের ইতিহাসে ইলেকট্রন থিয়োরীর জন্য চিরদিন স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে। লোরেনৎসের অবসর গ্রহণের পর এরেনফেস্টকে ঐ পদটি গ্রহণ করতে অনুরোধ করা হল।

লোরেনৎসের প্রতি আইনস্টাইনের ছিল গভীর শ্রদ্ধা। জুরিখে থাকতেই একবার লিডেন বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতা করতে গিয়ে তিনি লোরেনৎসের আতিথ্য গ্রহণ করেন। ১৯০৯ সালে তিনি লবকে লেখা এক চিঠিতেও ইঙ্গিত দিয়েছিলেন যে, বিকিরণ সমস্যা নিয়ে তিনি অধ্যাপক লোরেনৎসের সঙ্গে অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক চিঠিপত্র আদান-প্রদানে ব্যস্ত আছেন। ঐ চিঠিতে আরও লেখা ছিল—"I admire this man more than any other. I might almost say I love him."

১৯২৮ সালে পরিণত বয়সে লোরেনৎস মারা গেলেন। তাঁর অন্ত্যেষ্টি-অনুষ্ঠানে আইনস্টাইন নিম্নলিখিত হৃদয়-নাড়া-দেয়া কথাগুলো

বলেছিলেন—"আজ আমি দাঁড়িয়ে আছি এ যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ এবং সবচেয়ে মহৎ মানুষের কবরের পাশে তাঁরই একজন ছাত্র এবং প্রীতিমুগ্ধ অনুরাগী হিসেবে। তাঁর প্রোজ্জ্বল মেধায় আলোক-উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে ম্যাক্সওয়েলের মতবাদ থেকে শুরু করে নব্য পদার্থবিজ্ঞানের সৃষ্টিকাল। আর সে সৃষ্টিতে তিনি দান করে গেছেন গুরুত্বপূর্ণ সব ধ্যান-ধারণা ও প্রকরণ পদ্ধতি। একেবারে স্থূল বিশদ পর্যন্ত তাঁর সমগ্র জীবন তিনি এমনভাবে সাজিয়ে রেখেছিলেন যেন একটা সূক্ষ্ম শিল্পকর্ম। তাঁর ছিল never-flagging মহত্ব এবং ঔদার্য, আর ন্যায়ের প্রতি গভীর অনুভূতি। সেই সঙ্গে একটা নির্ভরযোগ্য স্বজ্ঞাধৃত মানুষ। ঘটনাবলী সম্পর্কে তাঁর ধারণা স্বভাবত তাঁকে সর্বত্র নেতৃপদে আসীন করেছে। প্রত্যেকেই সানন্দে তাঁকে অনুসরণ করেছেন। কারণ, সকলেই বোধ করতেন যে, তিনি কখন প্রাধান্য বিস্তারে লালায়িত নন, বরং সেবা করতেই সতত প্রস্তুত।"

মানবতাবোধ তথা বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের এই জ্বলন্ত উদাহরণটিকে পল এরেনফেস্ট তাঁর অপূর্ব শিক্ষণদক্ষতা এবং ছাত্রদের প্রতি প্রগাঢ় সহানুভূতি নিয়ে অনুসরণের চেষ্টা করতেন। কিন্তু পরিতাপের কথা, সু-উচ্চ নৈতিক চরিত্র এবং ক্ষুরধার মেধা সত্ত্বেও এই পদার্থবিদ্ হীনমন্যতায় বড় পীড়িত হয়ে পড়েন। অবস্থা এমন দাঁড়াল যে, জীবনে এবং সহকর্মীদের দ্বারা তিনি মানসিক দিক থেকে একেবারে ভেঙ্গে পড়লেন। দ্রুত অগ্রসর হয়ে গেলেন গুরুর পরিণতির দিকে। দীর্ঘ ও চিন্তাক্লিষ্ট দুঃখময় জীবনযাপনের পর ১৯৩৫-এর শরৎকালে একদিন আত্মহত্যা করলেন।

প্রথম বিশ্ব মহাযুদ্ধ এবং জার্মান জাতীয় সাম্যবাদের অভ্যুত্থানের মধ্যবর্তী সময়ে আইনস্টাইন প্রফেসর এরেনফেস্ট—the Gold-mensch—ছাড়া আর কোন লোকের সঙ্গে এতো বন্ধুভাবে মেশেন নি। এরেনফেস্টের বাড়িতে আইনস্টাইন সর্বদা ভাই-এর মতো অভ্যর্থনা পেতেন। একটি চিঠিতে আইনস্টাইন একবার লিখেছিলেন—

'Nature created us for each other'। পরে ১৯২২ সালে আবার লেখেন—"I find it difficult to find a human contact beneficial to me. I need your friendship perhaps more urgently than you need mine."। কতবার যে আইনস্টাইন বার্লিন থেকে লিডেন যেতেন তার সীমাসংখ্যা নেই। কেননা এরেনফেস্ট-দম্পতীর মধ্যে তিনি এমন বন্ধুত্বের সন্ধান পেয়েছিলেন যেখানে মিথ্যা দেবতার সংকীর্ণমনা পুজো নিয়ে হাসিঠাট্টা করা এবং পরক্ষণেই হঠাৎ সাধারণ কথোপকথনে পদার্থবিজ্ঞানের কোন জটিল সমস্যা নিয়ে সরাসরি ডুবে যাওয়া চলত। তিনি একবার সংক্ষিপ্ত জবাবে বলেছিলেন—"With other people things are far too respectable."। এরেনফেস্টের ছেলেমেয়েদের নিয়ে প্রায়ই গোটা দিন কাটিয়ে দিতেন সমুদ্রতীরে। তাঁর রোদ-ঝলসানো শরীরের উপর দিয়ে বাচ্চারা হামা দিত, অথবা তিনি ওদের মা-বাবার সঙ্গে বাক-এর ডুয়েট করতেন। যুদ্ধের কঠিন দিনগুলোতে এবং যুদ্ধোত্তর বছরগুলোতে আইনস্টাইনের কাছে লিডেন হয়ে উঠেছিল এক ধরনের স্যানাটোরিয়াম। এ স্যানাটোরিয়াম তাঁর আধ্যাত্মিক জীবনকে প্রদীপ্ত সূর্যরশ্মিতে অবগাহন করিয়ে দিতে পেরেছিল। কেননা, 'one can only bear solitude upto a certain point.'।

এরেনফেস্টের বিধবা-পত্নী—যাঁকে আইনস্টাইন "the laughing sphinx" বলে ডাকতেন—একবার আইনস্টাইন-জীবনীকার সেলিগের কাছে একটি ঘটনার উল্লেখ করেন। লিডেনের বৈজ্ঞানিক মহলে আইনস্টাইন কতখানি সম্মানের আসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন ঘটনাটি থেকে তা বোঝা যায়। অধ্যাপক এরেনফেস্ট, অধ্যাপক লোরেনৎস এবং নিউক্লীয় পদার্থবিদ্ জেমস ফ্রাঙ্ক (ইনি ১৯৩৩ সালে হিটলার রাজত্বের প্রতিবাদে স্বেচ্ছায় দেশ ছেড়ে যুক্তরাষ্ট্রে যান এবং নিউক্লীয় পদার্থ-বিজ্ঞানে মার্কিন গবেষণার কার্যসূচীতে গভীরভাবে অংশ নেন) পরস্পর

আলোচনা করছেন। আলোচনা প্রসঙ্গে আইনস্টাইনের কথা উঠল এবং প্রফেসর ফ্রাঙ্ক বললেন: একবার বার্লিন ফিজিক্স সোসাইটির এক অধিবেশনে বিখ্যাত পদার্থবিদ্ প্রফেসর ওয়াল্টার নার্নস্ট-এর সঙ্গে আইনস্টাইন তুমুল বিতর্কে প্রবৃত্ত হন। বিতর্ককালে অধ্যাপক নার্নস্ট কোন একটা কার্যকারণ সম্পর্কের কথা ওঠালে আইনস্টাইন মন্তব্য করলেন: "I do not think this relationship holds good."।

প্রত্যুত্তরে নার্নস্ট জানালেন—"But, my esteemed colleague, it is just this relationship on which you yourself quite recently insisted in a lecture."।

বিস্মিত নার্নস্ট আইনস্টাইনের কাছ থেকে জবাব পেলেন—"How can I help it if the Good Lord will not ratify what I maintained in my lecture ?"

গল্পটি শুনে এরেনফেস্ট-দম্পতী ও প্রফেসর ফ্রাঙ্ক একসঙ্গে হেসে উঠলেন। হাসলেন না শুধু লোরেনৎস। কয়েক মুহূর্ত গম্ভীর ভাবে চুপ করে রইলেন। শেষে এই কথা ক'টি যোগ করলেন—"Well, yes, Einstein is certainly in a position to argue on such lines."।

প্রাগে কিন্তু আইনস্টাইনের একদল প্রচণ্ড বিরুদ্ধবাদীও ছিলেন। এঁরা আইনস্টাইনের সহজ-সরল জীবনযাত্রা, উদারচেতা মনোভাব এবং সমাজের সব স্তরের লোকের সঙ্গে অবাধে মেলামেশা পছন্দ করতেন না। এঁদের মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের 'স্নব' অধ্যাপকেরাও ছিলেন। বিশেষ করে দার্শনিক অসকার ক্রাউস। রিলেটিভিটি থিয়োরী নিয়ে প্রায়ই ইনি প্রকাশ্যে আইনস্টাইনের সঙ্গে বিতর্কের আয়োজন করতেন। আইন-স্টাইন এগুলোকে বলতেন "circus performances"। একবার এ রকম একটি সান্ধ্য বিতর্ক বা 'সার্কাসের' শেষে আইনস্টাইন কিছুক্ষণ ভায়োলিন বাজিয়ে শ্রোতাদের শোনালেন। সেদিনের বিতর্ক সভায় জনসাধারণ ঐটুকু যা আনন্দ পেয়েছিলেন।

প্রাগে ঘনিষ্ঠ সহকর্মিদের মধ্যে এক উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিত্ব ছিলেন গণিতবিদ্ জর্জ পিক। শুধু গণিতশাস্ত্রে পারঙ্গমতাই নয়, পিক ছিলেন সঙ্গীতরসিক এবং নিজে ত অপূর্ব বেহালা বাজাতেন। তা ছাড়া, ভৌত বিশ্বের সমস্যাবলী নিয়েও তিনি মাথা ঘামাতেন। ফলে আইনস্টাইন ও পিকের মধ্যে গভীর সখ্যতা জন্মে।. ঐ দিনগুলিতে প্রায়ই আইন-স্টাইন পিকের সঙ্গে একত্রে সঙ্গীতে অংশ নিতেন। অবশ্য পিক ছিলেন মাক-এর শিষ্য, একদা মাক-এর সহকর্মিরূপে কাজও করেছেন। ফলে উভয়ের মধ্যে চলত অবিশ্রান্ত দার্শনিক বিতর্ক। ক্ষুরধার যুক্তি ও তর্কশাস্ত্রের গভীরতায় বিতর্কগুলো প্রাণবন্ত হয়ে উঠত। এ সময় আইনস্টাইন তাঁর সাধারণ আপেক্ষিক তত্ত্বের গাণিতিক দুর্গমতায় ক্ষত-বিক্ষত হচ্ছিলেন। পিকের সঙ্গে গণিত নিয়ে আলোচনা তাঁর কাছে আলোকরেখার কাজ করত। এই পিক-ই আইনস্টাইনকে বলেন যে, সম্ভবত ইতালীয় গণিতজ্ঞ রিসি ও লিভি-সিভিটার গাণিতিক কাজগুলো সাধারণ আপেক্ষিকতায় প্রয়োগ করে ভাল ফল পাওয়া যেতে পারে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে নাৎসী বাহিনী চেকোশ্লোভাকিয়া দখল করলে পিক-কে এক কনসেনট্রেশান ক্যাম্পে নির্বাসিত করা হয় এবং সেখানেই তিনি মারা যান।

আর যে অধ্যাপকের বাড়িতে আইনস্টাইনের ঘনঘন যাতায়াত ছিল তিনি হলেন মওরিস উইন্টারনিৎশ। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাচীন ইতিহাসের অধ্যাপক তথা বিশিষ্ট সংস্কৃত ভাষাবিদ্। উভয়ের পেশাগত পার্থক্য সখ্যতায় বাধা জন্মায় নি। দু'জনেই সাধারণ ও সাহিত্য বিষয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা উচ্চাঙ্গের আলাপ করতেন। উইন্টারনিৎশ-এর কল-রোলমুখর পাঁচ ছেলেমেয়ের কাছে আইনস্টাইন অন্যতম আকর্ষণ ছিলেন—ওরা তাঁকে কাছে পেলে আর কিছুতেই ছাড়ত না, তাদের খেলার সাথী করে নিত। প্রায়ই আইনস্টাইন তাঁর বেহালা সঙ্গে নিয়ে আসতেন। উইন্টারনিৎশ-এর এক শ্যালিকা ছিলেন সঙ্গীত-শিক্ষিকা। দু-জনে একত্রে আসর বসাতেন—আইনস্টাইন বাজাতেন

বেহালা, পিয়ানোয় সঙ্গত করতেন উইণ্টারনিৎশ-শ্যালিকা। শিক্ষিকা বলে তিনি ছিলেন বড় কড়া মেজাজের—আইনস্টাইন তাঁকে বলতেন 'a strict army Sergeant'।

অল্পদিনের মধ্যেই এখানকার বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রমহলে তিনি জনপ্রিয় হয়ে ওঠেন। একদিন ক্লাসে মহাকর্ষ বোঝাচ্ছিলেন। লেকচারের শেষে ছাত্ররা ভিড় করে তাঁকে ঘিরে ধরল এবং প্রশ্ন করতে লাগল।

— স্যার, বাড়িতে কখন গেলে আপনার সঙ্গে কথা বলা যায়?

— যে কোন সময় তোমরা আসতে পার।

— আপনার নিজের কাজে তাতে ব্যাঘাত ঘটবে না?

— তা হয়ত একটু হবে। তাতে কি। তোমরা চলে গেলে আবার নিজের কাজে তন্ময় হয়ে যাব।

অধ্যাপকদের মুখে এ ধরনের কথা শুনতে ছাত্ররা অভ্যস্ত ছিল না। এমন সরল উত্তর শুনে তারা বিস্মিত হল। এ রকম অধ্যাপকের সাহচর্যে তারা আগে কোনদিন আসে নি।

১৯১১ সালে বড়দিনের হপ্তা কয়েক আগে আইনস্টাইন হ্যাবিক্ট ভাইদের প্রাগে আসার আমন্ত্রণ জানালেন। "You will get something decent to eat without garlic, chives and onions. Prague is incidentally very well worth while visiting."। একমাত্র জেকব এরাট-ই আইনস্টাইনের ১২৫নং ট্রেবিজকেহো ইউলিস বাড়িটিতে এসেছিলেন। প্রাগে আর যিনি তাঁর বাড়িতে অতিথি হয়েছিলেন তিনি অটো স্টার্ন। আণবিক রশ্মি পদ্ধতি এবং প্রোটনের চৌম্বক ভ্রামক আবিষ্কার করে তিনি ১৯৪৩-এ পদার্থবিজ্ঞানে নোবেল প্রাইজ পান। স্টার্ন তখন ফিজিক্যাল কেমিস্ট্রিতে সদ্য ডক্টরেট হয়েছেন। তিনি আইনস্টাইনের স্বল্পসংখ্যক প্রত্যক্ষ ছাত্রদের অন্যতম। তাপ-গতিবিদ্যার প্রতি তাঁর বিশেষ আকর্ষণ ছিল। আইনস্টাইনের মতো এক অনন্যসাধারণ তত্ত্বীয় পদার্থবিদের-

তাপগতিবিদ্যার গবেষণার ক্ষেত্রে যাঁর প্রকৃতই ব্যুৎপত্তি ছিল—সান্নিধ্য লাভ করায় স্টার্ন নিজেকে খুব ভাগ্যবান বলে মনে করতেন। উভয়েরই মলিকিউলার থিয়োরীতে অনুরাগ ছিল। দু'জনেই তাপতত্ত্বের প্রতিভাধর পথিকৃৎ লাডউইগ বোলৎজমানের ভক্ত ছিলেন। এজন্য মনের দিক থেকে উভয়ে খুব কাছাকাছি এসেছিলেন। অসংখ্য বৌদ্ধিক যুদ্ধের মালমশলা দু-জনের কাছেই সঞ্চিত ছিল। মলিকিউল নিয়ে এঁরা আলোচনা শুরু করলেই অদূরে শুনতে পেতেন গণিতজ্ঞ জর্জ পিকের সানন্দ হাসি। আর্নস্ট মাক-এর সহকারী হিসেবে কাজ শেষ হয়ে গেলে প্রাগ বিশ্ববিদ্যালয় পিককে ডেকে নেয়। মলিকিউলের 'কুসংস্কার'-কে ঠাট্টা করার জন্য পিক ছিলেন সদাপ্রস্তুত, অথচ কখন ব্যাপারটি বুঝতে রাজি হতেন না।

যা হোক, পরবর্তীকালে ১৯৫২ সালে ক্যালিফোর্নিয়ার বার্কলে থেকে সিলিগকে লেখা এক চিঠিতে অধ্যাপক স্টার্ন মন্তব্য করেন: "আইনস্টাইনকে শত সহস্র ধন্যবাদ! তিনি আমায় শুধু কোয়াণ্টাম তত্ত্বের সমস্যাবলীকেই যথাযথ দৃষ্টিতে দেখতে শেখান নি। গোটা ফিজিক্সের প্রতি তাঁর সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি এবং আমার সমস্যাবলী সম্পর্কে তাঁর উৎসাহ পদার্থবিদ্‌রূপে গড়ে উঠতে আমায় সুনির্দিষ্টভাবে সাহায্য করেছিল।" ডঃ অটো স্টার্ন ছিলেন আপার সাইলেশিয়ার এক মিল মালিকের ছেলে। FIT-তে ভৌত-রসায়নে Privatdozent পদে স্টার্নের নিয়োগের পেছনেও আইনস্টাইনের যথেষ্ট হাত ছিল। ১৯১২-র মে থেকে আলবার্ট আইনস্টাইনের নেতৃত্বে উনি বৈজ্ঞানিক কাজকর্মে লিপ্ত ছিলেন—প্রথমে প্রাগে, পরে জুরিখে।

আইনস্টাইন ও অধ্যাপক ভাইস ছাড়া স্টার্নের দরখাস্তে আর যিনি সুপারিশ করেন তিনি প্রফেসর ই. বাওয়ার। সুপারিশ পত্রে তিনি যে মন্তব্য করেন তা প্রণিধানযোগ্য: "গত শতাব্দীতে আশির দশকে অসমোটিক প্রেসার, ফ্রি আয়ন এবং ফেজ রুল প্রভৃতি মতবাদের ফলে ভৌত-রসায়ন প্রচণ্ড ভরবেগ লাভ করে এবং তারপর নব্বুই-এর

দশকে এসে রুদ্ধগতি প্রাপ্ত হয়। গত দশক থেকে আবার একটা উর্ধ্ব গতির লক্ষণ দেখা যাচ্ছে। শেষ বিশ্লেষণে অবশ্য এর কারণ প্লাঙ্কের বিকিরণ তত্ত্ব। এই গবেষণাক্ষেত্রের ক্রমোন্নতি বিশেষ কাম্য এবং আমার মতে সব দিক বিবেচনায় হের স্টার্ন এ হলেন কাজে যথার্থ উপযুক্ত এক ব্যক্তি।"

এর কিছুদিন পরে ওঁর দরখাস্ত সুইস এডুকেশানাল কাউন্সিল অনুমোদন করেন। ১৯১৪-এর গ্রীষ্মকালীন টার্মে স্টার্নের লেকচারের বিষয়বস্তু ছিল: সল্যুশন বা দ্রবণ, পরবর্তী শীতের টার্মে মলিকিউলার থিয়োরী বা আণবিক তত্ত্ব। তারপর তাঁর ডাক আসে ফ্রাঙ্কফুর্ট থেকে। যুক্তরাষ্ট্রে যাওয়ার আগে ইনি বরস্টক এবং হ্যামবুর্গে শিক্ষকতা করেছেন।

আইনস্টাইনের সহকারী হপফ-ও জুরিখ থেকে প্রাগে তাঁর সহযাত্রী হন। হপফের স্বাভাবিক হৃদয়ালোক ছিল আইনস্টাইনের পক্ষে মঙ্গলকর। ১৯১১ সালে এই সদয় ও অমায়িক ব্যাভেরিয়ান ভদ্রলোক সিদ্ধান্ত করেন যে, তিনি আচেন পলিটেকনিকে এক সহকারীর পদ গ্রহণ করবেন। কারণ, কোন বিখ্যাত ব্যক্তির কোট ধরে বছরের পর বছর ঝুলে থাকা তাঁর মতে নিভ্রান্ত অনুচিত। আচেন-এ এই নুরেমবার্গার শীঘ্রই আপেক্ষিক-গণিত এবং আপেক্ষিক মেকানিক্সের সবচেয়ে জনপ্রিয় শিক্ষকে পরিণত হন। কিন্তু সারা জীবন আইনস্টাইনের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে ভোলেন নি।

১৯৩১ সালে রিলেটিভিটি থিয়োরীর উপর হপফ একটি বই লেখেন। এ বিষয়ে এর চেয়ে জনপ্রিয় অথচ সুস্পষ্ট এবং বিষয়নিষ্ঠ বই সম্ভবত আর নেই। বইটির ছত্রে ছত্রে ফল্গুধারার মতো একটি কথাই প্রবহমান। তা হল: আইনস্টাইনের এই টাইটানিক কাজে যা প্রকাশ পেয়েছে পদার্থবিজ্ঞানের মাটিতে তার চেয়ে প্রাণবন্ত এবং সাধারণ চিন্তারাজ্যে তার চেয়ে প্রভাবশালী দ্বিতীয় কোন চিন্তাধারা অদ্যাবধি জন্ম নেয় নি।

"রিলেটিভিটি থিয়োরীই প্রথম সেই পথের দিকে আমাদের চোখ খুলে দেয় যেখানে পুরাতন বিশ্বাসযোগ্য ধারণার উপর প্রকৃতি আর নির্ভরশীল নয়। আমাদের সংস্কারগুলোর হাত থেকে আমরা যাতে মুক্ত হতে পারি রিলেটিভিটি তার প্রথম সন্ধান দিয়েছে। অন্য দিকে এটি প্রকৃতির অতি-পরিচিত বিধানগুলোকে এত স্পষ্টভাবে এমন একটা তন্ত্রভুক্ত করেছে যে, আজ অবশ্যই একে শেষ কথা এবং ক্লাসিকাল পদার্থবিজ্ঞানের পরিপূর্ণতা বলে মানতে হয়। হয়ত একে আরও ব্যাপক করা চলতে পারে, এবং নবাগত পারমাণবিক এবং কোয়ান্টাম পদার্থবিজ্ঞানের প্রচণ্ড ঝঞ্ঝায় স্থানে স্থানে এর হয়ত বা পরিবর্তনও ঘটতে পারে। কিন্তু একে একেবারে ঝাঁকুনি দেয়া সম্ভব নয়। সবচেয়ে বড় কথা, it lights the way to new fields"।

প্রথম বিশ্বমহাযুদ্ধের সময় হপফ বার্লিনে Air Ministry Supplies-এর বায়ুগতিবিদ্যা বিভাগের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। এয়ারক্র্যাফটের সুস্থিতি, উড্ডয়নকালে বাঁক নেয়া এবং বিপরীতপৃষ্ঠ হয়ে উড্ডয়ন সম্পর্কে তৎকালীন বায়বীয় ধারণাগুলির পরিচ্ছন্ন করণে তাঁর কাজ স্পেশালিস্টরা সে সময় চূড়ান্ত বলে মেনে নিয়েছিলেন। অধ্যাপক রিচার্ড ফিউক্সের সহযোগিতায় তিন খণ্ডে তিনি যে "হ্যাণ্ডবুক অফ্ এরোডায়নামিক্স" প্রকাশ করেন তাতে অধিকাংশ সমস্যার সমাধান দেয়া আছে এবং আজও সেটি প্রামাণ্য গ্রন্থগুলোর অন্যতম।

আর্যামির ধাক্কায় ১৯৩৪ সালে আচান থেকে তাঁর চাকরি যায়। শেষে আশ্রয় পান ডাবলিনের ট্রিনিটি কলেজে। উচ্চতর গণিতের লেকচারার পদে। ১৯৩৩-এ বেলজিয়ামের লে কক-এ আইনস্টাইন National Socialist Germany থেকে বিতাড়িত শিক্ষক ও ছাত্রদের জন্য অন্তর্বর্তী বিশ্ববিদ্যালয় খোলার এক দুর্ভাগ্যজনক ও অপ্রীতিকর পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। আইনস্টাইন তখন ধরে নিয়েছিলেন যে, বিশ্বস্ত হপফ তাঁর অগাধ প্রশিক্ষণ অভিজ্ঞতা নিয়ে তাঁর সঙ্গে অবশ্যই যোগ দেবেন। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে তা হয় নি।

বার্নে এবং জুরিখ বিশ্ববিদ্যালয়ের বছরগুলোতে আইনস্টাইন তাঁর আবিষ্ক্রিয়াগুলো নিয়ে দুটি বিজ্ঞান কংগ্রেসে লেকচার দেন। একটি ইনস্‌ব্রুকে, অন্যটি সালজবুর্গে। বিশিষ্ট বেলজিয়ান শিল্পপতি ও রসায়নবিদ্‌ আর্নস্ট সলভের আমন্ত্রণে ১৯১১-তে তিনি প্রাগ থেকে ব্রুসেলস গেলেন। সলভে তাঁর আবিষ্ক্রিয়া ammoniacal soda-কে স্বয়ং শিল্পরূপ দেন এবং ফলে অচিরেই প্রচণ্ড বিত্তশালী হয়ে ওঠেন। বৈজ্ঞানিক হিসেবে সলভে খুব উঁচুদরের ছিলেন না। তিনি কতকগুলো কালজীর্ণ নিজস্ব ভৌত ধারণা মনে মনে পোষণ করতেন। সেগুলো প্রকাশ করার উদ্দেশ্য নিয়ে তিনি ঠিক করলেন, বিশ্বের সেরা পদার্থ-বিদ্‌দের নিয়ে এক কনফারেন্স বসাবেন। সমস্ত দায়িত্ব দিলেন বন্ধু ও বিশিষ্ট বিজ্ঞানী ওয়াল্টার নার্নস্টকে। নার্নস্টই ঠিক করলেন কোন্‌ কোন্‌ বিজ্ঞানীকে আমন্ত্রণ জানাবেন। প্রত্যেকের যাতায়াত ও রাহাখরচ এবং হাজার ফ্রাঙ্ক দক্ষিণার ব্যবস্থা হল। সব খরচ সলভের। এখানেই আইনস্টাইন সাক্ষাৎ পেলেন রেডিয়ম-খ্যাতা মাদাম কুরীর। কুরীর বস্তুনিষ্ঠা ও ন্যায়ের প্রতি সচেতনতা তাঁকে মুগ্ধ করল। দেখা হল আরো অনেকের সঙ্গে। হেনরী পঁয়কার, পল লাজঁভা, ম্যাক্স প্লাঙ্ক, ওয়াল্টার নার্নস্ট, আর্নস্ট রাদারফোর্ড এবং বিশেষ করে তিনি যাঁকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করতেন এবং ভালবাসতেন সেই এইচ. এ. লোরেনৎস। এঁর সঙ্গে অবশ্য কয়েক বছর আগে হল্যাণ্ডে ব্যক্তিগতভাবে আইনস্টাইনের সাক্ষাৎ হয়। ব্রুসেলসে এসে অনেকের সঙ্গেই তাঁর বন্ধুত্ব হল। আর একটি কারণে এই কনফারেন্স তাঁর কাছে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে তা হল, সেখানে ব্যক্তিগত আলাপ-আলোচনায় তাঁর জুরিখে ফেরার কথা আলোচিত হল। দীর্ঘ ষোল বছর পরে ১৯২৭-এ অনুষ্ঠিত দ্বিতীয় সলভে কনফারেন্সেও তিনি যোগ দেন। সেবার সঙ্গে ছিলেন নীলস বয়র এবং এরেনফেস্ট। আলোচ্য বিষয় ছিল 'ইলেকট্রন ও ফোটন'। তারপর তিনি তৃতীয় এবং শেষবারের মতো সলভে কনফারেন্সে যোগ

দিয়েছিলেন ১৯৩০-এ।

প্রথম সলভে কংগ্রেসে রিলেটিভিটি নিয়ে প্রাণবন্ত আলোচনা হল। আইনস্টাইনের অভিমত: তত্ত্বটি পুরোপুরি কেউই হৃদয়ঙ্গম করেন নি। এমন কি পঁয়কারও নন। তিনি উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করলেন লোরেনৎস-এর। 'Lorentz is a miracle of intellect and tact. A living work of art! In my view he is the most intelligent of all the theoreticians present.'।

. শীগগীরই বৃদ্ধা প্রাগ নগরীর ম্যাজিক তাঁর কাছ থেকে সরে গেল। ১৯১১-র ৫ই জুলাই বার্নে লুসিয়েন চ্যভন তাঁর কাছ থেকে শুনলেন—"এখানে আমার সময় ভালই কাটছে। তবে জীবন এখানে সুইজারল্যাণ্ডের মতো অত সুখকর নয়। একে আমি বিদেশী। তা ছাড়া, এখানকার পানীয় জল এত খারাপ যে, না ফুটিয়ে খাওয়া চলে না। অধিবাসীদের অধিকাংশ জার্মান বলে না এবং মনোভাবে অত্যন্ত জার্মান বিরোধী। এখানকার ছাত্ররাও অত বুদ্ধিমান ও পরিশ্রমী নয়, যেমনটা পেয়েছিলাম সুইজারল্যাণ্ডে। কিন্তু ইনষ্টিটিউটটি বড় ভাল। আর এর লাইব্রেরী একেবারে চমৎকার—magnificient।"

পরবর্তীকালে কথোপকথনে এ সময়ের প্রসঙ্গ উঠলে আইনস্টাইন স্বভাবসিদ্ধ সংক্ষিপ্ত উত্তরে প্রাচ্যের স্বাস্থ্যকর অবস্থা সম্পর্কে বলেছিলেন যে, সুইস কাল্ট এবং পরিচ্ছন্নতার সঙ্গে ওর কোন তুলনা চলে না। "One should not take it too much to heart. The filthier a nation is, the tougher it is."

১৯১২-র ২রা ফেব্রুয়ারী। আইনস্টাইন প্রফেসর স্টার্নকে লিখলেন—"দু-দিন আগে (Halleluja!) আমায় জুরিখ পলিটেকনিকে ডেকে পাঠান হয়েছিল। এখানে আমি ইতিমধ্যে সরকারীভাবে পদত্যাগ করেছি। বুড়ো লোকটা এবং ছোট্ট ভালুক দুটির খুব আনন্দ হয়েছে।" এক সপ্তাহ পরে হ্যাবিক্ট ভায়েরাও জানলেন ভাগ্যের এই নতুন পরিবর্তনের কথা, জানলেন আইনস্টাইন

এবং তাঁর কয়েকজন সহকর্মী মহাকর্ষ নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা করছেন। হ্যাবিক্টদের তিনি লিখলেন—ঘরমুখো পায়রা জুলাই-এর শেষে পৌঁছচ্ছে। "The homing pigeon will arrive at the end of July."।

বিদ্বজ্জন মহলে অনেকদিন ধরেই জুরিখের সুইস পলিটেকনিক বা ফেডারেল ইনষ্টিটিট্যুট অব টেকনলজি (FIT)-তে আলবার্ট আইনস্টাইনকে নিয়ে আসার চেষ্টা চলছিল। আইনস্টাইনের প্রিয় গণিত-অধ্যাপক হেরমান মিনকাওস্কির স্বহস্তে লেখা একখানা চিঠিই তার প্রমাণ। মৃত্যুর মাত্র তিন মাস আগে, ১৯০৮-এর ১৮ই অক্টোবর, কম্পিত হস্তের অক্ষরে লিপজিগের এক হোটেল থেকে এই বৃদ্ধ জ্ঞানতাপস সুইস এডুকেশানাল কাউন্সিলের প্রেসিডেন্ট ডঃ রবার্ট নেমকে চিঠি লেখেন—"আমার এবং সহকর্মিদের মতে আলোচ্য বর্ষে সবচেয়ে প্রতিভাবান গণিত-ছাত্র হলেন হের লুই কোলরস। একথা বলার অর্থ অনেক কিছু বলা। কেননা, ঐ দিনগুলোতে যে স্বল্প-সংখ্যক ছাত্র ডিপার্টমেন্ট VI-এ ছিল তাঁদের ভেতর থেকে বেশ কিছু বিশিষ্ট গবেষক বেরিয়েছেন। যেমন বার্নের আলবার্ট আইনস্টাইন, গোটিনজেনের ওয়াল্টার রিৎজ এবং আপনাদের মার্শেল গ্রসমান। চার বছর আগে কোলরস দুটো টার্ম গোটিনজেনে ছিলেন। আমি তখন তাঁর মধ্যে সহজ বাচনভঙ্গি এবং চিন্তার পরিচ্ছন্ন প্রকাশ আবিষ্কার করেছিলাম। তাঁর গাণিতিক প্রতিভাকে আমি খুব উঁচুতে স্থান দি।

"আমি সত্যিই দুঃখিত যে, অধ্যাপনার প্রচণ্ড চাপে তাঁর বৈজ্ঞানিক সৃষ্টিকর্ম যথেষ্ট বাধা পেয়েছে। Comptes Rendus পত্রিকায় প্রকাশিত তাঁর একটা সংক্ষিপ্ত প্রবন্ধের কথা আমি জানি। তাঁর ডিপ্লোমার কাজ থেকে এর উদ্ভব। তাঁর আর একটা কাজ হল, জুরিখে পেশ করা তাঁর ডক্টরেট থিসিস। গোটিনজেনে থাকার সময় থেকে শেষোক্ত কাজের সূত্রপাত। দুটি কাজের ফলাফল খুবই

সুদূরপ্রসারী এবং একথা মানতে হবে যে, অতি অল্প লোকের পক্ষেই এত উঁচু স্তরে ওঠা সম্ভব।

"এ প্রসঙ্গে আর একটা কথা নিবেদন করতে চাই। বহু বিদ্বজ্জনের অভিমত যে, Descriptive জ্যামিতির ক্ষেত্রে এক বিশেষ প্রতিভার প্রয়োজন যা গাণিতিক প্রতিভার সঙ্গে এক নয়। এই বিশেষ প্রতিভা ঐ সমস্ত ব্যক্তিদের ( চিঠিতে কোলবস ছাড়া উল্লিখিত হয়েছেন ওয়াডল্যাণ্ডার ও গুস্তাভ ডুমাস ) কতটা আছে তা তাঁদের প্রকাশিত গবেষণাপত্র থেকে ধারণা করা সম্ভব নয়।

"আমার দেয়া সংবাদ খুবই অসম্পূর্ণ। তবে, প্রিয় হের প্রেসিডেন্ট, প্রার্থনা করব চিঠিটি আপনি পলিটেকনিক সম্পর্কে আমার চিরন্তন উৎসাহের প্রকাশ বলেই ধরবেন। সেই সূত্রে আমি কি সাহস করে নিম্নোক্ত খবরটা আপনাকে দিতে পারি? এই ছুটির মধ্যে, কোলনে Natural Science Congress-এ এবং আবার লিপজিগে আমার সানন্দে জানার সুযোগ হয়েছিল যে, FIT-র এক প্রাক্তন ছাত্রের কাজ বিজ্ঞানীমহল কী উঁচু মর্যাদায় দেখে থাকেন। ছাত্রটি হলেন আলবার্ট আইনস্টাইন। সংবাদের সূত্র হিসেবে যাঁদের নাম করতে পারি তাঁরা হলেন বার্লিনের নার্নস্ট ও প্লাঙ্ক এবং লিডেনের এইচ. এ. লোরেনৎস"।

জুরিখ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আইনস্টাইনের পদত্যাগের ছ' মাসের মধ্যেই মার্শেল গ্রসমান কৌশলে প্রাগে বার্তা পাঠাতে শুরু করেন। উদ্দেশ্য তাঁর বন্ধু FIT-তে যোগ দিতে উৎসাহী কিনা জানা। ১৯০২ সালে গ্রাজুয়েট হওয়ার পর গ্রসমানের বাবার মাধ্যমেই আইনস্টাইন বার্নের পেটেন্ট অফিসের চাকরিটি পেয়েছিলেন। বন্ধুর কাছ থেকে গ্রসমান উত্তর পেলেন ১৮ই নভেম্বর, ১৯১১। "মোদ্দা কথা, আমি তোদের পলিটেকনিকে স্বভাবত তত্ত্বীয় পদার্থবিজ্ঞানের অধ্যাপক-পদ পেতে উৎসাহী। জুরিখে ফেরার সম্ভাবনা আমার কাছে বড় সুখকর। এ জন্য গত কয়েকদিন আগে আমি ইউট্রেক্ট বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদানের

আমন্ত্রণ পেয়েও গ্রহণ করতে রাজী হই নি। তুই ত জানিস আমি তোর সঙ্গে সর্বৈব একমত যে, 'পলি'র ডিপার্টমেন্ট VIII-এ ছাত্রদের যা পড়ান হয় তার সামান্য অংশই আধুনিক। যদি এ অভাব পূরণের সুযোগ পাই তবে খুশি হব। শেষ অবধি আমায় নেয়া সাব্যস্ত হলে যোগদানের তারিখ সম্পর্কে শিক্ষাবর্ষের আরম্ভকালই আমার সবচেয়ে পছন্দ। সম্ভবত পরবর্তী শরৎকাল, কারণ ফ্যাকাল্টির দিক থেকে সেটাই হবে মঙ্গলজনক।"

প্রাগ ছেড়ে জুরিখে আসার এই স্বতঃস্ফূর্ত ইচ্ছার পেছনে আইনস্টাইনের পারিবারিক সুখ-সুবিধার ভাবনাও বেশ সক্রিয় ছিল। কেননা, মিলেভা কিছুতেই জুরিখ ছেড়ে প্রাগে আসতে চান নি। আইনস্টাইনই তাঁকে বুঝিয়ে-সুজিয়ে এনেছিলেন। বলেছিলেন—"Do you realise, Mileva, for the first time I shall be a full Professor with a proper salary. And we won't be in Prague for life."। এ কেশান াল কাউন্সিলের প্রেসিডেন্টের সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য আইনস্ট ইনকে আমন্ত্রণ জানান হল। অবশ্য সময়াভাবে তিনি সাক্ষাৎ করতে পারলেন না। পরিবর্তে শুধু পাঠিয়ে দিলেন—১৯০১-১৯১১ অবধি তাঁর বৈজ্ঞানিক কাজকর্মের একটা হাতে লেখা লিস্ট, সংক্ষিপ্ত জীবনপঞ্জী এবং পরিশিষ্ট হিসেবে জুরিখের বিশিষ্ট সহকর্মীদের কাছ থেকে সং হীত বিবিধ ডকুমেন্ট। আকাঙ্ক্ষিত ফল লাভের পক্ষে এগুলিই যথেষ্ট ছিল। জুরিখ বিশ্ববিদ্যালয়ের ফোরেনসিক মেডিসি ইনষ্টিটিউ্যটের ডিরেক্টার প্রফেসর হাইনরিখ জাঙ্গার FIT-কর্তৃপক্ষকে ১৯১১-র ১৪ই ডিসেম্বর একটি চিঠি লেখেন। আইনস্টাইন সম্পর্কে দ্রুত সিদ্ধান্তে আসার প্রয়োজনীয়তার ব্যাপারে চিঠিটি FIT-কর্তৃপক্ষকে সচেতন করে তোলে। চিঠির অংশবিশেষ এই রকম। "কিভাবে আইনস্টাইনের সঙ্গে ব্যাপারটির সূত্রপাত তা আমি জানি না। কিন্তু হঠাৎ ভিয়েনাতে জানতে পেলাম যে, আগামী জানুয়ারীর শেষে তিনি ওখানে বক্তৃতা করতে

আমন্ত্রিত হয়েছেন। তাঁর মনের ইচ্ছা এই যে, শেষ পর্যন্ত হয়ত তাঁকে ওখানে একটা চাকুরি দেয়া হবে ইত্যাদি। সময় থাকতে বিপদ সঙ্কেত বুঝিনি—এবার আর আমার বিবেক ঝুঁকি নিতে চাইছে না।"

FIT-তে পদার্থবিজ্ঞানের অধ্যাপকরূপে ফেবার-এর উত্তরাধিকারী ছিলেন পরা ও অয়শ্চুম্বক ক্ষেত্রের বিশিষ্ট গবেষক পিয়ের ভাইস (১৮৬৫-১৯৪০)। তাঁর ইচ্ছা ছিল যে, মাদাম কুরী ও হেনরী পঁয়কার এই দুই প্রতিভাধর বিজ্ঞানীর কাছ থেকে নবীন সহকর্মী সম্পর্কে তাঁদের ধারণাটি জেনে নেবেন। ১৯১০ সালে আইনস্টাইনের নতুন তত্ত্ব সম্পর্কে পঁয়কার মন্তব্য করেছিলেন—"অত্যন্ত কষ্ট করে পরিণত বয়সে আমি আইনস্টাইনের পথকে খুঁজে পেয়েছি"। হ্যাঁ, ওঁদের উত্তর এল এবং সুইস এডুকেশানাল কাউন্সিল সেগুলো একটি কভারিং চিঠিতে বার্নের ফেডারেল ডিপার্টমেন্ট অব দি ইন্টিরিয়র বরাবর পাঠিয়ে দিলেন ১৯১২-র ২৩শে জানুয়ারী। কভারিং চিঠিতে যা লেখা ছিল তা হল: "মিনকাওস্কির অবসর গ্রহণের পর (১৯০২) উচ্চতর গণিতের প্রধান অধ্যাপক-পদটি শূন্য পড়ে আছে। প্রথম দিকে আমাদের স্টাফের ভেতর থেকেই (হারউইৎজ, রুডিও, ভাইস ইত্যাদি) ঐ পদ পূরণের চেষ্টা করেছিলাম এবং কিছুটা সফলও হয়েছিলাম। কিন্তু একদিকে ভগ্নস্বাস্থ্যের জন্য (প্রফেসর হারউইৎজ), অন্যদিকে প্রাগ্রসর ছাত্রদের সঙ্গে কাজ করার প্রচণ্ড চাপের দরুন (প্রফেসর ভাইস) এবং আরও অন্যান্য অবস্থাগতিকে এই সাময়িক ব্যবস্থা চালু রাখা খুব কঠিন বা অসম্ভব হয়ে পড়ে। ফলে পাঠ্যসূচী ক্রমাগত ছাঁটকাট করতে হয়, বিশেষত ডিপার্টমেন্ট VIII-এর উঁচু ক্লাসের (স্কুল ফর স্পেশালিস্ট ইন ম্যাথ এণ্ড ফিজিক্স) ছাত্রদের সিলেবাস্। বর্তমান শিক্ষণ-শক্তির এই অপ্রতুলতার প্রতি বহুবার আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে।

"অবস্থার উন্নতি ঘটাতে আমাদের পূর্ববর্তী চেষ্টাগুলোর ব্যর্থতার পেছনে বড় কারণ হল কাকে নিয়োগ করা হবে সেই মনোনয়ন

ব্যাপারটি। সম্প্রতি বহু সুযোগ্য বিশেষজ্ঞ ঐ পদে ডঃ আলবার্ট আইনস্টাইনকে নিয়োগের পরামর্শ দিয়েছেন। বর্তমানে ইনি প্রাগের জার্মান বিশ্ববিদ্যালয়ে তত্ত্বীয় পদার্থবিজ্ঞানের অধ্যাপক। স্কলার হিসেবে ইনিই আমাদের প্রয়োজন মেটাতে সমর্থ। আমরা এভাবে তরুণ গবেষকের মর্যাদা নিরূপণ করেছি: ইতিমধ্যে তিনি যা অর্জন করেছেন তা থেকে, তাঁর সম্পর্কে সর্বোচ্চ কর্তৃপক্ষের ধারণা কেমন কিছুটা তা থেকে (যা আমাদের কাছে প্রেরিত চিঠিতে লিপিবদ্ধ), আর বাকীটা তাঁর প্রকাশিত গবেষণাপত্র থেকে।"

প্যারিসের Faculty de Science থেকে ১৯১১-র ১৭ই নভেম্বর কুরী লিখলেন—"আধুনিক তত্ত্বীয় পদার্থবিজ্ঞানের সমস্যা নিয়ে আইন-স্টাইনের প্রকাশিত কার্যাবলী দেখে আমি বিস্মিত। তা ছাড়া, আমার বিশ্বাস, গাণিতিক-পদার্থবিদ্‌মাত্রেই একমত হবেন যে, কাজগুলো একেবারে উচ্চতম পর্যায়ের। আমি সম্প্রতি ব্রুসেলসে এক বৈজ্ঞানিক সভায় গিয়েছিলাম। আইনস্টাইনও ঐ সভায় যোগ দেন। ফলে তাঁর মানসিক স্বচ্ছতা, জ্ঞানের পরিধি এবং গভীরতার সান্নিধ্যে আসার সুযোগ হয়েছিল। দেখেশুনে আমি মুগ্ধ। কারও কারও মনে প্রশ্ন জাগতে পারে যে, বয়সের দিক দিয়ে তিনি নিতান্ত তরুণ। সেক্ষেত্রে তা হলে আইনস্টাইনের এই অধিকার বর্তাচ্ছে যে, ভবিষ্যতে তাঁর মধ্যে আমরা অন্যতম শ্রেষ্ঠ তত্ত্বীয় বিজ্ঞানীকে দেখতে পাব এই আশা স্থাপন করা চলে। আমার মনে হয়, কোন বৈজ্ঞানিক সংস্থা আইনস্টাইনকে যদি ইচ্ছামত কাজ করার সুযোগ দিয়ে তাঁর মর্যাদার উপযুক্ত অধ্যাপক পদে নিয়োগের সিদ্ধান্ত করেন তবে ঐ সংস্থা নিজেই সম্মানিত হবেন এবং নিঃসন্দেহে, বিজ্ঞানের প্রতি একটা মহৎ কর্তব্যও সম্পাদন করবেন।"

বিখ্যাত গণিতজ্ঞ এবং Institut de France-এর সদস্য হেনরী পঁয়কার লিখলেন—"আইনস্টাইন হলেন আমার দেখা সবচেয়ে মৌলিক চিন্তাবিদদের অন্যতম। বয়সের তারুণ্য সত্ত্বেও ইনি ইতিমধ্যে এ যুগের

অগ্রগণ্য বিজ্ঞানীদের মধ্যে মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত। বিশেষ করে তাঁর যে গুণে আমি মুগ্ধ তা হল কী অনায়াস দক্ষতায় তিনি নিজেকে নতুন ধ্যান-ধারণার সঙ্গে মানিয়ে নেন এবং সেগুলো থেকে সব কিছু সিদ্ধান্ত আহরণ করেন। নিজেকে শুধু ক্লাসিকাল নিয়মনীতিতেই তিনি আবদ্ধ রাখেন নি। পদার্থবিজ্ঞানের যে কোন সমস্যা তাঁকে দেয়া হলে তিনি দ্রুততার সঙ্গে তার সব রকম সম্ভাবনাগুলোকে খতিয়ে দেখতে পারেন। একবার কোন সমস্যা তাঁর মনের অন্দর মহলে প্রবেশ করলে তা নতুন ব্যাপারটির সবগুলো দিগন্ত খুলে দেয়। অথচ ব্যাপারটি তখনও পরীক্ষিত হয় নি, পরে হয়ত পরীক্ষায় যাচাই করা চলবে।...... সব দিকে অনুসন্ধান চালান বলে, মনে হয়, তিনি যে সব পথে চলেন তাদের অধিকাংশ কাণাগলি। কিন্তু সেই সঙ্গে অবশ্য এও আশা করতে হবে যে, এই দিকগুলোর যেটি তিনি নির্দেশ করেছেন তাই হয়ত ঠিক এবং তাই যথেষ্ট। প্রত্যেকের ঠিক এভাবেই এগিয়ে চলা উচিত। গাণিতিক-পদার্থবিদদের ভূমিকা হল শুধু প্রশ্ন উপস্থাপিত করা এবং একমাত্র পরীক্ষাই তার সমাধান দিতে পারে। আগামী দিনগুলো আরও বেশি করে আইনস্টাইনের কাজের মূল্যকে সপ্রমাণ করবে। যে বিশ্ববিদ্যালয় এই তরুণ স্কলারকে আকর্ষণ করার পর্যাপ্ত বুদ্ধি দেখাবে, সন্দেহ নেই, সে প্রভূত সম্মান অর্জনে সমর্থ হবে"।

বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক বিশ্ববিশ্রুত পদার্থবিদ ম্যাক্স প্লাঙ্ক ১৯০৯ সালের বসন্তকালে কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে "Eight lectures on Theoretical Physics" শীর্ষক একটি বক্তৃতামালা প্রদান করেন। পরে ঐ বক্তৃতামালা বই আকারে প্রকাশিত হয়। বইটির উনিশ-পৃষ্ঠায় আইনস্টাইনের কাজের উল্লেখ ও উচ্ছ্বসিত প্রশংসা রয়েছে। প্লাঙ্ক বলেছেন—

" 'সময়' সম্পর্কে আইনস্টাইনকৃত এই নতুন ধারণা পদার্থবিদদের বিমূর্তন ক্ষমতা ও কল্পনাশক্তির প্রতি এক বিরাট চ্যালেঞ্জ। দূরকল্পী

বা স্পেকুলেটিভ বিজ্ঞান এবং এমন কি, আমি বলতে চাই, দার্শনিক জ্ঞানতত্ত্ব বা এপিস্টেমোলজিতে যা কিছু অর্জিত হয়েছে এই ধারণা, সাহসিকতার দিক থেকে, তাদের সব কিছুকে ছাড়িয়ে গেছে। তুলনায় এর কাছে অ-ইউক্লীডীয় জ্যামিতি নেহাতই বালক্রীড়া। তথাপি, বিশুদ্ধ গণিতের জগতে, গুরুত্ব সহকারে এ পর্যন্ত যা কিছু চিন্তাভাবনা করা হয়েছে, অ-ইউক্লীডীয় জ্যামিতির বৈপরীত্যে আপেক্ষিক তত্ত্বকে তাতে পুরোপুরি অংশ নিয়ে প্রকৃত ভৌত-তাৎপর্য অর্জন করতে হবে। ভৌত বিশ্বের যে ধারণা এতদিন আমরা লালন করে এসেছি এই তত্ত্ব তাতে ভূ-কম্পন সৃষ্টি ক'রে পূর্ণ-বিপ্লব ঘটিয়ে দিয়েছে। বিস্তৃতি ও গভীরতায় একমাত্র কোপারনিকাসের বিশ্বধারণার আবির্ভাবের সঙ্গে এর তুলনা করা চলে"।

প্রাগ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক পদে আইনস্টাইনকে মনোনয়ন দেয়ার আগেও কর্তৃপক্ষ তাঁর কাজের সম্পর্কে প্লাঙ্কের অভিমত জানতে চেয়েছিলেন। তখনও প্লাঙ্ক অনুরূপ মন্তব্যই করেছিলেন— "If Einstein's theory should prove correct, as I expect it will, he will be considered the Copernicus of the 20th century."

মিউনিখ বিশ্ববিদ্যালয়ের শ্রুতকীর্তি অধ্যাপক ও বিশিষ্ট পদার্থ-বিজ্ঞানী ডঃ আর্নল্ড সোমারফেল্ড ১৯১১ খ্রীস্টাব্দে কার্লশ্রুহে শহরে জার্মান ন্যাচারাল সায়েনটিস্ট এণ্ড ডক্টরসদের এক বার্ষিক অধিবেশনে ভাষণ দিচ্ছিলেন। বিষয়বস্তু ঃ প্লাঙ্কের অ্যাকশন কোয়ান্টাম ও আণবিক পদার্থবিজ্ঞান। বক্তৃতাকালে অন্যান্য অনেক কথার মধ্যে তিনি বললেন—

"আমাদের সোসাইটির বিজ্ঞানশাখা যখন আমার কাছে এ সভায় রিলেটিভিটির উপর একটা রিপোর্ট করার অনুরোধ করেন তখন এই অজুহাতে আমি আপত্তি জানাই যে, বর্তমানে রিলেটিভিটি তত্ত্ব আর পদার্থবিজ্ঞানের বিতর্কমূলক বিষয়বস্তু নয়। যদিও এর বয়স মাত্র

ছ বছর—আইনস্টাইনের কাজের প্রকাশকাল ১৯০৫—তবু এর মধ্যেই পদার্থবিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠিত বিধানরূপে এটি স্বীকৃতি পেয়েছে। প্লাঙ্কের আবিষ্ক্রিয়া থেকে সবচেয়ে বেশি ফলাফল যিনি নিষ্কাশন করেছেন তিনি আইনস্টাইন। প্রসঙ্গক্রমে, রিলেটিভিটি তত্ত্বের ক্রমবিবর্তনেরও আগে, সেই স্মরণীয় ১৯০৫ সালে আইনস্টাইন শক্তির বিকিরণ ও শোষণের কণা-প্রকৃতিকে দেশ-এ ( space ) আলোকশক্তির গঠন (structure)-এর ক্ষেত্রে বিস্তৃত করেছিলেন। ······যে পরিস্থিতিতে আমাকে এখানে রিলেটিভেটি থিয়োরী স্পর্শ করতে হচ্ছে তাতেই প্রমাণিত হয় যে, কতটা গভীরভাবে এই থিয়োরী আমাদের ভৌত চিন্তাধারার মূলে অনুপ্রবেশ করেছে।"

এ রকম আরও উক্তি—যেমন লোরেনৎসের, ক্যামারলিঙ ওনেসের —উদ্ধৃত করা যায়। লোরেনৎস বলেন—হের আইনস্টাইন এক অনন্য প্রতিভাধর পুরুষ। সৃষ্টিধর্মী চিন্তায় তাঁর মস্তিষ্ক যেন ভরপূর। বাগ্মিতার ঝলক বা আবেগের উৎসারণে মন্ত্রমুগ্ধ করে তোলার শিক্ষক তিনি নন। বরং বক্তব্যের নিশ্চিত্যে এবং স্বচ্ছতার প্রকাশেই তিনি আকাঙ্ক্ষিত ফল লাভ করেন। কঠিনতম সমস্যার উপরও তিনি সুস্পষ্ট এবং বোধগম্য ভাষায় বক্তৃতা করার দক্ষতা রাখেন। তাঁর সম্পর্কিত সব কিছু এই ভবিষ্যদ্‌বাণী করে যে, যাঁর বৈজ্ঞানিক জীবনের ঊষাকাল এত অসাধারণ সাফল্যে ভাস্বর সেই জীবনের সমাপ্তি পর্বটি হবে আরও গৌরবময় এবং উজ্জ্বলতর চলমান অধ্যায়ের ক্রম-সংযোজন। আমাদের সুইস অধ্যাপকবৃন্দ—ফ্রানেল, গাইসার, গ্রসমান, কোলরস স্টোডোলা, ভাইস প্রমুখ সকলেই—এ বিষয়ে অনুরূপ ধারণা পোষণ করেন। তাঁর প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে সকলেই ঐক্যমত। শিক্ষণ বিভাগে তাঁর আগমনকে সবাই সানন্দ স্বাগত জানাচ্ছেন।

"জুরিখ বিশ্ববিদ্যালয়ের যে অধ্যাপকের পরামর্শে আইনস্টাইন বার্নের পেটেন্ট অফিস ছেড়ে ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ের সহকারী অধ্যাপক হয়েছিলেন সেই ডঃ ক্লাইনারের অভিমত হল: যদি অধ্যাপক পদ

ডিপার্টমেণ্ট VIII-এ তিন টার্মের জন্য শুরু হল তাঁর অধ্যাপনা। বিষয়ঃ গণিত ও পদার্থবিজ্ঞান। ছাত্রদলঃ স্পেশালিস্ট শিক্ষক। ডিপার্টমেণ্টের প্রধান: তাঁর পুরনো বন্ধু ও সহপাঠী মার্শেল গ্রসমান। যে যে বিষয় আইনস্টাইন পড়ালেন তা হলঃ

| | | |
|---|---|---|
| ১৯১২-১৩ : | শীতকালীন টার্ম | সময় |
| | অ্যানালিটিক্যাল বলবিদ্যা | ৩ ঘণ্টা |
| | তাপগতিবিজ্ঞান | ২ ঘণ্টা |
| | পদার্থবিদ্যার সেমিনার | ২ ঘণ্টা |
| ১৯১৩ : | গ্রীষ্মকালীন টার্ম | সময় |
| | বিস্তৃত বস্তুর বলবিদ্যা | ৩ ঘণ্টা |
| | তাপের আণবিক তত্ত্ব | ২ ঘণ্টা |
| | পদার্থবিদ্যার সেমিনার | ২ ঘণ্টা |

সঙ্গে প্রাগ্রসর ছাত্রদের জন্য প্রত্যহ ল্যাবরেটরির কাজ।

| | | |
|---|---|---|
| ১৯১৩-১৪ : | শীতকালীন টার্ম | সময় |
| | তড়িৎ ও চুম্বক | ৪ ঘণ্টা |
| | রশ্মি-আলোকবিজ্ঞান ও প্রতিসরণ | ১ ঘণ্টা |
| | পদার্থবিদ্যার সেমিনার | ২ ঘণ্টা |

সেই সঙ্গে প্রত্যহ ল্যাবরেটরি পিরিয়ড।

FIT-তে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ হল তাঁর পুরনো বন্ধু গ্রসমান ও কোলরসের। অবশ্য এবার শিক্ষকরূপে। ছাত্রাবস্থায় যে সব অধ্যাপকের অধীনে কাজ করেছেন বা যাঁদের সহকারী ছিলেন তাঁদের মধ্যে তখনও কর্মরত ছিলেন হারউইৎজ, গাইসার ও ফ্রানেল। এঁদের সান্নিধ্যে এসে আইনস্টাইন খুব আনন্দিত হলেন।

আইনস্টাইনের লেকচারের প্রতিক্রিয়া ঘটতে দেরি হল না। ওঁর প্রতিটি বক্তৃতা যথোচিত মর্যাদা ও প্রশংসা আদায় করে নিল।

বিদ্বজ্জন মহলে তাঁর নেতৃত্ব অকুণ্ঠ স্বীকৃতি পেল। আর এই স্বীকৃতি তিনি লাভ করলেন বিনা ঈর্ষায়। অবশ্য প্রতিষ্ঠা তাঁর চরিত্রের অন্তর্নিহিত সারল্য বা বিনয়কে বিন্দুমাত্র বিকারগ্রস্ত করল না। কোন প্রশ্নের উত্তর দিতে অপারগ হলে নির্দ্বিধায় বলতেন—"I don't know"। এমন কি ছাত্রদের সামনেও। যা হোক, উনি ছিলেন এক শক্তিধর যুক্তিবিদ, কিন্তু শিল্পী হিসেবে বিশ্বাস করতেন যে, সৃষ্টিশীলতার বিকাশে উপযুক্ত-কালের একটা প্রভাব আছেই। এক পরিশ্রমী সাহিত্যিক এমিল লাডউইগ-কে তিনি একবার বলেছিলেন —"Great thoughts must first be felt before they can be tried out scientifically on natural phenomena."। প্রাকৃতিক বিধানগুলোর অভ্রান্ততায় তাঁর অচলা বিশ্বাস তাঁকে জীবনের বহু কঠিন মুহূর্তে বেদনার আঘাত থেকে উত্তরণে সাহায্য করেছিল। তাঁর মতে পদার্থবিজ্ঞানের সর্বোচ্চ লক্ষ্য হওয়া উচিত—"প্রকৃতির সবচেয়ে মৌল সব বিধান আবিষ্কার করা যেগুলো থেকে বিশুদ্ধ অবরোহী প্রথায় মহাজাগতিক-মূর্তি লাভ করা যাবে।"

বার্গডর্ফে'র এক প্রাক্তন গণিত-ছাত্রের স্মৃতিচারণায় এ সময়কার FIT-র বৈশিষ্ট্যের কিছু কিছু সন্ধান মেলে। তিনি লিখেছেন যে, আইনস্টাইন খুব সতর্কতার সঙ্গে তাঁর লেকচারগুলো তৈরি করতেন। বস্তুত, ওগুলো ঠিক লেকচার ছিল না। ওগুলো হল উচ্চস্বরে নিজের সঙ্গে নিজেরই চিন্তার আদান-প্রদান। কি করে ঐ সব চিন্তাকে মৌল ধারণাবলীতে রূপ দেয়া যায় এবং প্রাত্যহিক জীবনের উদাহরণের মাধ্যমে কি করে জটিল তত্ত্বকেও বোঝান চলে এই ছিল তাঁর একমাত্র চেষ্টা। বিশুদ্ধ গাণিতিক ব্যায়ামের কোন আকর্ষণ তিনি অনুভব করতেন না। প্রায়ই বলতেন: সৌন্দর্য ব্যাপারটা মুচি আর দর্জিদের জন্য তোলা থাক, আমাদের গবেষণার লক্ষ্য হোক সত্য। "We will leave beauty, gentlemen, to shoemakers and tailors. The goal of our research must remain truth."

একবার বোর্ডে অ্যানালিটিক্যাল বলবিত্তার একটা কঠিন অঙ্ক কষছিলেন। ডা'আলেমবার্ট-এর সূত্র থেকে লাগরাঞ্জ সমীকরণের ব্যাসকলন করতে গিয়ে মুহূর্তের জন্য আটকে গেলেন। মনে হল, সমাধানটা ভুলে গেছেন। কয়েক সেকেণ্ড চিন্তাক্লিষ্ট থেকে ছাত্রদের বললেন—"কী হাস্যকর ব্যাপার! ঠিক এই মুহূর্তে সমাধানটা মনে আসছে না। অথচ কত সহজে সমাধানটা পাওয়া চলে। একবার শুধু ঘরে গিয়ে আব্রাহামের বইটা দেখে নিতে হবে।" এই বলে বই আনতে দরজার দিকে পা বাড়ালেন। দু-পা গিয়েই ফিরে এলেন। বললেন—"এভাবে নিজেকে ছোট করা ঠিক নয়। আব্রাহামের সাহায্য ছাড়াই এটা আমায় বের করতে হবে।" I can't let myself down in this way. I must find it without Abraham's help."। বলেই সঙ্গে সঙ্গে সমাধানটা করে ফেললেন।

আইনস্টাইনের মতো নিরহঙ্কার ও লৌকিকতামুক্ত শিক্ষক FIT আর কোনদিনই পায় নি। একবার—সে ১৯১২ সালের কথা—ক্লাশ শেষে ঐ ছাত্রটি বেরিয়ে এল দক্ষিণের ঘর থেকে। ক্লাশ ছিল অধ্যাপক ভাইস-এর। সেই মুহূর্তে আইনস্টাইনও বেরিয়ে এলেন আর এক ঘর থেকে ক্লাশ নিয়ে। ছেলেটিকে দেখেই কাছে ডাকলেন। বললেন, "এস, আমার সঙ্গে। অনেক কিছু বলার আছে তোমায়। শোন, শেষ অবধি মহাকর্ষ তত্ত্বের সমাধান বের করেছি।" অকুণ্ঠ মনোযোগের সঙ্গে ছাত্রটি তাঁর নতুন মহাকর্ষ তত্ত্বের ব্যাখ্যা শুনছিল। হঠাৎ বলে উঠল—"প্রফেসর, আপনার তত্ত্বের সত্যতা যাচাই-এর জন্য পরবর্তী সূর্যগ্রহণ অবধি দীর্ঘ আট বছর অপেক্ষা করতে হবে। এটা কি আপনার পক্ষে মানসিক নির্যাতন নয়?" অত্যন্ত নিরাসক্ত ও সহজ-ভাবে আইনস্টাইন উত্তর দিলেন—"তুমি ত জান, আমার মতো লোক কত কিছু তন্নতন্ন করে ঘেঁটেছে এবং বাজে-কাগজের ঝুড়িতে কত কিছু ফেলেছে। তার পক্ষে যদি এটা ভুল বা শুদ্ধ হয় তা জানা তত গুরুত্বপূর্ণ নয়।"

একবার একদল ছাত্র আইনস্টাইনের সঙ্গে দেখা করে 'আণবিক তত্ত্বে'র উপর তাঁর লেকচারের সময় ঠিক করে নিল। শনিবার সকাল সাতটা থেকে ন'টা। দেখা গেল, সময়টা নিয়ে দু-জন ছাত্রের কিছু আপত্তি আছে। আইনস্টাইন ওদের জিজ্ঞেস করলেন—"ও-সময় তোমাদের কী এমন জরুরী কাজ আছে?" তারা বললে—"হের প্রফেসর, ঐ সময় জ্যোতির্বিজ্ঞান বিষয়ে ওলফার লেকচার দেবেন।" আইনস্টাইন একটু আশ্চর্য হলেন। বললেন—"সত্যি কি তোমরা ওঁর লেকচার শুনতে যাচ্ছ?" ওলফার তখন একজন পুরো প্রফেসর, তবে শিক্ষক হিসেবে তাঁর একেবারেই নাম ডাক নেই। কাজেই আইনস্টাইনের প্রশ্নটা অহেতুক ছিল না।

লেকচার বা ল্যাবরেটরির কাজের পর কেউ আলোচনা করতে চাইলে আইনস্টাইন তাঁকে সঙ্গে যেতে আমন্ত্রণ জানাতেন। একবার এক শীতের সন্ধ্যায় ছেলেদের একটা ছোট্ট দল তাদের শিক্ষকের সঙ্গে জুরিখবার্গে গল্পগুজব করছিল। প্রফেসর আইনস্টাইন ওখানে এলেন এবং একটা 'ইণ্টারেস্টিং' সমস্যা নিয়ে বলতে শুরু করলেন। দাঁড়ালেন একটা স্ট্রীট ল্যাম্পের নিচে। ফোটানো ছাতাটি একজনের কাছে রেখে বের করলেন একটা নোটবুক। ওদিকে বাইরে তখন তুষারঝড় চলছে। ঐ পরিস্থিতিতেও শ্রোতারা যাতে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি ভাল করে বুঝতে পারেন এজন্য নোটবুকে লিখলেন নানা ফর্মূলা, আঁকলেন হরেক রকম চিত্র।

ছাত্রদের তিনি বারবার উপদেশ দিতেন তারা যেন সহজ কাজে আত্মনিয়োগ না করে। "Never go in for easy tasks, gentlemen"। একই কথা তিনি একটা চিঠিতেও বলেছেন। চিঠিটি আবার ঐ ছেলেটিকেই লেখা। বার্লিন থেকে ১৯১৫-র ৩১শে মে। চিঠির অংশবিশেষ এই রকম। "বৈজ্ঞানিক প্রচেষ্টা সম্পর্কে একটা অদ্ভুত ব্যাপার হল যে, প্রায়ই এমন সব জিনিস নিয়ে পর্যবেক্ষণ চালান হয় যেখানে সময় ও শক্তিক্ষয়ের প্রয়োজন নেই। সহজে

সিদ্ধির দেখা মেলে এমন লক্ষ্যের দিকে যাওয়া ঠিক নয়। শুধু দুরূহ চেষ্টাতে অর্জন সম্ভব এমন কিছুকেই লক্ষ্য হিসেবে অনুভূতিতে ধরা উচিত। উদাহরণ হিসেবে 'A study on the nature of magnetic molecules' এই চুম্বকীয় কাজটি যে কেউ করতে পারেন। কিন্তু সাধারণ আপেক্ষিকতা বা General Relativity সম্পূর্ণ অন্য জাতের কাজ। আমার লক্ষ্যে যে আমি পৌঁছতে পেরেছি তাতেই এ জীবনের পরম পরিতৃপ্তি। অবশ্য এ পথের গভীরতা ও প্রয়োজনীয়তা এখনও আমার অনেক বিশেষজ্ঞ সহকর্মী স্বীকার করেন না। না করুন, তবু আমি তৃপ্ত। দুটো প্রয়োজনীয় অঙ্গীকারের একটা ত ইতিমধ্যে চমৎকারভাবে প্রমাণিত হয়েছে। যথা, মহাকর্ষ বিভবে বর্ণালী রেখার বিচ্যুতি।"

১৯১৩-র গ্রীষ্মকালটি আইনস্টাইন কাটালেন ইতস্ততঃ ভ্রমণ করে। প্রথমটা হল, কনরাড হ্যাবিক্টের কাছে গিয়ে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎকার। হ্যাবিক্ট ইতিমধ্যে বিয়ে করেছেন এবং থাকতেন শায়ারস্-এ। তারপর উল্লেখযোগ্য হল ম্যারি কুরীর সঙ্গে পার্বত্য অঞ্চলে একটা ছোট্ট সফর। কুরী এসেছিলেন আইনস্টাইন-দম্পতীর বাড়িতে। মাত্র কয়েক ঘণ্টার জন্য। উদ্দেশ্য: নিছক সাক্ষাৎকার এবং ১৯১০-র শলভে কংগ্রেসে আইনস্টাইনের সঙ্গে তাঁর যে সখ্যতা জন্মেছিল তা দৃঢ় করা। এই দুই বিজ্ঞানীশ্রেষ্ঠের মধ্যে অনেক বিষয়ে সাদৃশ্য ছিল—বস্তুনিষ্ঠা, আত্ম-নিয়মানুবর্তিতা ও বিনয়-নম্রতা। ১৯১৩-র তেসরা এপ্রিল আইনস্টাইন তাঁর বিজ্ঞানপথের সহযাত্রী কুরীকে একটি চিঠি লেখেন। তাতে তিনি কুরীকে স্মরণ করিয়ে দেন যে, এ টার্মের শেষে পার্বত্য অঞ্চলে ভ্রমণসূচী কার্যকর করার সুযোগ রয়েছে। সেই সঙ্গে উভয়ের বৈজ্ঞানিক আলাপ-আলোচনার সুযোগেরও ইঙ্গিত দিলেন। লিখলেন—ম্যাক্স ফন লাওয়ে গতকাল আমায় বলেছেন যে, নিয়মিত সজ্জাযুক্ত স্ফটিকের তিনটি এক্স-রে ফোটোগ্রাম পরিমাপ করে দেখা গেছে যে, প্রাপ্ত মান সব ক্ষেত্রে এক

নয়। এটা সত্যি হলে, গতিতত্ত্বের বিরুদ্ধে যে গুরুতর ত্রুটির কথা বলা হয় তা নস্যাৎ হয়ে যাচ্ছে। লাওয়ে আরও জানিয়েছেন যে, স্ফটিকগুলোর অবস্থানের প্রভাব এত গভীর যে, প্রতিফলন তত্ত্ব বা শ্যাফ্‌ট থিয়োরী দিয়ে তাকে ঢাকা দেয়া সম্ভব নয়।

অগাস্ট মাসে আইনস্টাইন কুরীর সঙ্গে প্রস্তাবিত সফরে বেরলেন। সঙ্গে বড় ছেলে আলবার্ট ও কুরীর দুই মেয়ে আইরিন ও ইভ। জুনিয়র আলবার্টের বয়স তখন দশ, আইরিনের ষোল, ইভের নয়। কুরী ও আইনস্টাইন ভাবলেন, তাঁরা বৈজ্ঞানিক চিন্তার আদান-প্রদান করবেন আর ছোট ছেলেমেয়েরা বেশ মজা করে বেড়াতে পারবে। মিলেভা গেলেন না। বাড়িতেই রয়ে গেলেন ছোট ছেলে এডুয়ার্ডকে নিয়ে। আইনস্টাইনও পীড়াপীড়ি করলেন না। কারণ দু-জনেই জানতেন উভয়ের দাম্পত্য জীবন নষ্ট হয়ে গেছে। বিবাহ সুখের হয় নি।

যা হোক, প্রস্তাবিত সফরটি হল যাকে বলে একেবারে 'grand success'। পরবর্তীকালে মায়ের জীবনীগ্রন্থে ইভ এই ভ্রমণের কথা উল্লেখ করেছেন। লিখেছেন—"সেবার গ্রীষ্মে ম্যারি কুরী তাঁর সহন-শক্তির প্রমাণ দিলেন। পিঠে বোঝা নিয়ে এনগাডাইন-এর পার্বত্য ভূমিতে বেড়িয়ে এলেন। তাঁর দুই মেয়েও সঙ্গী ছিল। দলে আর ছিলেন আলবার্ট আইনস্টাইন ও তাঁর (বড়) ছেলে।" একটানা বহু বছর ধরে কুরী ও আইনস্টাইন চমৎকার বৌদ্ধিক সখ্যতার রোদ পুইয়েছেন। পরস্পারের প্রতি উভয়ের ছিল প্রগাঢ় শ্রদ্ধা। তত্ত্বীয় পদার্থবিজ্ঞানের অন্তহীন আলোচনায় দু-জনেই অনাবিল আনন্দ পেতেন। আলোচনা চলত অংশত জার্মান ভাষায়, অংশত ফরাসীতে। ছোটদের কাছে সফরটি ছিল নেহাতই প্রমোদ ভ্রমণ। তারা লাফাতে লাফাতে এগিয়ে চলত। অগাস্টের তাপদগ্ধ এনগাডাইন উপত্যকার সবুজ ঘাসে তখন সবে পাণ্ডুরতা এসেছে। নীল আকাশের পটভূমিতে রঙ-বেরঙের ফুলে ফুলে প্রজাপতির নাচানাচি দেখে মনে হত যেন

ফুলেরই নাচানাচি। পিঠের বোঝার চাপ ভুলে অফুরান শক্তিতে বাচ্চারা ঘণ্টার পর ঘণ্টা হেঁটে চলত। মাঝে মাঝে পেছন থেকে তাদের কানে ভেসে আসত জার্মান বা ফরাসী ভাষায় অদ্ভুত অদ্ভুত কথা—দেখুন, মহাশূন্যে পতনশীল ট্রেনে যাত্রীদের ঠিক কী ঘটে তা আমায় জানতেই হবে। "You see, I must know exactly what happens to the travellers in a train when it falls into the void······"। ছোটরা এ সব কথা শুনত আর খুব এক চোট হাসত। তারা কী করে বুঝবে যে, রিলেটিভিটি থিয়োরীর কাছে এ রকম কাল্পনিক সংঘর্ষ এক অন্যতম প্রধান সমস্যা। টেবিলে বসে ওমলেট খেতে খেতে জুনিয়র আলবার্ট অভিযোগের সুরে বলেই বসল—"You talk of nothing but gravitation. Every time we wait for you to catch up with us we know what exactly you'll be saying"। সত্যিই তাই! অনুযোগ করে ঝাঁঝিয়ে উঠল ইভ-ও—"We toss up to to see if you'll be talking in French or German."। টসে আইরিন জিতেছে—"She guessed right every time."।

চমৎকার সফর শেষে আইনস্টাইন জুরিখে ফিরে এলেন শারীরিক ও মানসিক উভয় দিক থেকেই চাঙা হয়ে। FIT-তে তাঁর কাজের চাপ ছিল খুব বেশি। তবু তার মধ্যেই বৈজ্ঞানিক গবেষণার জন্য সময় করে নিতেন। বন্ধু গ্রসমান অবশ্য তাঁকে খুবই সাহায্য করতেন। বন্ধুর কঠিন কঠিন গাণিতিক সমস্যার বাধা তিনিই অপসারণ করতেন। তখনও তাঁর তত্ত্ব সম্পূর্ণভাবে গৃহীত হয় নি, গবেষণার আরও অগ্রগতি দরকার। সেজন্য চাই নিরবচ্ছিন্ন সময়। এই ক্লাশগুলো যদি না নিতে হত! ওদিকে তাঁর নতুন মহাকর্ষ তত্ত্বকে রথী-মহারথীরা ক্রমাগত নিষ্ঠুরভাবে আক্রমণ করে চলেছেন।

আইনস্টাইন খবর পেলেন তাঁর প্রাক্তন সহকারী হপফ নিজ শহর নুরেমবার্গের এক ডাক্তারের মেয়েকে বিয়ে করেছেন। শুনেই চটপট

তাঁকে কয়েক লাইনের এক চিঠি পাঠালেন—আমি খুব খুশি হব যদি তুমি ও তোমার 'বেটার-হাফ' শীগগিরই সাক্ষাতের উদ্দেশে আমার কাছে আস। মহাকর্ষ তত্ত্বের ব্যাপারটি চমৎকারভাবে এগুচ্ছে এবং, যদি ভুল বুঝে না থাকি তবে, আমি সাধারণ সমীকরণগুলো পেয়ে গেছি। হয়ত দেখে থাকবে, Physikalische Zeitchrift পত্রিকায় আব্রাহাম তু-তুটো হিংস্র আক্রমণ চালিয়ে রিলেটিভিটি থিয়োরীকে একেবারে নিহত করে ফেলেছেন। লিখেছেন: "তথা-কথিত প্রকৃত মহাকর্ষ তত্ত্ব বা true gravitation theory একটা টগবগে ঘোড়া। তবে ওর তিনটে পা নেই।" প্রসঙ্গক্রমে বলেছেন: "শক্তির ভর ব্যাপারটা নাকি রবার্ট মেয়ারের গবেষণাপ্রসূত।"

আইনস্টাইন মনে মনে যা চাইছিলেন অলক্ষ্যে জীবনদেবতা বোধ হয় তার প্রস্তুতি চালাচ্ছিলেন—গবেষণার জন্য সর্বভারমুক্ত নিরবচ্ছিন্ন সময়ের ব্যবস্থা। মহাকর্ষ সম্পর্কে তাঁর নতুন ধ্যান-ধারণা ব্যাখ্যা করার জন্য ভিয়েনার Natural Scientists and Doctors নামে এক কনফারেন্স থেকে তাঁকে আমন্ত্রণ জানান হল। ভিয়েনা যাবার সুযোগ পেয়ে আইনস্টাইন খুব খুশি হলেন। কারণ বিখ্যাত দার্শনিক পদার্থবিদ্ আর্নস্ট মাক-এর সঙ্গে সাক্ষাতের এক তীব্র আকাঙ্ক্ষা তাঁর বরাবরই ছিল। মাক-এর চিন্তাধারায় তিনি খুব প্রভাবিত হন।

মাক ছিলেন একদা ভিয়েনা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক। নিম্নাঙ্গ পক্ষাঘাতগ্রস্ত হওয়ার ফলে বাধ্য হয়ে তাঁকে বার বছর আগেই অকালে অবসর নিতে হয়। তিনি শহরের সুন্দর উপকণ্ঠে নিভৃত-জীবন যাপন করতে থাকেন। শুধু পড়াশোনা আর পড়াশোনা। একমাত্র ল্যাণ্ডলেডি ছাড়া বড় একটা কারও সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হত না। লোকমুখে আলবার্ট গুজব শুনেছিলেন যে, দীর্ঘকাল রোগে ভুগে তিনি অন্তেবাসী, বিশ্বনিন্দুক, নিষ্ঠুর খরজিহ্বে পরিণত হয়েছেন। এই বিশ্বখ্যাত বিদ্বান লোকটিকে আইনস্টাইন লিখে পাঠালেন যে, শীগগিরই তিনি ভিয়েনায় যাচ্ছেন এবং ওঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে আগ্রহী। পত্রপাঠ মাক-এর

কাছ থেকে উত্তর এল ঃ যে ব্যক্তির কাজের গুরুত্বে বৈজ্ঞানিক মহল আজ চঞ্চল তাঁর সঙ্গে ব্যক্তিগত সাক্ষাতের সুযোগলাভে তিনিও যার-পর-নাই খুশি হবেন। এ সাক্ষাৎকারকে তিনি স্বাগত জানাচ্ছেন।

কনফারেন্স শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ঘোড়ায়-টানা বাসে চেপে আইনস্টাইন চললেন ভিয়েনার উপকণ্ঠে যেখানে থাকেন প্রফেসর মাক। পথে যেতে যেতে দেখলেন, কী সুন্দর শহর! যেমন সুখকর এর জলবায়ু, তেমনি চমৎকার এর স্থাপত্যশিল্প। আর লোকজন একেবারে বন্ধুত্বপূর্ণ, অতিথিবৎসল, সংস্কৃতিসম্পন্ন এবং অত্যন্ত আমুদে। তাঁদের সঙ্গীতপ্রীতিতে তাঁরা সঙ্গীতপ্রিয় আইনস্টাইনের একেবারে মনের মানুষ হয়ে উঠলেন।

আলবার্ট অধ্যাপক মাক-এর বাড়ি খুঁজে বের করলেন। ল্যাণ্ড-লেডি দরজা খুলে ওপরে যাওয়ার সিঁড়ি দেখিয়ে দিলেন। পরিবেশ নিখুঁতভাবে পরিচ্ছন্ন এবং উজ্জ্বল। দোতলায় এক দরজার সামনে এলেন আইনস্টাইন। অবশেষে আজ মাক-এর সাক্ষাৎ পাচ্ছেন—এই ভাবনায় আলবার্ট কিছুটা উত্তেজিত। যাঁর লেখা কত বই পড়েছেন, বহু বছর ধরে যাঁর ধ্যানধারণায় অবগাহন করেছেন, আর কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই তাঁর সঙ্গে তিনি মুখোমুখি কথা বলবেন! কেমন যেন শিহরণ বোধ করলেন। দরজায় টোকা দিতেই ভেতর থেকে ভেসে এল একটা রূঢ় ও সংক্ষিপ্ত কণ্ঠস্বর—'Come in.'। এবং আলবার্ট ভেতরে ঢুকলেন।

ডেস্কের পাশে একটা হুইল-চেয়ারে বসে ছিলেন অধ্যাপক মাক। বই আর কাগজপত্রের আড়ালে প্রায় অদৃশ্য। মাথায় একরাশ অবিন্যস্ত পাকা চুল—যেন আলবার্টের কেশরাশির সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে চায়। শুধু মাথার চুল নয়, দাঁড়িও সমান পাকা ও অবিন্যস্ত—পরি-পাটির এত অভাব যে, দেখে বুড়ো নাবিক বা ভবঘুরে বলে মনে হয়। মুখমণ্ডল বৃহদাকার ও চ্যাপ্টা, দুই চোখে এক সুচতুর সৌজন্যতার অভিব্যক্তি।

"আইনস্টাইন ?"— জিজ্ঞেস করলেন অধ্যাপক মাক।

"হ্যাঁ"—ঘাড় নাড়লেন আলবার্ট।

"অনুগ্রহ করে একটু জোরে বলবেন। আমার অন্যান্য অপ্রীতিকর বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে আমি আবার, যাকে বলে, বদ্ধ কালা।"

প্রথম সাক্ষাতের পক্ষে কথা ক'টি মোটেই আশাপ্রদ নয়। কিন্তু দেখা গেল, কিছুক্ষণের মধ্যেই উভয়ে গভীর আলোচনায় ডুবে গেছেন। মাক তাঁর তত্ত্বের কিছু কিছু বিষয়বস্তু যা বছরের পর বছর ধরে আলবার্টের কাছে হতবুদ্ধিকর মনে হয়েছিল তা ব্যাখ্যা করলেন। এতদিন যে সব ব্যাপারে আলবার্ট ভিন্নমত পোষণ করতেন তা দূর হল। হৃষ্টচিত্তে ভিয়েনা থেকে জুরিখ ফিরে গেলেন আলবার্ট।

এর কিছু পরে ১৯১৩ সালের ৩০শে নভেম্বর—আইনস্টাইন সুইস এডুকেশানাল কাউন্সিলের প্রেসিডেন্টকে নিম্নোক্ত চিঠি পাঠালেন—

"কিছুদিন আগে আমি মৌখিকভাবে আপনাকে জানিয়েছিলাম যে, সম্ভবত প্রাশিয়ান অ্যাকাডেমি অব সায়েন্সে একটা অধ্যাপক পদ আমাকে দেয়া হবে। কি কারণে ঐ পদ গ্রহণে আমি ইচ্ছুক তা নিয়েও তখন আমি আপনার সঙ্গে আলোচনা করেছিলাম। এখন সেই পদ গ্রহণ করার প্রস্তাব এসেছে। তাই আপনাকে অনুরোধঃ আগামী ১৯১৪-র ১লা এপ্রিল বর্তমান দায়িত্বভার থেকে আমায় অব্যাহতি দিন। আপনার তথা কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে আমি সর্বদা যে বন্ধুত্বপূর্ণ সহযোগিতা পেয়েছি সেজন্য হৃদয়ের মর্মস্থল থেকে এই সুযোগে আপনাকে অশেষ ধন্যবাদ জানাই।"

বিদ্যুতের আবিষ্ক্রিয়ায় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার ক্ষেত্রে এক বিপ্লবের সূত্রপাত ঘটে। বহুদিক থেকে একে প্রায় অর্ধশতাব্দীর ব্যবধানে সংঘটিত পারমাণবিক বিপ্লবের পূর্বসূরী বলা যায়। রেডিও ইঞ্জিনিয়ারিং, এক্স-রে ইঞ্জিনিয়ারিং, ভ্যাকুয়াম টিউব প্রভৃতি নতুন ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্পের অভ্যুদয়ে বিশ শতকের আরম্ভকালটি

চিহ্নিত। এ ক্রিয়াকাণ্ডে পদার্থবিজ্ঞানের পরীক্ষা-নিরীক্ষা ছিল উৎপাদন ব্যবস্থার এক অপরিহার্য অঙ্গ। এ কারণে বড় বড় ইলেকট্রিক সংস্থাগুলো সর্বপ্রথম এ ধরনের পরীক্ষাগার স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে সচেতন হন। এ সব ল্যাবরেটরি স্বাধীনভাবে শুধু গবেষণায় লিপ্ত থাকবে, গবেষণালব্ধ ফলাফলের সম্ভাব্য প্রয়োগ নিয়ে মোটেই মাথা ঘামাবে না। বস্তুত দেখা গেল, পরিকল্পিত ব্যবস্থার ফলাফলের তুলনায় প্রায়ই আকস্মিক ফলাফল বেশি চমকপ্রদ ও গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে। পূর্বনির্ধারিত ও পরিকল্পিত ব্যবস্থার সংকীর্ণতা নতুন তত্ত্বের আবিষ্ক্রিয়ার পথ রোধ করতে পারে এই আশঙ্কায় General Electric Co. শ্রুতকীর্তি তড়িৎপদার্থবিদ্ চার্লস স্টেইন-মেৎস-কে তাদের ল্যাবরেটরির প্রধানরূপে কাজ করতে আহ্বান জানালেন। ঠিক হল, খুশিমত যে কোন বিষয়ে গবেষণা করার অধিকার তাঁর থাকবে। একমাত্র শর্তঃ গবেষণার ফলাফল হবে কোম্পানীর সম্পদ! এভাবে ধীরে ধীরে বহু নতুন গবেষণাগারের উদ্ভব ঘটল এবং প্রযুক্তিবিদ্যার অগ্রগতির নানা তত্ত্ব তত্ত্বীয় গবেষণায় আবিষ্কৃত হল। অবস্থা ও ঐতিহ্যের উপর নির্ভর করে এই গবেষণাগারগুলি প্রতিষ্ঠিত হচ্ছিল বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগে, উচ্চতর টেকনিক্যাল স্কুলের ল্যাবরেটরিতে, বিজ্ঞান সংস্থাগুলোর বিভাগ সমূহে এবং এমন কি প্রাইভেট ল্যাবরেটরিতেও।

এখানকার গবেষণায় বাস্তব ও নিশ্চিত ফলাফল মিলবে এই প্রত্যাশায় সরকারও পরবর্তীকালে এই গবেষণাগারগুলোতে অর্থ বিনিয়োগ করলেন। অন্যকেও বিনিয়োগে উৎসাহ দিলেন। তত্ত্বীয় বিজ্ঞানের মধ্যে শিল্প ও সামরিক ক্ষেত্রে প্রভুত্ব বিস্তারের শক্তির সন্ধান পেল জার্মান সাম্রাজ্যবাদ। এবং এই শক্তিতে বলীয়ান হয়ে সে চাইল বিজ্ঞান, প্রযুক্তিবিদ্যা ও শিল্পক্ষেত্রে বৃটেনকে নেতৃত্ব করা থেকে বঞ্চিত করতে। আর চাইল বিশ্বের বাজার করায়ত্ত করতে, কাঁচামালের জোগান দিতে ও বিনিয়োগে নামতে। বদ্ধমুষ্টি রাজনীতির বিকাশ ঘটল।

রাজ-আনুকূল্যে এক বিজ্ঞানসভা ও ইনস্টিটিউট্ প্রতিষ্ঠার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন জার্মান সম্রাট। আর্থিক জগতের ধুরন্ধর কর্তাব্যক্তিরা সঙ্গে সঙ্গে সাড়া দিলেন। ব্যাঙ্কার ও শিল্পপতিদের নিয়ে গড়ে উঠল—The Kaiser Wilhelm Gesellschaft। এর সদস্যেরা ভূষিত হলেন 'সেনেটর' উপাধিতে, আর অধিকার পেলেন এক সুদৃশ্য গাউন পরিধানের। মাঝে মাঝে সম্রাটের সঙ্গে প্রাতরাশ গ্রহণেরও আহ্বান আসত। কোন্ অনুগত প্রজা এ রকম দুর্লভ সুযোগ হাতছাড়া করে?

সব রকম অধ্যাপনা-সংক্রান্ত বাধ্যবাধকতা থেকে মুক্ত থেকে উচ্চ বেতনে দেশের সর্বোৎকৃষ্ট বিজ্ঞানীর দল ইচ্ছামতো বিষয়ে গবেষণার অধিকার নিয়ে 'কাইজার উইলহেল্ম ইনস্টিটিউটে' যোগ দিলেন। স্বভাবত ধরে নেয়া হল এখানকার গবেষণার ফলাফল খুবই গুরুত্বপূর্ণ হবে। ইনস্টিট্যুটের হয়ে দক্ষ বিজ্ঞানী সংগ্রহের ভার পড়ল বিজ্ঞানী প্লাঙ্ক ও নার্নস্টের উপর।

কোয়াণ্টাম তত্ত্বের জনক ম্যাক্স প্লাঙ্ক ছিলেন অদ্ভুত বৈজ্ঞানিক মেধা ও সুগভীর প্রজ্ঞার এক মহান পদার্থবিদ্। আপেক্ষিক তত্ত্বের আন্তর-সুষমা ও সৌন্দর্য তিনিই প্রথম উপলব্ধি করেন। শুধু তাই নয়, তিনি বুঝেছিলেন আগামী বহু বছর ধরে আইনস্টাইনের তত্ত্ব পদার্থবিদ্যার গবেষণার গতিপথকে নিয়ন্ত্রিত ও নিরূপিত করবে। ফলে বিজ্ঞান ও সংস্কৃতির প্রতিটি ক্ষেত্র নব নব নিশ্চিত ও মূল্যবান ধ্যান-ধারণায় উজ্জ্বল হয়ে উঠবে। বিদ্বজ্জন মহলে প্লাঙ্কের বৈজ্ঞানিক ও নৈতিক কর্তৃত্ব ছিল অবিসংবাদিত। এই দীর্ঘদেহী, দোহারা-চেহারার, কিছুটা আত্মকেন্দ্রিক ও আত্মনিমগ্ন, লোকটির রোমান্টিক আত্মা রূপ পরিগ্রহ করত যখন তিনি পিয়ানো নিয়ে বসতেন বা অপূর্ব বৈজ্ঞানিক নিবন্ধ লিখতেন। প্লাঙ্ককে আইনস্টাইন অত্যন্ত শ্রদ্ধার চোখে দেখতেন।

সরকারী মহলেও প্লাঙ্কের জন্য ছিল সম্মানের আসন-পাতা। তাঁর

অভিজাত পারিবারিক ইতিহাস, নিয়ম-নিষ্ঠায় গভীর প্রত্যয়, সংযত ব্যবহার এবং সর্বোপরি সেনানীসুলভ দেহ-সৌষ্ঠবের একটা আবেদন জঙ্গী আমলা মহলে সর্বদাই বিরাজ করত।

অন্যদিকে ওয়াল্টার নার্নস্ট ছিলেন বুর্জোয়াদের প্রিয়পাত্র। বিশ শতকের অন্যতম শ্রেষ্ঠ এই রসায়নবিদ্ ছিলেন সক্রিয় এবং কর্মঠ প্রকৃতির মানুষ। আজন্ম সংগঠক ও সুরসিক, সেই সঙ্গে গভীর ও মৌলিক চিন্তানায়ক। পরীক্ষামূলক বিজ্ঞানে তিনি ছিলেন এক প্রবাদপুরুষ।

১৯১৩-র গ্রীষ্মকালে প্লাঙ্ক ও নার্নস্ট এলেন ব্যক্তিগতভাবে আইন-স্টাইন সকাশে সাক্ষাৎপ্রার্থী হয়ে। উদ্দেশ্য: জুরিখ থেকে ভাঙিয়ে আইনস্টাইনকে বার্লিনে নিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা যাচাই করে দেখা। তাই সঙ্গে এনেছেন একটি প্রস্তাব। প্রস্তাবটি হল, আইনস্টাইনকে পদার্থবিজ্ঞানের এক গবেষণাকেন্দ্রের ডিরেক্টর হতে হবে। বস্তুত, ১৯১০-র মার্চে পরলোকগত বিজ্ঞানী ভ্যাণ্ট হফের তিনি স্থলাভিষিক্ত হবেন। সেই সঙ্গে প্রাশিয়ান বিজ্ঞান অ্যাকাডেমির সদস্য। তিনি বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়েরও একজন অধ্যাপক হবেন। তবে অধ্যাপনার বোঝা থাকবে না। যে নামমাত্র অধ্যাপনা তিনি ইচ্ছা করলে করতে পারেন তার পরিকল্পনাটিও হবে তাঁর একান্ত নিজস্ব ব্যাপার। সব রকম বাধ্যবাধকতা থেকে তিনি মুক্ত থাকবেন, নিজের পছন্দসই যে কোন বিষয়ে গবেষণা করার স্বাধীনতা তাঁর থাকবে। ইচ্ছে করলে অন্য ইনস্টিটিউট বা সোসাইটির কাজকর্মেও তিনি স্বাধীনভাবে অংশ নিতে পারবেন। প্রস্তাবটি আর্থিক দিক থেকেও ছিল খুব লোভনীয়।

আইনস্টাইন বুঝলেন, প্রস্তাবটি গ্রহণ করলে তাঁর প্রিয় আপেক্ষিক তত্ত্বের সাধারণীকরণের কাজে তিনি আত্মনিয়োগের পুরো সুযোগ ও সময় পাবেন। তা ছাড়া, প্লাঙ্ক ও নার্নস্ট বললেন যে, বহু প্রথম শ্রেণীর পদার্থবিদ ও গণিতজ্ঞ বার্লিনে রয়েছেন। এঁদের মূল্যবান সাহচর্যে তিনি আসতে পারবেন। কথায় কথায় আইনস্টাইন বললেন—বিজ্ঞানী

লাঁজভার মতে আপেক্ষিক তত্ত্ব ঠিকমতো বুঝতে পারেন বিশ্বে এমন লোকের সংখ্যা নাকি বার। নার্নস্ট তখন চটপট জবাব দিলেন—'আর তাঁদের আটজনই থাকেন বার্লিনে।'

কিন্তু আইনস্টাইনের দ্বিধা গেল না। জুরিখের সহজ, সরল ও সহনশীল পরিবেশ ছেড়ে তাঁর মন চাইল না জার্মানীর জঙ্গী, উন্নাসিক, কেউকেটাদের সংস্পর্শে আসতে। আগে থেকেই তিনি অনুমান করেছিলেন যে, বিদ্বজ্জন সমাজের আশ্রয় সত্ত্বেও এদের সঙ্গে তাঁর সংঘর্ষ ঘটবেই।

তবে আইনস্টাইন ওঁদের একেবারে নিরাশ করলেন না। ব্যাপারটা ভেবে দেখার জন্য কিছু সময় চাইলেন। বিদায়কালে প্লাঙ্ক ও নার্নস্টও জানালেন যে, ইতি-নেতি যাই হোক, পাকা কথা পাওয়ার জন্য তাঁরা শীগগিরই আবার জুরিখে আসছেন। আইনস্টাইনও ব্যাপারটি নিয়ে একটু মজা করলেন। ঠিক হল, তখন যদি এক থোকা লালফুল নিয়ে তিনি তাঁদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন তবে বুঝতে হবে তাঁদের প্রস্তাব তিনি গ্রহণ করলেন। আর সাদা ফুল নিয়ে গেলে বোঝাবে তাঁদের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যাত হল।

দ্বিতীয়বার যখন প্লাঙ্ক ও নার্নস্ট জুরিখ স্টেশনে এসে নামলেন, আইনস্টাইন তখন গেলেন তাঁদের অভ্যর্থনা জানাতে। সঙ্গে নিলেন একগুচ্ছ লাল ফুল।

দীর্ঘদিন সুইজারল্যাণ্ডে কাটিয়ে ১৯১৪-র বসন্তকালে আইনস্টাইন বার্লিন চললেন। একা। দুই ছেলে নিয়ে মিলেভা জুরিখেই থেকে গেলেন। উভয়ের বিবাহ-বিচ্ছেদ আসন্ন হয়ে উঠল। সরকারীভাবে ডাইভোর্স হল অবশ্য আরও পরে। ১৪ই ফেব্রুয়ারী, ১৯১৯।

যা হোক, আইনস্টাইনের বার্লিন যাত্রার প্রাক্কালে কেউ ভাবতে পারেনি যে, শীঘ্রই এক রক্তক্ষয়ী সংগ্রামে সারা বিশ্ব জড়িয়ে পড়বে। একদিন জুরিখে বেশ রাত করে আইনস্টাইন ফিরছেন এক ফেয়ারওয়েল

পার্টি থেকে। সঙ্গে লুই কোলরস। আইনস্টাইন তাঁকে বললেন —"The Germans are gambling on me as they would on a prize-hen. I do not really know myself if I shall ever really lay another egg."।

বার্লিনে বৈজ্ঞানিক সমাজের সঙ্গে আইনস্টাইনের যোগাযোগের মাধ্যম ছিল এক সাপ্তাহিক সেমিনার। বিষয়ঃ পদার্থবিজ্ঞানের বিভিন্ন সমস্যা। বার্লিন ছেড়ে চলে যাওয়া অবধি নিয়মিত এই সেমিনার অনুষ্ঠিত হত। অংশগ্রহণকারী বিজ্ঞানীদের অনেকে অল্পদিনের মধ্যেই আইনস্টাইনের বন্ধু হয়ে গেলেন। নার্নস্ট ও প্লাঙ্ক ছাড়া এ দলে উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিদের মধ্যে ছিলেন ম্যাক্স ফন লাওয়ে, গুস্তাভ হার্ৎজ, জেমস ফ্রাঙ্ক, এড়ুইন শ্রোডিংগার, লিজে মেইৎনার প্রমুখ বিশিষ্ট সব বিজ্ঞানী। ১৯১২ সালে লাওয়ে সহকর্মিদের সহযোগিতায় কেলাসে এক্স-রশ্মির ডিফ্র্যাকশন ধর্ম আবিষ্কার করে যশস্বী হন। পদার্থের গঠন সম্পর্কে আধুনিক ধারণাগুলোর অন্যতম পরীক্ষামূলক ভিত্তি হল এই আবিষ্ক্রিয়া। তা ছাড়া, লাওয়ে ছিলেন বহু তত্ত্বীয় গ্রন্থের বিশিষ্ট লেখক। গ্রন্থগুলির অন্যতম হল আপেক্ষিক তত্ত্বের বিশ্লেষণী আলোচনা। শ্রোডিংগার অবশ্য তখনও বিশ্বখ্যাতি অর্জন করেন নি। পরে ১৯২৪-২৬ সালে তিনি কোয়ান্টাম বলবিদ্যার ভিত্তিস্থাপন করে জগদ্বিখ্যাত হন। আর লিজে মেইৎনার তিরিশের দশকের শেষভাগে য়ুরেনিয়ম পরমাণুর কেন্দ্রক-বিভাজন আবিষ্কার করে বিশ্ববিশ্রুত হন।

পরবর্তীকালে সেমিনারে অংশগ্রহণকারী সকলেরই স্মৃতিচারণায় সেমিনার সম্পর্কে উচ্ছ্বসিত উল্লেখ দেখা যায়। আইনস্টাইনের ব্যক্তিত্ব তাঁদের স্মৃতিতে চিরজাগরূক ছিল। বক্তব্যের গভীরতা বা বাগ্‌বিন্যাসই এর একমাত্র কারণ নয়। তাঁর সহজ-সরল ব্যবহার, সন্নিষ্ঠ জীবনচর্যা এবং প্রতিভার অন্যতম লক্ষণ—সহকর্মিদের মনোভাব বুঝে নেয়ার অনায়াস দক্ষতা—ঐ সমাবেশকে একটা সমুজ্জ্বল চমক দান করে। অন্যদিকে, নতুন অ্যাকাডেমিশিয়ান ক্বচিৎ কোন সভায় যোগ

দিতেন। ঐ সব সভা-সমিতি নিয়ে তিনি প্রায়ই পরিহাস করতেন এবং এক্ষেত্রে ব্যঙ্গরসে এমন একটা আক্রমণাত্মক ভঙ্গিমা দেখা যেত যা তাঁর স্বভাবসুলভ নয়। তিনি বলতেন—এ সব সভায় সদস্যেরা একটা মেকি সম্ভ্রম ও আভিজাত্য নিয়ে অর্ধনিমীলিত চোখে বসে থাকেন। হয়ত তখন কোন বিশেষ বিষয়ের উপর আলোচনা চলছে। আলোচনা অবশ্য প্রায়ই তুচ্ছ বিষয়ের উপর হত। সবচেয়ে মজার ব্যাপার হল, বিজ্ঞান থেকে বিচ্ছিন্ন বিষয়ের উপর বক্তাদের জ্বালাময়ী ভাষণ। আর, ঐ বক্তারা হলেন এমন সব ব্যক্তি বিজ্ঞানে যাঁদের ঋণ দানের চেয়ে ঢের ঢের বেশি।

জুরিখের বাড়ি আর সুইজারল্যাণ্ডের সহজ জীবনযাত্রা ছেড়ে আইনস্টাইন বার্লিনে এসেছিলেন নেহাৎ অনিচ্ছাসত্ত্বে। প্রাশিয়ান জাঁকজমক ও রাজতন্ত্র ছিল তাঁর কাছে 'a red reg to a bull', ষাঁড়ের কাছে যেমন লাল কাপড়। কিন্তু সব কিছুর উজ্জ্বল দিক দেখা ছিল তাঁর স্বভাবসিদ্ধ। তাই ১৯১৪ সালের ৪ঠা মে তিনি জুরিখে অ্যাডলফ হারউইৎজ-কে লেখেন—"যা ভেবেছিলাম জীবন এখানে ততটা খারাপ নয়। কিন্তু যা আমার মানসিক স্থৈর্যকে নষ্ট করছে তা হল কিছু বৃদ্ধ ভদ্রলোকের নির্দেশে নানা ননসেন্স বিষয়ে আমায় তালিম নিতে হচ্ছে। যেমন, আমাকে এমন পোষাক পরতে হবে যাতে অন্যে বুঝতে পারে আমি একজন কেউকেটা, সমাজের নিম্নস্তরের কেউ নই। ......... এখন পর্যন্ত সঙ্গীতচর্চার কোন অবকাশ পাইনি। কারণ অন্য কাজের চাপ বেশি। বার্লিনবাসিদের আত্মতুষ্টির কারণ এখন আমি বেশ বুঝতে পারি। প্রত্যেকের জীবন এখানে এত বহির্মুখী যে, আত্মম্ভরিতার গ্রাম্য কদর্যতা সম্পর্কে কেউ সচেতন নয়। শান্ত পরিবেশের শহরে এমনটা কখনও হতে পারত না।"

বার্লিন-জীবনের প্রথম দিকে আইনস্টাইনের বহু নতুন বন্ধু লাভ হয়। সে সময়ে অনেকে যে তাঁর শত্রুও হচ্ছিল সেদিকে তিনি

মোটেই নজর করেন নি। ত্বরণযুক্ত কাঠামোয় আপেক্ষিকতার সমস্যা, মহাকর্ষ, দেশ-এর জ্যামিতিক ধর্ম এবং তাঁর সঙ্গে ঐ দেশ-পটে সংঘটিত 'ঘটনা'র নির্ভরশীলতা প্রভৃতি নানা সমস্যা নিয়ে তিনি তখন সমাহিত। আইনস্টাইনের মানস-সমাধি প্রসঙ্গে একটি ঘটনার উল্লেখ করেছেন তাঁর অন্যতম জীবনীকার বিজ্ঞানী ফিলিপ ফ্রাঙ্ক।

একবার ফ্রাঙ্ক এলেন আইনস্টাইনের কাছে। ঠিক হল, তাঁরা দু-জনে একত্রে পটস্ডাম মানমন্দির দেখতে যাবেন। নিজ নিজ কাজ সেরে পটস্ডামে একটা ব্রিজের উপরে এসে উভয়ে মিলিত হবেন। সেখান থেকে একত্রে মানমন্দিরে যাবেন।

ফিলিপ—সামান্য দেরি হতে পারে কিন্তু। আমার অনেক কাজ রয়েছে বার্লিনে।

আইনস্টাইন—আরে, তাতে কি আসে যায়। আমি ঐ ব্রিজেই অপেক্ষা করব।

ফিলিপ— এতে ত আপনার অনেক সময় নষ্ট হয়ে যাবে!

আইনস্টাইন— আরে না। আমি যে ধরনের কাজ করি তা যে কোন জায়গায়ই করা চলে। বাড়ির চেয়ে পটস্ডাম ব্রিজে সমস্যা নিয়ে চিন্তাভাবনা করতে হঠাৎ কম দক্ষ হয়ে পড়ব—সে কী কথা!

বহমান নদীর স্রোতোধারার মত ছিল আইনস্টাইনের চিন্তাধারা। কথাবার্তার ফলে তাঁর চিন্তাস্রোতে যে বাধা পড়ত তা ছিল ঠিক বিপুলকায়া স্রোতস্বিনীর বুকে এক টুকরো পাথর পড়ার মতো। নদীর গতিপথকে প্রভাবিত করার পক্ষে নেহাতই ক্ষমতাহীন। আইন-স্টাইনের নিয়ত চলমান ও বিপুল মানসিক ক্রিয়াকাণ্ড যে তাঁর চরিত্রের স্বাভাবিক মাধুর্য বিকাশের অন্তরায় হয়নি এই হল তার কারণ।

বৈজ্ঞানিক সমস্যা নিয়ে অন্যের সঙ্গে আলোচনায় আইনস্টাইনের সোৎসাহ আগ্রহ কখন কখন বিব্রতকর পরিস্থিতিরও সৃষ্টি করত। একবার শুনলেন যে, বার্লিনের এক সহকর্মী বিখ্যাত শরীরতত্ত্ববিদ অধ্যাপক স্টাম্ফ 'স্পেস পারসেপশন' ( space perception ) সম্পর্কে

আগ্রহী। আইনস্টাইন ভাবলেন, এই সুযোগে অধ্যাপকের বাড়ি গিয়ে পারস্পরিক প্রয়োজনের ব্যাপারটি আলোচনা করা যাক। যাতে অধ্যাপককে বাড়ি পাওয়া যায় সেজন্য সাত-সকালে তাঁর বাড়ি গিয়ে উপস্থিত হলেন।

পরিচারিকা জানাল—'অধ্যাপক বাড়ি নেই। কিছু বলতে হবে কি?'

আইনস্টাইন বললেন—'পার্কে কিছুক্ষণ বেড়িয়ে আবার ঘুরে আসব।' এলেন। বেলা তখন তুটো।

এবারে পরিচারিকা বললে—'তুপুরে খেয়ে-দেয়ে অধ্যাপক একটু ঘুমচ্ছেন।' আইনস্টাইন যে আবার আসবেন এ কথা পরিচারিকা তাঁকে বলেননি।

আইনস্টাইন জানালেন—'ঠিক আছে, আবার পরে আসব।'

ফের এলেন। বিকেল তখন চারটে। এবারে দেখা হল।

আইনস্টাইন পরিচারিকাকে বললেন—'দেখলে ত, ধৈর্য আর অধ্যবসায় শেষ পর্যন্ত পুরস্কৃত হয়।'

আইনস্টাইনকে পেয়ে স্টাম্প পরিবার ত খুব খুশি। স্বভাবত ভাবলেন, প্রথম পরিচয়ে যে রকম হয় কথাবার্তা সেই ধরনের হবে। কিন্তু আইনস্টাইন স্পেস নিয়ে পড়লেন। বেচারা স্টাম্ফ! তাঁর না ছিল পদার্থবিজ্ঞানে ব্যাপক জ্ঞান, না গণিতে। আলোচনার একবর্ণও তিনি বুঝলেন না। প্রাসঙ্গিক একটা কথাও আলোচনায় জুড়তে পারলেন না। প্রায় চল্লিশ মিনিট ধরে কথা বলার পর আইনস্টাইনের সম্বিৎ হল যে, এতক্ষণ তিনি নিজের সঙ্গে নিজে কথা বলে চলেছেন এবং বেড়াতে এসে অন্যায়ভাবে অনেকক্ষণ কাটিয়ে দিয়েছেন। তৎক্ষণাৎ আকস্মিক বিদায় জানিয়ে দ্রুতপদে স্থানত্যাগ করলেন।

অবশ্য এ ধরনের ঘটনায় আইনস্টাইনের কোন মানসিক শান্তিভঙ্গ হত না। কারণ নিজের পেশাগত পরিবেশেও উৎসাহ এবং বোধের অভাবের সঙ্গে তাঁর বিলক্ষণ পূর্ব-পরিচয় ছিল।

একদল লোক কিন্তু সত্যি তাঁর শান্তিভঙ্গ করত। এক মারমুখী সাম্রাজ্যের যে কোন মতলব হাসিল করার জন্যই যেন এরা বিশেষ-ভাবে বড় হয়ে উঠেছে। এরা হল সেই প্রাশিয়ানিজমের বাহক যার সঙ্গে ছোটবেলার মিউনিখ-জীবন থেকেই তাঁর পরিচয়। এদের সম্পর্কে একবার তিনি মন্তব্য করেন—'এই সব ঠাণ্ডামার্কা ফর্সা লোকগুলো আমার অস্বস্তির কারণ। অন্যের সম্পর্কে এদের বিন্দুমাত্র মনস্তাত্ত্বিক বোধ নেই। সব কিছু এদের কাছে বিশদ করে ব্যাখ্যা করতে হবে।' এদিকে কিন্তু তখনকার ঘটনাবলী ঐসব ঠাণ্ডামার্কা ফর্সা লোকগুলোর পাদপ্রদীপের আলোয় আসার দিকেই দ্রুত এগোচ্ছিল। বার্লিনে আইনস্টাইনের বাসা নেয়ার এক বছরের মধ্যে শুরু হয়ে গেল প্রথম বিশ্ব-মহাযুদ্ধের বজ্রনির্ঘোষ ও অস্ত্র-ঝনৎকার।

আর ছোটবেলা থেকে যুদ্ধের প্রতি আইনস্টাইনের ছিল তীব্র ঘৃণা। এ সম্পর্কে তাঁর মতামত হুবহু অষ্ট্রিয় পরিহাসবিদ কার্ল ক্রাউসের মতো। "War at the outset is the hope that things will be worse for the others. Then comes the satisfaction that the others are in no better a position, and finally the surprise that things grow worse for both sides."। সৈন্যদলের কুচকাওয়াজ তিনি দু-চক্ষে দেখতে পারতেন না। পরবর্তী-কালে The world as I see it প্রবন্ধে যুদ্ধ এবং যুদ্ধবাদ সম্পর্কে তাঁর ধারণা তিনি আরও পরিস্ফুট করেন। তিনি লেখেন—"বাজনার তালে তালে সারিবদ্ধ হয়ে কেউ যে কুচকাওয়াজ ক'রে আনন্দ পেতে পারে—এটুকু জানাই তার উপর আমার ভক্তি চটে যাওয়ার পক্ষে যথেষ্ট। ভুল করে তাকে একটা বড় মস্তিষ্ক দেয়া হয়েছে। শুধু মেরুদণ্ড থাকলেই তার কাজ চলে যেত। সভ্যতার এই দুষ্টক্ষতকে দ্রুত অপসারণ করা দরকার। হুকুমমতো সাহস দেখান, কাণ্ডজ্ঞানহীন হিংসা এবং দেশপ্রেমের নামে আর যেসব চূড়ান্ত মূর্খামি চলে আমি তা মনেপ্রাণে ঘৃণা করি। এ রকম ঘৃণ্য ব্যাপারে অংশ নেয়ার চেয়ে

আমি বরং পৃথিবী থেকে লুপ্ত হয়ে যাব। টুকরো টুকরো করে কেটে ফেললেও আমায় দিয়ে এ কাজ হবার নয়। এ সত্ত্বেও মানবজাতি সম্পর্কে আমার ধারণা খুব উঁচু। আমি বিশ্বাস করি, বণিক ও রাজনৈতিক স্বার্থের বাহকেরা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এবং সংবাদপত্রের মাধ্যমে ধারাবাহিকভাবে বিভিন্ন জাতির সুবুদ্ধিকে কলুষিত না করলে অনেক আগেই এ জুজু অদৃশ্য হত।"

১৯১৪ সালে বার্লিনের রাজপথে শুরু হল সৈন্যদলের কুচকাওয়াজ। কাইজার ও রাইখ্‌সওয়ারের উৎসাহী উপাসকদের ভিড়ে ফুটপাথের দু-ধার একেবারে উপচে পড়ল। বিপ্লবী আন্তর্জাতিকবাদের সমর্থকেরা আত্মগোপন করলেন। আইনস্টাইনের কাছে এ দৃশ্য ছিল ভয়াল রাত্রির দুঃস্বপ্ন। অকস্মাৎ তিনি দেখলেন, বন্য যুদ্ধবাজদের চীৎকারে বিদ্যাচর্চার পরিবেশ একেবারে বিষাক্ত হয়ে উঠেছে। শান্তিপ্রিয় নাগরিকের দল, যাঁরা ছিলেন বিশ্ব-সংস্কৃতির প্রতি সত্যি শ্রদ্ধাশীল, তাঁরাও যেন হঠাৎ যুদ্ধসঙ্গীত আর রাশিয়া, ফ্রান্স ও ইংলণ্ডকে গুঁড়িয়ে দেওয়ার জিগিরে আনন্দ পেতে শুরু করলেন। সোৎসাহে পরস্পর আদান-প্রদান করতে লাগলেন হাজার হাজার নিরীহ লোকের অলীক মৃত্যু-কাহিনী। লেসিং ও শিলারকে সরিয়ে তাঁদের ডেস্কে স্থান করে নিল জার্মানীর ঐতিহাসিক মিশনের বিজ্ঞাপন এবং তার সমর্থনে বিষাক্ত ও যুক্তিহীন সব প্যামপ্লেট। ওস্টাল্ডের মতো বিশিষ্ট বিজ্ঞানীও বললেন—"য়ুরোপকে হোয়েনঝোলার্ন সাম্রাজ্যের পদানত করাই হল ইতিহাসের মহত্তম কাজ।" জার্মান বুদ্ধিজীবীদের এক ঘোষণাপত্রেও ওস্টাল্ড স্বাক্ষর দিলেন। ঐ ঘোষণাপত্রটি ছিল জার্মান জাতীয়তাবাদের নিকৃষ্ট লক্ষণে ভরা। প্লাঙ্ক এবং তাঁর অনুগামী বিজ্ঞানীরা একেবারে দিশেহারা হয়ে পড়লেন। জার্মানীর 'যুক্তিযুক্ত দাবীগুলো' নিয়ে অসংলগ্নভাবে বিড়বিড় করা ছাড়া তাঁদের আর কিছু করার ছিল না। সহকর্মিদের সঙ্গে স্বাভাবিক মধুর সম্পর্ক রাখাও আইনস্টাইনের পক্ষে আর সম্ভব হচ্ছিল না। সামান্য কয়েকজন ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছাড়া আর কেউ

তাঁর ধ্যানধারণা বা স্বাধীনতা এবং আন্তর্জাতিক সংহতির প্রতি আনুগত্যের অংশীদার ছিলেন না। সাম্রাজ্যবাদ ও যুদ্ধবিরোধী বিপ্লবী-গোষ্ঠীর কার্যকলাপ থেকে আইনস্টাইন তখনও বহু দূরে। কিন্তু শীগগিরই তাঁর ধ্যানধারণার অংশীদারদের সঙ্গে তিনি যোগাযোগ করে ফেললেন। এঁরা হলেন বিশিষ্ট ফরাসী সাহিত্যিক ও বুদ্ধিজীবী রোমা রঁল্যা এবং রঁল্যাকে ঘিরে একদল ফরাসী বিজ্ঞানী ও লেখক।

১৯১৫-র মার্চে আইনস্টাইন রঁল্যাকে একটি চিঠি দিলেন। ঐ চিঠিতে তিনি নিজেকে রঁল্যার যুদ্ধবিরোধী সংস্থার হাতে সমর্পণ করলেন। এবং লিখলেন যে, তিন শতাব্দী ধরে য়ুরোপে প্রচণ্ড সাংস্কৃতিক কার্যকলাপের পর আজ জাতীয় উন্মত্ততা ধর্মীয় উন্মাদনার স্থান দখল করেছে। কিছু কিছু বিজ্ঞানী এমন আচরণ করছেন যে, দেখে মনে হচ্ছে তাঁদের মাথা থেকে মস্তিষ্ককে অপসারিত করে ফেলা হয়েছে। এতগুলো বিজ্ঞানীর মধ্যে জান্তব প্রকৃতির কাছে যুক্তির এই পরাভবকে যুক্তিবাদী আইনস্টাইন য়ুরোপীয় বুদ্ধিজীবীদের এক চরম ট্র্যাজেডিরূপে দেখলেন।

১৯১৫-র শরৎকালে, যুদ্ধের মধ্যে, আইনস্টাইন কোন রকমে সুইজারল্যাণ্ড এসে পৌঁছলেন। সেখানে দুই ছেলে নিয়ে রয়েছেন মিলেভা। তাদের দেখতে আইনস্টাইন খুবই ব্যগ্র হয়ে পড়েন। সুইস-শহর ভিভে-তে রঁল্যা-আইনস্টাইন সাক্ষাৎকার হল। রঁল্যা জানালেন: যুযুধান সমস্ত জাতির মধ্যেই যুদ্ধবিরোধী গোষ্ঠী সক্রিয় রয়েছে। আইনস্টাইনের উপর গভীর রেখাপাত করলেন রঁল্যা। এখন থেকে আইনস্টাইন নিজেকে চরম জাতীয়তাবাদের বিরোধী এক আন্তর্জাতিক দলের সদস্যরূপে ভাবতে লাগলেন। সম-মনোভাবাপন্ন বহু ব্যক্তির সন্ধান তিনি জার্মানীতেও পেলেন।

ইতিমধ্যে যুদ্ধও পুরোদমে চলতে লাগল। সেই সঙ্গে জাতীয়তাবাদের বিষে বৈজ্ঞানিক সমাজের বিষিয়ে ওঠাও অব্যাহত রইল। যেমন জার্মান পদার্থবিদদের একটি গোষ্ঠী এক সার্কুলার প্রচার

করলেন। তাতে সহকর্মিদের উদ্দেশে এই মর্মে জোরালো আহ্বান জানান হল যে, তাঁরা যেন ইংরেজ পদার্থবিজ্ঞানীদের কাজের কোনরূপ উল্লেখ না করেন। তাঁরা আরও বললেন, ইংরেজ ও ফরাসী বিজ্ঞানীদের উদ্ভাবিত তত্ত্বাদির তুলনায় চরিত্রে জার্মান-বিজ্ঞান অনেক বেশি গভীর ও ব্যাপক। জাতীয়তাবাদের এই বাড়াবাড়িতে ব্যথিত আইনস্টাইন এমন সব ব্যক্তির সাহচর্য খুঁজতে লাগলেন যাঁদের যুক্তিবোধ ও বিবেক তখনও ততটা অন্ধ হয় নি। আর অন্যদিকে তিনি নিজ অন্তর্জগতে ডুবে গেলেন।

যুদ্ধবিধ্বস্ত এই দিনগুলোতে তিনি যখন নিজের স্টাডিকক্ষে একাকী থাকতেন তখন ভুলে যেতেন বাইরের জগতকে। তখন তাঁর সঙ্গে যে জগতের যোগাযোগ সেখানে পৌঁছত না যুদ্ধের কোলাহল, পৌঁছত না দৈনন্দিন জীবনের ছোঁয়া। এ সময় তিনি 'সাধারণ আপেক্ষিকতা'র পূর্ণতা সাধন করেন। বিকিরণ সম্পর্কেও প্রকাশ করেন নতুন তথ্য। ১৯১৬-র জানুয়ারীতে বন্ধু এরেনফেস্টকে লিখলেন—"Can you imagine my joy at the feasibility of the general covariance with the result that the equations of the perihelion of Mercury ( বুধগ্রহ ) prove correct ? I was speechless for several days with excitement."।

এ সময় তিনি তাঁর কাকা রুডলফ আইনস্টাইনের বাড়িতে ঘন ঘন যাতায়াত শুরু করলেন। কন্যা এলসাকে নিয়ে তাঁর কাকা তখন বার্লিনেই বসবাস করছিলেন। বহুদিন দেখা-সাক্ষাৎ হয় নি। এলসার এখন বয়স হয়েছে এবং ইতিমধ্যে তাঁর বিবাহও হয়েছিল। কিন্তু সে বিয়ে সুখের হয় নি। ফল বিবাহ-বিচ্ছেদ। বিবাহ-বিচ্ছেদের পর এলসা দুই মেয়ে ইলসে ও মার্গট-কে নিয়ে পিতৃগৃহে এসে উঠেছিলেন। এলসা ছিলেন আলবার্টের ছেলেবেলার খেলার সাথী। এক আকর্ষণীয়া মহিলা, শান্তশীলা ও সুরসিকা। চারিত্রিক ও অন্যান্য

গুণে এবং স্বভাবের দিক থেকে আইনস্টাইনের সঙ্গে তাঁর অনেক মিল ছিল। পরে ১৯১৯ সালে ডাইভোর্স পেয়ে আইনস্টাইন এলসাকে বিয়ে করেন। চির-অবিচ্ছেগু হয়েছিল এই নতুন মিলন।

ঐ বছর অক্টোবরে বন্ধুর কাছে আবার চিঠি গেল। "Hume has really made an enormous impression on me···In comparison Kant appears to me very weak. ···I have now applied the principle also to general relativity in Hamiltonian method to show the connection between relativity and the energy principle. On thursday, I will send it to you."।

১৯১৭ সালের ঐতিহাসিক ঘটনাবলী বহু বিজ্ঞানীকে এমন সব সমস্যার সম্মুখীন করল যার মুখোমুখি এঁরা আগে কোনদিন হন নি। তাঁরা কাদের সঙ্গে রয়েছেন, নব-উদ্ভূত সামাজিক ব্যবস্থার প্রতি তাঁদের মনোভাব কী, ভবিষ্যৎ মানবসমাজের কেমন ছবি তাঁদের মনে রয়েছে —এ সব প্রশ্ন ভিড় করে এল।

চার মাস পরে ১৯১৭-র ফেব্রুয়ারীতে আবার চিঠি—"I have once more broken a little ground in the gravitation theory and by so doing have run the risk of being placed in a madhouse. I hope you have none in Leyden so that I can pay you a visit without running any risk. What a pity we don't live on Mars so that we could observe the futile activities of human beings only through a telescope. Our Jehovah no longer needs to send down a rain of pitch or sulphur. He has turned modern and automatic."।

এ সময়ে য়ুরোপের বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে একটা রাজনৈতিক শ্রেণী-বিন্যাস ঘটছিল। সময়টা তখন এমন যে, নিজের অবস্থান সম্পর্কে

সুস্পষ্ট ধারণার প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল। যুক্তি ও বিজ্ঞানের ভিতের উপর গড়ে-ওঠা এক নতুন মানবসমাজের অভ্যুদয়রূপে আইনস্টাইন রাশিয়ার অক্টোবর বিপ্লবকে স্বাগত জানালেন। লেনিনের উদ্দেশে জানালেন শ্রদ্ধানম্র প্রণতি। লেনিনকে তিনি এমন একজন মানুষরূপে চিহ্নিত করলেন "যিনি পুরোপুরি আত্ম-উৎসর্জনের মাধ্যমে সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার জন্য সর্বশক্তি নিয়োগ করেন। ...তাঁর মতো লোকেরাই হলেন মানবজাতির বিবেকের উদ্বোধক, ধারক ও বাহক।"

১৯১৫ সালে সাধারণ আপেক্ষিক তত্ত্বের উপর প্রকাশিত গবেষণাপত্রটিতে আইনস্টাইন কয়েকটি ভবিষ্যদ্বাণী করেন। এগুলোর মধ্যে সবচেয়ে নাটকীয় হল মহাকর্ষ ক্ষেত্রে আলোকরশ্মির বক্রতা বা বিচ্যুতি। অর্থাৎ আলোরও মহাকর্ষজ ভর আছে। কিন্তু কিভাবে এটি যাচাই করা যায়? স্যার অলিভার লজ প্রমুখ বিশিষ্ট বিজ্ঞানীরা ত এ কথায় বিদ্রূপ করতে লাগলেন।

১৯১৭ সালের প্রথমদিকে বিশ্ববিশ্রুত ব্রিটিশ জ্যোতির্বিদ এবং পদার্থবিজ্ঞানী স্যার আর্থার এডিংটন আলোর মহাকর্ষজ ভর আছে কি নেই তা সরাসরি পর্যবেক্ষণে যাচাই-এর এক প্রস্তাব দিলেন। রিলেটিভিটি থিয়োরীর পরবর্তী বিকাশে এর গুরুত্ব ছিল অপরিসীম। আইনস্টাইনের ধারণাগুলোকে বিকশিত ও জনপ্রিয় করে তুলতে যেসব বিজ্ঞানী সচেষ্ট হন স্যার এডিংটন ছিলেন তাঁদের পুরোভাগে। এ সম্পর্কে একটা মজার কাহিনী উল্লেখ করা যাক।

একবার এডিংটনের এক সহকর্মী তাঁর কাছে মন্তব্য করেন যে, এডিংটন বিশ্বের এমন তিন ব্যক্তির একজন যাঁরা আইনস্টাইনের রিলেটিভিটি বোঝেন। কথা শুনে এডিংটনের চোখেমুখে বিব্রতা লক্ষ্য করে সহকর্মী পদার্থবিদ চটপট বললেন—"প্রফেসর এডিংটন, আপনার বিব্রত হওয়ার কিছু নেই। আপনি বড় বেশি বিনয়ী।" ( Professor Eddington, you shouldn't be embarrassed ;

you are too modest )।

"না, না, আমি মোটেই বিব্রত হচ্ছি না। শুধু ভাবছি তৃতীয় ব্যক্তিটি কে?" ( N., I am not embarrassed ; I am only wondering who is the third.)—উত্তর করলেন এডিংটন।

যা হোক, আলোর যদি অভিকর্ষজ ভর বা ওজন থাকে তা হলে কোন গুরুভার বস্তুর পাশ দিয়ে চলার সময় ঐ বস্তুর দিকে আলোর বিচ্যুতি ঘটবে—ঠিক যেমনটি হয় কামানের গোলা ছুঁড়লে। অভিকর্ষজ ভরের দরুণ সেটি পৃথিবীর দিকে বিচ্যুত হয় এবং শেষ অবধি পৃথিবীতে এসে পড়ে। অবশ্য কোন আলোকরশ্মি এভাবে পৃথিবীতে এসে পড়বে না, কেননা আইনস্টাইনের মহাকর্ষ সূত্রানুসারে পৃথিবীর ক্ষেত্রে আলোর এই বিচ্যুতি হবে নেহাতই অকিঞ্চিৎকর। কিন্তু বস্তুটি যদি পৃথিবীর তুলনায় আরও গুরুভার হয়? সেক্ষেত্রে অবশ্য বিচ্যুতি বেশি হবে। আপেক্ষিক তত্ত্বের গণনা অনুযায়ী আইনস্টাইন বললেন যে, সূর্যের গা-ঘেঁসে গেলে আলোকরশ্মি সরলরেখা থেকে ১·৭৫ সেকেণ্ড কোণ পরিমাণ বাঁকবে। কাজেই এডিংটন প্রস্তাব দিলেন: সুদূরের কোন নক্ষত্রের দু-বার ফোটো তোলা হোক—একবার সূর্য-সান্নিধ্যে, দ্বিতীয়বার সূর্য যখন আকাশের ঐ নাক্ষত্রিক অঞ্চল থেকে অনেক দূরে। তা হলে, প্রথম ফোটোগ্রাফে নক্ষত্রের প্রতিবিম্বকে দ্বিতীয় ফোটোগ্রাফের প্রতিবিম্বের তুলনায় বেশি বিচ্যুত দেখাবে। কিন্তু মুস্কিল হল, আকাশে যখন সূর্য থাকে তখন, বলতে গেলে, কোন নক্ষত্রই দেখা যায় না, বিশেষ, যদি তাদের অবস্থান সূর্যের ডিস্কের খুব কাছাকাছি হয়। কিন্তু, সূর্যগ্রহণের সময় এ ধরনের নক্ষত্রের ( যাদের আলোককিরণ সূর্যের পাশ দিয়ে যায় ) ফোটোগ্রাফ সহজেই নেয়া চলে। তা ছাড়া, গ্রহণের সময় কোন উজ্জ্বল নক্ষত্রের কাছে সূর্যের থাকাটাও জরুরি।

১৯১৯ সালের ২৯শে মে এ রকম এক সূর্যগ্রহণ হওয়ার কথা ছিল। যেখানে পূর্ণগ্রাস সূর্যগ্রহণ হবে সে সব অঞ্চলে এডিংটন বৈজ্ঞানিক অভিযানের ব্যবস্থা করলেন। মোট দুটি অভিযান

পরিচালনার সিদ্ধান্ত হল। একটি পশ্চিম আফ্রিকার উপকূলবর্তী গিনি উপসাগরের প্রিন্সিপ দ্বীপে, দ্বিতীয়টি ব্রাজিলের সোবরাল-এ। প্রথমটির নেতৃত্বে রইলেন এডিংটন স্বয়ং। ব্রিটীশ অভিযাত্রী দল ব্রাজিলে পৌঁছলে সেখানকার সংবাদপত্র কঠোর মন্তব্য করে তাঁদের অভ্যর্থনা জানাল। এ জাতীয় মন্তব্য ছিল প্রথম মহাযুদ্ধের পরবর্তী বছরগুলোর বৈশিষ্ট্য। পত্রিকাটি লিখল—"একটা জার্মান থিয়োরীকে প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা ছেড়ে আকাশ-বিশেষজ্ঞ অভিযাত্রী দলের সদস্যদের বরং চেষ্টা করা উচিত একটানা খরাক্লিষ্ট এ দেশটির জন্য কি করে বৃষ্টির ব্যবস্থা করা যায়?"

কিন্তু প্রিন্সিপ দ্বীপের অভিযানকে বরুণদেব স্বাগত জানালেন। বৃষ্টি হল। গ্রহণের দিন সারা আকাশ জুড়ে মেঘের ঘনঘটা, মেঘের ভেতর দিয়ে সূর্যের কিরীট মোটেই দেখা যাচ্ছিল না। আকাশে কোন নক্ষত্রও দৃষ্টিগোচর হচ্ছিল না। সহসা ভাগ্যদেবী সুপ্রসন্না হলেন। পূর্ণগ্রাস শেষ হওয়ার সামান্য কিছু আগে মেঘময় আকাশ নির্মেঘ হল, সৌরকিরীটের কাছে ফুটে উঠল নক্ষত্রের দল। বিজ্ঞানীকূল প্রাণভরে তাদের ফোটো তুললেন। ছ' মাস পরে সূর্য যখন ঐ অঞ্চল থেকে দূরে তখন আবার ঐ সব নক্ষত্রের ফোটো তোলা হল। দুই ফোটোগ্রাফ মিলিয়ে দেখা গেল যে, আইনস্টাইনের সাধারণ আপেক্ষিক তত্ত্বের ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী নক্ষত্রের প্রতিবিম্বগুলোয় সত্যি সত্যিই বিচ্যুতি ঘটেছে।

এদিকে ব্রাজিলের সোবরালের আকাশ ছিল নির্মেঘ। খুশিভরে বিজ্ঞানীর দল এখানে অনেক ফোটো তুললেন। কিন্তু নিয়ন্ত্রিত ছবির সঙ্গে ফোটোগুলো মেলাতে গিয়ে জ্যোতির্বিদরা একেবারে হতাশ হয়ে পড়লেন। তাঁদের ফলাফলের সঙ্গে তত্ত্বীয় ভবিষ্যদ্বাণী তথা আফ্রিকার অভিযানের ফলাফলে গড়মিল দেখা গেল। অনুসন্ধানে কারণ নির্ণয়ে দেরী হল না। সৌরতাপে সূক্ষ্ম যন্ত্রপাতি গরম হয়ে পড়ে। ফলে ফোটোতে নানা ধরনের ভ্রান্তি দেখা দেয়।

ঐ বছর সেপ্টেম্বর মাসে এডিংটনের অভিযানের ফলাফল আইনস্টাইনকে জানান হল। লোরেনৎস আইনস্টাইনকে টেলিগ্রাম পাঠালেন: "আপেক্ষিক তত্ত্ব প্রমাণিত হয়েছে।" মা'র কাছে আইনস্টাইন পোস্টকার্ড লিখলেন—"Good news today! A. H. Lorentz has cabled that an English expedition has proved the deflection of light rays near the sun"। (আজ সুখবর। এইচ. এ. লোরেনৎস টেলিগ্রামে জানিয়েছেন—এক ইংরেজ অভিযানের ফলে সূর্যের কাছে আলোকরশ্মির বিচ্যুতি প্রমাণিত হয়েছে)। কিন্তু মনে হয়, আইনস্টাইন মাকে সন্তুষ্ট করার জন্যই বেশি ব্যগ্র ছিলেন, এডিংটনের অভিযানের ফলাফল নিয়ে তাঁর তেমন মাথাব্যথা ছিল না।

শীঘ্রই এডিংটন লণ্ডন রয়্যাল সোসাইটি এবং রয়্যাল অ্যাস্ট্রোনমিক্যাল সোসাইটির এক যৌথ অধিবেশনে তাঁর অভিযানের ফলাফল ঘোষণা করলেন। রয়্যাল সোসাইটির সভাপতি জে. জে. টমসন অধিবেশনের উদ্বোধন ভাষণে বললেন—"এ কোন বিচ্ছিন্ন দ্বীপের আবিষ্ক্রিয়া নয়, এ হল নতুন বৈজ্ঞানিক ধারণারাজির এক সামগ্রিক মহাদেশের আবিষ্কার। নিউটন তাঁর সূত্র দেবার পর থেকে এটি হল মহাকর্ষ সংক্রান্ত সর্বশ্রেষ্ঠ আবিষ্কার।"

সারা বিশ্বে সংবাদপত্রের হেডলাইন হল এডিংটনের রিপোর্ট এবং অন্যান্য বিজ্ঞানীদের মন্তব্য। সাধারণ লোকেরাও বুঝলেন, বিজ্ঞানে এক ক্রান্তিকারী ঘটনা ঘটেছে। 'Curvature of space' বা মহাশূন্যের বক্রতা, 'finality of space' বা দেশের সসীমতা, 'bending of light rays' বা আলোকরশ্মির বক্রতা প্রভৃতি শব্দগুলো ওষ্ঠ থেকে ওষ্ঠান্তরে ঘুরতে লাগল। অবশ্য এগুলোর নিহিতার্থ অল্পলোকেরই হৃদয়ঙ্গম হল। জে. জে. টমসন নিজেই বললেন—"I have to confess that no one has yet succeeded in stating in clear language what the theory of Einstein really is.।" (আমাকে স্বীকার করতে হবে যে, পরিচ্ছন্ন বা বোধগম্য

ভাষায় এখন পর্যন্ত আইনস্টাইনের তত্ত্বটি যে ঠিক কী তা কেউ বলতে সমর্থ হন নি)। তত্ত্বটির প্রকৃত অর্থ সরলভাবে প্রকাশ করতে তাঁদের অসামর্থ্যের কথা বহু বিজ্ঞানীও স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছেন। আর বোঝার এই অসামর্থ্যই এর বিরুদ্ধে একটা যুক্তিরূপে ব্যবহৃত হল। বিশেষতঃ ব্রহ্মাণ্ডের সসীমতার ধারণা প্রবল প্রতিবাদের ঝড় তুলল।

উল্লেখযোগ্য যে, ব্রহ্মাণ্ডের সসীমতা এবং চলমান বস্তুসমূহ ও আলোকরশ্মির বদ্ধপথের সসীম ব্যাসার্ধ এই উভয়ের পার্থক্যটুকু পরিষ্কারভাবে বোধগম্য হওয়া কঠিন হয়ে পড়ে। এক মার্কিন সংবাদ-পত্র যথেষ্ট বৈশিষ্ট্যভরে দাবী করল যে, যুক্তিবিদ্যা ও অন্টোলজি (বা বাস্তব বিশ্বের মূল ধারণানিচয়) যেন ভৌত ধ্যানধারণার পরিবর্তনের উপর নির্ভরশীল না হয়। ঐ পত্রিকায় লেখা হল : "This fails to explain why our astronomers appear to think that logic and ontology depend on the shifting views of the astronomers. Speculative thought was highly advanced long before astronomy. A sense of proportion ought to be useful to mathematicians and physicists, but it is to be feared that British astronomers have regarded their own field as of somewhat greater consequence than it really is."। (কেন যে আমাদের জ্যোতির্বিদরা মনে করেন যে, জ্যোতির্বিদ্যার অপস্রিয়মান ধারণার উপর লজিক ও অন্টোলজি নির্ভর করে, এটা মোটেই বোধগম্য নয়। জ্যোতির্বিদ্যার জন্মের অনেক আগে থেকে কাল্পনিক চিন্তা যথেষ্ট উন্নত পর্যায়ে পৌঁছেছিল। গণিত ও পদার্থবিদ্‌দের পক্ষে পরিমিতিবোধ বা মাত্রাজ্ঞান একটি প্রয়োজনীয় জিনিস। কিন্তু ভয় হয়, নিজেদের ক্ষেত্রটি প্রকৃতপ্রস্তাবে যেটুকু প্রভাবশালী ব্রিটিশ জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা তাকে তার চেয়ে অনেক বেশি প্রভাবশালী বলে মনে করছেন।)

বিজ্ঞানীদের 'প্রকৃত প্রভাবের তুলনায় নিজেদের ক্ষেত্রকে বেশি প্রভাবশালী মনে করা'-র এই ধারণা মোটেই নতুন কিছু নয়। যাঁরা গোঁড়া তাঁরা সর্বদাই চাইবেন যে, বিশ্বের "মূল" ধারণাগুলো (তাঁদের তথাকথিত অন্টোলজি) যেন জ্ঞানের বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রের অগ্রগতি-জনিত পরিবর্তনের ফলে কোন রকম হেরফের না হয়। ষোড়শ শতকে কোপারনিকাসের বই-এর মুখবন্ধে ওশিয়েণ্ডার, সপ্তদশ শতকে ইতালিয়ান ইনকুইজিশনের প্রধান বেলারমাইনের লেখা গ্যালিলিও-র চিঠিতে উভয়েই জ্যোতির্বিদদের উদ্দেশে সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছিলেন। বলেছিলেন: তাঁরা যেন নতুন জ্যোতির্বিদ্যাবিষয়ক ধারণাগুলোর ফলিত প্রয়োগেই শুধু লেগে থাকেন, তাঁদের আবিষ্ক্রিয়ার অন্টোলজিক্যাল গুরুত্ব নিয়ে মাথা না ঘামান, সামগ্রিকভাবে বিশ্বছবির 'বিকৃতি' না ঘটান বা কল্পনা না করেন যে, তাঁদের আবিষ্ক্রিয়াগুলোই 'প্রকৃত সত্য'। বিশ শতকের গোঁড়ারা আবেদন করলেন 'জনমতের কাছে', 'কাণ্ডজ্ঞানের কাছে', 'স্বতঃসিদ্ধতা' ইত্যাদির কাছে। জনমত অবশ্য মোটেই ঐক্যমত ছিল না। সাধারণ লোকের কাছে 'space curvature' বা 'দেশের বক্রতা' স্বাভাবিকভাবেই অর্থবহ ছিল না, তবে এজন্য তাঁরা নিজেদের অপারগতাকেই দোষ দিতেন, আইনস্টাইনকে নয়। পক্ষান্তরে, গণমাধ্যমগুলো প্রায়ই আইনস্টাইনের দোষ খুঁজে পেত। নতুন মহাকর্ষ তত্ত্ব এবং বিমূর্ত জ্যামিতি থেকে তিনি ঝটিতি যে সব সিদ্ধান্তে এসেছেন সেগুলো বুঝতে হলে প্রয়োজন পদার্থবিদ্যা ও গণিতের জ্ঞান। নতুন ধারণাগুলো তখনও পর্যন্ত জনবোধ্যভাবে তুলে ধরা যায় নি, বিজ্ঞানের চিন্তাধারায় তত্ত্বটি সাহসিকতার দাবী জানাচ্ছিল। 'স্বতঃসিদ্ধতার'র দলভুক্তগণ এই দেখে খুব মুষড়ে পড়লেন যে, নতুন ধারণাগুলো দৃশ্যত ব্যাপকভাবে লোকেদের দ্বারা গৃহীত হচ্ছে। যাঁরা সাধারণ ব্যক্তি, যাঁরা রিলেটিভিটি বুঝি বলে দাবী করেন না, তাঁরাও এর ব্যাপকতা ও সাহসিকতার পরিমাণ সম্পর্কে সচেতন হলেন। দৃশ্যত যা স্বতঃসিদ্ধ সেই সব ধারণাগুলো যখন আলোচিত হচ্ছে তা

হলে বিষয়টি নিঃসন্দহে তাৎপর্যপূর্ণ—তাঁরা এই ধারণা করলেন। রিলেটিভিটি থিয়োরী ও তাঁর জনকের প্রতি ব্যাপক ও গভীর উৎসাহ প্রদর্শনের যে তরঙ্গ উঠেছিল তার মূল্যায়নে আজ পেছন ফিরে তাকিয়ে আমরা এই শতাব্দীর অন্যতম বৈশিষ্ট্য—সামাজিক চিন্তাধারায় বিপ্লবাত্মক পরিবর্তনের লক্ষণ—দেখতে পাই।

১৯১৮। প্রথম মহাযুদ্ধ শেষ হল। আর ১৯১৯-র ২৮শে জুন মিত্রশক্তি ও জার্মানীর মধ্যে স্বাক্ষরিত হল ভার্সাই চুক্তি। চুক্তির শর্তাবলী ছিল জার্মানীর পক্ষে অপমানকর। সমগ্র জার্মানীতে এর ফলে নেমে এল বিষাদের ছায়া। বেশ কয়েকটি উপনিবেশ জার্মানীকে হারাতে হল, সেই সঙ্গে দিতে হল প্রচুর টাকা। যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ। সেদিন এর বিরুদ্ধে সবার আগে যিনি গর্জে উঠলেন তিনি আইনস্টাইন। —'জার্মান জাতের মেরুদণ্ড ভেঙে দেয়া হল। এ ঘোর অবিচার।'

১৯২০ সাল থেকে আইনস্টাইনের খ্যাতি তৎকালীন জীবিত সব বৈজ্ঞানিকের খ্যাতিকে ছাড়িয়ে যায়। বিখ্যাত পোলিশ পদার্থবিদ্ ও আইনস্টাইনের একদা সহকর্মী লিওপোল্ড ইনফেল্ড তাঁর আত্ম-জীবনীমূলক উপন্যাস Quest-এ এর কারণ বিশ্লেষণ করেছেন।

১৯১৯ সালে ইংরেজ পদার্থবিদ্ আর্থার এডিংটনের নেতৃত্বে ইংরেজ বিজ্ঞানীদের এক বিখ্যাত অভিযানের ফলে সাধারণ আপেক্ষিক তত্ত্বের সত্যতা যাচাই হয়েছিল। ইনফেল্ড লিখছেন—"তখন সবেমাত্র যুদ্ধ শেষ হয়েছে। বিদ্বেষ, হত্যা আর আন্তর্জাতিক চক্রান্তে সবাই ক্লান্ত। পরিখা, বোমা, আর নির্বিচার হত্যার তিক্ত আস্বাদে সমস্ত পরিবেশ ভারাক্রান্ত। যুদ্ধের ওপর লেখা বই আর বিক্রি হয় না। শান্তির এক নবযুগের জন্য সবাই প্রতীক্ষারত, সবাই চাইছে যুদ্ধকে ভুলতে। আর এর মধ্যে তাঁরা এমন কিছু পেলেন যাকে তাঁদের কল্পনা আঁকড়ে ধরল। কবর আর রক্তে মোড়া পৃথিবী থেকে

মানুষের চোখ চাইল তারায় ভরা আকাশের দিকে। দুঃখ ও হতাশার বাস্তবতা থেকে এই বিমূর্ত চিন্তা মানুষকে নিয়ে গেল অনেক অনেক দূরে। সূর্যগ্রহণের রহস্য, মানব মনের অন্তর্ভেদী ক্ষমতা, রোমান্টিক চিত্র, রাহুগ্রস্ত সূর্যের অদ্ভুত দৃশ্য, বক্র আলোকরশ্মির রূপকল্প—সবই জীবনের পীড়াদায়ক বাস্তবতা থেকে বহু যোজন দূরের জিনিস।"

এই ধরনের আবেগপ্রবণতার ফলে আইনস্টাইনের তত্ত্ব তথা নব্য পদার্থবিজ্ঞানের সামাজিক প্রভাব সম্পর্কে জনমানসে একটা সচেতন, বা প্রায়শ অবচেতন, বোধ বিস্তারলাভ করে। নক্ষত্রখচিত আকাশ শুধু যে বাস্তবের আশাভঙ্গতা থেকে মানুষের মনকে দূরে নিয়ে গেছে তা-ই নয়, আরো কিছু করেছে। এর ফলে পৃথিবীতে উঠেছে যুক্তির জয়ধ্বনি। বিশ্ব সম্পর্কে জ্ঞানের ক্রমবিকাশ ছাড়া আরো কিছুর সঙ্গে এই জয়ধ্বনি জড়িত। বহু আগে স্বতঃসিদ্ধতার বেলা-ভূমি থেকে একদিন যাত্রা শুরু হয়েছিল বিজ্ঞানের, আর অনাবিষ্কৃত নতুন দেশে উত্তীর্ণ হওয়া ছিল তার ললাটলিপি। নতুন দেশের অব্যবহৃত সম্পদরাজি তখনও দেখা হয়ে ওঠেনি। কিন্তু নতুন আইডিয়ার প্রয়োগে, নিঃসন্দেহে, প্রযুক্তিবিদ্যায় মূল্যবান সব পরিবর্তন আসবে আশা ছিল; উৎপাদিকা শক্তির বিরাট বিকাশের একটা আবছা আকাঙ্ক্ষাও ছিল। আর সেই সঙ্গে মানুষের মনে বাসা বেঁধে-ছিল বিজ্ঞানের শান্তিপূর্ণ প্রয়োগের জন্য সংগ্রামের ক্ষেত্রে বিজ্ঞানের নিজস্ব ভূমিকা নিয়ে একটা স্পষ্ট পূর্ব-ধারণা। মানুষ পূর্বাহ্নেই বুঝেছিল, বিজ্ঞানের ধ্বংসাত্মক প্রয়োগের বিরুদ্ধে এবং শান্তিপূর্ণ প্রয়োগের জন্য শেষ পর্যন্ত একটা সংগ্রাম বাধবেই। আর, কয়েক দশকের মধ্যে সত্যিই বাধল সেই সংগ্রাম। প্রতিক্রিয়ার যে বিষবাষ্প প্রায়ই যুদ্ধের কালো মেঘরূপে ঘনীভূত হয়, মানুষ ভেবেছিল, বিজ্ঞান তা দূর করতে সাহায্য করবে। কারণ বিজ্ঞান হল কার্যত আন্তর্জাতিক এবং মূলত জাতীয়তা-বাদ ও যুদ্ধের বিরোধী। কিন্তু যে পুরুষ সোৎসাহে রিলেটিভিটি থিয়োরী এবং তার পরীক্ষামূলক সত্যতাকে জয়ধ্বনি সহ বরণ করেছিল

সেই পুরুষই দেখে গেছে চরমপন্থী জাতীয়তাবাদের আগ্নেয় উদ্গীরণের কোথায় গিয়ে পরিসমাপ্তি ঘটে।

ইনফেল্ড আরও লিখলেন—"আর একটি কারণ সম্ভবত আরও বেশি গুরুত্বপূর্ণ। তা হল, জার্মান-বিজ্ঞানী আইনস্টাইন এক নতুন ঘটনা সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করলেন, আর ইংরেজ জ্যোতির্বিদেরা সেই ঘটনার সত্যতা যাচাই করলেন। যুযুধান দুই জাতির বিজ্ঞানী-কূল আবার পারস্পরিক সহযোগিতার দুই হাত বাড়িয়ে দিলেন। যেন এক নবযুগের সূত্রপাত হল। আমার মতে, শান্তির জন্য জনসাধারণের আকাঙ্ক্ষাই আইনস্টাইনের ক্রমবর্ধমান পর্বতপ্রমাণ খ্যাতির কারণ।"

ইনফেল্ডের বিশ্লেষণের সঙ্গে হয়ত আরো কয়েকটি কথা যোগ করা চলে। ঐ বছরগুলোতে একটি নতুন গোষ্ঠী ধীরে ধীরে আত্মপ্রকাশ করছিল। এঁদের দর্শন হল 'anti-intellectualism' বা 'বুদ্ধিবাদের বিরোধিতা'। রহস্যবাদী অভিজ্ঞানের তুলনায় মানব মনীষা যে অপূর্ণ ও দুর্বল এঁরা তাই প্রচার করতেন। নুরেমবার্গের প্যারেড গ্রাউণ্ডে তখনও এই দর্শন আত্মপ্রকাশ করেনি। মুষ্টিমেয় কয়েকজন শুধু বুঝেছিলেন যে, বুদ্ধিবাদের এই বিরোধিতা এক দশক পরে সবাইকে ধীরে ধীরে এক কর্দমাক্ত ভূমিতে নিয়ে যাবে। উদ্গত-অঙ্কুর এই দল এবং প্রতিক্রিয়াশীল অনেকের দ্বারা এ সময় আইনস্টাইন ব্যক্তিগতভাবে দংশিত হচ্ছিলেন। এ কথা জনসাধারণের অনেকে জানতেন। এর ফলেও রিলেটিভিটি থিয়োরী ও তার জনকের প্রতি ব্যাপক জন-আগ্রহের সৃষ্টি হয়েছিল।

এডিংটনের অভিযানের পর কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের এক অধ্যাপক লেখেন—"কয়েক বছর হল সারা বিশ্বে বিরাজ করছে এক অস্থিরতা—মানসিক ও শারীরিক। হতে পারে যে, যুদ্ধ, বলশেভিকদের উত্থান প্রভৃতি দৃশ্যমান ঘটনাগুলো অংশত মানসিক অস্থিরতার কারণ। বৈপ্লবিক এবং অ-পরীক্ষিত এক্সপেরিমেণ্ট সমূহের

অনুকূলে বহু-পরীক্ষিত সরকারী প্রথাগুলো বিসর্জন দেয়ার ইচ্ছা থেকে এই অস্থিরতা প্রকট হয়ে পড়েছে। অস্থিরতার এই মনোভাবে বিজ্ঞানও আজ আক্রান্ত। এমন অনেকে আছেন যাঁরা চাইছেন, সু-পরীক্ষিত যে সব তত্ত্বের উপর আধুনিক বিজ্ঞান এবং যান্ত্রিক বিকাশের সামগ্রিক কাঠামোটি গড়ে উঠেছে সেগুলো যেন আমরা বিশ্বসম্পর্কে পদ্ধতিগত সব কল্পনা আর অবিশ্বাস্য সব স্বপ্নের খাতিরে বিসর্জন দিই।"

শীগগিরই রিলেটিভিটি থিয়োরীর উপর সরাসরি আক্রমণ শুরু হল। বিশেষ করে জার্মানীতেই এটা ঘটল। প্রথম দিকে অবশ্য জার্মান জাতীয়তাবাদীরা নতুন থিয়োরীকে 'খাঁটি জার্মান' মনীষার অভিব্যক্তি বলে স্বাগত জানিয়েছিল। আর সে সময়ে গ্রেট বৃটেনের জনগণ চেষ্টা করছিলেন এই থিয়োরীর সঙ্গে জার্মানীর কোনরূপ সম্পর্ককে অস্বীকার করতে! জ্যোতির্বিদ্যা সংক্রান্ত পরীক্ষাটির ফলাফল যদি অন্য রকম হত তা হলে, আইনস্টাইন যেমন এক সময় বলেছিলেন, জনমতও সেই অনুসারে অন্যরূপ হত। লণ্ডনের Times পত্রিকায় ১৯১৯ এর ২৮শে নভেম্বর এক প্রবন্ধে আইনস্টাইন লিখেছিলেন—"পাঠকের রস উপভোগের জন্য আপেক্ষিক তত্ত্বের আরো একটি প্রয়োগের উল্লেখ আমি করছি। আজ জার্মানীতে আমাকে বলা হচ্ছে 'জার্মান বিজ্ঞানী', আর ইংল্যাণ্ডে আমার পরিচয় হল 'সুইস ইহুদী'। কপালে যদি 'কালো পশু' পরিচিতি লেখা থাকে তবে জার্মানরা আমায় বলবে 'সুইস ইহুদী', আর ইংরেজরা বলবে 'জার্মান বিজ্ঞানী'।"

আপেক্ষিক তত্ত্বের সত্যতা যাচাই হওয়া সত্ত্বেও কিন্তু আইনস্টাইন শীঘ্রই 'কালো পশু' হয়ে পড়লেন। জার্মানরা সত্যি সত্যি তাঁকে 'সুইস ইহুদী' বলতে লাগল, তাঁর থিয়োরীও আর জার্মানদের কাছে জাতীয়-গরিমার কারণ হয়ে রইল না। সারা জার্মানী জুড়ে শুরু হয়ে গেল এক অভূতপূর্ব শ্রেণীসংগ্রাম, গজিয়ে উঠল অসংখ্য সন্ত্রাসবাদী

সংস্থা। জাতীয়তাবাদী ম্যাগাজিন Der Turmer-এ প্রকাশিত হল 'বলশেভিক ফিজিক্স' নামে এক প্রবন্ধ। তাতে এক জায়গায় লেখা হল: "···নব কোপারনিকাস নামে পরিচিত প্রফেসর আইনস্টাইন তাঁর ভক্তদের হিসেবে প্রায়ই বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের সংখ্যা উল্লেখ করে থাকেন। তবু, কথার মালা না গেঁথে বলি, আমরা এখানে এমন একটা কুখ্যাত বৈজ্ঞানিক অপবাদ-কাহিনীর উল্লেখ করছি যা রাজনৈতিক সর্বকালের মধ্যে বিষাদতম এ যুগের চিত্রের সঙ্গে সুন্দর মিলে যায়। জার্মান অধ্যাপকেরা নিজেরাই যখন আইনস্টাইনের দ্বারা বিপথগামী হচ্ছেন, সেক্ষেত্রে শেষ বিশ্লেষণে শ্রমিকদের মার্কসবাদের দিকে ঢলে পড়ার জন্য দোষ দেয়া বৃথা।"

আইনস্টাইন ও তাঁর থিয়োরীর বিরোধিতা করার একমাত্র উদ্দেশ্য নিয়ে জনৈক পল ওয়েল্যাণ্ড এক বিশেষ সংস্থাই সৃষ্টি করে ফেললেন। ইনি সভাসমিতির ব্যবস্থা করতেন আর সেখানে চলত আইনস্টাইনের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক আক্রমণের লাভা উদ্গীরণ। তারপর নতুন থিয়োরীর বিরোধিতা করতে তিনি পদার্থবিদ্ ও দার্শনিকদের তুলে দিতেন মঞ্চে। এ সময়ে খ্যাতনামা পরীক্ষামূলক পদার্থবিদ্ ফিলিপ লেনার্ড-ও আইনস্টাইনের বিরুদ্ধে আক্রমণে তাঁর সঙ্গী হন। লেনার্ড ছিলেন রিলেটিভিটি থিয়োরীর হিংস্র বিরোধী এবং এত উন্মত্ত জাতীয়তাবাদী যে, নিজ পরীক্ষাগারে 'অ্যাম্পিয়র' প্রতিশব্দ পাল্টে জনৈক জার্মান বিজ্ঞানীর নাম ব্যবহার করতেন। লেনার্ডের বক্তব্যে, এমন কি, আইনস্টাইনকে শারীরিকভাবে নির্যাতন করার আহ্বানও থাকত। রিলেটিভিটি তত্ত্বের মূল্যবান অনুসিদ্ধান্তরূপে পাওয়া যায়—বেগের সঙ্গে বস্তুর ভরের পরিবর্তনের ধারণা এবং তার পরিমাণগত সূত্র। লেনার্ড এই ধারণাটির উৎস সন্ধানে একজন 'খাঁটি জার্মান বিজ্ঞানীর' খোঁজ করতে থাকেন। শেষ পর্যন্ত ঘোষণা করেন যে, যুদ্ধে নিহত বিশিষ্ট তত্ত্বীয় পদার্থবিদ্ এফ হাসেনোর্হল আইনস্টাইনের অনেক আগে ঐ ধারণাটি আবিষ্কার করেন।

দেখতে দেখতে রিলেটিভিটি রাজনৈতিক সংগ্রামের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে উঠল। এজন্যও আইনস্টাইনের খ্যাতি দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে। তবু রিলেটিভিটি সম্পর্কে এত ব্যাপক উৎসাহ-উদ্দীপনার কারণ বিশ্লেষণে তত্ত্বটির বক্তব্য ও উদ্দেশ্যকেও একেবারে উপেক্ষা করা চলে না। 'ক্লাসিকাল আইডিয়াল'-এর সঙ্গে এই থিয়োরীর সংযোগটি রয়েছে একেবারে তলদেশে। পরস্পর আপেক্ষিক বেগে গতিশীল বস্তু-পুঞ্জের সমবায়রূপে বিশ্বের ধারণা গত তিন শতাব্দী ধরে আমাদের চিন্তার চিত্তভূমিতে অন্তর্লীন হয়ে বিরাজ করছে। দূরস্থ বিন্দুতে তাৎক্ষণিক ক্রিয়া, চরম দেশ-কাল, চরম কাঠামো-রূপে ইথরের ধারণা ( বিশ্বছবির মূল চরিত্রের সঙ্গে যা একেবারে সামঞ্জস্যহীন ) প্রভৃতির দ্ব্যর্থকতার হাত থেকে বিশ্বছবিকে এখন মুক্ত করা হচ্ছে। আর, এটি করতে গিয়ে যে মূল্য দিতে হচ্ছে তা হল বেগের লব্ধি নির্ণয়ে প্রচলিত বিধানটির বর্জন। এ এক প্যারাডক্স বা কূট। এভাবে রিলেটিভিটি মানুষের উপর চাপিয়ে দিল এক কূট অথচ ভৌত বাস্তবতা—যা বিশ্বাস-যোগ্য, প্রশ্নাতীত এবং পরীক্ষিত সত্য। এ থেকে জন্ম নিল paradoxical rationalism বা আপাতবিরুদ্ধ যুক্তিবাদ—বিশ্বসুষমার এক নবীন ধারণা। এটি 'স্বতঃস্পষ্টতা'র ট্রাডিশনের বিরোধিতা ক'রে অত্যন্ত সরল কয়েকটি সম্পর্কের রূপ পরিগ্রহ করে। আইডিয়ার এই কমপ্লেক্স রিলেটিভিটি থিয়োরী তথা আইনস্টাইনের বিশ্বদৃষ্টির মূল কথা। ক্রমে এ কথা রিলেটিভিটির সঙ্গে পরিচিত লোকজনের কাছ থেকে সাধারণ মানুষের কাছেও চলে যায়। সাধারণভাবে এ তত্ত্ব যে ধারণার জন্ম দিল তা হল বুদ্ধির সর্বত্রগামিতা এবং বিশ্বের বস্তুনিষ্ঠ প্রকৃতি ও সুষমা সম্পর্কে এক অচলা বিশ্বাস। যে কালে রহস্যবাদ ও বিশৃঙ্খলতার সঙ্গে বুদ্ধি এবং সুষমার তীব্র সংঘাত চলছে ইতিহাসের সেই গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়ের বাসিন্দাদের কাছে এ সব আইডিয়ার একটা অপ্রতিরোধ্য আবেদন ছিল। শীঘ্রই গোটা ব্যাপারটা এক শৃঙ্খল প্রক্রিয়ার রূপ নিল। থিয়োরীর প্রতি উৎসাহের ফলে

এর সামাজিক মূল্যবৃদ্ধি ঘটল, এর উদ্গাতাকে জনসমক্ষে বক্তব্য পেশ করতে হল ; আর সামাজিক মূল্যবৃদ্ধির ফলে তত্ত্বটির জনপ্রিয়তাও বাড়তে লাগল।

জ্যোতির্বিদদের পর্যবেক্ষণে তত্ত্বের সত্যতা যাচাই ছাড়া আরো একটি কারণে আপাত-স্ববিরোধিতা সত্ত্বেও তত্ত্বটি সাধারণের কাছে বিশ্বাসযোগ্য হয়ে ওঠে এবং জনমনে প্রচণ্ড অনুরণন সৃষ্টি করে। তা হল, তত্ত্বটির প্রতি আইনস্টাইনের নিজের মনোভাব। তাঁর দৃঢ় প্রত্যয় ছিল যে, পর্যবেক্ষণে তত্ত্বের সত্যতা যাচাই না হয়েই পারেনা। বিজ্ঞানীর দার্শনিক ধারণা যাই হোক না কেন, তত্ত্বের যাচাই-এ তিনি যখন পরীক্ষার জন্য অপেক্ষা করেন তখন অবশ্যম্ভাবীরূপে সংশয়বাদিতার মঞ্চ থেকে নেমে আসেন। নিজ আইডিয়ার সত্যতা সম্পর্কে তার উদ্গাতা স্বয়ং কতদূর বিশ্বাসী তার উপর অনেক কিছু নির্ভর করে। অনেক সময় অবস্থা এমন হয় যে, বিশ্বের অন্তর্গঠনের পরিজ্ঞেয়তা সম্পর্কে স্বতঃস্ফূর্ত, অবচেতন ধারণাই যথেষ্ট নয়। রিলেটিভিটি থিয়োরী যে পরীক্ষার কষ্টিপাথরে উত্তীর্ণ হবে আইনস্টাইনের এই প্রত্যয়ের উৎস শুধু তাঁর চিন্তারাজির গাণিতিক রূপের অভ্রান্ততা নয়। বিশ্বের পরিজ্ঞেয়তা সম্পর্কে তাঁর সচেতন, সুসঙ্গত এবং অচলা বিশ্বাস থেকেও এই প্রত্যয় জন্ম নিয়েছিল। পূর্ণগ্রাস সূর্যগ্রহণের সময় গৃহীত ছবিগুলো যখন আইনস্টাইনকে দেখান হল তখন তিনি মন্তব্য করলেন—'ফোটোগ্রাফ হিসেবে খুব চমৎকার।' নিজ তত্ত্বের সত্যতা প্রমাণিত হওয়ার দরুন তিনি মোটেই মুগ্ধ হন নি। তত্ত্বটি সম্পর্কে এতোই গভীর ধারণা তিনি মনে মনে পোষণ করতেন। পরীক্ষায় তত্ত্বটি ভুল প্রমাণিত হলে আপনার প্রতিক্রিয়া কী হত ? —এ প্রশ্নের উত্তরে বলেছিলেন : "I should have been very surprised indeed"।

কেউ হয়ত মনে করতে পারেন যে, কথাটি বড়ই অহং-গন্ধী। তাই এ কথা বলা প্রয়োজন যে, আইনস্টাইনের ঐ প্রত্যয়ের কারণ এই

নয় যে, বিজ্ঞানী হিসেবে তিনি নিজেকে অভ্রান্ত বলে মনে করতেন। নিজ মনীষার জয়গান নিজে করার মতো লোক ছিলেন না তিনি। বিশ্বের পরিজ্ঞেয়তা এবং ছন্দোময়তায় তাঁর বিশ্বাসের অভিব্যক্তিই ছিল তাঁর মনোভাব। তাঁর মতে, পরীক্ষামূলক পর্যবেক্ষণের সঙ্গে (বাইরের যাচাই) যদি কোন বিশ্বছবি সুসঙ্গত হয় এবং যদ্দূর সম্ভব ঐ ছবি যদি খুশিমতো নেয়া কোন অঙ্গীকারের উপর নির্ভরশীল না হয় (অন্তরের সুষমা) তা হলে তা বস্তুনিষ্ঠ বিশ্বছবির প্রায় অনুরূপ। বিশ্বের পরিজ্ঞেয়তা এবং ছন্দোময়তার দৃঢ় বিশ্বাস আইনস্টাইনের জীবনে এমন একটা অনুসন্ধিৎসার মাত্রা পরিগ্রহ করেছিল যা কেবল তাঁর মতো প্রতিভাধর পুরুষকেই মানায়। বিজ্ঞান এবং নিজের কাজ, কাজের গুরুত্ব এবং তার সামাজিক প্রভাবের প্রতি তাঁর মনোভাবও এর দ্বারা রঞ্জিত হয়েছিল।

আইনস্টাইনের বৈজ্ঞানিক প্রত্যয়ের সঙ্গে তার নৈতিক দর্শনেরও একটা অঙ্গাঙ্গী সম্পর্ক রয়েছে। বৌদ্ধিক ক্ষমতা এবং নৈতিকতার মধ্যে তিনি কোন পার্থক্য করতেন না। একমাত্র 'অধিব্যক্তিকতায়' (extra-personal) মগ্ন এবং আপনভোলা (কাজেই পরের সম্পর্কে সর্বদা সচেতন) লোকের পক্ষেই বিস্ময়কর অনায়াসে বিমূর্ত ধারণাগুলো নিয়ে নাড়াচাড়া করা সম্ভব। ক্ষণিকের জন্যও খুশিমতো ধরা, পরীক্ষা-নিরপেক্ষ কোন রূপকল্পের ফাঁদে তিনি পড়েন নি। বা, অভিজ্ঞতার সম্পর্ককে 'নিছক বিবরণের' গণ্ডীতে নিয়েও ফেলেন নি। খ্যাতির যে গুরুভার হঠাৎ তাঁর কাঁধে এসে পড়েছিল তার ফলে তিনি উপলব্ধি করেন যে, মানবজাতির ভাগ্য নির্ধারণে বিজ্ঞানীর দায়িত্ব অপরিসীম। মানুষী ক্রিয়াকলাপে বিজ্ঞান যে এক অ-প্রথাসিদ্ধ বিশেষ ভূমিকা পালন করতে এসেছে এবং তা-ই যে বিংশ শতকের বিশিষ্ট যুগলক্ষণ, শেষ বিশ্লেষণে, আইনস্টাইনের খ্যাতি তারই দ্যোতক।

বালজাক বলতেন—"the motherly feeling towards all

people" অর্থাৎ সকলের প্রতি মায়ের স্নেহময় ভাবের কথা। বিজ্ঞানে বিপ্লবের ফলে উদ্ভূত নতুন অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে আইনস্টাইনের কাছে ঐ কথা ক'টি মনুষ্যভাগ্য নির্ধারণের এক সচেতন দায়িত্বরূপে গৃহীত হয়েছিল। অনেকে আইনস্টাইনকে পরমাণুযুগের ভবিষ্যৎ-দ্রষ্টা বলে থাকেন। অবশ্য নিজেকে প্রফেট বা দ্রষ্টা মনে করার চেয়ে আর কিছু তাঁর কাছে বেশি চরিত্রবিরুদ্ধ হতে পারে না। বিশ শতকের বৈজ্ঞানিক ও সামাজিক বিকাশের প্রকৃতিই এমন যে, সেখানে ভবিষ্যৎ-দ্রষ্টার কোন স্থান নেই। তব একথা সত্যি যে, ভরকে আলোর বেগের বর্গ দিয়ে গুণ করলে যে শক্তির সমান হয় ( $E=mc^2$ ) তা তিনিই প্রথম আবিষ্কার করেন। তা ছাড়া, অন্যান্য বিজ্ঞানীদের তুলনায় তিনি অনেক আগে উপলব্ধি করেন, বিজ্ঞানের সম্ভাবনাগুলো এমন যে, সামাজিক শক্তিগুলোর সংগ্রামে বিজ্ঞানী ও বুদ্ধিজীবীদের অংশ গ্রহণ করা প্রয়োজন হয়ে পড়ছে। কেননা, ওগুলোর সঙ্গে রয়েছে বৈজ্ঞানিক আবিষ্ক্রিয়ার সম্ভাব্য প্রয়োগের একটা সাক্ষাৎ সম্পর্ক। আইনস্টাইন নিজে সহজেই আইডিয়ার সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়লেন বটে, কিন্তু সংগ্রামের আসল সিদ্ধান্তকারী ক্ষেত্রটি তখনও তাঁর কাছ থেকে অনেক দূরে। কিন্তু যে উদ্দেশ্যে তিনি নিজেকে নিবেদন করলেন—আসুরিক জাতীয়তাবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে সমস্ত বুদ্ধিজীবীদের একত্রীকরণ—তার গুরুত্ব ছিল অপরিসীম।

কখন কখন তিনি অবস্থার যে বিশ্লেষণ করতেন তা হয়ত ঠিক হত না। তবে নেতৃত্বের ক্ষেত্রে নিজের যোগ্যস্থানটি তিনি অধিকার করে নিয়েছিলেন। যে যে শক্তি যুদ্ধবাজ ও প্রতিক্রিয়াশীলদের কার্যকরীভাবে বাধা দেয়ার ক্ষমতা রাখে সেগুলো সম্পর্কে প্রথম দিকে তাঁর পরিষ্কার ধারণা ছিল না। তাঁর শক্তিবাদীর ভূমিকাটিও ছিল অস্পষ্টতায় আচ্ছন্ন। ১৯২০ সালে একবার বার্লিনে একদল আগন্তুকের কাছে তিনি মন্তব্য করেছিলেন—"আমার শান্তিবাদ একটা নিজস্ব ধারণা এবং এটি আমায় পেয়ে বসেছে। কারণ, নরহত্যা

আমার কাছে এক বীভৎস ব্যাপার। কোন বৌদ্ধিক তত্ত্ব থেকে আমার এ ধারণার জন্ম হয় নি। এর ভিত্তি হল: যে কোন প্রকার নিষ্ঠুরতা ও ঘৃণার প্রতি আমার প্রগাঢ় বিরূপতা। আমার এই প্রতিক্রিয়াকে আমি একটা যৌক্তিক রূপ দিতে পারি বটে, তবে সে হবে আসলে পশ্চাৎচিন্তার সামিল।"

এ সময়ে জাতিসংঘ কতকগুলো অস্পষ্ট আলোচ্য-সূচীসহ একটা কমিশন গঠন করেন। নাম দেন: Commission for Intellectual Co-operation। ১৯২২ সালে আইনস্টাইনকে এই কমিশনের অন্যতম সদস্যরূপে যোগ দেয়ার আমন্ত্রণ জানান হয়। নিম্নোক্ত চিঠিসহ আইনস্টাইন ঐ আমন্ত্রণে সাড়া দেন।

"......কমিশনকে কি ধরনের কাজ করতে হবে, স্বীকার করতে দ্বিধা নেই, সে সম্পর্কে ভাল করে না বুঝলেও এ আহ্বানে সাড়া দেয়া আমি কর্তব্য বলে মনে করি। কেননা, এ সময়ে আন্তর্জাতিক সহযোগিতার যে কোন প্রচেষ্টায় সহায়তা করতে কারও অস্বীকার করা উচিত নয়।"

কমিশনে বসেই কিন্তু আইনস্টাইন রাজনৈতিক মতাদর্শের সম্মুখীন হলেন। ফলে নিষ্ঠুরতার প্রতি নিছক বিরূপতা ও স্বজ্ঞালব্ধ শান্তিবাদ আর যথেষ্ট মনে হল না। ক্রমে তিনি সুস্পষ্টভাবে যুদ্ধ-বিরোধী এক প্ল্যাটফর্মে এসে দাঁড়ালেন এবং পরের বছর রূঢ়-অঞ্চল দখলের প্রতি জাতিসংঘের ভূমিকায় ক্লিষ্ট ও হতাশাগ্রস্ত হয়ে কমিশন থেকে পদত্যাগ করলেন। এ প্রসঙ্গে তিনি লিখলেন—"এ সম্পর্কে আমি নিঃসন্দেহ যে, নিজ কর্তব্য পালনে জাতিসংঘের না আছে কোন ক্ষমতা, না আছে প্রয়োজনীয় শুভ ইচ্ছা। একজন গোঁড়া শান্তিবাদী হিসেবে লীগের ( জাতিসংঘ ) সঙ্গে আমি কোন সম্পর্ক রাখতে চাই না।" আরও তীক্ষ্ণ মন্তব্য করলেন একটি শান্তিবাদী পত্রিকার কাছে লেখা এক চিঠিতে—"আমার এরূপ আচরণের কারণ এই যে, জাতিসংঘের কাজকর্ম দেখে আমি নিঃসংশয় যে,

বর্তমান পাওয়ার-গ্রুপের ক্রিয়াকলাপের—তা যতই পাশবিক হোক না কেন—বিরুদ্ধে ব্যবস্থা অবলম্বনে জাতিসংঘ অপারগ। বর্তমানে এর কাজকর্ম যেভাবে চলে তাতে একটি আন্তর্জাতিক সংস্থার আদর্শ রূপায়ণে জাতিসংঘ শুধু যে অক্ষম তাই নয়, বস্তুত সেই আদর্শের সে অবমাননা করছে। আর ঠিক এই কারণে আমি এর সংস্রবমুক্ত হয়েছি।"

এভাবেই আইনস্টাইন উপলব্ধি করলেন যে, স্বজ্ঞালব্ধ শান্তিবাদ যুদ্ধবাজদের শক্তিকে রুখতে নেহাতই অক্ষম। তিনি ঠিকই ধরেছিলেন: জাতিসংঘের শুভ ইচ্ছা তো থাকতেই হবে, সেই সঙ্গে তার শান্তি-ভঙ্গকারী ক্রিয়াকলাপ বন্ধ করার ক্ষমতাও থাকা চাই। দুয়ের কোনটাই জাতিসংঘের ছিল না।

এদিকে সম-মনোভাবাপন্ন বহু ব্যক্তি, বিশেষ বিশ্ববন্দিতা বিজ্ঞানী স্ক্লোডাওয়াস্কা কুরী, তাঁকে এই ধারণা দিলেন যে, জাতিসংঘের কাঠামোর মধ্যে বিজ্ঞানীদের আন্তর্জাতিক সহযোগিতা ফলপ্রসূ করে তোলা সম্ভব। আর এর ফলে লোকজনকে জাতীয়তাবাদের মূঢ়তা থেকে ফেরানো যাবে। কুরীর প্রস্তাব আইনস্টাইনের মনে ধরল। তিনি ভাবলেন, বিজ্ঞান ধর্মান্ধ জাতীয়তাবাদকে পরাভূত করতে পারবে। তা ছাড়া, নিছক নেতিবাচক মনোভাবের তিনি বিরোধী ছিলেন।

এ সময়ে তিনি লিখলেন—"আলোচিত বিষয়বস্তুর বিশ্বজনীন চরিত্রের দরুন এবং আন্তর্জাতিক সহযোগিতার প্রয়োজনে জড়-বিজ্ঞানের প্রতিভূগণ সহজেই আন্তর্জাতিক মনোবৃত্তির প্রতি আকৃষ্ট হন। ফলে শান্তিবাদী লক্ষ্যগুলির প্রতি এঁরা অনুকূল ধারণার পরিপোষক ......। সাংস্কৃতিক শিক্ষার অন্যতম শক্তি হিসেবে বিজ্ঞানের ঐতিহ্য মনের সম্মুখে এক বৃহত্তর দিকচক্রকে উন্মোচিত করবে। অর্থহীন জাতীয়তাবাদ থেকে লোকজনকে দূরে সরানোর কাজে এর বিশ্বজনীন দৃষ্টিভঙ্গি শক্তিশালী প্রভাব বিস্তার করবে।"

১৯২০-র ঘটনাবলীর ফলে উদ্ভূত এই ধরনের সেন্টিমেণ্ট থেকে বোঝা যায় যে, আইনস্টাইন তখন বিজ্ঞানকে এক নতুন দৃষ্টিভঙ্গিতে, পৃথিবীতে শান্তিপ্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে অন্যতম শক্তিরূপে দেখতে শুরু করেছেন। বিজ্ঞানের প্রতি তিনি অনন্যচিত্ত এবং নিবেদিত-প্রাণ রইলেন বটে, কিন্তু মতান্ধদের আক্রমণ থেকে মুক্তির আশ্রয়রূপে আর একে ভাবতে পারলেন না। বরং বিজ্ঞানের মধ্যে খুঁজে পেলেন ওগুলোর বিরুদ্ধে সংগ্রামের শক্তিশালী হাতিয়ার।

Commission for Intellectual Co-operation-এর পরবর্তী কাজকর্মে আইনস্টাইনের দৃঢ় প্রতীতি জন্মাল যে, সামরিক আগ্রাসন এবং সামাজিক প্রতিক্রিয়ার দুর্গগুলির বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ সংগ্রামের মাধ্যমে যদি বিজ্ঞানীদের সংহতি বাড়িয়ে নেয়া যায় তবে তা দুর্মর শক্তিরূপে আত্মপ্রকাশ করতে পারে। ১৯২৫ সালে ইতালীর ফ্যাসিবাদীরা মুসোলিনী সরকারের বিচারমন্ত্রীকে ঐ কমিশনে তাঁদের প্রতিনিধি করে পাঠালেন। মাদাম কুরী ঘোষণা করলেন, স্বাধীন বুদ্ধিজীবিদের দলে কোন মন্ত্রীকে গ্রহণ করা আদৌ সম্ভব নয়। আইনস্টাইনও এর বিরুদ্ধে মুখ খুললেন। এবং কুরীর বক্তব্যের সঙ্গে আরও যোগ করলেন যে, টোটালিটেরিয়ান রাষ্ট্রের কোন মন্ত্রী এ ধরনের কমিশনে উপযুক্ত প্রতিনিধি হতে পারেন না। কমিশনের কিছু কিছু সদস্য অবশ্য ভয় পেয়ে গেলেন। ভাবলেন, ইতালী হয়ত জাতিসংঘ থেকে সদস্যপদ প্রত্যাহার করে নেবে।

বিশের দশকে আঁন্তোনিনা ভ্যালেন্তিন প্রায়ই আইনস্টাইন ও তাঁর পরিবারের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে যেতেন। এর ফলশ্রুতি তাঁর লেখা আইনস্টাইন-জীবনী গ্রন্থ Le drame d Albert Einstein। জেনিভায় কমিশনের এক অধিবেশন চলাকালে আইনস্টাইনের মেজাজ সম্পর্কে ঐ গ্রন্থে উল্লেখ দেখা যায়। "কমিশনের ক্লান্তিকর এক দীর্ঘ সভার শেষে একদিন সন্ধ্যাবেলায় জেনিভা হ্রদের তীরে মাদাম কুরীর সঙ্গে এক বেঞ্চে বসে আছেন আইনস্টাইন……।

উভয়েই চিন্তাস্তব্ধ। দুজনেই নিবিষ্টচিত্তে দেখছেন হ্রদের জলে প্রতিবিম্বিত একটা ল্যাম্পের উজ্জ্বল এক চিলতে আলোর ওঠানামা। হঠাৎ মৌনতা ভেঙ্গে তাঁরা কথাবার্তা শুরু করলেন। তখন চোখেমুখে আগের মেজাজের লেশমাত্রও নেই। আইনস্টাইন প্রশ্ন করলেন—জলে প্রতিবিম্বটি শুধু এখানেই ভাঙছে কেন? অন্য কোথায় ত এমন হচ্ছে না। আইনস্টাইনের ধ্যানীসুলভ সুরের সঙ্গে সঙ্গতি রাখতে কুরীর শুকনো স্বরেও যেন রঙ ধরল। তারপর তাঁদের কথাবার্তা মোড় নিল ফর্মূলা, ফিগার আর ফিজিক্সের নিয়ম-কানুনের দিকে।"

ভ্যালেন্তিন আরও লিখেছেন যে, কমিশনের কাজে আইনস্টাইন যখন মোহভঙ্গের চূড়ায় তখন বাস্তবের বেদনাদায়ক অভিজ্ঞতার হাত থেকে মুক্তি কামনায় তিনি সঙ্গীতের পরিমণ্ডলে আশ্রয় খুঁজতেন। একদিন জেনিভা লেকের তীরে এক রেস্তরাঁয় বসে কমিশনের সদস্যরা গল্পগুজব করছেন। ব্যক্তিগত মত-পার্থক্যের বিষয়কে সযত্নে আলোচনা থেকে বাদ দেয়া হয়েছে। কারণ সবাই বেশ বুঝেছেন যে, বৈজ্ঞানিক মত পার্থক্যের তুলনায় এ পার্থক্য কত আলাদা। ওদিকে কণ্ঠস্বরের সমস্ত কোলাহল আর প্লেটের টুংটাং শব্দ ছাপিয়ে রেস্তরাঁয় বেজে উঠল অর্কেস্ট্রার সুর। মনে হল, সারাদিনের তিক্ত অভিজ্ঞতা এবং ক্লান্ত পারিপার্শ্বিক থেকে ঐ সঙ্গীত যেন আইনস্টাইনকে টানছে। তিনি উঠে ধীরে স্টেজের দিকে চললেন! বেহালাবাদককে অনুরোধ করলেন বেহালাটি দিতে এবং সেটি নিয়ে আপনমনে বাজাতে শুরু করলেন। "অমনি তাঁর মুখখানা পাল্টে গেল। দুই ঠোঁটে খেলল হাসির উদ্ভাস। সমস্ত শরীর বিশ্রামস্নিগ্ধ হয়ে উঠল। মনে হল যেন স্বপ্ন দেখছেন। ভুলে গেছেন সমস্ত পারিপার্শ্বিক। রেস্তরাঁয় লোকজনের চোখে স্টেজের উপর তাঁর উপস্থিতি কেমন লাগছে সে সম্পর্কেও সচেতন নন। তিনি তখন জনারণ্যেও একাকী। যেন জনসান্নিধ্যের তিক্ততাকে ধুয়ে ফেলছেন সঙ্গীত স্রোতোধারায়।" বন্ধু বান্ধবেরা তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন যে, অনেকক্ষণ হয়ে গেছে। তখন

খেয়াল হল। তক্ষুণি সহাস্যে ক্ষমাপ্রার্থনার ভঙ্গিতে ভায়োলিন ফিরিয়ে দিয়ে স্থানত্যাগ করলেন। দৈনন্দিন জীবনের তিক্ত বাস্তবতা ও কঠোর সংগ্রাম থেকে পলায়নী মনোবৃত্তির কথা কিন্তু কাহিনীটির উপজীব্য নয়। ভৌত-বাস্তবতার বিধানগুলির মধ্যে বিধৃত বিশ্বছন্দ যেমন বিজ্ঞানে অভিপ্রকাশিত হয়, আইনস্টাইনের কাছে শব্দধৃত বিশ্বছন্দটি তেমনি সঙ্গীতে অবয়ব লাভ করত।

১৯২০ সালে আইনস্টাইনের বার্লিনের বাড়িটি বিভিন্ন পেশা, মতবাদ, লক্ষ্য ও স্বার্থবিশিষ্ট নরনারীর কাছে এক তীর্থস্থান হয়ে ওঠে। এঁরা পদার্থবিজ্ঞান, গণিত, দর্শন, নীতিবিজ্ঞান, ধর্মবিষয়, রাজনীতি, এমন কি নিছক ব্যক্তিস্বার্থ সংক্রান্ত নানা প্রশ্নের উত্তর খুঁজতেন। এই অফুরন্ত জনস্রোত আবার অসংখ্য ভ্রমণবিলাসী দর্শনার্থীর ধাক্কায় ফুলে-ফেঁপে উঠত। কেননা, ইতিমধ্যে আইনস্টাইন বার্লিনের অন্যতম দর্শনীয় বস্তু হয়ে উঠেছেন এবং তাঁর ৫ নম্বর হেবারল্যাণ্ডস্ট্রাসের বাড়িটি ট্যুরিস্টদের কাছে অবশ্য দ্রষ্টব্যের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। এ রকম কয়েকবার ভ্রমণের ফলে অনেকের সঙ্গে আইনস্টাইনের সখ্যতাও জন্মেছে। এঁদের অনেকে সে সম্পর্কে মূল্যবান সব স্মৃতিকথা রেখে গেছেন। এগুলো থেকে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আইনস্টাইনের মতামত গভীরভাবে জানা যায়। তাঁর ছিল এক অন্তর্নিহিত গণতান্ত্রিক চরিত্র। সামান্য সুযোগপ্রার্থী ছাত্রকেও মুহূর্তে নতুন ও অপ্রকাশিত ধারণায় সঞ্জীবিত করতে আইনস্টাইনের দক্ষতা ছিল অনন্যসাধারণ। তাঁর বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ এবং চিঠিপত্রে ঐ সব ধারণা পাওয়া যায়। যে সব ভাগ্যবান তাঁকে কাছের মানুষ হিসেবে পেয়েছিলেন তাঁদের স্মৃতিকথা তাঁর জীবন, চালচলন, অভ্যাস এবং চেহারার বিশদ ও ঘনিষ্ঠ বিবরণে আকীর্ণ। এগুলো বড় মিষ্টি-মধুর এবং ভবিষ্যতে বহুদিন ধরে এই মাধুর্য অক্ষুণ্ণ থাকবে। আমরা ঐ সব স্মৃতিকথার কিছু কিছু এখানে উল্লেখ করব। আইনস্টাইনের বিশ্বদৃষ্টি, তাঁর

চিন্তাধারা এবং আচার-ব্যবহারের মূল কথার সঙ্গে আমরা পরিচিত বলে ঐ সব নিখুঁত ও বিশদ বিবরণ তাঁর সম্পর্কে একটা ব্যাপক ভাবমূর্তি গড়ে তোলে। তিনি এমন এক প্রকৃতির মানুষ ছিলেন যেখানে নিছক ব্যক্তিকতা এবং দৈনন্দিন সাধারণতা একেবারে পশ্চাৎপটে পড়ে থাকত। এদিক থেকে তাঁর আত্মজীবনীমূলক লেখায় উদ্গীত নিজস্ব বৈজ্ঞানিক জ্ঞানাদর্শের তিনি ছিলেন এক প্রোজ্জ্বল উদাহরণ।

কিন্তু শুধু গায়ক হলেই সবটা হয় না, সেই সঙ্গে প্রয়োজন ওস্তাদ সঙ্গতকারেরও। স্বামীর প্রকৃতির পক্ষে অনুকূল গার্হস্থ্য পরিবেশ সৃষ্টিতে স্ত্রী এলসার ভূমিকাটিও ছিল অনন্য। আইনস্টাইন ও অন্যান্য আগন্তুকের মধ্যে তিনি কখনও কোন রকম প্রাচীর তোলার সৃষ্টি করেন নি। তথাকথিত সম্ভ্রান্ততাকে একেবারে অপছন্দ করতেন। তাঁর বুদ্ধি, সামাজিকতা, রুচি এবং অন্যের মতামতের প্রতি শ্রদ্ধাশীলতা হেবারল্যাণ্ডস্ট্রাসের বাড়িটিতে এমন এক পরিবেশের সৃষ্টি করেছিল যে, জনপ্রীতি এবং নির্জনে কাজ করার ইচ্ছা—আইনস্টাইনের এই দুই আপতবিরুদ্ধ অথচ অন্তরে সঙ্গতিপূর্ণ স্বার্থ—পরিপূর্ণ রূপ পেয়েছিল। রূপকার এলসাকে এজন্য অজস্র ধন্যবাদ।

এবারে আইনস্টাইনের বাড়ি সম্পর্কে দু-এক কথা বলা যাক। বাড়িওয়ালা ছিলেন একজন রাশিয়ান। বহুদিন ধরেই মনে মনে তিনি আইনস্টাইনের পরম ভক্ত। তাঁর সাধের স্বপ্ন ছিল আইনস্টাইনকে ভাড়াটে হিসেবে পাওয়া। কিন্তু 'সাধিতে মনের সাধ' তাঁর পক্ষে করার কিছু ছিল না। তবু একদিন স্বপ্ন সফল হল। নয়-ঘরের ফ্ল্যাটটি ভাড়া নিলেন আইনস্টাইন। তাঁর সঙ্গে তখন থাকতেন স্ত্রী এলসা, দুই সৎ মেয়ে—ইলসে ও মার্গট—এবং কিছুদিনের জন্য মা পওলিন। হেরমান আইনস্টাইনের মৃত্যুর পর পওলিন কিছুদিন আত্মীয়-স্বজনের কাছে কাটান, পরে চলে আসেন বার্লিনে ছেলের কাছে। সেখানেই ১৯২০ সালে তিনি মারা যান।

বাড়িটি ছিল বার্লিনের পশ্চিমপ্রান্তের অপেক্ষাকৃত নতুন এলাকায়। অঞ্চলটিকে বলা হত 'ব্যাভেরিয়ান কোয়ার্টার্স'। এখানকার রাস্তাঘাট সবই ছিল ব্যাভেরিয়ার বিভিন্ন স্থানের নামে নামাঙ্কিত। প্রশস্ত রাস্তা, সযত্নরক্ষিত গাছপালা এবং নতুন বাড়িঘর এলাকাটিকে ধনী লোকদের কাছে লোভনীয় করে তুলেছিল। বাড়িটি দেখতে বার্লিনের অন্যান্য হাজার হাজার বাড়ির মতোই। সামনে ছোট্ট স্কোয়ার, তার মাঝখানে সেণ্ট জর্জ এবং ড্রাগনের দুই বিরাট মূর্তি।

বাড়ির ভেতরেও উল্লেখযোগ্য তেমন কিছু বৈশিষ্ট্য ছিল না। ঘরে ঘরে না ছিল আসবাবের প্রাচুর্য, না ছিল মূল্যবান বস্তুর সমারোহ। শোবার ঘরটি ছিল একেবারে সাধারণভাবে সাজানো, দেয়ালে টাঙানো ছিল বড় আকারের পারিবারিক একটি ফোটো, আর দুই কুকুরসহ মহামতি ফ্রেডরিকের একটা বড় তৈলচিত্র। এক কোণে একটা পিয়ানো। একমাত্র লাইব্রেরী ঘরটা দেখলে তবে গৃহকর্তার পেশা সম্পর্কে ধারণা হত। এ ঘরটির জন্য তিনি পয়সা খরচ করতেন অকাতরে। তবে ঘর সাজাতে নয়, বই কেনার জন্যে। যে সব আগন্তুক বাড়ির সাজগোজে আইনস্টাইনের ব্যক্তিত্বের প্রতিফলন খুঁজতেন তাঁরা প্রায়ই হতাশ হতেন। কেননা, সেজন্য প্রয়োজন হত অধ্যাপকের স্টাডি বা পাঠকক্ষে প্রবেশের।

পড়াশোনার ঘরখানা ছিল উল্লেখ করার মতো। ছোট্ট এক কোণের টাওয়ারে, সিঁড়ি দিয়ে বাড়ির বাকি অংশ থেকে আলাদা-করা একখানা ছোট ঘর। এই হল আইনস্টাইনের স্টাডি বা পাঠকক্ষ। জানালার গায়ে লাগান একটা গোল টেবিল। লাল এবং সাদা কাপড়ে টেবিলটি মোড়া। ওপরে ইতস্ততঃ ছড়ানো ম্যাগাজিন, প্যামপ্লেট আর মাঝে মাঝে তামাকের বিক্ষিপ্ত ছাই। আসবাব বলতে স্ট্র-এর সিট্ লাগানো দুটো চেয়ার, একটা কোচ এবং দেয়ালের গায়ের শেল্ফ। শেল্ফগুলো বিজ্ঞানের বই, ম্যাগাজিন এবং মোটা দুটি বাইবেলে ঠাসা। একটা শেলফে ছোট্ট এক বুড়ো ইহুদীর মূর্তি, তার

মাথায় একরাশ ঝাঁকড়া চুল। এর পেছনে একটা কাহিনী আছে। আইনস্টাইনের চুল দ্রুত উঠে যাচ্ছিল দেখে চুল শক্ত করতে এলসা তাঁকে প্রচুর পেঁয়াজ খেতে পরামর্শ দেন। আইনস্টাইনও সেই উপদেশ মেনে চলছিলেন। সৎ-মেয়ে মার্গট তখন ঐ মূর্তিটি গড়ে ওর গায়ে 'রব্বি জিয়েবেল' কথা ক'টি উৎকীর্ণ করে দেয়। জার্মান ভাষায় 'জিয়েবেল' শব্দের অর্থ পেঁয়াজ। মার্গট আইনস্টাইনকে বললে—"পেঁয়াজ খেলে এই রকম চুলওয়ালা মাথা হবে। আর দাড়ি হবে একেবারে কোমড় পর্যন্ত। বুঝলে।" মূর্তিটি আইনস্টাইনের খুব প্রিয় ছিল।

আইনস্টাইন পরিবারে একটা সহজ ও সরস পরিবেশ বিরাজ করত। মূর্তিটি ছিল তার প্রতিভাস। আগের ভাড়াটের ফেলে-যাওয়া পাঁচমেশালি জিনিসপত্তরের সঙ্গে মূর্তিটিও নিজেকে বেশ মানিয়ে নিয়েছিল। আইনস্টাইন নিজে অবশ্য ঐ সব ফেলে-যাওয়া জিনিসপত্তর নিয়ে মোটেই মাথা ঘামাতেন না। অন্যের রুচিকে তিনি সহজে গ্রহণ করতে পারতেন। ডেস্কের উপরে থাকত নিউটনের একটি প্রতি-কৃতি, আর তার পাশে একটা ছোট দূরবীন।

একবার এক আগন্তুক প্রশ্ন করেন—"এটা কি সেই দূরবীন যা দিয়ে আপনি বিশ্বজগতের বিপুল রহস্য উদ্‌ঘাটিত করেছেন?"

আইনস্টাইন হেসে উত্তর দেন—"না বন্ধু, তারার পানে চেয়ে থাকা আমার কাজ নয়। যে দূরবীনটি দেখছেন এর মালিক এক মুদি। তিনি আগে এ বাড়িতে ভাড়া থাকতেন। খেলার জিনিস হিসেবে ওটা রেখে দিয়েছি।"

"কিন্তু আপনার যন্ত্রপাতি কোথায়?"—জিজ্ঞাসা করলেন উৎসুক ভদ্রলোক।

নিজের মাথায় টোকা দিয়ে সহাস্যে আইনস্টাইন বললেন—"এই আমার যা কিছু যন্ত্রপাতি।"

আর একবার এক আগন্তুক তাঁর ল্যাবরেটরি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা

করলে আইনস্টাইন নিজের ফাউণ্টেন পেনটি দেখিয়ে দেন।

আইনস্টাইন সাধারণত সকাল আটটায় ঘুম থেকে উঠতেন। উঠেই হাতমুখ ধুয়ে দাড়ি কামাতেন। তারপর স্নানের পোশাক আর চটি পায়ে বাথ-টাবের অপেক্ষায় থাকতেন। স্নানের জলের ব্যবস্থা করতেন স্ত্রী এলসা। ঠাণ্ডা জল, গরম জল, যখন যা দরকার। জলের জন্য অপেক্ষা করতে গিয়ে প্রায়ই পিয়ানোয় সুর তুলতেন। এলসা যখন ঘোষণা করতেন—'রেডি, আলবার্টল্',—তখন যেতেন বাথরুমে। প্রায়ই ভুলে যেতেন দরজা দিতে। এলসা ছুটে গিয়ে দরজা দিয়ে দিতেন। আইনস্টাইন দাড়ি কামাতে আর স্নানের জন্য একই সাবান ব্যবহার করতেন। 'সেভিং সোপ' বলে তাঁর আলাদা কিছু ছিল না। স্নানের পর প্রাতরাশ করতেন। প্রাতরাশ সেরে পাইপটি ভর্তি করে চলে যেতেন পাঠকক্ষে, পেন আর এক প্যাড কাগজ নিয়ে। তারপর নিমগ্ন হয়ে যেতেন গবেষণায়।

"আপনি দিনে ক' ঘণ্টা কাজ করেন?"—লোকজনের কাছ থেকে আইনস্টাইনকে প্রায়ই এ প্রশ্ন শুনতে হত। ভেবে পেতেন না এর কী উত্তর দেবেন? কারণ, তাঁর কাজ ত শুধু চিন্তা করা। আর সব সময়েই ত তিনি তাই করছেন।

"ভাই, দিনে ক' ঘণ্টা কাজ কর?"—নিজেও একবার এক বন্ধুকে জিজ্ঞেস করেছিলেন।

"এই আট-ন' ঘণ্টা"—উত্তর দিয়েছিলেন বন্ধুটি।

শুনে কাঁধ নেড়ে চীৎকার করে ওঠেন—"আমি অতক্ষণ কাজ করতে পারি না। বড় জোর দিনে চার-পাঁচ ঘণ্টা। আপশোষ হয় মোটেই পরিশ্রমী নই বলে।"

আইনস্টাইন নিরাপদে পাঠকক্ষে ঢুকলে এলসা গিয়ে বসতেন সেদিনের ডাক নিয়ে। চিঠি বাছাই করতে। বিশ্বের সমস্ত প্রান্ত থেকে সব ভাষায় লেখা চিঠিপত্র আসত—একটা নয়, দুটো নয়, শ'য়ে শ'য়ে। বাড়ির তত্ত্বাবধায়ক ঝুড়ি ভর্তি ক'রে সেগুলো ওপরে

দিয়ে যেতেন। চিঠির লেখকরা হলেন বিজ্ঞানী, রাজনীতিবিদ্, জননেতা, শ্রমিক, বেকার ও ছাত্রদল। তাতে থাকত অজস্র আবেদন-নিবেদন—সাহায্যের জন্য, পরামর্শের জন্য। কেউ কেউ আবার তাঁর কাজে লাগতে চাইতেন। যেমন একবার এক যুবতী 'মহাজাগতিক ধ্যানী' ( cosmic contemplator ) এই পরিচয়ে আইনস্টাইনকে সহযোগিতা করতে চেয়ে চিঠি লেখেন। আবিষ্কারকেরা তাঁদের নতুন নতুন উদ্ভাবিত যন্ত্র সম্পর্কে লিখতেন ও মতামত চাইতেন। নিজের ছেলের নাম রেখেছেন আলবার্ট—একথা জানাতেন তাদের বাবা-মায়েরা। একবার জনৈক সিগার উৎপাদক লিখলেন তাঁর নতুন ব্র্যাণ্ডের কথা—নাম দিয়েছেন 'রিলেটিভিটি'।

এলসা একাই চিঠি বাছাই পর্ব সমাধা করতেন। কিছু চিঠির আদৌ উত্তর দেয়া হত না। আর কিছুর উত্তর এলসা নিজেই দিতেন। বাকিগুলো দেখাতেন আইনস্টাইনকে। দিনের বেশির ভাগ সময় এতেই কেটে যেত এলসার। এমন কি কখন কখন সন্ধ্যে গড়িয়ে রাতও হয়ে যেত।

এলসার বাছাই সত্ত্বেও এই ডাকের ব্যাপারটা ছিল আইন-স্টাইনের কাছে এক চির-বিরক্তির উৎস। ১৯২০ সালে এ সম্পর্কে অভিযোগ করে তিনি লেখেন—"আমি কখন 'না' বলতে পারতাম না। এখন এই অফুরন্ত প্রবন্ধ আর চিঠির ধাক্কায় আমি রোজ রাতে স্বপ্ন দেখি। দেখি যে, নরকের আগুনে ঝলসাচ্ছি! আমাদের ডাক-পিয়ন যেন এক মূর্তিমান শয়তান। আমায় দেখে চীৎকার করে। আর আগের চিঠিগুলোর জবাব দিইনি বলে নতুন নতুন চিঠির প্যাকেট আমার মাথায় ছুঁড়ে মারে। এর সঙ্গে যোগ করুন আমার মায়ের অসুস্থতা এবং 'খ্যাতির ঋতুচক্র' অর্থাৎ অসংখ্য উদ্দেশ্যহীন সভা-সমিতি। ফলে, আমি হয়ে পড়েছি এক বাণ্ডিল সরলতম reflectory response।"

এ বিষয়ে অন্য এক সময়ে মন্তব্য করেন—"আমার সবচেয়ে বড়

শত্রু হল ডাক পিয়ন। এর হাত থেকে আমার নিস্তার নেই।"

নৌকোবিহার ছিল আইনস্টাইনের হবি। এ ছাড়া, অন্য কোন খেলাধুলোর প্রতি তাঁর ঝোঁক ছিল না! তিনি বলতেন—"শারীরিক পরিশ্রম আমি পছন্দ করি না। আমি হলাম এক কুঁড়ের বাদশা। নৌকোবিহারই আমার একমাত্র পছন্দসই স্পোর্টস।" কারণ হিসেবে বলতেন—'এ সময় কেউ আমায় ডাকবে, এ ভয় থাকত না'।

নিজের পোশাকের দিকে আইনস্টাইনের কোনদিনই লক্ষ্য ছিল না। সাধারণত বাদামি রঙের একটা চামড়ার জ্যাকেট পড়তেন। এলসাই তাঁকে জ্যাকেটটি উপহার দিয়েছিলেন। ঠাণ্ডার দিনে পড়তেন ধূসর রঙের একটা পশমী ইংলিশ সোয়েটার। এটাও ছিল এলসার উপহার। নিয়মমাফিক ডিনারে যেতে পরতেন পুরনো ধরনের একটা কালো স্যুট। আর বিশেষ ডিনারের বেলায়, পরিবারের সকলের দাবিতে বাধ্য হয়ে ডিনার জ্যাকেট পরতেন। তাঁর অভ্যেস, প্রকাশভঙ্গি এবং চিন্তাধারা সম্পর্কে মজাদার সব কাহিনী অনেকের স্মৃতিকথা থেকে পাওয়া যায়।

ডাঃ কাজেনস্টাইন ছিলেন পেশায় একজন সার্জেন। ইনি আইনস্টাইন-পরিবারে চিকিৎসা করতেন। আইনস্টাইন এঁকে বার্লিনের ঘনিষ্ঠ বন্ধু বলে উল্লেখ করেছেন। ইনি লিখেছেন এঁরা দু-জনে কিভাবে দিনের পর দিন রাজধানীর আশেপাশের লেকগুলোয় একত্রে নৌকোবিহার করেছেন। কাজেনস্টাইনের মতে, আইনস্টাইনের চরিত্রের বড় বৈশিষ্ট্য হল সূক্ষ্ম-রসানুভূতি আর চমৎকার কল্পনা-প্রবণতা। "প্রকৃতিতে তিনি ছিলেন উত্তর-জার্মান টাইপের ঠিক বিপরীত, অতিরিক্ত কাজের চাপে সর্বদাই পিষ্ট—'বেস্টিয়া সিরিওসা'।"

আইনস্টাইনের আর এক বন্ধু হলেন রুডলফ এরমান। পেশায় ইনিও ছিলেন ডাক্তার। বার্লিনের শহরতলিতে আইনস্টাইনের সঙ্গে খুব ঘুরে বেড়িয়েছেন। আইনস্টাইনের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে ইনি লিখছেন—"ওঁর দেবদূতের মতো চোখ দুটির কথা সমসাময়িক

অনেকেই জানতেন। যখন হাসতেন তখন দুই চোখে নেচে উঠত যেন ছোট্ট দুটি দুষ্টু শিশু। কী সারল্য আর নিষ্ঠার সঙ্গেই না তিনি এই পৃথিবীকে দেখতেন! তবে দৈহিক দিক থেকে তাঁর পরিচয় খুব অল্পই জানা আছে। উচ্চতায় আইনস্টাইন ছিলেন মাঝারির চেয়ে কিছুটা লম্বা, গায়ের রঙ সাদা, সুগঠিত পেশল গড়ন ......। ওষুধ-বিষুধের তিনি ছিলেন ঘোর বিরোধী। তবে ডাক্তারদের খুব পছন্দ করতেন। কারণ সমাজের বিভিন্ন স্তরের লোকজনের সঙ্গে তাঁরা কত সহজে মেলামেশা করতে পারেন! এঁদের সাহচর্যে তিনি নিজ মনের সাহচর্য পেতেন। কেননা, নিজের অধিকারেই আইনস্টাইন ছিলেন সুস্থ ও সুন্দরতম মানব-সমাজের প্রবক্তা।"

বার্লিনে আইনস্টাইনের আর এক ঘনিষ্ঠ সঙ্গী হলেন ইমানুয়েল লাস্কার। দাবা খেলায় এক সময়ে ইনি বিশ্ব-চ্যাম্পিয়ন ছিলেন। লাস্কার অবশ্য আইনস্টাইন সম্পর্কে কোন স্মৃতিকথাই রেখে যান নি। কিন্তু এ বন্ধুটি সম্পর্কে আইনস্টাইনের কিছু মন্তব্য নিজের চরিত্রকেই ফুটিয়ে তুলেছে। আইনস্টাইন লিখছেন—"আমার দেখা লোকদের মধ্যে সবচেয়ে মজাদার ছিলেন নিঃসন্দেহে লাস্কার। সমাজের গুরুত্বপূর্ণ সমস্যার প্রতি গভীর অনুরাগ, আর সেই সঙ্গে চিন্তার এমন স্বাধীনতা ক্বচিৎ দেখা যায়। আমি দাবারু নই। কাজেই দাবা খেলায় তাঁর বুদ্ধিমত্তার বিচার করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। এবং উচিতও নয়। এই উদ্দীপক খেলার মধ্যে যে প্রতিযোগিতার মনোবৃত্তি কাজ করে আমি জীবনে তাকে সর্বদাই অপছন্দ করেছি।"

বড় তাৎপর্যপূর্ণ স্বীকৃতি! আইনস্টাইন দাবা খেলাকে বুদ্ধির অনুশীলন বলে মনে করতেন ঠিকই, কিন্তু তাঁর নিজের চিন্তা আবর্তিত হত সম্পূর্ণ অন্য এক খাতে। যে সব সমস্যায় তিনি মগ্ন থাকতেন তাদের সমাধান হত সত্যের আবিষ্ক্রিয়ায়, শত্রুর পরাভবে নয়। মানসিক গঠনে আইনস্টাইন ছিলেন গভীর আস্তিক্যধর্মী, স্পিনোজার যুক্তিবাদের পরম ভক্ত। এই অস্তিবাদেই ভৌত-বাস্তবতার

যুক্তিগ্রাহ্য ব্যাখ্যা মেলে। যে চিন্তাধারা এই অস্তিবাদের লক্ষ্যকে না খুঁজে নিজের মধ্যেই মানদণ্ডের অনুসরণ করে আইনস্টাইন তাঁকে বরণ করতে পারতেন না। যে কোন দ্বন্দ্বমূলক প্রতিযোগিতার মানসিকতা এবং গবেষণার ক্ষেত্রে 'ব্যক্তি-কৈবল্যতা'র বিকাশ আইনস্টাইনের জীবনদর্শন কোনদিন মেনে নিতে পারেনি।

আর এক উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিত্ব হলেন লিওপোল্ড ইনফেল্ড। ইনি আইনস্টাইনের সাহচর্যে অনেকদিন কাটিয়েছেন এবং তাঁর সম্পর্কে অনেক কিছু লিখে গেছেন। লিওপোল্ড ইনফেল্ড বিজ্ঞানী। দু'জনের প্রথম সাক্ষাৎ ঘটে ১৯২০-এ। ইনফেল্ড তখন পোল্যাণ্ডের ক্রাকাও বিশ্ববিদ্যালয়ে পঞ্চম বর্ষের ছাত্র। ইচ্ছে ছিল বার্লিনে প্লাঙ্ক, লাওয়ে এবং আইনস্টাইনের কাছে গিয়ে শিক্ষা শেষ করবেন। কিন্তু প্রাশিয়ান আমলাতন্ত্রের কাছে পোল্যাণ্ডের লোকেরা, বিশেষ ইহুদীরা, ছিলেন অনাহুত আগন্তুক। ইনফেল্ডের কাছে তাই সব দুয়ার রুদ্ধ বলে বোধ হল। অনেক চিন্তাভাবনার পর সাহস সঞ্চয় করে ঠিক করলেন সরাসরি আইনস্টাইনের কাছে আবেদন করবেন। করলেনও। আর ফলও পেলেন সঙ্গে সঙ্গে।

আইনস্টাইনের সঙ্গে তাঁর প্রথম সাক্ষাৎকারের বর্ণনাটি এই রকম। "সংকোচের সঙ্গে, ব্যাকুলতা চেপে, আমি বিশ্বের শ্রেষ্ঠ জীবিত পদার্থবিদের সাক্ষাতের আশায় ছুটির দিনের মেজাজে চললাম ৫ নম্বর হেবারলাণ্ডস্ট্রাসের উদ্দেশে। গিয়ে ফ্ল্যাটের বেল টিপলাম। ভারি আসবাবে ভর্তি একটি ঘর দেখিয়ে আমায় অপেক্ষা করতে বলা হল। মিসেস আইনস্টাইনের কাছে আমার আসার কারণ ব্যাখ্যা করলাম। ক্ষমাপ্রার্থী হয়ে তিনি বললেন—ঠিক এই মুহূর্তে তাঁর সঙ্গে চৈনিক শিক্ষামন্ত্রী কথাবার্তা বলছেন। সুতরাং কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতেই হবে। প্রতীক্ষায় বসে রইলাম। উত্তেজনায় আমার গাল দুটো যেন একেবারে পুড়ে যাচ্ছিল……। আইনস্টাইন তাঁর পাঠ-কক্ষের দরজা খুললেন। চৈনিক ভদ্রলোক বেরিয়ে গেলেন। আর আমি

ভেতরে ঢুকলাম। আইনস্টাইনের গায়ে মর্নিং-কোর্ট, পরনে স্ট্রাইপ দেয়া ট্রাউজার। তার প্রয়োজনীয় একটি বোতাম বেপাত্তা। সেই পরিচিত মুখ—ছবি আর ম্যাগাজিনে যে মুখ সে সময় প্রায়ই দেখা যেত। কিন্তু দেখলাম, কোন ছবিই তাঁর সমুজ্জ্বল চোখের দ্যুতিকে কখন ফুটিয়ে তুলতে পারেনি।

"যা বলব বলে সযত্নে প্রস্তুত হয়ে এসেছিলাম তা বেমালুম ভুলে গেলাম। একমুখ হাসি নিয়ে আইনস্টাইন আমার দিকে চাইলেন এবং একটা সিগারেট বাড়িয়ে দিলেন। বার্লিনে আসার পর এই প্রথম বন্ধুত্বে ভরা হাসিতে কেউ আমার দিকে তাকালেন। সংক্ষেপে আমার অবস্থা তাঁকে বললাম। মনোযোগ দিয়ে সব কথা শুনলেন।

"শিক্ষামন্ত্রকের কাছে তোমার হয়ে সুপারিশ করতে পারলে খুবই খুশি হতাম। কিন্তু আমার সই-এর আর এখন কোন মূল্য নেই।

"কেন ?

"কারণ, আমি অনেকের হয়ে সুপারিশ করেছি এবং··· ( কণ্ঠস্বর নামিয়ে গোপনীয়তার সুরে ) এঁরা খুব ইহুদী-বিদ্বেষী।

"পায়চারি করতে করতে কি যেন ভেবে নিলেন খানিকটা।

"তবে তুমি ত পদার্থবিদ্। কাজেই ব্যাপারটা কিছুটা সরল। আমি প্রফেসর প্লাঙ্কের কাছে দু-চার কথা লিখে দিচ্ছি। তাঁর সুপারিশের অনেক মূল্য। হ্যাঁ, এই হবে সবচেয়ে ভাল ব্যবস্থা।

"লিখবার জন্য তিনি প্যাড হাতড়াতে লাগলেন। অথচ সামনেই ডেস্কের উপর পড়ে রয়েছে প্যাড। সংকোচে আমিও দেখাতে পাচ্ছিলাম না। শেষ পর্যন্ত তিনি প্যাড খুঁজে পেলেন এবং কয়েক লাইন লিখলেন। ফিজিক্স সম্পর্কে আমার সামান্য জ্ঞানও আছে কিনা তা না জেনেই তিনি কথাগুলো লিখলেন।"

সোভিয়েট রাষ্ট্রনীতিকগণও বার্লিনে আইনস্টাইনের সাক্ষাৎপ্রার্থী হতেন। এঁদের মধ্যে বৈদেশিক অফিসার কিচেরিনের সঙ্গে কথা

বলে আইনস্টাইন বিশেষ মুগ্ধ হন। এঁর কাছ থেকে বিপ্লব ও স্যোশালিজম সম্পর্কে তিনি অনেক কিছু জানতে পারেন। শিক্ষা অফিসার লুনাচারস্কির সঙ্গে কথাবার্তায়ও আইনস্টাইন সোভিয়েত রাষ্ট্রের প্রতি তাঁর প্রগাঢ় সহানুভূতি জানান। এ সম্পর্কে লুনাচারস্কি মস্কো ম্যাগাজিনে একটি প্রবন্ধও লেখেন। নাম দেন A Meeting with Greatness।

একটি ঘটনার উল্লেখ করে প্রবন্ধটি আরম্ভ হয়েছে। প্যারিসের সোভিয়েত রাষ্ট্রদূত ক্রাসিনকে হত্যার চেষ্টার সঙ্গে ইউজেনিয়া ডিকসন নামে এক বিকৃতমস্তিষ্ক মহিলার নামটি বেশ জড়িত। যে রিভলবারের সাহায্যে হত্যার চেষ্টা করা হয় তা থেকে শেষ পর্যন্ত গুলি বের হয় নি। এমন কি, দৃশ্যত তাতে কোন গুলি পোরাও হয়নি। মহিলাটি এক সময়ে লুনাচারস্কিরও পিছু নিয়েছিল। ভূতপূর্ব জার-মন্ত্রী মিলুকভ নাকি ঐ মহিলার 'অস্তিত্বহীন' সন্তানের পিতা। নতুন একটা 'বেইলিস ট্রায়াল'-এর মতলবে তিনি নিজের সন্তানকে হত্যা করেন। আর, জার-অনুচর আজেফ ছিলেন তার আর এক 'অস্তিত্বহীন' শিশুর পিতা। ঐ আজেফ এখন আইনস্টাইন নামে এক পদার্থবিদের পরিচয়ে আত্মগোপন করে আছেন।

পরে বার্লিনে আইনস্টাইনের সঙ্গে লুনাচারস্কির সাক্ষাৎকালে এলসা তাঁকে গল্পের পরবর্তী অংশটি শোনান। ডিকসন আইনস্টাইনকে একটি চিঠি লিখে সব কিছু ফাঁস করে দেবে বলে শাসিয়েছিল। এর পর ভীতিপ্রদর্শন করে আসতে থাকে চিঠির বন্যা। চিঠিগুলো পোস্ট করা হত প্যারিস ও বার্লিনের মধ্যবর্তী প্রত্যেকটি স্টেশন থেকে। শেষে একদিন ঐ বিকৃতমস্তিষ্ক হতভাগিনী হেবারল্যাণ্ডস্ট্রাসের বাড়িতে এসে বেল বাজায়। ক্রমাগত দাবী জানাতে থাকে আজেফ-আইনস্টাইনের কাছে তাকে নিয়ে যাওয়ার জন্য। আইনস্টাইনকে দেখে তার ভুল ভাঙে। চীৎকার করে বলে ওঠে—"না, না, তুমি আজেফ নও।" তারপর মৃতশিশুর 'অভিযুক্ত পিতা' আইনস্টাইনের কাছে বারবার মিনতি

করতে থাকে ঃ আইনস্টাইন যেন তাকে মানসিক হাসপাতালে যাবার হাত থেকে মুক্তির ব্যবস্থা করে দেন। সেই সঙ্গে সে কিছু টাকাপয়সাও চায়। সমস্ত ব্যাপারটি তদন্ত করার ভার পরে বার্লিন-পুলিশের ওপর। এক পুলিশ অফিসার বোকার মতো এলসাকে এসে বলেন—গুপ্তচরবৃত্তির সম্ভাবনা একেবারে উড়িয়ে দেয়া যায় না।

লুনাচারস্কির এ বিবরণ কতদূর সত্যি ? আইনস্টাইনের জীবনীকার সিলিগ-ও এ ঘটনার উল্লেখ করেছেন। তিনি ব্যাপারটি আইনস্টাইনের সুহৃদ, বিজ্ঞানী এরেনফেস্টের কাছ থেকে জানতে পারেন। লুনা-চারস্কির বিবরণের সঙ্গে সিলিগের বিবরণের মোটামুটি মিল আছে।

১৯২৫-র গোড়ার দিকে আইনস্টাইনের সঙ্গে সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে এরেনফেস্ট এলেন লিপজিগ স্টেশনে। কথা ছিল, আইনস্টাইন ভোরের ট্রেনে বার্লিন থেকে লিপজিগে এসে পৌঁছবেন। কিন্তু আইনস্টাইনের দেখা নেই। শেষ পর্যন্ত আইনস্টাইন এলেন সন্ধ্যেয়। চিন্তাকূল এরেনফেস্টকে বললেন, এক মহিলাকে দেখতে তাঁকে জেলখানায় যেতে হয়েছিল। তাই এত দেরি হল। ঐ মহিলা নাকি আইনস্টাইনকে আজেফ মনে করে হত্যার ষড়যন্ত্র করে এবং ধরা পড়ে যায়। বাড়ির দরজার মুখে মার্গট তাকে দেখে ফেলে। দৃশ্যত বিকৃতমস্তিষ্ক মহিলাটি ওপরে তাদের ফ্ল্যাটেও যেতে পারে ভেবে রাস্তার টেলিফোন বুথ থেকে সে মা-কে ফোনে সাবধান করে দেয়। ফলে মহিলাটি ধরা পড়ে এবং তাকে জেলে নিয়ে যাওয়া হয়। জেলে আইনস্টাইন যখন তাকে দেখতে যান তখন সে চীৎকার করে ওঠে—"না, না, তুমি আজেফ নও, তোমার নাক অনেক ছোট।" নিজের প্রভাব প্রয়োগ করে আইনস্টাইন তাকে মুক্ত করেন এবং তার অনুরোধে কিছু জিনিসপত্রও কিনেকেটে দেন।

লুনাচারস্কি ও এরেনফেস্টের বিবরণ দুটির মধ্যে মিল আছে। তা সত্ত্বেও গোটা কাহিনীটা যত সরল ও মজার মনে হচ্ছে আসলে তা না-ও হতে পারে। কারণ আইনস্টাইনের প্রাণনাশের গভীর চক্রান্তের কথা

গার্বোডিয়ান-ও উল্লেখ করেছেন। এ সম্পর্কে তিনি লিখছেন—"রাজনৈতিক ব্যাপারে কাজকর্মের দরুন আইনস্টাইনের অনেক নতুন নতুন বন্ধুলাভ ঘটে। স্বভাবত সেই সঙ্গে কেউ কেউ তাঁর চরম শত্রুও হয়ে ওঠে। এই শত্রুদেরই একজন একদিন আইনস্টাইনের বাড়ির তত্ত্বাবধায়ক বিশ্বাসভাজন অটো-র সতর্ক দৃষ্টি এড়িয়ে গোপনে আইন-স্টাইনের বার্লিনের ফ্ল্যাটে ঢুকে পড়ে। ব্যক্তিটি হল ম্যাডাম মেরী এগুঁয়েস্বোয়া ডিকসন—জনৈক আমেরিকানের রাশিয়ান বিধবা। রুশ-বিপ্লবের পর সে হয়ে পড়ে প্যারিসবাসিনী। তার হৃৎপিণ্ডে ছিল হত্যার বাসা। হ্যাটপিনের প্রান্তেও ছিল এই বিষ এবং ছোবলটিকে সে প্রায়ই নাচাত। কিন্তু প্রিয়তম স্বামীকে বাঁচাতে মিসেস আইন-স্টাইন যে, সব অবস্থার সম্মুখীন হতে প্রস্তুত এ কথা না জেনে কাজ করাতেই তার বিপত্তি ঘটে। বিপজ্জনক আগন্তুকটিকে এলসা স্বয়ং নিরস্ত্র করেন এবং পুলিশ ডাকেন। আর কাজটি তিনি এত নিখুঁত এবং শান্তভাবে করেন যে, প্রফেসর আইনস্টাইন ঘটনার অনেকদিন পরে এ কথা জানতে পারেন।"

লুনাচারস্কির প্রবন্ধে আবার ফিরে যাওয়া যাক। আইনস্টাইনের একটা পূর্ণ চিত্র তুলে ধরার উদ্দেশ্যে লুনাচারস্কি কাহিনীটির উল্লেখ করেছেন। আইনস্টাইনের শুধু উপস্থিতি অন্যের উপর কী অপরিসীম প্রভাবই না বিস্তার করত! এ সম্পর্কে লুনাচারস্কি বলছেন—"a feeling of great sympathy mixed with a degree of reverence : প্রগাঢ় সহানুভূতি আর সেই সঙ্গে প্রভূত শ্রদ্ধামেশানো একটা ভাব।"

"আইনস্টাইনের ক্ষীণদৃষ্টির দুই চোখে স্বপ্নের ভাবালুতা। মনে হয় যেন, বহুদিন আগে নিজদৃষ্টির বড় অংশটুকু অন্তর্চিন্তার দিকে ফিরিয়ে সেখানেই আবদ্ধ করে রেখেছেন। দেখলেই বোঝা যায়, আত্মচিন্তা আর গাণিতিক কাজে দৃষ্টির প্রায় সবটাই সতত লিপ্ত। এজন্য তাঁর

চোখে কেমন যেন স্বপ্নালুতা, এমন কি একটা বিষণ্ণতাও, বিরাজ করে। এ সত্ত্বেও, তিনি ছিলেন খুব খোশমেজাজী মজলিসী লোক, সুরসিক এবং রসজ্ঞ···। উচ্চ ঘণ্টাধ্বনির মতো ক্রমাগত আনন্দে এবং শিশুর মতো হাস্যরোলে সহজেই ভেঙে পড়তে জানতেন। হাসলে চোখ দুটি ক্ষণিকের জন্য শিশুর চোখের মত হয়ে যেত। তাঁর অনবদ্য সারল্য এতোই মনমাতানো যে ইচ্ছে করে তাঁকে জড়িয়ে ধরি, পিষ্ট করি বা পিঠে চাপড় মারি। তবে এতে কিন্তু তাঁর প্রতি সম্ভ্রমবোধ মোটেই কমে না। এ এক অনাস্বাদিতপূর্ব অভিজ্ঞতা—এক মহান পুরুষ ও নির্বাধ-সারল্যের বিগ্রহের প্রতি সুকুমার স্নেহ ও সীমাহীন শ্রদ্ধার অপূর্ব মিশ্রণ।"

শুধু আইনস্টাইন সম্পর্কেই নয়, বৈজ্ঞানিক-গৃহিনী এলসা সম্পর্কেও ঐ প্রবন্ধে লুনাচারস্কি মন্তব্য করেছেন। বলেছেন—"তখন তাঁর বয়স হয়েছে। মাথায় ঘনবিন্যস্ত পাকা কেশদাম। কিন্তু বড় মিষ্টি স্বভাবের মহিলা। শুদ্ধা, সৌন্দর্যভূষিতা। দৈহিক সৌন্দর্যের চেয়ে সে অনেক বড় জিনিস। মহান স্বামীর প্রতি তিনি ছিলেন প্রেমের এক জ্বলন্ত প্রতিমূর্তি। জীবনের কঠোর আঘাতগুলো থেকে স্বামীকে বাঁচাতে এবং তাঁর মহান চিন্তাধারাগুলো যাতে পূর্ণতা পায় সেজন্য মানসিক শান্তির অনুকূল বাতাবরণ সৃষ্টিতে তিনি সর্বদাই প্রস্তুত ছিলেন। চিন্তানায়ক হিসেবে আইনস্টাইনের আবির্ভাবের মহান উদ্দেশ্য সম্পর্কে সচেতন এই মহীয়সী মহিলা এক অনুপম সুন্দর বয়স্ক-শিশুর প্রতি সঙ্গিনী, স্ত্রী এবং মায়ের সুকোমল বৃত্তিতে ভরপুর ছিলেন।"

১৬১৫ খ্রীস্টাব্দে গ্যালিলিও তাঁর সৌরকেন্দ্রিক বিশ্ব-মতবাদের সমর্থনে রোমে যান এবং সেখানে কার্ডিনালদের এক সভায় বক্তৃতা করেন। ১৯২০-এর দশকের বছরগুলোতে আইনস্টাইনও সমষ্টি মানুষের বুদ্ধির কাছে তাঁর নতুন বিশ্বছবি তুলে ধরার উদ্দেশ্যে এক

ব্যাপক পরিক্রমায় বেরিয়ে পড়েন।

বিশের দশকের গোড়ার দিকে আইনস্টাইন দম্পতী হল্যাণ্ড, চেকোশ্লোভাকিয়া এবং অস্ট্রিয়ায় এলেন। তারপর গেলেন আমেরিকায়। মাঝপথে যাত্রাবিরতি করলেন ইংল্যাণ্ড ও ফ্রান্সে। সবশেষে এক লম্বা পরিভ্রমণে গিয়ে উপস্থিত হলেন জাপান, প্যালেস্টাইন এবং স্পেনে।

উল্লেখযোগ্য, আইনস্টাইন যেসব শ্রোতার কাছে তাঁর বক্তব্য রাখতেন ক্রমাগত তাদের সংখ্যাবৃদ্ধিতে আইনস্টাইন-বিরোধীরা অত্যন্ত বিরক্ত হচ্ছিলেন। এ সম্পর্কে জার্মানীতে একটি পুস্তিকাই বেরিয়ে গেল। নাম: The Mass Suggestion of the Relativity Theory। এতে লেখক এক জায়গায় বলেছেন—"আপেক্ষিক তত্ত্বের ভুলে-ভরা চরিত্রটি বৈজ্ঞানিক মহলে যেই স্পষ্ট হয়ে উঠল তখন আইন-স্টাইন বেশি করে জনসমর্থনের দিকে ঝুঁকলেন এবং যদ্দূর সম্ভব নিজেকে ও নিজ তত্ত্বকে জনসমক্ষে হাজির করলেন।"

আইনস্টাইন প্রথম বক্তৃতা দিলেন হল্যাণ্ডের লিডেনে। পনের শ' শ্রোতার এক সভায়। বিষয়বস্তু: ইথর ও আপেক্ষিক তত্ত্ব। এটি ছিল পদার্থবিজ্ঞানের মূল কথাগুলোর ওপর জনপ্রিয় এক আলোচনা। নিজ পেশার বাইরের জগতে সমমনস্ক মানুষদের কাছে তাঁর আবেদনের বৈশিষ্ট্যে-ভরা এক অনুপম বক্তৃতা। বিশ্বের ছন্দোময়তার ধারণাকে তুলে ধরাই ছিল এই বক্তৃতার উদ্দেশ্য। এর সামাজিক প্রতিধ্বনি শত্রুমিত্র নির্বিশেষে সকলের কাছেই ভাল লাগল। তবে শত্রুপক্ষ মন্তব্য করলেন: "বহুদিন ধরে এই উত্তেজক তথ্যটি আমাদের বোঝান হচ্ছিল যে, ইথরের হাত থেকে মুক্তিলাভ করা গেছে। এখন দেখছি, স্বয়ং আইনস্টাইন তার পুনরুজ্জীবন ঘটাচ্ছেন। এ মানুষটির কথাবার্তা গুরুত্বসহকারে নেয়া ঠিক নয়। ইনি ক্রমাগত নিজেকে নিজে খণ্ডন করেন।"

লিডেন বক্তৃতার পর আইনস্টাইনের সমর্থকদের অভূতপূর্ব সংখ্যা-বৃদ্ধি ঘটল। ফলে বোঝা গেল যে, বিপদ শুধু পদার্থবিজ্ঞানের ক্ষেত্রেই

সীমাবদ্ধ নয়। ব্যাপারটি প্রতিক্রিয়ার বিরুদ্ধে একটা যুক্তিনিষ্ঠ ও বৈজ্ঞানিক বিশ্বদৃষ্টি রক্ষার সংগ্রামের সামিল।

লিডেন বক্তৃতায় আইনস্টাইন ইথর ধারণার ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট নিয়ে বিশদ আলোচনা করেন। ভৌত-বাস্তবতার এক সামূহিক ছবি বিকশিত করার আকাঙ্ক্ষায় একদিন ইথর তত্ত্বের আবির্ভাব ঘটেছিল। কেননা 'দূরস্থ বিন্দুতে তাৎক্ষণিক ক্রিয়া'র ধারণা এবং বলের প্রভাবে পদার্থের গতির ধারণা পরস্পর বিরোধী। ফলে এমন এক সর্বব্যাপী মাধ্যমের প্রয়োজন হল যার ক্রিয়ায় বিভিন্ন বস্তুকণা মহাকর্ষে পরস্পর আকৃষ্ট হবে। তারপর এল আলোর তরঙ্গতত্ত্ব। এজন্যও দরকার হল এক মাধ্যমের যার ভেতর দিয়ে যান্ত্রিক কম্পন তরঙ্গরূপে প্রবাহিত হবে এবং আলোকীয় ঘটনার ব্যাখ্যা জোগাবে। উনিশ শতকে আলোক-সংক্রান্ত বিভিন্ন পরীক্ষায় বোঝা গেল, মাধ্যমটি নিজে গতিতে কোনরূপ অংশ নেয় না। অন্যান্য বস্তুই ইথর সাপেক্ষে গতি লাভ করে। এদিকে বিজ্ঞানী মাইকেলসনের ঐতিহাসিক পরীক্ষা রায় দিল: ইথরের ভেতর দিয়ে সমবেগে চলমান বস্তুর কাঠামোয় বিভিন্ন দিকে আলোর বেগের ভিন্নতা কিছুতেই ধরা যায় না। এই পরীক্ষার ভিত্তিতেই বিশেষ আপেক্ষিক তত্ত্ব। তাতে বলা হল: ইথরের সাপেক্ষে গতি কথাটি কোন বাস্তব অর্থ বহন করে না। কেননা, তা জানার উপায় উদ্ভাবন করা আদৌ সম্ভব নয়। ইথর ধারণা পরিত্যক্ত হল।

পরবর্তীকালে এল সাধারণ আপেক্ষিক তত্ত্ব। এতে ইথর-ধারণায় ভৌত অর্থ আরোপ করে, ইচ্ছে করলে, ইথরকে আংশিক পুনর্বাসন দেয়া চলে। মহাকর্ষ ক্ষেত্রের উৎসগুলো দেশ-এর ( space ) মেট্রিক ধর্মকে ( দূরত্ব-সময় ) পাল্টে দেয়। এই মেট্রিক ধর্মকে ভৌতধর্ম হিসেবে দেখা চলে। আর, দেশ যদি প্রত্যক্ষণ-সম্ভব কিছু ভৌতধর্মের অধিকারী হয় তবে একে আমরা বাস্তবধর্মী মাধ্যম বলে মনে করতেও পারি। এমন কি, 'ইথর' নামে ডাকতেও পারি। অবশ্য এই 'নব

ইথরে'র সেই সনাতন ধর্মগুলো থাকবে না। শুধু এই রূপকল্পে ইথর-ধারণাকে তুলে ধরতে গিয়ে আইনস্টাইন জোরের সঙ্গে বললেন: যেহেতু সাধারণ আপেক্ষিক তত্ত্বে দেশ-এর ভৌতধর্ম স্বীকৃত সেহেতু, শুধু এই অর্থেই, ইথরের অস্তিত্বের কথা বলা চলে। শেষ পর্যন্ত অবশ্য ইথর আত্মরক্ষা করতে পারেনি। মহাকর্ষ ক্ষেত্রই দেশ-এর ধর্ম পরিবর্তনের জন্য দায়ী—এ কথা বলতেই বিজ্ঞানীরা বেশি পছন্দ করতেন।

১৯২০ সালে আইনস্টাইনের লিডেন যাত্রাকে পরবর্তীকালে এই শহরে তাঁর নিয়মিত ভ্রমণের শুভারম্ভ বলা চলে। লিডেনে থাকতেন বিশ্ববিখ্যাত বিজ্ঞানী লোরেনৎস। ওঁর প্রতি আইনস্টাইনের ছিল অগাধ শ্রদ্ধা। লিডেনে আর ছিলেন পল এরেনফেস্ট। এঁর সান্নিধ্যের জন্যও আইনস্টাইন সর্বদা লালায়িত ছিলেন। এরেনফেস্টের বাড়ির দরজাও আইনস্টাইনের কাছে সর্বদা উন্মুক্ত ছিল। এরেনফেস্ট ও তাঁর রাশিয়ান স্ত্রী তাত্যায়ানা এবং আইনস্টাইন ও তাঁর স্ত্রী এলসা ঘনিষ্ঠ বন্ধুতে পরিণত হন। ১৯২৩-এ এরেনফেস্ট লিডেন বিশ্ববিদ্যালয়ে লোরেনৎসের স্থলাভিষিক্ত হয়েই আইনস্টাইনকে ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ে নন-স্টাফ অধ্যাপকরূপে যোগ দেয়ার আমন্ত্রণ জানান। আর আইন-স্টাইনও সানন্দে বার্লিন ও লিডেন করতে লাগলেন। লিডেনে তিনি সর্বদা এরেনফেস্টদের সঙ্গে থাকতেন। কারণ ওখানে তাঁর প্রিয় ও পছন্দসই খাবার পাওয়া সম্পর্কে নিশ্চয়তা ছিল। আর এরেনফেস্টদেরও বড় ভাল লাগত যখন আইনস্টাইন আনন্দে চীৎকার করতে করতে বাড়ি ঢুকতেন—"What does a man need besides a violin, a bed, a desk and a chair?"

লিডেন বক্তৃতার পরের বছর প্রাগের এক বৈজ্ঞানিক সংস্থা 'ইউরেনিয়া' তাঁকে বক্তৃতা করার জন্য আমন্ত্রণ জানায়। সেখানে তিনি বিজ্ঞানী ফিলিপ ফ্রাঙ্ক ও তাঁর স্ত্রীর আতিথ্য গ্রহণ করেন। প্রাগে বাড়ি পাওয়া ছিল দুষ্কর। ফ্রাঙ্ক-দম্পতী ফিজিক্স লেবরেটরির

অফিস ঘরে থাকতেন। এ সেই ঘর যেটি একদিন আইনস্টাইনের অফিস ঘর ছিল। এর ফলে আইনস্টাইন সাংবাদিকদের হাত থেকে মুক্তি পেলেন। ফ্রাঙ্ক-কে নিয়ে আইনস্টাইন চেক বিশ্ববিদ্যালয় ঘুরে ঘুরে দেখলেন। তারপর ঘুরে বেড়ালেন বিভিন্ন সব কাফে-তে। ঘুরে ঘুরে কাফে দেখার আইডিয়াটি ছিল আইনস্টাইনের নিজের। যে শহরের রাস্তায় রাস্তায় একদিন কত ঘুরেছেন সেই শহরের জীবন-যাত্রার ঘনিষ্ঠ পরিচয় নেয়াই ছিল তাঁর উদ্দেশ্য।

সন্ধ্যায় ইউরেনিয়া সোসাইটির ভিড়ে-ঠাসা হলে তিনি বক্তৃতা করলেন। বক্তৃতা-শেষে বেশ কিছু অতিথি সন্ধ্যেটা আইনস্টাইনের সঙ্গে কাটানোর উদ্দেশ্যে জমায়েত হলেন। কিছু কিছু বক্তৃতাও হল। এবার আইনস্টাইনের বলার পালা।

তিনি বললেন—"বক্তৃতা না দিয়ে আপনাদের যদি ভায়োলিন বাজিয়ে শোনাই তা হলে, মনে হয়, আরও উপভোগ্য হবে।" সহজ-সরল, ত্রুটিহীন, মর্মস্পর্শী ভঙ্গিমায় তিনি মোজার্টের একটি সোনাটা বাজালেন।

প্রাগ থেকে ভিয়েনায়। সেখানে তিন হাজার দর্শকের সামনে এক বিরাট কনসার্ট হলে বক্তৃতা করলেন। এখানে এসে তিনি শুনলেন ফ্রেডরিক অ্যাডলারের মর্মান্তিক ঘটনার বিশদ বিবরণ। যুদ্ধের সময় ফ্যাশানদুরস্ত হোটেল মাইসেল-এর ডিনারে অ্যাডলার অস্ট্রিয়ান সরকারের প্রধানমন্ত্রী স্টুর্গ-কে গুলি করে হত্যা করেন। তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয় এবং বিচারে মৃত্যুদণ্ডের আদেশ হয়। কিন্তু রাজা দণ্ডাদেশ কমিয়ে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের আদেশ দেন। রটে যায়, হত্যাকালে অ্যাডলার মানসিক দিক থেকে সুস্থ ছিলেন না। এ কথার সমর্থন মিলল এক বিচিত্র ব্যাপারের মাধ্যমে। মাক-এর ভাবশিষ্য অ্যাডলার ছিলেন আপেক্ষিক তত্ত্বের ঘোরতর বিরোধী। জেলে থাকাকালে আপেক্ষিকবাদের বিরোধিতা করে একটি নিবন্ধও লেখেন। তাঁর বিশ্বাস, ঐ নিবন্ধে আইনস্টাইনের ধারণার বিরুদ্ধে জোরালো যুক্তি

উত্থাপন করা হয়েছে। বিশিষ্ট মনোবিদ ও পদার্থবিজ্ঞানীদের কাছে পাণ্ডুলিপিটি পাঠিয়ে আদালত জানতে চাইলেন: প্রবন্ধটি পড়ে কি এমন সিদ্ধান্ত করা চলে যে, এর লেখক মানসিক ব্যাধিতে ভুগছেন? বিশেষজ্ঞদের অন্যতম ছিলেন পদার্থবিজ্ঞানী ফিলিপ ফ্রাঙ্ক। তিনি লিখেছেন—ব্যাপারটিতে পদার্থবিদেরা বড়ই ফ্যাসাদে পড়লেন। অ্যাডলারকে যদি মানসিক অসুস্থ বলে ঘোষণা করা হয় তবে দণ্ডাদেশ হ্রাস পাবে একথা সুনিশ্চিত। কিন্তু সেক্ষেত্রে ব্যাপারটা হবে লেখকের প্রতি চরম অবমাননাকর। কেননা, লেখকের দৃঢ় বিশ্বাস তিনি এক উল্লেখযোগ্য বৈজ্ঞানিক কীর্তি স্থাপন করেছেন।

ভিয়েনায় আইনস্টাইন থাকতেন বিখ্যাত অস্ট্রিয় পদার্থবিদ ফেলিক্স এরেনহাফ্‌টের সঙ্গে। দু'জনের মধ্যে সর্বদা চলত তুমুল তর্কবিতর্ক। কিন্তু এ সত্ত্বেও, অথবা হয়ত এই কারণেই, পরস্পর সাক্ষাতের জন্য উভয়েই লালায়িত হতেন। এরেনহাফ্‌টের স্ত্রী ছিলেন অস্ট্রিয়ায় নারীশিক্ষা বিস্তারের বিশিষ্ট সংগঠক। তিনি চাইতেন, বক্তৃতাকালে আইনস্টাইন যেন পোশাক-পরিচ্ছদে কেতাদুরস্ত থাকেন। তাই আইনস্টাইন যে দু-জোড়া ট্রাউজার্স সঙ্গে এনেছিলেন তার এক জোড়া মিসেস এরেনহাফ্‌ট ইস্ত্রির জন্য পাঠিয়ে দেন। কিন্তু অবাক কাণ্ড! দেখা গেল, আইনস্টাইন যখন বক্তৃতা করছেন তখন তাঁর পরনে ইস্ত্রিবিহীন ট্রাউজার জোড়া॥

১৯২১ সালে আইনস্টাইন ইহুদী আন্দোলনের নেতা ভাইসমানের আমন্ত্রণ পেলেন। যুক্তরাষ্ট্রে তাঁর এক ভ্রমণসূচীতে সঙ্গী হতে হবে। উদ্দেশ্য: প্যালেস্টাইনে প্রস্তাবিত এক ইহুদী বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য অর্থ সংগ্রহ করা। নিউইয়র্ক বন্দরে এক বিরাট জনতা তাঁদের বিপুল অভ্যর্থনা জানাল। জাহাজ পুরোপুরি বন্দরে নোঙর করার আগেই একদল সাংবাদিক লাফিয়ে জাহাজে উঠে পড়েন এবং আইনস্টাইন, তাঁর স্ত্রী ও ভাইসমানকে ঘিরে ধরেন। সাক্ষাৎকারের ঝামেলায় বিব্রত আইনস্টাইনকে বাধ্য হয়ে অনেক প্রশ্নের জবাব দিতে হয়।

এক সাংবাদিক প্রশ্ন করলেন—"অনুগ্রহ করে মাত্র কয়েকটি বাক্যে আপেক্ষিকতা তত্ত্বের মূল বক্তব্যটি বলবেন কি ?"

এ ধরনের প্রশ্ন এর আগেও অনেকবার তাঁকে শুনতে হয়েছে। তাই চট্ করে আইনস্টাইন মন্তব্য করলেন—"খুব সিরিয়সভাবে যদি না নেন এবং একে এক ধরনের রসিকতা বলে মনে করেন তা হলে বলি। আগে মনে করা হত, সমস্ত বস্তুপুঞ্জ যদি বিশ্ব থেকে অদৃশ্যও হয়ে যায় তবু দেশ এবং কাল পড়ে থাকবে। কিন্তু আপেক্ষিক তত্ত্ব অনুসারে, বস্তুপুঞ্জের সঙ্গে সঙ্গে দেশ এবং কাল-ও অদৃশ্য হবে।"

আবার প্রশ্ন—"এ কথা কি সত্যি যে, পৃথিবীতে মাত্র বারো জন ব্যক্তি রিলেটিভিটি থিয়োরী বোঝেন ?"

উত্তর—"এমন কথা আমি কখন বলিনি এবং সত্য বলে স্বীকারও করি না।"

বস্তুত, এ ধরনের মন্তব্য করেছিলেন ফরাসী বিজ্ঞানী লাঁজভা। সে রিলেটিভিটির প্রথম যুগের কথা। আইনস্টাইনের মতে, "যে কোন পদার্থবিদ সহজেই এটা বুঝতে পারবেন। বার্লিনে তাঁর সব ছাত্রই এটা বুঝতে পেরেছিল"।

"আচ্ছা, যে থিয়োরী তারা বোঝে না তা নিয়ে হাজার হাজার লোকের এই craze কেন ?"—জনৈক রিপোর্টারের প্রশ্ন।

"That's a problem of psychologists." —আইনস্টাইন হাসলেন।

বিরতি টানার চেষ্টায় আইনস্টাইন বললেন—"Well, gentleman, I hope I have passed my examination."।

"আপনি কি রিলেটিভিটি বোঝেন ?" —প্রশ্ন করা হল মিসেস আইনস্টাইনকে।

সহাস্যে মিসেস জবাব দিলেন—"না, একদম না। অবশ্য উনি বহুবার বিষয়টি আমার কাছে ব্যাখ্যা করেছেন। তবে কি জানেন, আমার সুখ-শান্তির জন্য এর কোন প্রয়োজন নেই।"

শেষ অবধি পুলিশ পথ করে দিল। বিরাট জনতার ভেতর দিয়ে এক হাতে পাইপ, আর এক হাতে ভায়োলিন কেস নিয়ে স্মিতহাস্যে আইনস্টাইন আমেরিকার মাটিতে পা রাখলেন।

যুক্তরাষ্ট্রের বক্তৃতাগুলোর মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হল প্রিন্সটন বিশ্ববিদ্যালয়ে দেয়া চারটি ধারাবাহিক বক্তৃতা। এগুলো পরে ছেপে বই—The Meaning of Relativity—আকারে প্রকাশ করা হয়। বহুদিন ধরে এগুলিই ছিল রিলেটিভিটি থিয়োরীর ক্লাসিকাল বিবরণী। যুক্তরাষ্ট্র থেকে ফেরার পথে লর্ড হলডেনের আমন্ত্রণে আইনস্টাইন লণ্ডনে যাত্রাবিরতি করলেন।

যুক্তরাষ্ট্র আইনস্টাইনকে মুগ্ধ করল। উনিও যেখানে গেলেন সেখানেই—'এলেন, দেখলেন ও জয় করলেন'। কিন্তু যখন বলা হল এ সম্পর্কে কিছু বলুন, তখন সরস ভঙ্গিমায় বললেন—"The impression cannot be very elevating when I remember that a victorious boxer is received with still greater enthusiasm."। তা ছাড়া, "The ladies in New York want to have a new style every year—this year the fashion is Relativity."

বিদায় বাণীতে পাইপ টানতে টানতে বললেন—Much is to be expected from American Youth! তুলনা দিয়ে বোঝাতে চাইলেন। হাতের কাছে পাইপ ছাড়া ত কিছু ছিল না। তাই বললেন— "It's like a pipe, as yet unsmoked, young and fresh."।

লর্ড হলডেন ছিলেন একজন শখের বিজ্ঞানী ও তৎকালীন যুদ্ধমন্ত্রী। তাঁর ইচ্ছে ছিল ব্রিটীশ বিজ্ঞানীদের সঙ্গে আইনস্টাইনের সাক্ষাৎ ঘটুক। ইংলণ্ড ও জার্মানের মধ্যে যুদ্ধজনিত শত্রুতার অবসান হোক। পারস্পরিক ঘৃণার যে প্রকাশ ঘটেছে একমাত্র সাংস্কৃতিক

ও বৈজ্ঞানিক বিনিময়েই তার অবসান হতে পারে। আইনস্টাইনও এ বিশ্বাসের শরিক ছিলেন। তাই হলডেনের অনুরোধে তিনি কিংস কলেজে একটা বক্তৃতাও দিলেন।

কিন্তু অনেকে যা আশঙ্কা করেছিলেন তাই ঘটল। হলের বিরাট সমাবেশ আইনস্টাইনকে 'শীতল অভ্যর্থনা' জানাল। এই প্রথম শ্রোতৃবৃন্দ তাঁকে করতালি দিয়ে সোৎসাহে অভিনন্দিত করল না। নিঃসন্দেহে তিনি একজন বিশ্ববন্দিত বিজ্ঞানী, কিন্তু তিনি যে জার্মান-বিজ্ঞানের প্রতিনিধি! ইংলণ্ডে তখন 'জার্মান' শব্দটা ছিল গাল-গালির সমার্থক। জার্মান কুকুরকে পর্যন্ত মেরে ফেলা হচ্ছিল। যা হোক, বক্তৃতায় আইনস্টাইন সোৎসাহে বিজ্ঞানের আন্তর্জাতিক ভূমিকার কথা উল্লেখ করলেন। বিনম্র শান্তকণ্ঠে ব্যাখ্যা করলেন বিশ্বরহস্য। বললেন বিজ্ঞানীদের পারস্পরিক যোগাযোগের কথা। আর বললেন, বিজ্ঞানের ক্রমোন্নতিতে ব্রিটীশ জাতির ভূমিকা, বিশেষ আইজাক নিউটনের কথা। ইংরেজ সহকর্মিদের এই বলে ধন্যবাদ দিলেন যে, তাঁদের দান ব্যতিরেকে সম্ভবত তাঁর থিয়োরীর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যাচাই তিনি দেখতে পেতেন না।

বিজ্ঞানীদের আন্তর্জাতিক সহযোগিতার এক কর্মসূচীও তাঁর বক্তৃতায় উপস্থাপিত করলেন। পরিবেশনা ও বিষয়বস্তুতে বক্তৃতাটি শুধু যে উপস্থিত শ্রোতৃবৃন্দের মন কেড়ে নিল তাই নয়, সমগ্র ব্রিটীশ বিজ্ঞান-জগৎ আলোড়িত হল। জনতার এই অনুরণনে আর একবার প্রমাণিত হল যে, আইনস্টাইনের আইডিয়াগুলোর প্রতিক্রিয়া কতো গভীর এবং সুদূরপ্রসারী। তাঁর এই সফর ব্রিটেন ও জার্মানীর সম্পর্ক উন্নত করতে যথেষ্ট সাহায্য করল।

আইনস্টাইন-দম্পতী লণ্ডনে লর্ড হলডেনের অতিথি হিসেবে ছিলেন। লর্ডের প্রাসাদোপম বাসগৃহের যে কক্ষে তাঁরা থাকতেন তা ছিল আকারে তাঁদের বার্লিনের গোটা ফ্ল্যাটের চেয়েও বড়। এজন্য আইনস্টাইন বড় বিব্রতবোধ করতেন। বিব্রতভাব শীঘ্রই বিমর্ষতায়

রূপ নিল। কারণ তিনি দেখলেন, তাঁর জন্য একজন খানসামার ব্যবস্থা করা হয়েছে। ফিসফিস করে স্ত্রীকে বললেন— "এলসা, ছুটে পালানোর চেষ্টা করলে কি ওঁরা আমাদের ছেড়ে দেবেন।"

যে বিস্তৃত বেডরুমে ওঁরা ঘুমলেন তার জানালাগুলো ভারি পর্দায় পুরোপুরি ঢাকা। পরদিন খুব ভোরে আইনস্টাইন ঘুম থেকে উঠলেন। উঠেই পরদা সরানোর চেষ্টা করলেন। কিন্তু পারলেন না। পেছনে দাঁড়িয়েছিলেন স্ত্রী এলসা। সহাস্যে মন্তব্য করলেন—"আলবার্টল, খানসামাকে একবার ডেকে কাজটা করিয়ে নাও না কেন?"

"না, না। ওকে দেখলেই আমার যেন কেমন ভয় করে।"—উত্তর করলেন আইনস্টাইন।

শেষ অবধি দু'জনের মিলিত চেষ্টায় পর্দা সরলো এবং প্রাতরাশের জন্য তাঁরা হলঘরে এলেন।

ঐদিন সন্ধ্যায় বিশিষ্ট অতিথির সম্মানে হলডেন এক ভোজসভার আয়োজন করলেন। উদ্দেশ্য, যত বেশি সংখ্যায় ইংল্যাণ্ডের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সঙ্গে আইনস্টাইনের পরিচয় করানো যায়। সমাগত অন্যান্য অতিথিদের মধ্যে ছিলেন প্রধানমন্ত্রী লয়েড জর্জ, বার্নার্ড শ, ক্যাণ্টারবেরির আর্চবিশপ। আর্চবিশপ বসেছিলেন আইনস্টাইনের ঠিক পাশেই।

আর্চবিশপ আইনস্টাইনকে প্রশ্ন করলেন—"আচ্ছা, ধর্মের উপর আপনার রিলেটিভিটির কি কিছু প্রভাব আছে?"

আর্চবিশপকে আশ্বস্ত করে আইনস্টাইনের সংক্ষিপ্ত অথচ তীক্ষ্ণ উত্তর এল—"না, কিচ্ছু না।" এ নিছক বৈজ্ঞানিক ব্যাপার। ধর্মের সঙ্গে এর কোন সম্পর্ক নেই। আর মজা কী জানেন? The less knowledge a scholar possesses the farther he feels from God. But the greater his knowledge, the nearer his approach to God."।

ভোজসভাটি প্রাণবন্ত হয়ে উঠল শ আর আইনস্টাইনের তীক্ষ্ণ-সরস

শ্লেষাত্মক উত্তর-প্রত্যুত্তরে। শ বললেন—"Tell me, my dear Einstein, do you really understand what you write ?"

আলবার্ট হাসলেন। বললেন—"As much as you understand your writings."।

পরদিন রিপোর্টারেরা এই সব কথোপকথনের পসরায় সাজিয়ে দিলেন তাঁদের সংবাদপত্রগুলো।

১৯২১ সালের জুন মাসে আইনস্টাইন বার্লিনে ফিরলেন। তাঁকে ও আপেক্ষিক তত্ত্বকে ঘিরে যে সামাজিক ঝড় উঠেছিল যুক্তরাষ্ট্র এবং ইংল্যাণ্ডে তাঁর প্রতি সম্মান দেখানোর ফলে তা আরও প্রচণ্ড আকার নিল। ঠিক যেন অগ্নিতে ঘৃতাহুতি। ওদিকে জার্মানীতে প্রতিক্রিয়ার শক্তিও ক্রমাগত বেড়ে চলল।

১৯২২-এর জুন। জার্মানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ওয়াল্টার রাথেনাউ নিহত হলেন। সোভিয়েত রাশিয়ার সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক রাখার জন্য ইনি ওকালতি করতেন। তাঁর অন্ত্যেষ্টির দিন সব বিশ্ববিদ্যালয়ের সমস্ত ক্লাশ ছুটি হয়ে গেল। ব্যতিক্রম শুধু হাইডেলবার্গ। ঐদিন সেখানে ফিলিপ লেনার্ড তাঁর রাজনৈতিক সমর্থকদের একটি বক্তৃতায় যোগ দিতে আমন্ত্রণ জানালেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের একদল কর্মী লেনার্ডকে অডিটোরিয়ম থেকে টেনে বার করে আনল। আইনস্টাইন ও রিলেটিভিটি থিয়োরীর বিরুদ্ধে আক্রমণ ছিল কার্যত গণতন্ত্র, শান্তি এবং প্রগতির বিরুদ্ধে ব্যাপক ষড়যন্ত্রের একটা অংশ। রিলেটিভিটির বিরুদ্ধে লেনার্ড পাগলের মতো জাতিবিদ্বেষী আক্রমণ চালিয়ে যেতেন। জাতীয়তাবাদী টেররিস্ট সংস্থাগুলোর সঙ্গে তিনিও রিলেটিভিটি থিয়োরীতে 'ঘৃণ্য', যুক্তিবাদী চিন্তাধারার বিজয় অভিযান দেখতেন। আর সাধারণ কর্মী এবং গণতান্ত্রিক মানসিকতার বুদ্ধিজীবীরা তত্ত্বটিকে দেখতেন প্রতিক্রিয়াবিরোধী একটি শক্তি হিসেবে। ১৯১৯-১৯২০ সালে জনসাধারণ মনে মনে যা ভাবতেন তা আরও দৃঢ় হল। তাঁরা

দেখলেন, আইনস্টাইন ও তাঁর রিলেটিভিটিকে কেন্দ্র করে একটা সামগ্রিক রাজনৈতিক ঝঞ্ঝা দেশকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছে।

আইনস্টাইনের বিদেশ পরিক্রমার ফলে আদর্শগত অমিল আরও প্রকট হয়ে উঠল। ১৯২২-র মার্চে আইনস্টাইন কলেজ ডি ফ্রাঁসের আমন্ত্রণে ফ্রান্সে গেলেন। পল লাঁজভার আগ্রহেই এই আমন্ত্রণ। সেখানে আইনস্টাইনের সঙ্গে লাঁজভা ও চার্লস নর্ডমানের দেখা হল। ফ্রান্সে আইনস্টাইনের আইডিয়া প্রচারে ফরাসী পদার্থবিদ্ নর্ডমানের একটা বিশেষ ভূমিকা ছিল।

লাঁজভা ও নর্ডমান খবর পেলেন যে, জাতীয়তাবাদী ও রাজতন্ত্রী গোষ্ঠীর লোকেরা রেল স্টেশনে আইনস্টাইনের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ জানানোর জন্য প্রস্তুত হচ্ছে। ফলে তাঁরা আইনস্টাইনকে পাশের একটা প্রবেশ পথ দিয়ে নিয়ে আসার ব্যবস্থা করলেন। কিন্তু, পরে দেখা গেল, স্টেশনের বাইরের জনতা ছিল কার্যত ছাত্রদল। লাঁজভার ছেলের নেতৃত্বে তাঁরা আইনস্টাইনকে অভ্যর্থনা জানাতে এবং বিরুদ্ধ-বাদীদের বিক্ষোভ পর্যুদস্ত করতে স্টেশনে জমায়েত হয়েছিল।

৩১শে মার্চ, শুক্রবার। বিকেল পাঁচটায় বিজ্ঞানী এবং কিছু ছাত্রের ছোট্ট একটা দল কলেজ ডি ফ্রাঁসের সবচেয়ে বড় হলটিতে আইন-স্টাইনের বক্তৃতা শুনতে সমবেত হলেন। উপস্থিত বিজ্ঞানীদের মধ্যে তাঁর প্রিয় এবং পুরনো বন্ধু ম্যাডাম কুরী-ও ছিলেন। সবাই বিস্মিত! কেন 'সমস্ত প্যারিস' আজ এখানে উপস্থিত নেই! কিন্তু লাঁজভা স্বয়ং দেখে দেখে সযত্নে তাঁদেরই শুধু প্রবেশপত্র দিয়েছিলেন যাঁদের বিষয়টিতে উৎসাহ আছে বলে তিনি জানতেন। যাঁর "people killed our sons" তাঁর বক্তৃতা শোনার অপরাধে যথারীতি পরদিন কাগজে বিজ্ঞানীদের অনেক কটূবাক্য শুনতে হল।

বক্তৃতায় আইনস্টাইন সনাতন আপেক্ষিকবাদের সঙ্গে ইলেকট্রো-ডায়নামিক্সের বিরোধের কথা উপস্থাপিত করলেন। বললেন, ইলেক-ট্রোডায়নামিক্স জোরের সঙ্গে যে প্রশ্ন তুলে ধরছে তা হল: সমবেগে

সরলরেখায় গতি কোন জড়-কাঠামোয় ভৌত পরীক্ষার মাধ্যমে ধরা সম্ভব নয়, আপেক্ষিক তত্ত্বের এ আইডিয়া কি আলোকীয় ঘটনার ক্ষেত্রেও সত্যি? আলোর বেগের ধ্রুবত্বের অর্থ হল, আলোকীয় পদ্ধতিগুলো যখন ধর্তব্যের মধ্যে আনা হয় তখন গতি তার আপেক্ষিক প্রকৃতিকে অবিকৃত রাখে। জাড্য-গতির ক্ষেত্রে আলোর বেগ পরিবর্তিত হয় না এবং গতির কোন অন্তঃপ্রকাশ ঘটে না। রিলেটিভিটির মূল ধারণার এই তন্নিষ্ঠ চরিত্রটি তিনি পরিস্ফুট করলেন। যে সমস্ত গণিতজ্ঞ শুধু ফর্মূলা মুখস্থ করেছেন কিন্তু রিলেটিভিটির অবজেকটিভ চরিত্র হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন নি তাঁদের উদ্দেশে মন্তব্য করলেন—"এঁদের ভুল হল, এঁরা কেবল গাণিতিক সম্পর্কগুলো দেখতে পান। সেগুলো যে আসলে ভৌত-বাস্তবতাকে প্রকাশ করে তা চিন্তা করেন না।" ভৌত-বাস্তবতা বলতে আইনস্টাইন প্রত্যক্ষ পর্যবেক্ষণভিত্তিক যুক্তিনিষ্ঠ রূপকল্পের যাচাই-এর সম্ভাবনা বুঝতেন। এটা যে নীতিগতভাবে সম্ভব তাতেই প্রমাণ হয় যে, বাইরে একটা অবজেকটিভ ভৌত-বাস্তবতার অস্তিত্ব আছে এবং আমাদের ইন্দ্রিয়লব্ধ ধারণার পেছনে এটিই কারণ। রূপকল্পগুলোর সঙ্গে ইন্দ্রিয়জ ধারণার যে পারস্পারিক সম্পর্ক তা-ই রূপকল্পগুলোর অবজেকটিভ মূল্যকে প্রমাণ করে।

দৈশিক-দূরত্ব বা ব্যবধান এমন একটা ধারণা যার সঙ্গে পর্যবেক্ষণের সম্পর্ক থাকবে। আর, সেই সম্পর্ক নির্ণয়ের উপযুক্ত ব্যবস্থা হল কোন ভৌতবস্তুর দ্বারা অতিক্রান্ত দূরত্ব নিরূপণ। কিন্তু কোন ভৌত বস্তুই অসীম বেগে চলতে পারে না। তাই ইন্দ্রিয়লব্ধ ধারণার সঙ্গে কোন সম্পর্ক স্থাপন করতে গেলে দৈশিক-দূরত্ব ও সময়ের ব্যবধান অবশ্যম্ভাবীরূপে যুক্ত থাকা চাই। এ রকম ধারণাই শুধু ভৌত তাৎপর্যবাহী। এই অবজেকটিভ বা বস্তুনিষ্ঠ জগতে 'তাৎক্ষণিক' দৈশিক-দূরত্ব বা ব্যবধান বলতে কিছু নেই। আছে শুধু 'দেশকাল ব্যবধান' বা spacetime interval।

কলেজ ডি ফ্রাঁসের পদার্থবিভাগের অডিটোরিয়মে বিজ্ঞানীদের এক ছোট্ট ঘরোয়া সভা হল ৩রা এপ্রিল। আইনস্টাইন ঐ সভায় পরস্পরের সাপেক্ষে সমবেগে গতিশীল কাঠামোগুলোতে পর্যবেক্ষণ চালিয়ে ঘড়ি-মেলানো যে অসম্ভব সে সম্পর্কে বিশদ বললেন। যাঁরা তাঁর বক্তব্যের বিরোধিতা করলেন তাঁদের মধ্যে প্রধান ছিলেন বিশিষ্ট গণিতজ্ঞ পল পেঁইলিভে। তিনি সোৎসাহে আইনস্টাইনের প্রতিভার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করলেন। কিন্তু আক্রমণ করে বসলেন রিলেটিভিটির মূল অঙ্গীকারগুলো। তিনি এমন কিছু উদাহরণ দিলেন যা দৃশ্যত থিয়োরীর সিদ্ধান্তের পরিপন্থী। প্রত্যুত্তরে আইনস্টাইন সবিনয়ে, কিন্তু জোরের সঙ্গে, নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করে দেখালেন যে, উদাহরণগুলোর প্রত্যেকটিতে পরোক্ষে ত্বরণ ( acceleration ) ক্রিয়া করছে অর্থাৎ কাঠামোগুলো মোটেই সমবেগে গতিশীল কাঠামো নয়। স্বভাবত এগুলো বিশেষ আপেক্ষিক তত্ত্বের আওতায় আসে না।

তিন দিন পর, ৬ই এপ্রিল। আইনস্টাইন সর্বোনে ফরাসী দার্শনিক সোসাইটির এক সভায় কাণ্টের দর্শন সম্পর্কে নিজের অভিমত ব্যক্ত করলেন। সভাপতি ছিলেন বিশ্ববিখ্যাত ফরাসী দার্শনিক হেনরী বার্গসঁ। বক্তৃতার পর বার্গসঁ-র সঙ্গে তিনি তুমুল বিতর্কে জড়িয়ে পড়লেন। এক বিশেষ 'অন্তরশায়ী', 'স্বজ্ঞালব্ধ' সময়ের ধারণার স্বপক্ষে 'যুক্তি' দিচ্ছিলেন বার্গসঁ। হঠাৎ এমিল মেয়ার্শ ন আইনস্টাইনকে জিজ্ঞাসা করে বসলেন—"মাক-এর দর্শন সম্পর্কে আপনার অভিমত কি?" উত্তরে আইনস্টাইন বললেন—"দার্শনিক হিসেবে মাক খুব একটা উঁচুদরের নন।"

আইনস্টাইন ফরাসী অ্যাকাডেমিতে বক্তৃতা করেন নি। কেননা, তাঁর নাম বহু 'অমর ব্যক্তিত্বের' কাছে বিকর্ষণ সৃষ্টি করত। নামটি যেন বড় বেশি স্বাধীনতা, শান্তি ও প্রগতির সংগ্রামের সঙ্গে যুক্ত। অন্যান্য অ্যাকাডেমিশিয়ানরা রিলেটিভিটিতে ক্লাসিকাল বিজ্ঞানের অপমৃত্যুর ঘণ্টাধ্বনি শুনতে পেতেন। এ সম্পর্কে আইনস্টাইনের নিজের মন্তব্য :

"আঠার বছর বয়স পর্যন্ত তাঁরা যা শিখেছিলেন তাকেই অভিজ্ঞতা বলে ভাবা হত। আর পরে যা শুনছেন তা সবই তত্ত্ব আর কল্পনা।"

যা হোক, অ্যাকাডেমির প্রতিক্রিয়াশীল বৈজ্ঞানিক ও রাজনৈতিক চিন্তাধারার শরিকেরা নানা অজুহাত দেখাতে লাগলেন। কেউ বললেন, আইনস্টাইন অ্যাকাডেমির সদস্য ছিলেন না। কাজেই সদস্যদের মধ্যে তিনি বসতে পারবেন না। তাঁকে বসতে হবে শ্রোতাদের মধ্যে। ত্রিশ জন সদস্যের একটি দল জানালেন যে, আইনস্টাইন যদি আসেন তবে প্রতিবাদে তাঁরা ঘর থেকে বেরিয়ে যাবেন। অ্যাকাডেমিশিয়ানদের এই সব নীচ ও স্থূল কথাবার্তা আইনস্টাইনের কানেও পৌঁছল। তাঁর ফরাসী বন্ধুরা যাতে অযথা অপ্রীতিকর পরিস্থিতির সম্মুখীন না হন এজন্য অ্যাকাডেমির সেশনে অংশগ্রহণ করতে আইনস্টাইন নিজে থেকেই অস্বীকার করলেন।

এ প্রসঙ্গে ফিলিপ ফ্রাঙ্ক লিখছেন—"সেই একই গোষ্ঠী যাঁরা আইনস্টাইনকে 'জার্মান' বলে তাঁর অভ্যর্থনার বিরুদ্ধে তীব্র ও ক্ষিপ্ত প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন নাৎসীদের ক্ষমতা দখলের পর তাঁরাই আবার জার্মানের সঙ্গে 'সহযোগিতা' নীতির সবচেয়ে জোরাল সমর্থক হয়ে ওঠেন। এ সব ফরাসী 'দেশপ্রেমিকেরা' ১৯৪০ সালে ফরাসীদের পরাজয়ের এবং সারা মহাদেশ জুড়ে জার্মান প্রভূত্ব বিস্তারের প্রস্তুতি চালিয়েছিলেন।"

আইনস্টাইন জার্মানীতে ফিরলেন। ফিরেই দেখেন জুরিখ যাবার আমন্ত্রণ এসেছে। সেই জুরিখ যে শহরকে তিনি নিজের বাড়ি বলে ভাবতেন! কিন্তু তিনি তখন বড় ক্লান্ত—পথশ্রান্ত। লিখে পাঠালেন —"আপনার ছাত্রদের বলবেন যে, জুরিখের প্রাক্তন ছাত্র হিসেবে এই নিমন্ত্রণে আমি অভিভূত। কিন্তু আমার একটু বিশ্রামের বড় প্রয়োজন। You must not take it amiss and say 'He went to Paris but did not come to us.'।"

কিন্তু অল্পদিনের মধ্যেই আবার বেরিয়ে পড়তে হল। জাপান ও চীন থেকে বারবার তাঁর কাছে আমন্ত্রণ আসছিল। সেই আমন্ত্রণ রক্ষায় ১৯২২-এর শরৎকালে আইনস্টাইন সস্ত্রীক মার্সাই এলেন এবং সেখান থেকে এক জাপানী জাহাজে চললেন প্রাচ্যভূমি অভিমুখে। ভূমধ্যসাগর ও ভারত মহাসাগর হয়ে কলম্বো, সিঙ্গাপুর এবং সাংহাই এলেন। প্রত্যেকটি জায়গায় জনসাধারণ তাঁকে স্বতঃস্ফূর্ত অভিনন্দন জানাল।

সাংহাই-এ জাহাজ ভিড়তেই শিশুকণ্ঠে জার্মান জাতীয় সঙ্গীত Deutschland, Deutschland, uber alles শুনে আইনস্টাইন হঠাৎ হতচকিত হয়ে পড়েন। জার্মান স্কুলের ছাত্র ও শিক্ষকেরা জাহাজ-ঘাটায় এসেছিলেন তাঁদের বরেণ্য সন্তানকে বরণ করতে। ক্রমভঙ্গহীন অভ্যর্থনার এই সবে শুরু। সম্মান, সম্মান, আর সম্মান। চীন সম্রাজ্ঞীর সঙ্গে একান্ত সাক্ষাৎকারও এর অন্তর্গত ছিল। এর পরিণতি ঘটল নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তির সংবাদে।

নভেম্বরের শেষে আইনস্টাইন জাপানের কোবে পৌঁছলেন। এক বিরাট জনতা সেখানেও তাঁকে অভ্যর্থনা জানাল।

বক্তৃতা, সভা, অভ্যর্থনা আর ভ্রমণ। চলল একাদিক্রমে। শেষে ব্যাপারটা কঠিন হয়ে দাঁড়াল। কেননা, প্রত্যেকটি কথা ভাষান্তরিত করার প্রয়োজন দেখা দিল। বক্তৃতাকালে শ'য়ে শ'য়ে শ্রোতা অসীম ধৈর্যের সঙ্গে অপরিচিত জার্মান ভাষায় তাঁর বক্তৃতা শুনতেন। তারপর শুনতেন আর এক জাপ-বিজ্ঞানীর বক্তৃতা যিনি মূল বক্তৃতা জাপ ভাষায় অনুবাদ করে দিতেন। অনুবাদের ফলে প্রথম দিনের বক্তৃতা পর্বটি শেষ হতে লাগল প্রায় চার ঘণ্টা। এত ধৈর্য ধরে যাঁরা তাঁর বক্তৃতা শুনছিলেন আইনস্টাইন তাঁদের উদ্দেশে গভীর কৃতজ্ঞতা ও সহানুভূতি জানালেন। ঠিক করলেন, পরবর্তী বক্তৃতাগুলো সংক্ষিপ্ত করবেন। তা হলে শ্রোতৃবৃন্দের কষ্টের লাঘব হবে। এলসাকে বললেন—"Those poor people, sitting there all the

time. I'll have to cut it down."

দ্বিতীয় বক্তৃতা করলেন অন্য এক শহরে, প্রায় আড়াই ঘণ্টা ধরে। কিন্তু জাপানীদের চরিত্র সম্পর্কে আইনস্টাইনের কোন পূর্ব-অভিজ্ঞতা ছিল না। তাঁর জাপ সহযাত্রীরা কিছুটা বিব্রতভাবে তাঁকে বোঝালেন যে, বক্তৃতার সময় সংক্ষেপ করায় শ্রোতারা দারুন অখুশি। এতে তাঁরা নিজেদের খাটো মনে করছেন।

জাপানে থাকতেই আইনস্টাইনের কাছে সংবাদ এল যে, তিনি রাশিয়ান বিজ্ঞান অ্যাকাডেমির সদস্য নির্বাচিত হয়েছেন। সুপারিশ পত্রে সই করেছেন এ. এফ. জোফে, পি. পি. ল্যাজারেভ এবং ভি. এ. স্টেকলভ। পত্রটির অংশবিশেষ এই রকম "......গত পনের বছরে পদার্থবিজ্ঞানের যা কিছু উল্লেখযোগ্য উন্নতি তা মূলত আইনস্টাইনের আইডিয়াগুলোর ফসল।"

প্রতিটি নতুন মহানগরীতে অভ্যর্থনা, সভা-সমিতি, আর উপহারের ছড়াছড়ি পড়ে গেল। অনিবার্যভাবে এগুলো ক্রমে একটা জটিল ধর্মীয় নিয়মের রূপ নিল। উপহারগুলোর মধ্যে 'চা মহাকোষ বা Encyclopaedia of Tea' নামে চার খণ্ডের এক সেট বই-ও ছিল। বইটির উপজীব্য বিভিন্ন চা-পান অনুষ্ঠানের কৃত্য ও বিস্তৃত বিবরণ।

জাপান আইনস্টাইনকে অভিভূত করল। জাপান থেকে তিনি সলোভিনকে চিঠি লিখলেন—"জাপান এক বিস্ময়কর দেশ। পরিশীলিত আদব-কায়দা, সব ব্যাপারে উৎসাহ, শিল্পীসুলভ মন, বৌদ্ধিক সারল্য আর সাধারণ বুদ্ধির অপূর্ব সংমিশ্রণে ছবির মতো দেশের এক রুচিসম্পন্ন জাত।"

জাপানী বালকদের এক সমাবেশে আইনস্টাইন ভাষণ দিলেন। বললেন, "মনে রেখ, স্কুলে যা কিছু শিখছ তা সবই পূর্বসূরীদের কাছ থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া। ঐ জ্ঞানভাণ্ডারে তোমাদেরও কিছু যোগ করে ওকে বাড়াতে হবে। বিশ্বস্ততার সঙ্গে রেখে যেতে

হবে পরবর্তী বংশধরদের জন্য। আমরা মরণশীল জীবেরা এভাবে যেসব চিরস্থায়ী জিনিস সৃষ্টি করব তার মাধ্যমেই অর্জিত হবে আমাদের অমরত্ব।”

দীর্ঘ চার মাস কাটিয়ে, বহু শুভেচ্ছা আর উপহারে ভারাক্রান্ত হয়ে আইনস্টাইন ও এলসা প্যালেস্টাইনের উদ্দেশ্যে জাপান ত্যাগ করলেন। ফেব্রুয়ারি মাসে পৌঁছলেন প্যালেস্টাইনে। জাতিংসঘের 'mandate'-এ প্যালেস্টাইন তখন ব্রিটেনের দ্বারা শাসিত হচ্ছিল।

ব্রিটিশ হাই-কমিশনার স্যার হার্বার্ট স্যামুয়েল আইনস্টাইন-দম্পতীকে স্বগৃহে আতিথ্য গ্রহণ করতে আমন্ত্রণ জানালেন এবং ওঁদের গাইড হিসেবে কাজ করলেন। স্যার স্যামুয়েলের কাজটা ছিল বড় মুস্কিলের। নিজে ছিলেন একজন ইংরেজ ইহুদী। আর কাজটি হল ইহুদী এবং আরবদের মধ্যে শান্তি ও সদ্ভাব বজায় রাখা। ইহুদী বলে আরবরা তাঁকে বিশ্বাস করত না। আর তিনি সচেতনভাবে ইহুদীদের অনুগ্রহ দেখান থেকে বিরত থাকতেন বলে ইহুদীদেরও প্রিয়পাত্র ছিলেন না।

ওদিকে জিওনিষ্টদের জন্য অনেক কিছু করলেও আইনস্টাইন প্যালেস্টাইনে সকলের কাছে প্রিয় হয়ে উঠতে পারেন নি। কোন ব্যাপারেই আইনস্টাইন গোঁড়ামি পছন্দ করতেন না। সেজন্য গোঁড়া ইহুদীরা তাঁর উপর চটা ছিল। আবার দেশপ্রেমিক ইহুদীরাও তাঁকে ভাল চোখে দেখতেন না। কেননা, তিনি তাঁদের মধ্যে এসে বসবাস বা কাজ কোনটিই করেন নি।

যা হোক, এখানেও আনুষ্ঠানিকতার কাছে আইনস্টাইনকে ধরা দিতে হল: যখনই হাইকমিশনার বাড়ি থেকে বেরতেন অমনি কামান দাগা হত; আর ঘোড়ায় চড়ে যখন তিনি রাস্তা দিয়ে যেতেন তখন সঙ্গে চলত অশ্বারোহী একদল সেনা। সব অভ্যর্থনা, ডিনার এবং লাঞ্চেই থাকত আনুষ্ঠানিকতার আতিশয্য। এগুলো আইনস্টাইন বিদ্রূপাত্মক রসবোধের সঙ্গে মেনে নিতেন বটে, কিন্তু

মুস্কিল হত এলসাকে নিয়ে। এসব আতিশয্যে এলসা অত্যন্ত বিরক্তবোধ করতেন।

একদিন স্বামীর কাছে নালিশ জানালেন—"আমি একজন সাধারণ গৃহবধূ। এ সমস্ত অর্থহীন প্রদর্শনী আর ত বরদাস্ত করতে পারছি না।"

"ধৈর্য ধর, প্রিয়ে, আমরা বাড়ির দিকেই ফিরছি"—স্ত্রীকে সান্ত্বনা দেন আইনস্টাইন।

"তোমার পক্ষে ধৈর্য ধরা সহজ। ম একজন বিশ্ববিখ্যাত ব্যক্তি। আদবকায়দার ভুলচুকে বা নিজের ধারণা মত কাজ করলে সবাই সেটা উপেক্ষা করে। কিন্তু দেখ, সংবাদপত্রগুলো সব সময় আমায় জ্বালাতন করছে। আমি ত কাছের জিনিস চোখে ভাল দেখিনে। তাই ওরা লিখল, আমি নাকি ভুল করে প্লেটের স্যালাডের বদলে ফুলদানির সবুজ পাতাগুলো খেয়ে ফেলেছি।"

অনুষ্ঠানের হাত থেকে রেহাই পেতে এলসা প্রায়ই নানা অজুহাত আবিষ্কার করতেন।

কিন্তু আইনস্টাইন চাইলেন প্যালেস্টাইন খুঁটিয়ে দেখতে। জেরুজালেম বিশ্ববিদ্যালয়, একেবারে আধুনিক শহর টেল-আবিভ এবং আরও কয়েকটি শহরে বক্তৃতাও করলেন। সর্বত্র দেখলেন বিরাট ও সচেতন সমাবেশ। আর, তিনিও প্রাণখুলে তাঁদের কাছে প্রকাশ করলেন তাঁর বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক এবং রাজনৈতিক মতাদর্শের কথা। তিনি ডাগানিআ-য় kibbutzim-ও দেখতে গেলেন। ঐ সম্প্রদায়ের প্রধান ছিলেন বাইশ বছরের এক মহিলা—মিরিয়াম। মেয়েটিকে দেখেই আলবার্ট চিনলেন। প্রাগে থাকাকালে মেয়েটির সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়েছিল। মেয়েটি তখন খুব ছোট। kibbutz-এ এক কমলালেবুর বাগানে বসে মিরিয়াম-আইনস্টাইন কথাবার্তা চলল। আইনস্টাইন বসেছিলেন ছোট্ট একটা কাঠের টেবিলে, সামনে ছিল ফুলদানি-ভরা পপিফুলের গুচ্ছ। নীল আকাশের প্রেক্ষাপটে ফুলগুলো

টকটকে লাল দেখাচ্ছিল। মিরিয়াম বসেছিল মাটিতে জোড়াসন কেটে। আইনস্টাইন তাকে অনেক প্রশ্ন করলেন। kibbutz-এ ইহুদীদের নিষ্ঠা, কঠোর পরিশ্রম এবং আত্মত্যাগ, বিশেষ, শ্রমিক ও স্কুলশিক্ষককে একযোগে একই অভিলক্ষ্যের জন্য কাজ করতে দেখে তিনি মুগ্ধ হলেন।

১৯২৩-এর মার্চে আইনস্টাইন-দম্পতী প্যালেস্টাইন থেকে জাহাজে ফ্রান্সের মার্সাই অভিমুখে চললেন। সেখানে থেকে গেলেন স্পেনে। স্পেনের ম্যাড্রিড বিশ্ববিদ্যালয় এবং আরও কয়েকটি শহরে আইনস্টাইন বেশ কয়েকটি বক্তৃতা করলেন। স্পেনের প্রাকৃতিক দৃশ্য, প্রাচীন স্থাপত্য আর আর্ট-গ্যালারির বিস্ময়কর রঙীন চিত্রগুলো তাঁকে মুগ্ধ করল। সব রকম লোকের সঙ্গে তিনি সাক্ষাৎ করলেন, কথাবার্তা বললেন। স্পেনের রাজার সঙ্গেও সাক্ষাতের সুযোগ ঘটল। মনে হল জীবন যেন এক সুখস্বপ্ন। এলসাকে বললেন—"Let's enjoy it before we wake up."। এলসা আর পারছিলেন না। বললেন—"Only one more stop now."। স্বল্পকালীন বিরতির পর স্পেন থেকে আইনস্টাইন ফিরে এলেন বার্লিনে।

১৯২৩-এর জুলাই-এ সস্ত্রীক আইনস্টাইন এলেন সুইডেনের গোটে-বার্গে। নোবেল পুরস্কার নিতে। তাঁর নামে পুরস্কার ঘোষিত হয়েছিল ১৯২২-এর নভেম্বরেই। তিনি তখন সাংহাই সফর করছিলেন। গোটেবার্গে স্ক্যাণ্ডিনেভীয় বিজ্ঞানীদের এক সভায় আইনস্টাইন বক্তৃতা করলেন। বিষয়ঃ The Basic Considerations and Problems of the Relativity Theory। সুইডেনের রাজা স্বয়ং ঐ সভায় উপস্থিত ছিলেন।

নোবেল পুরস্কার দিয়ে আইনস্টাইনকে যে সম্মানিত করা উচিত এ কথাটা কিছুদিন ধরে চলছিল। কিন্তু সুইডিশ অ্যাকাডেমির নোবেল কমিটির কর্তাব্যক্তিরা কিছুতেই সিদ্ধান্তে আসতে পারছিলেন না। কেননা, রিলেটিভিটি তত্ত্বের বহু জাঁদরেল বিরোধী ছিলেন। প্রায়োগিক

ব্যবহার আছে এমন আবিষ্কারের জন্যই সাধারণত নোবেল কমিটি পুরস্কার দিয়ে থাকেন। রিলেটিভিটির জন্য নোবেল পুরস্কার দিলে রাজনৈতিক ঝড় উঠবে আশঙ্কায় নোবেল কমিটি এবং সুইডিশ অ্যাকাডেমি ব্যাপারটিতে দ্বিধাগ্রস্ত ছিলেন। লেনার্ড ও তাঁর সমমনস্ক অন্যান্য বিজ্ঞানীদের অবশ্যম্ভাবী প্রতিক্রিয়ায় তাঁরা ছিলেন অত্যন্ত ভীত। এজন্য রিলেটিভিটির নাম উল্লেখ না করে মাত্র একটি অতি সাধারণ বয়ানে পুরস্কারটি ঘোষণা করা হয়ঃ "আলোক-তড়িৎ বিধি (বিকিরণের কণিকাবাদ) এবং তত্ত্বীয় পদার্থবিজ্ঞানের অন্যান্য ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য কাজের জন্য আইনস্টাইনকে পুরস্কারে ভূষিত করা হল।"

এতো করেও সুইডিশ অ্যাকাডেমি আত্মরক্ষা করতে পারলেন না। কালবিলম্ব না করে অ্যাকাডেমির কাছে তীব্র ও তীক্ষ্ণ প্রতিবাদবার্তা পাঠালেন লেনার্ড।

অমিত অর্থের এই পুরস্কারের অর্ধেক টাকা আইনস্টাইন মিলেভাকে দিলেন। দুই ছেলে নিয়ে তাঁর সংসার যাতে স্বাচ্ছন্দ্যে চলে এই উদ্দেশ্যে। এবং বাকি অর্ধেক দান করে দিলেন।

জার্মানীতে ফিরে আইনস্টাইন বিজ্ঞান বিষয়ক সমস্যার উপর জনপ্রিয় বক্তৃতায় এবং অন্যান্য সাধারণ বিষয়ে আগের চেয়ে অনেক বেশি সময় দিতে লাগলেন। এ সব বক্তৃতায় প্রচণ্ড ভিড় হত।

এ সময় একদিন খবরের কাগজে একটা সংবাদ দেখে আইনস্টাইন হকচকিয়ে গেলেন। তিনি নাকি সেপ্টেম্বরের শেষে মস্কো যাচ্ছেন। রিলেটিভিটির উপর বক্তৃতা করতে। খবরটি ডাহা মিথ্যে। তিনি না পেয়েছেন কোন আমন্ত্রণ, না ছিল তাঁর রাশিয়া যাওয়ার ইচ্ছে।

অক্টোবরে মিথ্যে সংবাদটির পুনরাবৃত্তি ঘটল। জানান হল, তিনি মস্কো রওনা হয়ে গেছেন।

দু' সপ্তাহ পরে আবার সংবাদ! তিনি শীগগিরই পেট্রোগ্রাড (বর্তমান লেনিনগ্রাড) পৌঁছচ্ছেন।

আরো এক হপ্তা পরে বলা হল, তিন দিন ধরে তিনি পেট্রোগ্রাডে রয়েছেন।

এভাবে তিনি এমন একটি দেশে 'অলীক ভ্রমণ' সেরে নিলেন যে দেশ জীবনে কখনও দেখেন নি। কিন্তু ব্যাপারটি ছিল পাকা মাথার ফসল। খবরটির ফলে তিনি 'বলশেভিক' অপবাদে হত্যার হুমকি সহ বহু চিঠি পেতে লাগলেন।

দান-সংগ্রহের জন্য আইনস্টাইন এ সময় কনসার্টেও অংশ নিতেন। এ রকম এক কনসার্টে অর্থসংগ্রহের উদ্দেশ্য তিনি একবার মধ্য-জার্মানীর এক শহরে যান। কোন এক সংবাদপত্র জনৈক অনভিজ্ঞ যুবক-সাংবাদিককে ঘটনা রিপোর্ট করতে কনসার্টে পাঠান।

সাংবাদিক ভদ্রলোক পাশে-বসা এক ভদ্রমহিলাকে জিজ্ঞাসা করলেন—"আচ্ছা, আজ রাতে যিনি বাজাচ্ছেন এই আইনস্টাইন ভদ্রলোকটি কে?"

"হায় ভগবান, তা-ও জানেন না? ইনি হলেন সেই বিখ্যাত আইনস্টাইন।"

"আচ্ছা? তাই নাকি?"—ব্যস্তভাবে নোট লিখতে লিখতে উত্তর করলেন যুবক রিপোর্টার।

পরদিন তাঁর কাগজে খবর বের হল—"মহান সংগীতজ্ঞ আলবার্ট আইনস্টাইনের সার্থক আবির্ভাব!" তাঁকে আখ্যা দেওয়া হল 'a musical celebrity' এবং অদ্বিতীয় 'violin virtuoso'।

খবরটি পড়ে হ্যাবারল্যাণ্ডস্ট্রাসের বাড়িতে হাসির ধুম পড়ে গেল। সবচেয়ে বেশি হাসলেন আইনস্টাইন স্বয়ং। তিনি সযত্নে রিপোর্টটি কেটে রাখলেন। পরে পরিচিতদের দেখিয়ে প্রায়ই মন্তব্য করতেন —"তোমরা ভাব আমি একজন বিজ্ঞানী। হাঃ হাঃ হাঃ! আমি হলাম গিয়ে একজন বিখ্যাত বেহালাবাদক—fidler। ঠিক, এই-ই হলাম আমি।"

ডাভোস এবং সুইজারল্যাণ্ডেও আইনস্টাইন কয়েকবার এলেন। এখানে আরোগ্যনিকেতনে অসুস্থ ছাত্রদের রাখা হত এবং তিনি ঐসব ছাত্রদের কাছে লেকচার পড়তেন ও তাদের মনোরঞ্জনের জন্য বেহালা বাজিয়ে শোনাতেন। ১৯২৭ সালে একবার এখানে তিনি নিজেই রোগী হতে বাধ্য হলেন। সে সময় তিনি কাপুথ-এ ভাড়া বাড়িতে থাকতেন এবং বৈঠা টেনে কাপুথের হ্রদে হাউসবোট চালাতেন। ফলে তাঁর হৃদ্‌যন্ত্রের প্রসারণ ঘটিত রোগ (dilation of heart) দেখা দেয়। ডাভোসের হোটেলে তিনি এক বুড়ো পোর্টারকে কিছুতেই সাহায্য করতে না দিয়ে নিজেই সুটকেশ বয়ে সিঁড়ি দিয়ে ওপরে ওঠেন। পরিশ্রমের বাড়াবাড়িতে হার্টের অবস্থা খারাপ হয়ে পড়ল এবং কিছু দিনের জন্য তিনি শয্যা নিতে বাধ্য হলেন।

বার্লিনে ফিরে এলে ডাক্তার ডঃ প্লেখ তাঁকে পরীক্ষা করলেন। হৃৎপিণ্ডের পাশে ধমনীর দেয়ালে স্ফীতি ধরা পড়ল। ডাক্তারের পরামর্শে পূর্ণ বিশ্রাম নিতে সপরিবারে হামবুর্গের এক বাড়িতে এলেন। এখানেই বুদ্ধিমতী এলসা ঠিক করলেন যে, আর নয়। স্বামীকে যদি ঠিক মত কাজ চালিয়ে যেতে হয় তা হলে উপযুক্ত একজন সাহায্যকারীর প্রয়োজন। ১৯২৮ সালের ১৩ই এপ্রিল তিনি ফ্রাউ হেলেন ডুকাস-কে এই কাজের জন্য মনোনীত করলেন। আইনস্টাইনের মৃত্যুকাল পর্যন্ত ইনিই ছিলেন তাঁর সুযোগ্যা একান্ত সচিব। এঁর সম্পর্কে বিজ্ঞানী ওপেনহাইমার-এর সশ্রদ্ধ উক্তি: "তাঁর সচিবের জীবনও ছিল চমৎকার। এক মুহূর্তও তিনি মহৎ ভাবনা ও রসিক বৃত্তি ছাড়া থাকতে পারতেন না।" এখনও বেঁচে আছেন মহিলা, অশীতিপরা বৃদ্ধা। আছেন আর এক অশীতিবর্ষীয়ার সঙ্গে—আইনস্টাইনের সৎ মেয়ে মার্গট। দু'জনে একসঙ্গে থাকেন, প্রিন্সটনের সেই ১১২ নম্বর মার্সার স্ট্রিটের বাড়িতে। ডুকাস এখনও যেন আইনস্টাইনের ব্যস্ত সেক্রেটারী—ব্যস্ত তাঁর লেখা, চিঠি, বক্তৃতা আর পত্র-পত্রিকা নিয়ে।

১৯২৯। আইনস্টাইনের পঞ্চাশতম জন্মদিন ( ১৪ই মার্চ ) আগত-প্রায়। দিন যত এগিয়ে এল, আইনস্টাইন ততই রিপোর্টার আর ফোটোগ্রাফারে অবরুদ্ধ হতে লাগলেন। তাঁদের হাত থেকে পরিত্রাণ পেতে জন্মদিনের কয়েকদিন আগে তিনি বাড়ি ছাড়লেন। বার্লিনের কাছে এক হ্রদের তীরে ডাক্তার প্লেখের ছোট্ট একটা সুন্দর ভিলায় আশ্রয় নিলেন। শুধু পরিবারের লোকজন নিয়ে জন্মদিন পালিত হল। আইনস্টাইন সেই পুরনো ট্রাউজার্স আর সোয়েটার পরে দিনটি কাটিয়ে দিলেন। এলসা ও মেয়েরা নিয়ে এলেন হলি-ডে ডিনার। তাতে ছিল তাঁর প্রিয় সব খাবার—নানারকম মাশরুম, জেফিল্টে মাছ, ভেজিটেবল স্টু, স্যালাড, ফল আর কেক। অসুখের পর আইনস্টাইন তখনও পুরো সুস্থ হয়ে ওঠেন নি। কাজেই কফি এবং ড্রিঙ্কসের কোন ব্যবস্থা ছিল না। আইনস্টাইন পা নামিয়ে ক্বচিৎ কখন পাইপ টানছিলেন। কিন্তু এলসা ধূমপান নিয়ে আপত্তি জানাচ্ছিলেন। যখনই এলসা জিজ্ঞাসা করছেন 'এ নিয়ে আজ ক'টা পাইপ টানলে ?', তখনই তাঁর সেই এক উত্তর : 'এই একটা'।

পঞ্চাশ বছর পূর্তি উপলক্ষে প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে অনারারি ডক্টরেট উপাধি দিল, জার্মানীর চ্যান্সেলার হেরমান ম্যুলার তাঁকে জার্মানীর মহান সেবক বলে সম্মান জানালেন, প্যালেস্টাইনে তৈরি হল আইনস্টাইন উপবন। উপহারে, কবিতায়, পুষ্পস্তবকে আর টেলিগ্রামে টেলিগ্রামে বার্লিনের বাড়ি ছয়লাপ। এর মধ্যে একটি বিশেষ উপহার আইনস্টাইনের দৃষ্টি আকর্ষণ করল। সেটি হল জার্মান-শ্রমিকদের পাঠানো এক আউন্স তামাক, সঙ্গে একটা চিরকুট—Relatively small but gathered in good field ( আপেক্ষিকভাবে কম কিন্তু ভাল ক্ষেত্রে সংগৃহীত )। ১৯২৯ সালের গোড়ার দিকে প্রাশিয়ান অ্যাকাডেমি থেকে তাঁর একীভূত ক্ষেত্রতত্ত্বের ( Unified field theory-র ) প্রথম ভাষ্য প্রকাশিত হয়। উপহারটি প্রতীকে তাই জানাচ্ছে। অন্যদিকে আপেক্ষিকতা বিরোধী চক্র এ উপলক্ষে একটা

বই প্রকাশ করলেন—Hundred Authoren gegen Einstein। 'আইনস্টাইনের বিরুদ্ধে শত গ্রন্থকার'। আইনস্টাইন মন্তব্য করলেন —"আমি যদি ভ্রান্ত হই তবে একজনই ত যথেষ্ট।"

পঞ্চাশ বছর পূর্তি উপলক্ষে বার্লিন পৌরসভা আইনস্টাইনকে একটি 'বাড়ি' উপহার দেয়ার সঙ্কল্প করেন। কিন্তু ভারপ্রাপ্ত অফিসারেরা বড় দায়িত্বজ্ঞানহীনভাবে গোটা ব্যাপারটা পরিচালনা করলেন। আইনস্টাইন নৌকো চালাতে ভালবাসতেন বলে লেকের ধারে একটা বাগানবাড়ি নির্বাচন করা হল। খবরের কাগজে ছবিও বের হল—'আইনস্টাইন ভবন'। কিন্তু এলসা খোঁজ নিতে গিয়ে দেখেন, বাড়িতে অন্য লোক এবং এমন কি আইনস্টাইনের খাতিরেও তাঁরা উঠে যেতে রাজি নন। তারপর দু-দুবার তাঁকে এমন এক খণ্ড করে জমি দেখান হল যার ওপর কাউন্সিলের কোন কর্তৃত্বই নেই। শেষে পছন্দসই একটা প্লট বেছে নিতে আইনস্টাইনকেই তাঁরা অনুরোধ করলেন। পটস্‌ডামের কাছে কাপুথ গ্রামে এলসা একটা প্লট ঠিক করলেন। জমির মালিকের সঙ্গে চুক্তি হল, এবং বাড়ি তৈরির জন্য স্থপতি ও গৃহনির্মাতাদের আমন্ত্রণ জানান হল। ইতিমধ্যে জাতীয়তাবাদী সদস্যেরা জমি-কেনার ব্যাপারটা মিউনিসিপ্যাল কাউন্সিলে চ্যালেঞ্জ করলেন। ফলে সব কিছু আটকে গেল। ক্রমে গোটা ব্যাপারটা কেলেঙ্কারির পর্যায়ে চলে গেল। আইনস্টাইন তখন ধৈর্যের শেষ সীমায়! তিনি প্রস্তাবিত দানগ্রহণে সরাসরি অস্বীকার করলেন। ঐ মর্মে মিউনিসি-প্যাল কাউন্সিলকে চিঠিও লিখে পাঠালেন।

"প্রিয় মেয়র মহোদয়,

"মানুষের জীবন ক্ষণিকের। এদিকে কর্তৃপক্ষমহল কাজকর্ম করেন বড় ঢিমেতালে। কাজেই আপনাদের কাজকর্মের ধরনধারণের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেয়ার পক্ষে, আমি মনে করি, আমার জীবন বড়ই ক্ষণস্থায়ী। আপনাদের সৌহার্দ্যপূর্ণ ইচ্ছার জন্য অনেক অনেক

ধন্যবাদ। এখন ত আমার জন্মদিন পেরিয়েই গেছে। কাজেই আপনাদের দান গ্রহণ করা থেকে অনুগ্রহ করে আমায় মুক্তি দিন।"

ওদিকে আগের কথামতো বাড়ি তৈরি শুরু হয়েছে। বাড়ি ও জমি দুয়ের জন্যই আইনস্টাইনকে অকাতরে অর্থ খরচ করতে হচ্ছে।

এ প্রসঙ্গে ফিলিপ ফ্রাঙ্ককে মিসেস আইনস্টাইন বলেন: "এভাবে অযথা আমরা পেয়ে গেলাম পছন্দসই নিজস্ব একটা সুন্দর বাড়ি। জলের ধারে, জঙ্গলের মধ্যে। অবশ্য এজন্য সঞ্চয়ের সবটাই ব্যয় হয়ে গেল। টাকা-পয়সা বলতে এখন আর কিছুই আমাদের অবশিষ্ট নেই। আছে শুধু এই একখণ্ড জমি আর সম্পত্তি। তবে এগুলো লোককে অনেক নিরাপত্তা-বোধ এনে দেয়।"

কাপুথের শান্ত গ্রামটি ছিল জঙ্গলে-ঘেরা ছোট্ট একটা পাহাড়ের উপর। বাড়িটি গ্রামের বাইরে, লেক হাভেল থেকে হাঁটাপথে মাত্র কয়েক মিনিট। অদূরে ঘাটে নোঙর-বাঁধা জন্মদিনে পাওয়া তাঁর ছোট্ট প্রমোদ নৌকো—Tummler। চারপাশে স্নিগ্ধ হাওয়ায় ভরপুর শান্ত গ্রামীণ দৃশ্যাবলীর হাতছানি। ১৯৩০ সালে আইনস্টাইন তাঁর কাপুথের বাড়িতে গৃহপ্রবেশ করেন। তারপর এখানে এলেন একের পর এক বহু জ্ঞানীগুণী। ১৯৩০ এর ১৪ই জুলাই এলেন ভারতভাস্কর রবীন্দ্রনাথ।

বিজ্ঞানের স্বরাটের সঙ্গে সাহিত্য-সার্বভৌমের ঐতিহাসিক আলোচনা হল। একই সোফায় মুখোমুখি বসে দুই মনীষী আলোচনা করলেন সত্য ও সুন্দর নিয়ে, আকস্মিকতার জগতের দ্বৈত অস্তিত্বের রূপ আর বিরোধ নিয়ে। উভয়ের এই কথোপকথন Rabindranath-Einstein News নামে Asia পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। প্রকাশিত হয় American Hebrew পত্রিকাতেও, সেপ্টেম্বর ১১, ১৯৩১। সেখানে শিরোনামা ছিল "আইনস্টাইন ও রবীন্দ্রনাথ—শান্তির স্বপক্ষে এঁদের চেয়ে বড় বন্ধু নেই"। পরের বছর ১৯৩১। রবীন্দ্রনাথের

সপ্ততিতম জন্মদিন। এই উপলক্ষে রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় 'The Golden Book of Tagore' প্রকাশিত হয়। এতে রবীন্দ্রনাথকে শ্রদ্ধা জানিয়ে আইনস্টাইনের একটা লেখা আছে—"পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে সুন্দর মানুষ হলেন বিখ্যাত বাঙালী কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। সমুন্নত দেহ ও উন্নত মনের অধিকারী এই ভারতীয় দার্শনিকের তুল্য প্রতিভা আমি দেখতে পাইনে। তাঁকে মনে হয়েছিল তিনি একাধারে কবি ও ঋষি। নিঃসন্দেহে সর্বকালের, সর্বদেশের জনগণ-মন-অধিনায়ক।

রবীন্দ্রনাথ-আইনস্টাইন কথোপকথন বিষয়টি রবীন্দ্রনাথের নিজের কথায়ই বলা যাক:

"প্রথম মহাযুদ্ধের পর জার্মানীতে গিয়ে আইনস্টাইনের সঙ্গে আমার দেখা। মনে পড়ে আধুনিক জীবনযাত্রার মান-উন্নয়নে যন্ত্রশিল্পের উপযোগিতা সম্পর্কে আমাদের আলাপ হয়েছিল। তখন আমি বলেছিলাম আর আজও আমি বিশ্বাস করি, যন্ত্রবিদ্যার এই উন্নতি আসলে আমাদের শারীরিক কল্যাণ বিধানের অনুকূল। বিশেষত এই উন্নতির প্রতিরোধ যখন অসম্ভব তখন প্রয়োজনের তাগিদে মানুষের বিদ্যাবুদ্ধি জীবনে যে সুবিধার সৃষ্টি করেছে, তার সুচিন্তিত সদ্ব্যবহার করাই ত আমাদের কর্তব্য। সভ্যতার যে স্তরে মানুষ আজ উন্নীত তাতে যেমন আঙুলে জমি আঁচড়ে চাষ করার কথা ভাবা যায় না, তেমনি হস্তপদ, জ্ঞানেন্দ্রিয়, কর্মেন্দ্রিয় যেখানে পরাজিত, আমাদের বুদ্ধিবৃত্তি যন্ত্র সৃজন করে সেখানে আমাদের অক্ষমতা ঘুচিয়ে চলেছে। আইনস্টাইন আর আমার মধ্যে এ বিষয়ে সম্পূর্ণ মতের মিল হল যে, নতুন যন্ত্র আবিষ্কারের সাহায্যে প্রকৃতির অফুরন্ত ভাণ্ডার থেকে আমাদের জীবনযাত্রার সম্পদ আহরণ করতে হবে।

"গত বছরের গ্রীষ্মে আবার জার্মানীতে যাই, বার্লিনের অদূরে Kaputh-এ (কাপুথ) আইনস্টাইনের নিজের বাড়িতে গিয়ে দেখা করার আমন্ত্রণ পেলাম। দুদিন আগে অক্সফোর্ডে হিবার্ট বক্তৃতা-

মালায় যা বলেছিলাম, তা The Religion of Man নাম দিয়ে পুস্তকের আকারে গ্রথিত করতে তখন ব্যস্ত ছিলাম, সেই ভাবনায় আমার মন তখন ভরপুর। আইনস্টাইনের সঙ্গে আলাপের সূত্রপাতেই বুঝলাম যে, তিনি ধরে নিয়েছেন 'আমার বিশ্ব' মানবিক ধ্যানধারণা দিয়ে সীমাবদ্ধ বিশ্ব। এদিকে তাঁর দৃঢ় প্রতীতি এই যে, মানুষের মন-বুদ্ধির বাইরেও আছে এক সত্য। আমার বিশ্বাস, ব্যষ্টি-মানব ঐক্যসূত্রে বাঁধা সেই দিব্য-মানবের সঙ্গে, যিনি আমাদের অন্তরে, আবার বাইরেও। অনন্তের ভূমিকায় বিরাজিত মানুষ, সেই অনন্ত মূলত মানবিক। আমাদের ধর্মসাধনা নয় বিশ্বভৌমিক, আমাদের যে সজীব ব্যষ্টিসত্তা নিয়ে তার করণ-কারণ, তার কাছে শুভাশুভের আদর্শ-ভাবনা। স্বভাবের মধ্যে ওই প্রকার শুভাশুভের নীতি বা নন্দনীয়তা বিজ্ঞানের স্বীকার্য নয়। নিরাবরণ, নিরাভরণ 'অস্তি' নিয়েই তার কারবার। বিজ্ঞানে ব্যক্তিসত্তার কোন উপযোগিতা নেই। অথচ, অধ্যাত্মপথে বা ধর্মসাধনায় নিছক বাস্তব তথ্য বা তৎ-সম্পর্কিত তত্ত্ব কোন কাজে লাগে না।

"একক নিঃসঙ্গ মানুষ বলে আইনস্টাইনের খ্যাতি আছে। তুচ্ছাতিতুচ্ছের ভিড় থেকে গাণিতিক ভাবনা ও দৃষ্টি মানুষের মনকে মুক্তি দেয় যেখানে, সেখানে তিনি একক বই কি। তাঁর জড়বাদকে তুরীয়ই বলা চলে। দার্শনিক ধ্যান-ধারণার সীমান্তচুম্বী সীমাবদ্ধ অহমের জটিল জাল থেকে, জগৎ থেকে, নিঃসম্পর্ক মুক্তি হয়তো সেখানে সম্ভবপর। আমার কাছে, বিজ্ঞান এবং আর্ট দুটিই মানুষের স্বরূপ-প্রকৃতির প্রকাশ, জৈবিক প্রয়োজন-অপ্রয়োজনের বাইরে, আর আপনাতেই আপনার তার অপরিসীম এক সার্থকতা আছে।"

রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, সত্যের প্রকাশ মানুষের ভেতর দিয়ে। আর আইনস্টাইনের বক্তব্য ছিল, সত্যকে গ্রহণ করতে হবে মানুষ নির্বিশেষে প্রতিষ্ঠিত সত্য হিসেবে। সম্পূর্ণ কথোপকথনটি এই রকম :

আইনস্টাইন—সৃষ্টি থেকে বিচ্ছিন্ন ভাগবতী-সত্তায় আপনার বিশ্বাস

আছে কি ?

রবীন্দ্রনাথ—বিচ্ছিন্ন নয়। মানুষের অপ্রমেয় সত্তায় নিখিল বিশ্বের ধ্যান ও ধারণা। মানুষীসত্তায় গৃহীত হতে পারে না এমন কিছুই ত দেখা যায় না। কাজেই বিশ্বের যা সত্য তা মানবসত্য। একটি বৈজ্ঞানিক দৃষ্টান্ত দিয়ে আমার বক্তব্যটি পরিস্ফুট করা যাক। জড়পদার্থ যেসব প্রোটন ও ইলেকট্রনে গড়া তার মাঝে মাঝে অবকাশ আছে। কিন্তু জড়বস্তু তবু ফাঁপা দেখায় না, কঠিন ও সংহত বলে মনে হয়। তেমনি অগণ্য ব্যষ্টির সমাবেশে সমষ্টিমানব। মানবিক সম্পর্কের প্রসাদে তারা পরস্পর যুক্ত, আর সেই কারণে মানুষের সংসার একটি জীবন্ত সংহতি। এ হল মানবিক ভুবন। আমার এ ভাবনা-সূত্রের সত্যতা ও সার্থকতা আমি দেখেছি সাহিত্যে, শিল্পে আর মানবজাতির অধ্যাত্মচেতনায়।

আ—বিশ্বসৃষ্টি সম্পর্কে সম্পূর্ণ পৃথক দুটি ধারণা রয়েছে। (১) সৃষ্টি হল মানবনির্ভর একটি সংহতি, আর (২) সৃষ্টির আছে একটি মানব-অতিরিক্ত স্বতন্ত্র সত্তা।

র—আমাদের এ সৃষ্টি যখন মানুষের নিত্যসত্তার সুরে বাঁধা থাকে তখনই শুধু তাকে আমরা সত্য বলে জানি, সুন্দর বলে বোধ করি।

আ—সৃষ্টি সম্পর্কে এটি একটি 'নির্ভেজাল' মানুষী ধারণা।

র—অন্যরূপ ধারণার সম্ভাবনা কোথায়? এ বিশ্বভুবন যে মানবিক বিশ্বভুবন। বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি পর্যন্ত বিজ্ঞানী মানুষের দৃষ্টি। বিচার এবং বোধের একটি কোন নীতি অনুযায়ী তার সত্যতা, নিত্য-মানবেরই সেই নীতি। নিত্য-মানবের জীবন আমাদের প্রত্যেকের জীবন।

আ—এ হল মানবিক সত্তার আত্ম-আবিষ্কার।

র—হাঁ, নিত্য-মানবসত্তার। আমাদের আবেগ-অনুভূতিতে তার অনুভব, কর্মের ভেতরে ভেতরে তার ক্রিয়া। আমরা জানি সেই পরাৎপর মানব ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে প্রকাশিত, অথচ সব রকম ব্যক্তিত্বের সীমার অতীত। বিজ্ঞানের বিষয় হল তা-ই যা ব্যক্তিগত

নয়। নৈর্ব্যক্তিক মানবভুবনের সত্যই তার সত্য। ধর্মসাধনার পথে এ সত্য আমাদের সত্তার গূঢ় গভীর প্রয়োজনের সঙ্গে সমন্বিত হয়ে থাকে। সত্য সম্পর্কে আমাদের ব্যক্তিগত ধারণা ও উপলব্ধি একটি সার্বভৌমিকতায়, সার্বজনীনতায় উত্তীর্ণ হয়ে যায়। অধ্যাত্মদৃষ্টিতে সত্যের বিশেষ মূল্য বা তাৎপর্য আছে, নিজেকে সত্যের সঙ্গে সুরে বেঁধে সত্যকেই কল্যাণ বলে জানা যায়।

আ—সত্য ও সুন্দর তবে ত মানব-অতিরিক্ত নয়।

র—না।

আ—সৃষ্টি থেকে মানুষ যদি লোপ পেয়ে যায়, অ্যাপোলো মূর্তির সৌন্দর্য বা অপরূপতাও কি তা হলে সেই সঙ্গে লোপ পাবে?

র—হ্যাঁ।

আ—সুন্দর সম্পর্কে এ উক্তি আমি মেনে নিই, কিন্তু সত্য সম্পর্কে না।

র—নয় কেন? মানুষের ভেতর দিয়েই ত সত্যের ধ্যান-ধারণা।

আ—আমার বিশ্বাসের অনুকূলে আমি কোন প্রমাণ দিতে পারিনে, তবু এ বিশ্বাসই আমার ধর্ম।

র—একদিকে পরিপূর্ণ সমন্বয় বা সঙ্গীতির যে রূপকল্প বিশ্বসত্তায় উদ্ভাসিত, নিখিল সৌন্দর্যের সেই হেতু, অন্যদিকে বিশ্বমনের নিখুঁত ও সম্পূর্ণ যে ধারণা, তার নামই সত্য। মনে মনে আমরা ব্যক্তিগত ভুল-ভ্রান্তির ভেতর দিয়ে, সঞ্চীয়মান অভিজ্ঞতার সাহায্যে, ব্যক্তিচৈতন্যের আলো জ্বেলে ঐ সত্যের দিকে অগ্রসর হই। সত্যকে জানবার অন্য উপায় কি আছে?

আ—বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতিতে প্রমাণ করতে পারিনে যে, মানুষকে বাদ দিয়েও সত্য থাকে এমনিভাবে সত্যকে ধারণা করা চাই। তবু এর অনুকূলেই আমার সুদৃঢ় প্রতীতি। দৃষ্টান্ত দিয়ে বলা যায়, জ্যামিতিতে পীথাগোরাসের উপপত্তি এমন একটি তত্ত্বকে উপস্থিত করে, যা বিশ্বসংসারে মানুষ থাক বা না থাক সত্য হতে বাধা নেই। মোট

কথা, মানুষ থেকে স্বতন্ত্র কোন 'সং' যদি না থাকে, তবে তেমন 'সত্য'ও কিছু নেই।

র—সত্য আর বিশ্বসত্তা একই, সেটি হল মানবিক। না হলে ব্যক্তিগত হিসেবে সত্য বলে যা কিছু জানছি তার সত্যতা কোথায়? অন্তত বৈজ্ঞানিক সত্যে উপনীত হতে গেলে ত যুক্তিবিচার অপরিহার্য, অর্থাৎ মানবিক মনের মধ্যস্থতা অস্বীকার করা যায় না। ভারতীয় দর্শনশাস্ত্র বলে, ব্রহ্মই নির্বিশেষ সত্য। ব্যক্তিমন তাকে আলাদা করে ধারণা করতে অক্ষম। বাক্যে তার বর্ণনা হয় না, কেবল তার আনন্দে নিজেকে সম্পূর্ণ হারিয়ে ফেলে ব্যক্তি তাই হতে পারে। কিন্তু এ সত্য ত বিজ্ঞানের এলাকায় নেই। আমরা আলোচনা করছি প্রতীয়মান সত্য নিয়ে—মানুষের মনের কাছে যার সত্যতা, অতএব যা মানবিক, যাকে আমরা মায়াও বলি।

আ—তা হলে আপনার মতে, অথবা ভারতীয় মতে, এ 'মায়া' বা 'স্বপ্ন' ব্যষ্টিমনের নয়, সমগ্র মানবজাতির?

র—বিজ্ঞানের পদ্ধতি হল এই যে, ব্যক্তিগত সীমা ও সঙ্কীর্ণতা, ত্রুটি ও ভ্রান্তি বাদ দিতে দিতে বিশ্বমানবের মনে সত্যের যে ধারণা সম্ভব সেদিকেই আমরা যেতে চাই।

আ—সমস্যা ত এখানে, সত্য আমাদের জ্ঞান বা চেতনা-নিরপেক্ষ কিনা।

র—আমরা যাকে সত্য বলি, সে হল সং-বস্তুর ব্যক্তিগত আর বিষয়গত দুটি দিকের যুক্তিযুক্ত একটি সমন্বয়ে বা সঙ্গতিতে। তার যথার্থ স্থান ব্যক্তি-অতীত মানবে।

আ—আমাদের দৈনন্দিন জীবনে, আমাদের ব্যবহারের জিনিস-গুলোতেও, মানুষ-নিরপেক্ষ একটি বাস্তবতা আমরা স্বীকার না করে পারিনে। আমাদের ইন্দ্রিয়ের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতাকে যুক্তিসিদ্ধ একটি সম্পর্ক ও শৃঙ্খলায় বাঁধতে হলে এটি দরকার। ধরুন, বাড়িতে কেউ রইল না, তবু ঘরের টেবিল ত ঘরেই থাকবে।

র—হাঁ। ব্যক্তিমনের বাইরে পড়ে রইল টেবিলটা, বিশ্বমানব-মনের বাইরে নয়। আমার জ্ঞানগোচর টেবিলটা আমার জ্ঞানের প্রকৃতির ওপর নির্ভরশীল।

আ—মানুষ-নিরপেক্ষ সত্য সম্পর্কে মানুষের সহজ স্বাভাবিক ধারণাটি ব্যাখ্যা করা যায় না, প্রমাণ করা যায় না, মানি। তবু এটি সব মানুষেরই ধারণা, আদিবাসীরাও বাদ যান না। সত্যে মানব-অতিরিক্ত বাস্তবতা আমরা অবশ্যই কল্পনা করি। আমাদের অস্তিত্ব, আমাদের অভিজ্ঞতা, আমাদের মন—এ সবের অতীত একটি সত্যবস্তু না হলে আমাদের চলে না—কেন, কী অর্থে, তা অবশ্য বলা যায় না।

র—বিজ্ঞান প্রমাণ করেছে, টেবিলটা যে একটা কঠিন পদার্থ এটা ইন্দ্রিয়ের অনুমান মাত্র। মানুষের মন যদি না থাকে, মানুষের মনের ধারণায় ধরা সাধারণ টেবিলটাও থাকে না। কী থাকে? এটাও ত বলতে হবে, ও যে কেবল অচিন্ত্যবেগবান ইলেকট্রন-প্রোটনপুঞ্জের ঘূর্ণাবর্ত, টেবিল সম্পর্কে, তার 'শেষ সত্য' সম্পর্কে এ অসাধারণ ধারণাটিও মানবমনের সৃষ্টি। সত্যের অবধারণ ব্যাপারে বিশ্বমানব মন আর ব্যক্তিতে-বদ্ধ মন—এ দুয়ের একটি চিরদ্বন্দ্ব আছে। তারই চির-সমাধান হয়ে চলেছে মানুষের বিজ্ঞানে, দর্শনে আর ধর্মনীতিতে। সে যা হোক, একেবারেই মানুষের কোন অপেক্ষা নেই এমন কোন সত্য-বস্তু যদিও বা থাকে, আমাদের কাছে তা একেবারেই না-থাকা।

এমন মনের কল্পনা করা কঠিন নয়, যার সামনে বস্তুপারম্পর্য নেই দেশ জুড়ে, আছে কেবল ঘটনা-পরম্পরা, কালের ভেতরে। স্বরের বিন্যাস যেমন সঙ্গীতে। এমন মনে সত্যের সত্যতাবোধ সুরের বোধের সঙ্গে তুলনীয়। সেখানে পীথাগোরীয় জ্যামিতির কোন অর্থই থাকে না। কাগজের বাস্তবতা আর কাগজে ছাপা সাহিত্য-বস্তু —দুয়ের মধ্যে অপরিসীম ব্যবধান। গ্রন্থকীট কাগজ বা বই পুরোপুরি চিবিয়ে খেলেও সাহিত্যের অস্তিত্ব তার কীট-মনের কাছে কোনখানে

নেই। অথচ মানুষের মনের কাছে ত কাগজের তুলনায় (হরফেরও তুলনায়) সাহিত্য শতগুণ বেশি করে আছে। তেমনি, মানুষের মনের কাছে, ইন্দ্রিয়প্রত্যক্ষ হিসাবে হোক আর যুক্তিপ্রমাণসিদ্ধ ধারণারূপে হোক, গোচর-নয়-এমন কোন সত্য থাকলেও সে নেই যতক্ষণ আমরা মানুষ আছি।

আ—তা হলে দেখছি, আস্তিক্যবুদ্ধি ত আপনার চেয়ে আমারই বেশি।

র—আমার ব্যক্তিসত্তা ব্যক্তি-অতীত মানবে, শাশ্বত মানবে মেলান। এ নিয়েই আমার আস্তিক্যবুদ্ধি বা অধ্যাত্মবিশ্বাস। একেই আমি 'মানুষের ধর্ম' বলে ব্যাখ্যা করেছি।

পরের আলোচনা আকস্মিকতার জগতের দ্বৈত অস্তিত্বের রূপ আর বিরোধ নিয়ে। রবীন্দ্রনাথের ধারণা, আকস্মিকতা আর পূর্ববিধান—এ দুয়ের চিরন্তন সঙ্গতিতে আমাদের জীবনলীলা চিরনবীন ও প্রাণবান। আর আইনস্টাইনের বিশ্বাস, আমরা যা কিছু করি বা যা কিছুর জন্য বেঁচে থাকি তা সব কার্যকরণের অধীন। তবে সব সময় সেটা যে চোখে পড়ে না, তা ভালই।

পূর্ণাঙ্গ কথোপকথনটি ছিল এই রকম:

র—আজ ডক্টর মেণ্ডেলের সঙ্গে গণিতশাস্ত্রের আধুনিকতম আবিষ্কার গুলো সম্পর্কে আলোচনা হচ্ছিল। এঁর মতে ক্ষুদ্রতম পরমাণুর জগতে আকস্মিকতারও স্থান আছে। জীবন-নাট্যের সব কিছু একেবারে পূর্ব-নির্ধারিত নয়।

আ—যে সব তথ্যের দরুন বিজ্ঞান এ মতের দিকে আকৃষ্ট হয়, তারা ত কার্যকারণবাদকে সম্পূর্ণ বিদায় দেয় না।

র—তা হতে পারে। কিন্তু মনে হয়, সৃষ্টির মূল উপাদানগুলোর মধ্যে কার্যকারণত্ব নেই। অন্য কোন শক্তি তাদের নিয়ে একটা সুশৃঙ্খল বিশ্বকে গড়ে তোলে।

আ—এ শৃঙ্খলা কেমন তা আমরা একটা উচ্চতর স্তর থেকে বুঝতে চেষ্টা করি। বড় বড় উপাদানগুলো পরস্পর মিলিত হয়ে জীবন বা অস্তিত্বকে যখন নিয়ন্ত্রিত করে, তখন আমরা শৃঙ্খলা দেখতে পাই। কিন্তু ক্ষুদ্রতম উপাদানগুলোর মধ্যে নেমে এলে এ শৃঙ্খলা আর অনুভব করা যায় না।

র—তা হলে, অস্তিত্বের গভীরতম এলাকায় এ দ্বৈততা আছে। একদিকে অসংযত আবেগ এবং অন্যদিকে যে ইচ্ছাশক্তি সেই আবেগকে পরিচালনা ক'রে সমস্ত বস্তুর মধ্যে একটা বিধিবদ্ধ ব্যবস্থা উদ্ভাবন করে—এ দুয়ে নিত্য বিরোধ চলছে।

আ—এরা যে পরস্পরবিরোধী এ কথা আধুনিক পদার্থবিজ্ঞান স্বীকার করে না। দূর থেকে দেখলে মেঘকে এক অখণ্ড সত্তা বলে মনে হয়। কিন্তু কাছে থেকে দেখলে বোঝা যায় যে, সেগুলো ইতস্তত বিক্ষিপ্ত বারিবিন্দু ছাড়া আর কিছু নয়।

র—মানুষের মনোরাজ্যেও এর তুলনা মেলে। আমাদের কামনা-বাসনাগুলো সব অসংযত, কিন্তু আমাদের চরিত্র তাদের সংযত করে একটা সুসঙ্গত সমগ্রতা দেয়। বস্তুজগতেও কি এমন কিছু ঘটে? উপাদানগুলো কি সব স্বৈরাচারী? তারা কি আপন আপন আবেগে চঞ্চল? সেগুলোকে শাসন ক'রে নিয়ন্ত্রিত বিধির মধ্যে রাখার মত কোন শক্তি জড়-জগতে আছে কি?

আ—উপাদানগুলোর মধ্যেও একটা সমষ্টিগত শৃঙ্খলার (statistical order) অভাব নেই। যেমন, রেডিয়মের বস্তুকণা কখনও তার আপন নিয়ম লঙ্ঘন করে না। চিরকাল সেগুলো একটা নিয়মে চলে এসেছে, ভবিষ্যতেও সে নিয়ম চলবে। উপাদানগুলোর মধ্যেও তা হলে একটা সমষ্টিগত শৃঙ্খলা রয়েছে।

র—তা না হলে জীবন-নাট্যপ্রবাহ নিতান্ত এলোমেলো ও খাপ-ছাড়া রকমের হত! আকস্মিকতা ও পূর্ববিধান—এ দুয়ের চিরন্তন সঙ্গতির ভেতর দিয়েই আমাদের জীবনলীলা চিরনবীন ও প্রাণবান

হয়ে ওঠে।

আ—আমার বিশ্বাস, আমরা যা কিছু করি বা যা কিছুর জন্য বেঁচে থাকি, সমস্তই কার্যকারণের অধীন। তবে আমরা সেটা সব সময় দেখতে পাই না। এবং তা ভালই।

র—তবে মানুষের জীবনে কিছুটা শিথিলতা, অল্প পরিসরের মধ্যে কিছুটা স্বাধীনতাও রয়েছে। আমাদের ব্যক্তিত্বের প্রকাশের জন্য সেটা প্রয়োজন। এ যেন কতকটা আমাদের ভারতীয় সঙ্গীত শাস্ত্রের মতো। পাশ্চাত্য সঙ্গীতের মত তা অত ধরাবাঁধার মধ্যে নেই। আমাদের সুরকারেরা মোটামুটি একটা কাঠামো ঠিক করে দেন। তার মধ্যে রাগ-রাগিনী ও তাল-মান-লয়ের একটা পরিষ্কার বিধান থাকে। তবে ঐ বিধানের মধ্যে গায়ক বা বাদক তাঁর অবস্থা ও প্রয়োজন অনুসারে এক-আধটু এদিক-ওদিক করতে পারেন। কোন রাগিনীবিশেষের নিয়মের মধ্যে তাঁকে অবশ্যই থাকতে হবে, কিন্তু তারপর তাঁর সঙ্গীতাবেগের একটা স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশ ঘটাতে কোন বাধা নেই। সুরের ভিত্তি এবং তার ওপর একটা কাঠামো খাড়া করে দেয়ার জন্য আমরা সুরকারের প্রতিভার তারিফ করি। কিন্তু গায়ক বা বাদকের কাছ থেকেও আশা করি রাগিনীর মধ্যে নানা সুচিক্কণ ও কারুকার্যের বৈচিত্র্য রচনার কলাকৌশল। সৃষ্টির মধ্যেও সমস্ত অস্তিত্বের কেন্দ্রগত নিয়ম আমরা মেনে চলি। তবে সৃষ্টি থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে না নিলে, আমাদের ব্যক্তিগত জীবনের স্বল্প পরিসরেও পরিপূর্ণ আত্মপ্রকাশের যথেষ্ট স্বাধীনতা থাকে।

আ—যেখানে সঙ্গীতের মধ্যে জনমত পরিচালনার জন্য বহুকালের আচরিত একটা শক্তিশালী শিল্প-সংস্কার থাকে এটা সেখানেই সম্ভব। য়ুরোপে সঙ্গীতশাস্ত্র জনসাধারণের শিল্প ও অনুভূতির রাজ্য থেকে অনেক দূরে সরে গেছে এবং স্বকীয় সংস্কার ও প্রথাগুলো নিয়ে অনেকটা গুপ্তশিল্পের মত হয়ে উঠেছে।

র—তাই আপনাদের অতি জটিল সঙ্গীতশাস্ত্রের কাছে পরিপূর্ণ নতি স্বীকার করতে হয়। আমাদের দেশে কিন্তু গায়কের যতখানি ব্যক্তিগত সৃজনীশক্তি থাকে ততখানি তার স্বাধীনতাও থাকে। যে সুরকারের সুরলহরীর রূপায়ণ করতে হবে, তার কোন রাগিনীর সাধারণ রূপের ব্যঞ্জনার মধ্যে নিজেকে স্রষ্টা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার শক্তি থাকলে গায়ক মূল সুরস্রষ্টার গান নিজের মত করেও গাইতে পারেন।

আ—অতি উচ্চাঙ্গের কুশলতা না থাকলে কোন সুরের অন্তর্নিহিত বিরাট ভাবটি এমনভাবে ধরা যায় না যাতে সে সুরের মধ্যে ইচ্ছামতো অদল-বদল করা চলে। আমাদের দেশে সুরের সব পরিবর্তন আগে থেকেই নির্দেশ করা থাকে।

র—নিজেদের আচরণে মঙ্গলের সমস্ত নিয়মগুলো মেনে চলতে পারলেই আমরা সত্যিকারের আত্মবিকাশের স্বাধীনতা পাই। আচরণের নিয়ম ত আছেই, কিন্তু যে চরিত্র সেগুলোকে যথার্থ ও প্রতিবিম্বিত করে তোলে, তা আমাদের নিজেদের সৃষ্টি। আমাদের সঙ্গীতেও এ স্বাধীনতা ও পূর্ববিধানের দ্বৈরাজ্য আছে।

আ—সঙ্গীতের 'কথা' সম্বন্ধেও কি স্বাধীনতা আছে? অর্থাৎ গান গাইবার সময় গায়ক কি ইচ্ছামতো সে গানে নিজের কথা জুড়ে দিতে পারেন?

র—হাঁ। বাংলাদেশে কীর্তন নামে এক ধরনের গান আছে। কীর্তন গাইবার সময় ইচ্ছে করলে কিছু কিছু নিজস্ব কথা জুড়ে দেয়ার স্বাধীনতা গায়কের থাকে। এর ফলে উচ্ছ্বাস অনেকখানি বেড়ে যায়। কারণ শ্রোতারা সব সময়েই গায়কের জুড়ে দেয়া একটা নতুন স্বতঃস্ফূর্ত মধুর ভাবাবেগে পুলকিত হয়ে ওঠেন।

আ—ছন্দের নিয়ম কি খুব কঠোর?

র—হাঁ, নিশ্চয়ই। ছন্দের মাত্রা একটুও অতিক্রম করার জো নেই। গায়ককে তার সমস্ত পরিবর্তনের মধ্যে নির্দিষ্ট তাল ও লয় মেনে

চলতে হবে। য়ুরোপের সঙ্গীতে লয় সম্পর্কে আপনাদের অপেক্ষাকৃত স্বাধীনতা আছে। কিন্তু সুর সম্বন্ধে নেই। ভারতবর্ষে সুর সম্বন্ধে কিছুটা স্বাধীনতা থাকলেও লয় সম্বন্ধে একেবারেই নেই।

আ—ভারতবর্ষীয় সঙ্গীত কি কথার সাহায্য না নিয়েও গাওয়া চলে? বিনা কথায় কি সঙ্গীত বোঝা যায়?

র—আমাদের এমন অনেক গান আছে যাতে কথার কোন অর্থই নেই। সেখানে কেবল ধ্বনিই সুরগুলোকে বহন করে। উত্তর-ভারতের সঙ্গীত একটা স্বতন্ত্র আর্ট। বাংলাদেশের সঙ্গীতের মতো ভাব ও ভাষাকে সুরে তর্জমা করা তার কাজ নয়। সে সঙ্গীত বড় সূক্ষ্ম ও জটিল। যেন একটা আলাদা সুর-জগৎ।

আ—সে সঙ্গীত কি বহুধ্বনিবিশিষ্ট ( polyphonic ) নয়?

র—যন্ত্র ব্যবহার করা হয় বটে, তবে তা সঙ্গতের জন্য নয়। তালের জন্য এবং সুরের ব্যাপ্তি ও গভীরতার জন্য। আপনাদের সঙ্গীতে সঙ্গতের চাপে সুর কি ক্ষুণ্ণ হয় না?

আ—হয় বৈ কি, খুব হয়। কখন কখন সঙ্গতে সুর একেবারে চাপা পড়ে যায়।

র—সঙ্গীতের সুর ও সঙ্গৎ চিত্রে রেখা ও রঙের মত। একটা সাধারণ রেখাচিত্র সর্বাঙ্গসুন্দর হতে পারে, কিন্তু তাতে রঙ লাগালে সেটা হয়ত অর্থহীন ও অস্পষ্ট হয়ে পড়ে। তবে রঙ যদি রেখাকে চাপা দিয়ে অস্পষ্ট না করে, তবে রেখার সঙ্গে মিশে মহান চিত্র সৃষ্টি হতে পারে।

আ—এটা ত বেশ চমৎকার তুলনা। রেখা রঙের চেয়ে অনেক প্রাচীনও বটে। মনে হয়, গঠনের দিক থেকে আপনাদের সুর আমাদের সুরের চেয়ে অনেক সমৃদ্ধ। অন্তত জাপানী সুরকে ত তাই মনে হয়।

র—আমাদের মনের উপর প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সঙ্গীতের প্রতিক্রিয়া বিশ্লেষণ করে দেখা শক্ত। পাশ্চাত্য সঙ্গীত আমার মনকে খুব নাড়া

দেয়। আমি বেশ অনুভব করি যে, সে সঙ্গীতের ঠাট যেমন বিশাল, তার রচনাও তেমনি উদার। সে সঙ্গীত মহীয়ান। আমাদের নিজেদের সঙ্গীত তার মূলগত গীতিধর্মিতার জন্য আমাকে মুগ্ধ করে। য়ুরোপের সঙ্গীতের ধরনটা মহাকাব্যের মত। এর পটভূমি বিশাল, ঠাট গথিক ধরনের।

আ—ঠিক, ঠিক, একেবারে ঠিক। আপনি য়ুরোপীয় সঙ্গীত প্রথম শুনেছিলেন কবে ?

র—যখন আমি প্রথম য়ুরোপে এসেছিলাম তখন আমার বয়স সতের। তখন থেকেই য়ুরোপের সঙ্গীতের সঙ্গে আমার নিবিড় পরিচয়। কিন্তু তার আগেও আমাদের বাড়িতে আমি পাশ্চাত্য সঙ্গীত শুনেছি। শোপাঁ (Chopin) এবং অন্যান্য সুরকারদের সঙ্গীত আমি ছেলেবেলাতেই শুনি।

আ—আমাদের সঙ্গীতে আমরা এত বেশি অভ্যস্ত যে, একটা কথা আমরা য়ুরোপীয়েরা ঠিক বুঝতে পারিনে। সেটা হচ্ছে এই যে, যে অনুভূতিকে আশ্রয় করে আমাদের সঙ্গীত রচিত হয়, তা কি কোন মৌলিক মানবীয় অনুভূতি ? নাকি এদেশের কোন প্রথাগত অনুভূতির ওপর আমাদের সঙ্গীত-সৌধটি নির্মিত ? যে সঙ্গৎ-অসঙ্গৎ আমাদের কানে লাগে, সেটা কি স্বাভাবিক না অভ্যাসজাত ?

র—পিয়ানোটা কেমন যেন আমি বুঝতে পারিনে। তার চেয়ে বেহালা আমার অনেক বেশি ভাল লাগে।

আ—যে ভারতবাসী যৌবনে কখন য়ুরোপীয় সঙ্গীত শোনেনি তার ওপর আমাদের সঙ্গীতের কেমন প্রতিক্রিয়া হয়, তা জানতে আমার ভারি আগ্রহ।

র—একবার আমি একজন ইংরেজ সঙ্গীতজ্ঞকে কোন উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত বিশ্লেষণ করে কোন্ কোন্ উপাদানের জন্য তার সৌন্দর্য— সে কথা আমায় বুঝিয়ে দিতে বলেছিলাম।

আ—মুশকিল হচ্ছে যে, প্রাচ্য বা পাশ্চাত্ত্য, যাই হোক না

কেন, সত্যিকারের ভাল সঙ্গীত বিশ্লেষণ করা যায় না।

র—ঠিক তাই। শ্রোতাকে যা গভীরভাবে স্পর্শ করে, তা তার নাগালের বাইরে।

আ—আমাদের অনুভূতিলোকের প্রতিটি মৌলিক বস্তুর ক্ষেত্রে সর্বদাই এ অনিশ্চয়তা থাকবে। কি য়ুরোপে, কি এশিয়ায়, কোন দেশের শিল্পসম্বন্ধীয় অভিজ্ঞতার মূলেও একই কথা। এমন কি, আপনার টেবিলের লাল ফুলটি আমাদের দু'জনের কাছে অভিন্ন না-ও হতে পারে।

র—তবু ব্যক্তিগত রুচি ও সার্বজনীন মাপকাঠি—এদের মধ্যে চিরকাল একটা সামঞ্জস্য বিধানের প্রক্রিয়া চলে আসছে।

১৯২৫ সালে আইনস্টাইনকে আমেরিকা যাওয়ার আমন্ত্রণ জানান বিজ্ঞানী মিলিকান। বিশেষ আপেক্ষিকতত্ত্ব তাঁর মোটেই পছন্দ ছিল না, যেমন ছিল না সে যুগের আরও অনেক বিজ্ঞানীর। এমন কি রিলেটিভিটিকে নস্যাৎ করার জন্য তিনি অনেক সাক্ষ্যপ্রমাণও জোগাড় করেছিলেন। কিন্তু কী আশ্চর্য! কাজের শেষে দেখলেন, তিনিই রিলেটিভিটির অন্যতম পৃষ্ঠপোষক—না, তার চেয়েও বেশি। আইনস্টাইনের ভক্ত! মিলিকানের ইচ্ছে, তাঁর ক্যালিফোর্নিয়া ইনস্টিটিউট অব্ টেকনলজিতে (বা সংক্ষেপে ক্যালটেকে) আইনস্টাইন যোগ দিন। মিলিকান ছিলেন ক্যালটেকের ডিরেক্টর। আইনস্টাইন যেতে কিছুটা রাজি হলেন, কিন্তু যাওয়া হয়ে ওঠেনি। ১৯২৭ এবং ১৯২৯-এ মিলিকান আবার আমন্ত্রণ জানালেন। পরের বছর ১৯৩০-এর ডিসেম্বর। মিলিকানের উৎসাহেই প্যাসাডেনার ক্যালিফোর্নিয়া ইনস্টিটিউট অব টেকনলজিতে ভিজিটিং অধ্যাপক হিসেবে আইনস্টাইন এক বক্তৃতামালা দেয়ার আমন্ত্রণ পেলেন। এবার আর অনুরোধ এড়াতে পারলেন না আইনস্টাইন। আশা করলেন, এ যাত্রায় নিছক বৈজ্ঞানিক বিষয়বস্তু নিয়েই আলোচনা হবে। আনুষ্ঠানিকতার

ঝামেলা আর পোহাতে হবে না। বিশের দশকে তত্ত্বীয় পদার্থ-বিজ্ঞানের বিকাশ, নিঃসন্দেহে, আলোচনার অনেক খোরাক জোগাবে।

কার্যক্ষেত্রে কিন্তু তা হল না। নিউইয়র্ক বন্দরে জাহাজ নোঙর করতেই শ'য়ে শ'য়ে রিপোর্টার উঠে এলেন জাহাজে। সব্বাই একসঙ্গে ঘিরে ধরলেন আইনস্টাইনকে। ব্যাপারটা বুঝে ওঠার আগেই তিনি জনৈক রিপোর্টারকে আধ-ঘণ্টার ইণ্টারভিউ মঞ্জুর করে বসলেন। এদিকে অন্যেরাও ক্রমাগত তাঁর ওপর প্রশ্নবাণ নিক্ষেপ করে চলেছেন।

"মাত্র একটা বাক্যে আপনি কি রিলেটিভিটি থিয়োরী ব্যাখ্যা করতে পারেন ?"—এবারেও জনৈক রিপোর্টারের ঐ এক প্রশ্ন।

চালু হল সেই বিখ্যাত গল্প। 'জ্বলন্ত স্টোভের ওপর এক সেকেণ্ড বসলে মনে হয় সে যেন অনন্তকাল ; আর মোহময়ী সুন্দরী মেয়ের সঙ্গে এক ঘণ্টা কাটালেও বোধ হয় এক মুহূর্ত'। দেশ-কাল-পাত্রে সময় পাল্টায়। সাংবাদিকেরা ত ভারি খুশি।

"আপনার বেহালাটি কোথায় ?"—আর একজন প্রশ্ন করলেন।

"ধর্ম কি শান্তির সহায়ক ?"—তৃতীয় সাংবাদিকের প্রশ্ন।

"এখনও পর্যন্ত নয়"—উত্তর দিলেন আইনস্টাইন।

"মানুষের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আপনার ধারণা কী ?"—আবার প্রশ্ন।

প্রশ্নের পর প্রশ্ন। অনেক···অনেক···অনেক প্রশ্ন। অপেক্ষারত ফটোগ্রাফারদের দেখে মন্তব্য করলেন—'More of the film-star treatment.'। ফোটোগ্রাফারেরাও বিন্দুমাত্র সময় নষ্ট করলেন না। পরদিন কাগজে আইনস্টাইনের বড় বড় সব ফোটো ছাপা হল। বিপন্ন, বিব্রত, কালো ওভারকোট পড়া, অবিন্যস্ত ঝাঁকড়া চুলের, কিছুটা ফ্যাকাশে একটি লোকের ফোটো। দেখে মনে হচ্ছে, যেন ক্যামেরার হাত থেকে কোন রকমে পালিয়ে বাঁচতে চাইছেন। নিউইয়র্কে আইনস্টাইন পাঁচ দিন রইলেন। কর্মসূচী বলতে একটানা সীমাহীন বক্তৃতা, অভ্যর্থনা, সাক্ষাৎকার আর প্রমোদভ্রমণ।

কিন্তু মাসখানেকের মধ্যে সত্যি ফিল্মস্টারের অভ্যর্থনা তিনি

পেলেন যখন হলিউডে এলেন। সেখানে চার্লি চ্যাপলিনের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হল। দুজনে একসঙ্গে ডিনার খেলেন। নিজের স্টুডিওতে নিয়ে গিয়ে চার্লি আইনস্টাইনকে তাঁর City Lights ছবিটি দেখালেন। শহরের ভেতর দিয়ে লিমুজিন গাড়ি চেপে যখন দুজনে যাচ্ছেন রাস্তার জনতা চীৎকার করে সোল্লাসে তাঁদের অভিনন্দিত করছিলেন। আইনস্টাইন বললেন—ব্যাপার কী! আলবার্টের দিকে তাকিয়ে মুচকি হেসে চার্লি মন্তব্য করলেন—You are being cheered because nobody understands you, and I'm being cheered because everybody understands me!"

এরই মধ্যে এক উদীয়মান শিল্পী আইনস্টাইনের স্কেচ এঁকে ফেললেন। আইনস্টাইন চেয়ারে বসে আছেন, বিজ্ঞানীসুলভ গম্ভীর ভারিক্কি চেহারা। খুশি হয়ে আইনস্টাইন তাতে সই দিলেন। শুধু সই নয়, তার ওপরে দু-লাইন সরস কবিতাও লিখলেন—

Diesse fette satte schwein
Soll Professor Einstein sein!

লাইন দুটোর অর্থ হল:

চেয়ারেতে শোয়া ঐ মোটাসোটা শোর।
প্রফেসর আইনস্টাইন, শিওর শিওর॥

এর মধ্যে একদিন আইনস্টাইন দম্পতি হাডসন নদীর মুখে রিভারসাইড চার্চটি দেখতে গেলেন। চার্চের প্রবেশদ্বারের ওপরে কেবল স্ট্যাচু আর স্ট্যাচু। মানবজাতির প্রাণভাণ্ডারে যাঁরা প্রাণশস্য সঞ্চয় করে রেখে গেছেন সর্বযুগ এবং জাতির সেই কীর্তিমানদের সব স্ট্যাচু। সংখ্যায় ছয় শ'। সবই মৃত ব্যক্তির। জীবিত লোকের স্ট্যাচু বলতে মাত্র একটি। সেটি আলবার্ট আইনস্টাইনের। বিদ্বজ্জনেরা সর্বসম্মতিক্রমে এটি তৈরি করিয়ে ওখানে রেখেছেন। স্ট্যাচুটি দেখে কেমন যেন চিন্তাভারে আক্রান্ত হয়ে গেলেন আইনস্টাইন। নিজের খ্যাতির প্রতি যে বিদ্রূপাত্মক মনোভাব তিনি সর্বদা পোষণ করতেন, মনে হল, আজ

যেন তার কাছে তিনি পরাজিত, পরাভূত।

প্যাসাডেনাতেও অনুষ্ঠান এবং বক্তৃতার ব্যতিক্রম হল না। অবশ্য সেই সঙ্গে বৈজ্ঞানিক রিপোর্ট, আলোচনা সভা এবং ঘরোয়া মিটিং-এরও ব্যাপক ব্যবস্থা ছিল। প্রমোদভ্রমণের ব্যবস্থা এখানেও ছিল, তবে তা নিউইয়র্কের মতো অত্যাচার বলে মনে হয়নি। অ্যারিজোনায় আইনস্টাইন এক রেড ইণ্ডিয়ান ট্রাইবের সঙ্গে পরিচিত হলেন। তাঁকে ঐ ট্রাইবের সদস্য করে নেয়া হল। নাম দেয়া হল Chief Great Relative। তাঁকে রেড ইণ্ডিয়ানদের এক প্রস্থ পোশাক-পরিচ্ছদ উপহার দেয়া হল।

আইনস্টাইন প্যাসাডেনার বিখ্যাত মাউণ্ট উইলসন মানমন্দির দেখতে গেলেন। বিশাল দৈত্যাকৃতি টেলিস্কোপটি তাঁকে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখান হল। সঙ্গে ছিলেন মিসেস আইনস্টাইন।

"আচ্ছা, এ বিশাল যন্ত্রটি আপনাদের কী প্রয়োজনে লাগে?"—জিজ্ঞেস করলেন মিসেস।

"বিশ্বের গঠন কী রকম তা প্রতিষ্ঠা করার জন্য"—উত্তর দিলেন মানমন্দিরের ডিরেক্টর।

"না, আপনি ঠিক বলছেন না।"— মিসেসের কণ্ঠে একটা অবিশ্বাসের সুর। "আমার স্বামী ত এ সব কাজ প্রায়ই পুরনো খামের পেছন দিকে সারেন।"

১৯৩১-এর বসন্তকালে আইনস্টাইন আমেরিকা ত্যাগ করলেন। আশ্বাস দিলেন যে, পরের বছর আবার প্যাসাডেনায় আসবেন। সঙ্গে নিয়ে গেলেন একগাদা স্যুভেনির, হাওয়াই বাস্কেট, রেড ইণ্ডিয়ান চীফের পোশাক এবং অ্যারিজোনায় পাওয়া এক টুকরো প্রস্তরীভূত কাঠ। কিন্তু একটি বিশেষ উপহার নিতে তিনি সরাসরি অস্বীকার করলেন। সেটি হল একটি আসল Guarneri ভায়োলিন। এ সম্পর্কে তাঁর মন্তব্য: "প্রকৃত যিনি ওস্তাদ, একমাত্র তাঁরই সাজে

এ রকম যন্ত্র বাজানো।"

১৯৩১-এর শেষের দিকে আইনস্টাইন আবারও প্যাসাডেনায় এলেন। গোটা শীতকাল ওখানকার পদার্থবিদ্‌দের সঙ্গে কাটালেন। ১৯৩২-র বসন্তে ফিরে গেলেন বার্লিনে। আবার শরতেই ফিরে এলেন প্যাসাডেনায়।

১৯৩১, ৩২ এবং ৩৩—পরপর তিনবার মিলিকানের আমন্ত্রণে আইনস্টাইন আমেরিকা এলেন। আমেরিকা যাওয়া মানে অতলা-ন্তিকের ওপর দিয়ে একটানা ভেসে চলা। সমুদ্রযাত্রা বড় ভাল লাগে আইনস্টাইনের, এলসারও। তাই এই আনন্দসুখের জন্য দুজনেই মিলিকানের কাছে কৃতজ্ঞ।

তৃতীয়বার প্যাসাডেনা আসার আগে একটা ঘটনাকে কেন্দ্র করে তাঁর মার্কিন বন্ধুদের মধ্যে অস্বস্তির সৃষ্টি হল। আগের দু'বার ভিশা-পাশপোর্টের ব্যাপারটা মার্কিন দূতাবাসের লোকেরাই করে দিয়েছিলেন। ব্যক্তিগতভাবে আইনস্টাইনকে কিছুই করতে হয় নি। এবারে রাষ্ট্রদূত অনুপস্থিত থাকায় ভিশা-পাশপোর্টের কাগজপত্র এল এক অফিসারের কাছে। উনি আইনস্টাইনকে দূতাবাসে ডেকে পাঠালেন। এবং তাঁকে প্রশ্ন করতে শুরু করলেন। 'আপনার এ যাত্রার উদ্দেশ্য কী, আপনার রাজনৈতিক মতাদর্শ কী' ইত্যাদি হরেক রকম প্রশ্ন। আইনস্টাইন এতে অত্যন্ত বিরক্ত বোধ করলেন। এবং ঘোষণা করলেন, এমন হলে, তিনি আর যুক্তরাষ্ট্রে যাবেন না। এই বলে দূতাবাস ত্যাগ করে চলে গেলেন। ব্যাপারটিতে বার্লিনের মার্কিন দূতাবাস-চক্রে বেশ জল ঘোলা হল। সারা রাত ধরে ব্যস্ত রইল বার্লিন আর ওয়াশিংটনের টেলিফোন লাইন। শেষে, পরদিন সকালে, বিশেষ বার্তাবহ মারফৎ আইনস্টাইনের হাতে পাশপোর্ট পৌঁছে দেয়া হল।

দূতাবাসের এই অত্যুৎসাহ সম্ভবত একটি চিঠির দরুন ঘটেছিল। যুক্তরাষ্ট্রে আইনস্টাইনের আগমনের বিরুদ্ধে এক মার্কিন মহিলা

সমিতি স্টেট ডিপার্টমেন্টে প্রতিবাদপত্র পাঠায়। ঐ চিঠির একটি প্রতিলিপি বার্লিনের মার্কিন দূতাবাসেও পাঠানো হয়। প্রতিবাদের কারণ হিসেবে মহিলা সমিতি আইনস্টাইনকে শান্তিবাদী ও কম্যুনিস্ট বলে অভিযুক্ত করে। গোটা ব্যাপারটায় যুক্তরাষ্ট্রে তুমুল আলোড়নের সৃষ্টি হয় এবং আইনস্টাইন স্তূপাকৃতি টেলিগ্রাম পেতে থাকেন। প্রত্যেকটিতে সনির্বন্ধ অনুরোধ : তিনি যেন দূতাবাসের কাজকর্মের ধরনধারণ এবং 'দেশপ্রেমিক' নারীদের চিঠি—তুই-ই ক্ষমাভরে উপেক্ষা করেন। এলসাও স্বামীকে গোটা ব্যাপারটা উপেক্ষা করতে অনুরোধ করলেন। কেননা, তা না হলে তুর্ভাগা অফিসারটির চাকরি নিয়ে টানাটানি হতে পারে। চাকরি খোয়ানোর আশঙ্কার কথা ভেবে আইনস্টাইন শেষ পর্যন্ত নরম হন এবং পরদিন আমেরিকা যাত্রা করেন। কিন্তু ঐ 'দেশপ্রেমিক' রমণীকূলের উদ্দেশে তিনি নিম্নোক্ত কথাগুলো না লিখে পারেন নি।

"জীবনে ফেয়ার সেক্সের কাছ থেকে সব রকম প্রগতির এতো সতেজ প্রত্যাখ্যানের অভিজ্ঞতা আমার এখন পর্যন্ত হয় নি। হলেও এক সঙ্গে এতো জনের কাছ থেকে নয়।

"কিন্তু এই সব নজরদার নাগরিকাদের বক্তব্য কি সত্যি যথার্থ নয়? যে লোক এতখানি খিদে নিয়ে ও আস্বাদ করে হার্ড-বয়েল্ড ক্যাপিটালিস্টদের খেয়ে ফেলে তার কাছে দেশের তুয়ার কেন খোলা হবে? পুরাকালে ক্রীট দেশের নরখাদকেরা যেমন করে মিষ্টি গ্রীক কুমারীদের খেয়ে ফেলত শুধু তার সঙ্গেই এই খিদে ও আস্বাদনের তুলনা করা চলে। তা ছাড়া, একমাত্র নিজের স্ত্রীর সঙ্গে যে অনিবার্য যুদ্ধ তা বাদে এ ব্যক্তি আর সব যুদ্ধই বাতিলের পক্ষে। কাজেই লোকটি যথেষ্ট শয়তান। সুতরাং অনুগ্রহ করে আপনাদের সমিতির চতুরা ও দেশপ্রেমী রমণীকূলের বক্তব্যে কান দিন। মনে রাখবেন, শক্তিশালী রোমক সাম্রাজ্যের রাজধানী রোম নগরী একদা

ঈদৃশী বিশ্বস্ত রাজহংসীদের কলধ্বনিতেই রক্ষা পেয়েছিল।"

অষ্টাদশ শতকের মহান যুক্তিবাদীরা প্রকৃতিতে বস্তুনিষ্ঠ যুক্তির সন্ধানে শেষ পর্যন্ত খুঁজে পেয়েছিলেন কার্যকারণ সূত্রকে। প্রাকৃতিক ঘটনাবলীর পেছনে আবিষ্কার করেছিলেন নিশ্চয়তাবাদের অনুশাসন। কিন্তু এখানেই ক্ষান্ত না হয়ে তাঁরা আরো এক ধাপ এগিয়ে গেলেন। দাবী করলেন যে, মানুষের সামাজিক সম্পর্কগুলোও যুক্তি ও ন্যায়বোধের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হওয়া চাই। ফলে জন্ম নিল সামাজিক অধিকার এবং ন্যায়বিচারের ধারণা।

কিন্তু ১৯৩০ নাগাদ যুক্তিহীনতার দৈত্যটি আবার তার করাল নখ-দন্ত বিস্তার করে মাথা-চাড়া দিল। উদ্দেশ্য: যুক্তির বিরুদ্ধে সংগ্রামে প্রতিশোধ-স্পৃহা মেটানো। বিজ্ঞানের বস্তুনিষ্ঠ এবং যৌক্তিক মানদণ্ডকে নির্বাসিত করাই ছিল হিটলারের কর্মসূচীর অন্যতম অঙ্গ। পরীক্ষা ও পর্যবেক্ষণ নয়, নয় অভিজ্ঞতা-অনুসারী মানসিক রূপকল্পের যুক্তিনিষ্ঠ যোগসূত্র--বিজ্ঞানকে চলতে হবে এক স্বৈরাচারীর ইচ্ছা মেনে, তার হুকুম মোতাবেক মানদণ্ডকে স্বীকার ক'রে। এ রকম অবশ্য-স্বীকার্য একটি মানদণ্ড হল: বৈজ্ঞানিক ধারণার জাতিগত প্রেক্ষাপট। তত্ত্বীয় চিন্তাধারা এ মানদণ্ডকে সামগ্রিকভাবে মানতে পারছিল না। নাৎসী শিক্ষামন্ত্রী বার্নহার্ড রাস্ট তাই ঘোষণা করলেন— "জাতীয় সমাজবাদ মোটেই বিজ্ঞানের শত্রু নয়, বৈজ্ঞানিক তত্ত্বাদির শত্রুমাত্র ( National socialism is not an enemy of Science, but only of theories )।"

নাৎসী সংস্কারের কাছে ভৌত-বিশ্বের বস্তুনিষ্ঠ অস্তিত্বে দৃঢ় প্রত্যয়ের ওপর প্রতিষ্ঠিত আপেক্ষিক তত্ত্বের স্বপ্রকাশ যুক্তিবাদ ছিল নিতান্তই অসহ্য। বিজ্ঞানী লেনার্ড ও স্টার্ক কিছুদিন আগে আইনস্টাইন ও তাঁর আপেক্ষিকবাদের বিরুদ্ধে এক ব্যর্থ আক্রমণ শানিয়েছিলেন। এই সুযোগে তাঁরা বদলা নিতে বিন্দুমাত্র কালহরণ করলেন না। ১৯৩৩

সালে Volkische Beobacher-এ লেনার্ড লিখলেন—"বিজ্ঞানে ইহুদী গোষ্ঠীর বিপজ্জনক প্রভাবের গুরুত্বপূর্ণ উদাহরণ হল হের আইনস্টাইন এবং কিছু প্রাচীন জ্ঞানের সঙ্গে অর্থহীন সামান্য কিছু আবর্জনা যোগ করে গণিতে ফেনিয়ে তোলা তাঁর তত্ত্বগুলো। আজ তাঁর সাধের তত্ত্বটি ভেঙ্গে একেবারে গুঁড়িয়ে গেছে। প্রকৃতির সঙ্গে সম্পর্কহীন হলে অদৃষ্টে যা হওয়া উচিত তাই হয়েছে। এমন কি, যে সমস্ত বিজ্ঞানী অন্যক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য কাজ করেছেন তাঁরা এ তিরস্কার এড়াতে পারেন না যে, জার্মানীতে তাঁরাই আপেক্ষিক তত্ত্বের পায়ের তলায় মাটি জুগিয়েছেন। কেননা, হয় তাঁরা দেখেন নি নয়তো দেখতে চাননি যে, বিজ্ঞান ছাড়া অন্য ক্ষেত্রেও এ ইহুদীটিকে একজন ভাল জার্মান মনে করা কত ভুল।"

দু-বছর পরে পদার্থবিজ্ঞানের এক নতুন ইনস্টিটিউটের উদ্বোধন অনুষ্ঠানের ভাষণে লেনার্ড বললেন—"আশা করি, এ ইনস্টিটিউট বিজ্ঞানে এশীয় ভাবধারার বিরুদ্ধে সংগ্রামের পতাকা হিসেবে গণ্য হবে। আমাদের ফুয়েরার রাজনীতি ও অর্থনীতির ক্ষেত্র থেকে এ ভাবধারা—যেখানে এর নাম মার্কসবাদ—দূর করেছেন। কিন্তু বিজ্ঞানে এ ভাবধারা এখনও জাঁকিয়ে বসে রয়েছে। এর কারণ আইনস্টাইনকে নিয়ে অতিরিক্ত মাতামাতি। আমাদের মনে রাখতে হবে যে, বুদ্ধির জগতে কোন জার্মানের পক্ষে একজন ইহুদীকে গুরু বলে মানা আত্মগ্লানিকর। প্রকৃতি-বিজ্ঞান পুরোপুরি আর্যোদ্ভব। অজানার ক্ষেত্রে আজ জার্মানদের নিজেদেরই পথ করে নিতে হবে।"

শুধু আবিষ্কারকের জাতিদুষ্টতা নয়, তত্ত্বের বিমূর্ত প্রকৃতিতেও পাওয়া গেল জাতিদোষের গন্ধ। সরাসরি ইন্দ্রিয়লব্ধ জ্ঞানের সঙ্গে সম্পর্কতার যে মৌলিকত্ব 'আর্য পদার্থবিজ্ঞান বা Aryan Physics'-এর বৈশিষ্ট্য তা এতে নেই। জার্মান বিশ্ববিদ্যালয় ও বিজ্ঞানে বিশোধন পর্ব যখন তুঙ্গে সৌভাগ্যক্রমে আইনস্টাইন তখন ছিলেন ঝটিকাবাহিনী ও গুপ্ত পুলিশের নাগালের বাইরে, অনেক অনেক দূরে।

আগেই বলা হয়েছে, ১৯৩০ সাল থেকে আইনস্টাইন ক্যালিফোর্নিয়া ইনস্টিট্যুট অব্ টেকনলজিতে 'পরিদর্শক' অধ্যাপক হিসেবে কাজ করছিলেন। জার্মানীর প্রেসিডেন্টরূপে হিণ্ডেনবার্গের নির্বাচনের পর ১৯৩২-র বসন্তকালে আইনস্টাইন বার্লিনে ফিরে এলেন। কাপুথের বাড়িতে বন্ধুবান্ধবেরা তাঁকে ব্রুনিং-এর পদত্যাগ, চ্যান্সেলর পদে পাপেনের নিয়োগ এবং মঞ্চে শেলিশারের আবির্ভাব প্রভৃতি সর্বশেষ ঘটনাবলী সম্পর্কে অবহিত করলেন। উদ্বিগ্ন আইনস্টাইন দেখলেন, অর্থজগতের রাঘব-বোয়ালেরা হিটলারের ক্ষমতায় আসার পথ তৈরি করছেন। ১৯৩২-র শরতে আর একটি শীত কাটাতে তিনি আবার সস্ত্রীক ক্যালিফোর্নিয়া যাত্রা করলেন।

স্ত্রীকে বললেন—'এ যাত্রায় ভিলা ছাড়তে বাড়িটি একবার ভাল করে দেখে নিও ( Before you leave the villa this time, take a good look at it. )।'

'কেন ?'—স্ত্রী জিজ্ঞাসা করলেন।

'আর কখনো তুমি এটা দেখতে পাবে না ( You won't see it again )'।—উত্তর দিলেন আইনস্টাইন।

ফ্রাঙ্ককে এলসা বললেন—'দেখছেন, ছেলেমানুষের মতো কী যা তা বকে !'

কাপুথের বাড়ি সত্যি তাঁরা আর কখন দেখেন নি।

হিটলার যখন ক্ষমতায় এলেন আইনস্টাইন তখন ক্যালিফোর্নিয়ায়। ১৯৩২-৩৩ এর শীতে জার্মান বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর বিশোধন ক্রিয়াকাণ্ড একেবারে চূড়ান্ত পর্যায়ে। আইনস্টাইন তখন প্যাসাডেনা থেকে নিউইয়র্কে এলেন। যোগাযোগ করলেন জার্মান দূতাবাসের সঙ্গে। রাষ্ট্রদূত তাঁকে আশ্বাস দিলেন, জার্মানীতে ফিরতে ভয়ের কোন কারণ নেই। নতুন সরকার নির্বিশেষে সকলের প্রতি সুবিচার করবেন। নির্দোষ হলে তাঁর কোন বিপদ ঘটবে না। কিন্তু আইনস্টাইন

ঘোষণা করলেন—যতদিন নাৎসী রাজত্ব চলবে ততদিন তিনি জার্মানীতে ফিরছেন না। সরকারী আলাপ শেষ হলে রাষ্ট্রদূত তাঁকে একান্তে ডেকে বললেন—"মাননীয় অধ্যাপক, ব্যক্তিগত কথাবার্তায় এখন বলি, আপনি ঠিক কাজ করছেন।"

১৯৩৩-র বসন্তে আইনস্টাইন প্যাসাডেনা ছেড়ে য়ুরোপে ফিরলেন। তবে আর বার্লিনে নয়। এলেন লিডেনে, বন্ধু এরেনফেস্টের বাড়িতে। কয়েকদিন ওখানে কাটিয়ে বাসা নিলেন বেলজিয়ামের সমুদ্রতীরে, স্বাস্থ্যকেন্দ্র Le Coq-এ। ওস্টেণ্ডে শহরের কাছে ছবির মতো সুন্দর এ স্বাস্থ্যনিবাস। বেলজিয়ামের রাজা আলবার্টের সঙ্গে আগে থেকেই আইনস্টাইনের পরিচয় ছিল। রানী এলিজাবেথের সঙ্গেও একত্রে সঙ্গীত চর্চা করেছেন। কাজেই লে কক-এ তিনি নিরাপদ আশ্রয় পেলেন। প্রতি সপ্তাহে আবার শুরু হল সদলবলে ভায়োলিন বাজানো। রানী এলিজাবেথও এ দলে যোগ দিলেন।

এলসা অনুনয় করে বললেন—"Can't you go back home? Even if it is only to sell the house and pack up our belongings."।

"If we did go back, we would never be allowed to leave"—উত্তর দিলেন আলবার্ট।

কে জানত আইনস্টাইনের ভবিষ্যদ্বাণী এত শীগগির মিলে যাবে?

১৯৩৩-র মার্চে আইনস্টাইনের কাপুথের বাড়িতে নাৎসী পুলিশ চড়াও হল। বাড়িটি তছনছ করল। তাঁর ব্যাঙ্কের অর্থ ও লকারের জিনিসপত্র সহ সমস্ত স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হল। হরণ করা হল সম্মানসূচক জার্মান নাগরিকত্ব। রাজনৈতিক পুলিশের ভাষ্য অনুসারে, ঐ সম্পত্তি নাকি কম্যুনিস্ট আন্দোলনে অর্থ জোগানোর কাজে ব্যয়িত হচ্ছিল। এর কিছুদিন পরে আইনস্টাইনের

সমস্ত লেখা, আপেক্ষিক তত্ত্বের প্রবন্ধাবলী বার্লিনের স্টেট অপেরা হাউসের সামনের স্কোয়ারে প্রকাশ্যে পোড়ান হল। সেই সঙ্গে অন্যান্য 'অ-আর্য এবং কম্যুনিস্ট সাহিত্যও'। এ বিশাল বন্-ফায়ারে আলোর বদলে ঘনিয়ে এল জমাট অন্ধকার। আইনস্টাইনকে গ্রেফতার করার পরওয়ানা জারি হল, সেই সঙ্গে ঘোষণা করা হল তাঁর মাথার জন্য পঞ্চাশ হাজার মার্ক পুরস্কার। আইনস্টাইন মন্তব্য করলেন—"আমার এ পাকাচুলওয়ালা মাথার যে এত দাম তা ত জানতাম না।"

১৯৩৩-এর ১লা এপ্রিল জার্মানীতে সরকারী পদ আর বিশ্ব-বিদ্যালয়ের অধ্যাপনা থেকে ইহুদী বিতাড়ন সুরু হল। ষোল শ' লেকচারার সরাসরি বরখাস্ত হলেন। এঁদের অন্যতম হলেন ফ্রিশ হেবার। সংশ্লেষণ পদ্ধতিতে অ্যামোনিয়া আবিষ্কারের জন্য বিশ্ববিখ্যাত হন। সপরিবারে খৃস্টান হয়েও তিনি নিস্তার পেলেন না। আর মাত্র কয়েক মাস পরে তাঁর অবসর নেয়ার কথা। সেটুকু সময়ও তাঁকে দেয়া হল না। মনের দুঃখে জেরুজালেমের পথে তিনি মারা গেলেন। নামকরা বিজ্ঞানীদের অনেকেই দেশত্যাগ করলেন। ম্যাক্স বর্ন গেলেন ইংল্যাণ্ডে, এডুয়ার্ড টেলর ও লিও জিলার্ড আমেরিকায়। ফ্যাসিস্ট সরকারের অত্যাচারে মাতৃভূমি ইতালী ছেড়ে এনরিকো ফের্মি-ও এলেন আমেরিকায়।

শুধু একত্রে সঙ্গীতচর্চাই নয়, বেলজিয়ামের রানী আইনস্টাইনের আপেক্ষিক তত্ত্ব সম্পর্কেও অত্যন্ত উৎসাহী ছিলেন। তত্ত্বের রূপ-কারকে তিনি পরম শ্রদ্ধার চোখে দেখতেন। সীমান্তের ওপার থেকে আইনস্টাইনের জীবনের উপর সম্ভাব্য আক্রমণের কথা ভেবে তিনি খুবই উদ্বিগ্ন ছিলেন। তাই রাজপরিবার ও বেলজিয়াম সরকার আইনস্টাইনকে রক্ষা করতে সব ব্যবস্থা নিয়েছিলেন। দিনরাত দেহরক্ষীরা তাঁর ওপর কড়া নজর রাখতেন।

একবার ১৯৩৩-র গ্রীষ্মকালে ফিলিপ ফ্রাঙ্ক ওস্টেণ্ডের ওপর দিয়ে কোথায় যেন যাচ্ছিলেন। ঠিক করলেন, আইনস্টাইনকে খোঁজ করে একবার তাঁর সঙ্গে দেখা করে যাবেন। এ উদ্দেশ্যে তিনি Le Coq-এ এলেন এবং ওখানকার লোকজনকে আইনস্টাইনের ঠিকানা জিজ্ঞেস করলেন। কিন্তু কর্তৃপক্ষের কড়া হুকুম ছিলঃ কাউকে যেন আইনস্টাইনের বাসস্থান সম্পর্কে সংবাদ দেয়া না হয়। ফ্রাঙ্কের প্রশ্নে দেহরক্ষীরা সতর্ক হয়ে উঠল। অবশেষে ফ্রাঙ্ক মিসেস আইনস্টাইনকে হঠাৎ দেখতে পান। মিসেস তখন খুব ভয় পেয়ে গেছেন। কারণ তাঁকে সাবধান করে দেয়া হয়েছিল যে, সন্দেহজনক এক আততায়ী আইনস্টাইনের খোঁজে Le Coq-এ ঘুরে বেড়াচ্ছে।

এ সব ব্যবস্থা ছিল আইনস্টাইনের কাছে খুব বিরক্তিকর। কিন্তু নিঃসন্দেহে এর প্রয়োজন ছিল। প্রতিবেশী জার্মানী থেকে নাৎসী অনুচরেরা যেসব বিজ্ঞানীদের খোঁজ নিতে পারে বলে সন্দেহ করা হচ্ছিল সে লিস্টের প্রথম নামটি ছিল আইনস্টাইনের। কাজেই ঘনিষ্ঠ বন্ধুবান্ধবেরা তাঁকে বাঁচাতে সম্ভাব্য সব কিছু করেছিলেন।

লে কক-এ আইনস্টাইন সমুদ্রের তীরে ছোট্ট একটা বাসা ভাড়া করেন। মিসেস আইনস্টাইন ছাড়া তাঁর সঙ্গে তখন থাকতেন সেক্রেটারী হেলেন ডুকাস আর সৎ-মেয়ে মার্গট। বুদ্ধিমতী মার্গট জার্মানী থেকে পালানোর আগে ফরাসী দূতাবাসের সহায়তায় বাবার ব্যক্তিগত দলিলপত্রের অনেকটাই বিদেশে পাচার করে দেন।

এ সময় আইনস্টাইনের মানসিকতার পরিচয় পাওয়া যায় বন্ধু সোলোভিনকে লেখা একটা চিঠিতে। তারিখ ২৮শে এপ্রিল, ১৯৩৩। "My great fear is that this hate and power epidemic will spread throughout the world. It comes from below to the surface like a flood, until the upper regions are isolated, terrified and demoralised, and

then also submerged."।

মাত্র কয়েক সপ্তাহ আগে সংবাদপত্র মারফৎ জানিয়েছিলেন—"As long as the opportunity still remains open to me, I shall only live in a land where political freedom, tolerance and equality of all citizens at law reign."।

১৯৩৩-র বসন্তকালে অ্যান্তোনিনা ভ্যালেন্তিন লে কক-এ এসেছিলেন। তিনি তাঁর বইতে এ সময়কার কথা লিখেছেন—"সে বছর বসন্ত এসেছিল দেরিতে। ধূসর, শীতেল আকাশ ছিল বড় পীড়াদায়ক। রূপালি বালিয়াড়িগুলো দেখে মনে হচ্ছিল, বাতাস যেন তাদের ঝেঁটিয়ে নিয়ে গেছে। সমুদ্র কেবলই আছড়ে পড়ছিল তীরভূমিতে……। সমুদ্রশঙ্খে যেমনটি হয়, ঐ ছোট্ট বাড়িটিতেও তেমনি সব শব্দ ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হচ্ছিল। পায়ে চলার শব্দ, ডিসের টুংটাং, আর টাইপরাইটারের টকাটক।"

ভ্যালেন্তিন আইনস্টাইনকে তাঁর স্বাভাবিক মেজাজেই দেখলেন। বরাবরের মতই বৈজ্ঞানিক চিন্তায় বিভোর। নিজের দুর্বিপাকগুলো তিনি দেখছিলেন তাঁর সেই পুরনো ব্যঙ্গরসাত্মক দৃষ্টিতে। ভ্যালেন্তিন লিখছেন—"যখন তিনি হাসতেন মনে হত যেন মহান ও বিরাট এক হাসির গাছ ক্রমাগত তার বড় বড় ডালপালাগুলো ঝাঁকাচ্ছে।" ভ্যালেন্তিন এলসাকে জার্মানী থেকে প্রকাশিত বড় একটা অ্যালবাম দেখালেন। তাতে নাৎসী রাজত্বের বিরোধীদের সব ছবি ছিল। প্রথম পৃষ্ঠার ছবিটি আইনস্টাইনের। সঙ্গে তাঁর বিরুদ্ধে 'অপরাধেব লিস্ট'। লিস্টের শুরু আপেক্ষিক তত্ত্ব দিয়ে, শেষে ছোট্ট একটি মন্তব্য —'noch unge hangt' অর্থাৎ 'এখনও ফাঁসিতে লটকানো হয় নি।'

এলসার সব সময় ভয়ঃ এই বুঝি কিছু হল। তিনি ফ্রাঙ্কের কাছে নাৎসী ঝটিকাবাহিনীর জনৈক প্রাক্তন নায়কের সঙ্গে তাঁর সাম্প্রতিক এক সাক্ষাতের কথা বলছিলেন ঐ নায়ক চিঠি লিখে জরুরী

দাবী জানাচ্ছিলেন, আইনস্টাইন যেন তাঁকে অভ্যর্থনা জানান। আইনস্টাইন অস্বীকৃতি জানালে বিস্ফোরক দ্বিতীয় চিঠি এল। তখন এলসা ঠিক করলেন যে, তিনি লোকটির সঙ্গে দেখা করবেন এবং লোকটি কী চায় জেনে নেবেন। জানা গেল, লোকটির বিশ্বাস আইনস্টাইন হলেন এক ফ্যাসিবিরোধী বাস্তুত্যাগী সংস্থার নেতা। বেশ কিছু টাকার বিনিময়ে লোকটি আইনস্টাইনের কাছে গোপন সব তথ্য বিক্রি করতে চায়।

এলসা বললেন—"Why do you think my husband would spend all that money on your party's secrets"।

উত্তর এল—"Because every one knows that Professor Einstein leads the opposing party throughout the world."।

গুম করা, হত্যা প্রভৃতি যে কোন অস্বাভাবিক ঘটনা তখন স্বাভাবিক জীবনযাত্রার অঙ্গ হয়ে উঠেছিল।

ফ্রাঙ্কের সঙ্গে আলাপের সময় আইনস্টাইন বলেন যে, বার্লিনের পরিবেশ থেকে মুক্তি পেতে গিয়ে তিনি এক ধরনের মনস্তাত্ত্বিক মুক্তিও আস্বাদ করেছেন। এ রকম মন্তব্যে কিন্তু মিসেসের সায় ছিল না। তিনি বলতেন, বার্লিনে আইনস্টাইন বহু সুখকর সময়ও কাটিয়েছেন। বিশেষ করে, সেখানে প্রথম শ্রেণীর পদার্থবিদদের সান্নিধ্য তাঁর যথেষ্ট তৃপ্তির কারণ হয়েছিল। উত্তরে আইনস্টাইন বললেন—"হ্যাঁ, নিছক বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ থেকে বার্লিনের জীবন সত্যি খুব সুন্দর ছিল। কিন্তু সব সময় আমি কী যেন একটা চাপ অনুভব করতাম! কেন জানি না, সর্বদা মনে হত শেষ পর্যন্ত এখানে আমার ভাল হবে না।"

ইতিমধ্যে আইনস্টাইন প্রাশিয়ান অ্যাকাডেমি থেকে পদত্যাগ করেছেন। লিডেনে এরেনফেস্টের বাড়িতে থাকাকালেই পদত্যাগপত্রটি পাঠিয়ে দেন, ২৮শে মার্চ, ১৯৩৩। তিনি জানতেন, নাৎসীরা এক সময় অ্যাকাডেমি থেকে তাঁকে বহিষ্কার করতে চাপ দেবেই। এতে তাঁর

বহু জার্মান বিজ্ঞানী-বন্ধু, যেমন একজন ম্যাক্স প্লাঙ্ক, খুবই বিব্রতবোধ করবেন। কেননা, বহিষ্কারের বিরুদ্ধে তাঁদের প্রতিবাদের অর্থ হবে খোলাখুলি অত্যাচার বরণ। আর অন্যদিকে নাৎসীদের সঙ্গে সায় দেয়া হবে তাঁদের পক্ষে নেহাৎ আত্মগ্লানিকর। এ রকম একটা বিশ্রী পরিস্থিতির হাত থেকে বন্ধুদের মুক্তি দেয়ার উদ্দেশ্যে আইনস্টাইন অ্যাকাডেমিকে লিখলেন—"বর্তমান সরকারের অধীনে প্রাশিয়ান রাজ্যকে সেবা করতে আমি অক্ষম। কাজেই পদত্যাগ করছি।"

প্রথমে ত অ্যাকাডেমি কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়ল। বিজ্ঞানী নার্নস্ট বহু চেষ্টা করলেন যাতে পদত্যাগপত্রটি গৃহীত না হয়। বললেন —ভলতেঁয়ার, দ্য' আলেমবার্ট এবং মঁপারতুস প্রমুখ বিদগ্ধ ফরাসী সদস্যদের নিয়ে যে অ্যাকাডেমি গর্ববোধ করে থাকে তার পক্ষে কোন সদস্যের কাছ থেকে জাতীয়তাবোধযুক্ত জার্মানত্বের দাবী করা মানায় না। কিন্তু, শেষ পর্যন্ত, নাৎসীদের চাপে অ্যাকাডেমি একটি বিবৃতি দিতে বাধ্য হলেন। তাতে অভিযোগ করা হলঃ আইন-স্টাইন জার্মানীর পক্ষে ক্ষতিকর সব কাজে লিপ্ত। এবং বিরোধিতা করার পরিবর্তে তিনি স্বয়ং জার্মান-অত্যাচারের নানা অলীক কাহিনী ছড়াচ্ছেন। অ্যাকাডেমি আইনস্টাইনকে লিখলেন—"জার্মান জাতির হয়ে আপনার কাছ থেকে সামান্য একটা প্রশংসাবাণীও বিদেশে খুব কার্যকরী হত।"

উত্তরে আইনস্টাইন জানালেন—"তা হয়ত হত ঠিকই। কিন্তু সেক্ষেত্রে, ন্যায় ও স্বাধীনতার যে ধারণা সারাজীবন ধরে আমি তুলে ধরেছি তার চিরসমাধি ঘটত। বর্তমান পরিস্থিতিতে এ ধরনের সাক্ষ্য দেয়ার অর্থ, পরোক্ষে হলেও, প্রতিষ্ঠিত সমস্ত সাংস্কৃতিক মূল্য-বোধের ধ্বংসে সহায়তা করা এবং সেই সঙ্গে নৈতিক দুর্নীতির অংশীদার হওয়া। এ কারণেই অ্যাকাডেমি থেকে পদত্যাগ করা আমার কাছে বাধ্যতামূলক মনে হয়েছিল। আপনার চিঠি পেয়ে বুঝতে পারছি কী ঠিক কাজই না আমি করেছি।"

প্রকল্প।' প্রবন্ধটি পড়ে আইনস্টাইন মুগ্ধ হলেন এবং এতদিন ধরে তিনি যা খুঁজছিলেন ঠিক তাই মিলে গেল অযাচিতভাবে। আইনস্টাইন প্রবন্ধটি স্বয়ং জার্মান ভাষায় অনুবাদ করে পাঠালেন পদার্থবিদ্যার সম্ভ্রান্ত পত্রিকা 'ৎসাইট শ্রিফ্‌ট ফ্যুর ফিজিক'-এ। সঙ্গে ব্যক্তিগত মন্তব্য জুড়ে দিলেন যা বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। "আমার মতে বোসের এই কার্জ আধুনিক পদার্থবিদ্যার জটিল সমস্যা সমাধানে এক মূল্যবান যোজনা। একে সাধারণ গ্যাসের ক্ষেত্রেও প্রয়োগ করা যাবে এবং আমি তা পরে দেখাব।" ঐ বছরই বসুর তত্ত্বের বিস্তৃতি ঘটিয়ে দুটি পেপার প্রকাশ করেছিলেন আইনস্টাইন।

সত্যেন্দ্রনাথ বসু আবিষ্কার করেছিলেন কোয়ান্টাম পরিসংখ্যান সম্পন্ন করার এক নতুন পদ্ধতি। এবং এটি তিনি করেছিলেন, তাঁর নিজের ভাষায়, 'প্লাঙ্কের বিকিরণ সূত্রকে তার পাঁক থেকে উদ্ধার করার জন্য', ঐ সূত্রের এক নতুন সংজ্ঞা দেবার জন্য। আইনস্টাইন পদ্ধতিটিকে সাফল্যের সঙ্গে সাধারণ গ্যাসের ক্ষেত্রেও প্রয়োগ করলেন। তাই যদি হল, তবে এ থেকে অন্য একটি অর্থও দাঁড়িয়ে যেতে পারে বলে তাঁর ধারণা হল। সেটি এই—পরিসংখ্যানের দিক থেকে সাধারণ গ্যাসের কণিকাগুলোর আচরণ হওয়া উচিত আলোর কোয়ান্টার মতো। অর্থাৎ কিনা তরঙ্গ লক্ষণবিশিষ্ট।

আইনস্টাইন যখন এ নিয়ে ব্যস্ত তখন তাঁর হাতে এল লুই দ্য ব্রগলীর ডক্টরেট নিবন্ধের একটি কপি। ভিন্নতর কারণ দেখিয়ে একই সিদ্ধান্তে এলেন দ্য ব্রগলী। আইনস্টাইন মন্তব্য করলেন, দ্য ব্রগলী "বিশাল আচ্ছাদনের একটি কোণ তুলে ধরলেন।" বর্নকে লিখলেন—"পড়ে দেখ, মনে হয় পাগলের প্রলাপ; কিন্তু কি সুদৃঢ় যুক্তি।" ১৯২৫ সালের মধ্যে আইনস্টাইন এ তত্ত্বে খুবই আস্থাশীল হয়ে উঠলেন। বোসের কণাবাদ আর দ্য ব্রগলীর তরঙ্গবাদ একসূত্রে গাঁথার ইঙ্গিত তাঁর দ্বিতীয় নিবন্ধটিতেই ছিল। স্পষ্টই লিখলেন, "গ্যাসের অণুর একটি ফলক ( beam ) যদি একটি ফুটোর (slit)

ভেতর দিয়ে পার হয় তা হলে আলোকরশ্মির বেলায় যেমন ব্যবর্তন ( diffraction ) ঘটে, এখানেও তা-ই হবে।"

এ প্রসঙ্গে দ্য ব্রগলীও পরে লিখেছেন—"বৈজ্ঞানিক জগৎ সে সময় আইনস্টাইনের প্রতিটি কথার জন্য উন্মুখ হয়ে থাকত। তিনি ছিলেন তখন খ্যাতির শীর্ষে। তরঙ্গ প্রকরণের উপর জোর দিয়ে তার বিকাশকে ত্বরান্বিত করতে এই কীর্তিমান বিজ্ঞানী বড় রকমের কাজ করলেন। তাঁর নিবন্ধটি না থাকলে আমার তত্ত্বটির স্বীকৃতি পেতে হয়ত আরও অনেক দেরি হয়ে যেত।" আর ১৯০৫ সালের অবিশ্বাস্য ঘটনার উল্লেখ করে এই দ্য ব্রগলী বলেছিলেন—"অন্ধকার রাতে হঠাৎ অল্পক্ষণের জন্য প্রখর আলোকশিখায় বিশাল অজানা দিগন্ত উদ্ভাসিত করা উজ্জ্বল হাউই।"

আইনস্টাইন তথা দ্য ব্রগলীর ধারণা পরীক্ষায় প্রমাণিত হতে দেরি হল না। প্রমাণ এল ১৯২৭-এ সি. জে. ডেভিশন ও এল. এইচ জার্মারের পরীক্ষায় এবং পরে জি. পি. টমসনের পরীক্ষায়। অর্থাৎ স্বীকার করতে হল যে, যেমন আলোর মধ্যে তেমনি ইলেকট্রনের মতো কণিকার মধ্যেও যুগপৎ তরঙ্গ ও কণিকা লক্ষণ প্রকাশ পাচ্ছে।

১৯২৫ সালে তাঁদের তত্ত্ব উপস্থাপিত করে শ্রোয়েডিঙ্গার ও হাইজেনবার্গ কোয়ান্টাম বলবিদ্যার দিকে এক বড় রকমের পদক্ষেপ করলেন। প্রথমে ধারণা হয়েছিল, তত্ত্ব দুটি সম্পূর্ণ পৃথক। কিন্তু দেখা গেল, তা নয়। গাণিতিক দিক থেকে এদের অভিন্নতার প্রমাণ দিলেন শ্রোয়েডিঙ্গার স্বয়ং। তাঁর বিখ্যাত তরঙ্গ-সমীকরণ দ্য ব্রগলীর জড় তরঙ্গের আচরণ ব্যাখ্যা করল। আইনস্টাইন শ্রোয়েডিঙ্গারকে অভিনন্দিত করলেন।

এরপর এলেন ম্যাক্স বর্ন ও তাঁর এক সহকর্মী। তাঁরা দ্য ব্রগলীর তরঙ্গের চলার পথে চেহারা কেমন তা দেখাতে গিয়ে বললেন, এ সম্পর্কে নিশ্চিত কিছু বলা সম্ভব নয়। বড় জোর তার সম্ভাব্যতা হিসেব করা যেতে পারে। আইনস্টাইন ও শ্রোয়েডিঙ্গার দু-জনেই

এ বক্তব্যকে অগ্রাহ্য করলেন। নিউটন থেকে আইনস্টাইন পর্যন্ত যে কঠোর নিশ্চয়তাবাদ বিজ্ঞানে রাজত্ব করছিল বর্নের সম্ভাবনাবাদে তা বর্জিত হল। একে অস্বীকার করে আইনস্টাইন বললেন—"ঈশ্বর এ জগৎ নিয়ে পাশা খেলেন না ( God does not play at dice )।" এ মন্তব্যে বোর একবার চটে উঠে বলেন—"ঈশ্বরের কি করা উচিত আর কি উচিত নয়, দয়া করে তা বলা থেকে বিরত থাকুন।"

এবারে আসরে অবতীর্ণ হলেন হাইজেনবার্গ ও বোর। হাইজেনবার্গ প্রায়ই যেতেন কোপেনহেগেনে, নীলস বোরের ইনস্টিট্যুটে অতিথি হয়ে। তাঁরা বললেন—কণিকা-তরঙ্গের এই দ্বৈতবাদ শুধু পারমাণবিক পদার্থের ক্ষেত্রেই সীমিত নয়, প্রকৃতি জগতেরই মূল কথা। পরমাণুর ভেতরে মাপ-জোখ নেয়া এবং তার অর্থ বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করলে এটি স্পষ্ট হয়ে ওঠে। হাইজেনবার্গ এই অর্থকে ধরতে চাইলেন তাঁর 'অনিশ্চয়তার নীতি' বা principle of indeterminacy-র মাধ্যমে। ধরা যাক, পরমাণুর মধ্যে ইলেকট্রনের অবস্থান জানার চেষ্টা হচ্ছে। সেটা ব্যর্থ হতে বাধ্য। কেননা, এই প্রচেষ্টার অর্থই হল ইলেকট্রনকে তার অবস্থান থেকে সরিয়ে দেয়ার প্রয়াস। অর্থাৎ পরমাণুর মধ্যে ইলেকট্রনের কক্ষ বলে কোন কিছুর ধারণা করতে যাওয়া অর্থহীন। বড় জোর, পরমাণুর ভেতরে ইলেকট্রনের অবস্থানের সম্ভাব্যতা কোথায় কতটা তার ধারণা করা চলে। ফিজিক্স ধোঁয়াশায় ভরে উঠল, পথের নিশানা পাওয়া দুষ্কর।

অনিশ্চয়তার নিয়মকে আইনস্টাইন গোড়া থেকেই বর্জন করলেন। তিনি খুঁজতে লাগলেন এই নিয়মের ভেতরের নিয়মকে। বোর-ও ছাড়ার পাত্র নন। তিনিও পাল্টা জবাব দিয়ে চললেন। অবস্থা দেখে মনে হল, ভোরবেলা ঘুম থেকে উঠে বোর ভাবতে বসেন আইনস্টাইনের কোন্ কথার জবাবে কী বলেছেন, ভবিষ্যতে আইনস্টাইন কী বলতে পারেন এবং জবাবে তিনি আর কী বলবেন।

অবস্থা এমন দাঁড়াল যে, পঞ্চম (১৯২৭) এবং ষষ্ঠ (১৯৩০) সলভে কংগ্রেসে সব কিছু ছাপিয়ে এই প্রশ্নের আলোচনা উঠল—কণিকা না তরঙ্গ? একটি কণিকার সঠিক অবস্থান নির্ণয় করা কী সম্ভব? বা বিশেষ কোন মুহূর্তে সেই কণিকার শক্তি?

কাল্পনিক পরীক্ষায় আইনস্টাইন ছিলেন সিদ্ধহস্ত। তিনি তিরিশের সলভে কংগ্রেসে এ সম্পর্কে এক কাল্পনিক পরীক্ষার প্রস্তাব রাখলেন বোরের কাছে চ্যালেঞ্জ হিসেবে। ধরা যাক, দর্পণ-বসানো একটা বাক্সে আবদ্ধ রাখা আছে আলোক। ঐ অবস্থায় বাক্সের ওজন নেয়া হল। তারপর সময়-নিয়ন্ত্রিত যান্ত্রিক ব্যবস্থায় স্বয়ংক্রিয়ভাবে একটা ফোটোনকে বাক্স থেকে মুক্ত করা হল। এবার যদি বাক্সটির ওজন নেয়া হয় তবে জানা যাবে মুক্ত ফোটনের ভর। আর, ভর জানা গেলে, তা থেকে শক্তিও জানা যাবে। কাজেই অনিশ্চয়তা বলে আর কিছু থাকছে না।

বড় কঠিন প্রশ্ন! বোর সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিতে পারলেন না। সারা রাত ধরে অস্থিরভাবে কেবলই ভাবলেন। ভোর হতেই গিয়ে হাজির হলেন আইনস্টাইনের কাছে। বললেন—ইউরেকা, জবাব রয়েছে আপনার আপেক্ষিক তত্ত্বের মধ্যে। মহাকর্ষ ক্ষেত্রে ত সময় (ঘড়ি) আস্তে চলে। কাজেই অনিশ্চয়তা থেকেই যাচ্ছে।

দীর্ঘ তিরিশ বছর ধরে চলেছিল বিতর্ক—প্রায় দুই দৈত্যের লড়াই-এর মতো। কোন পক্ষ এতটুকু টলেনি। এমন কি আইনস্টাইনের মৃত্যুর পরেও বোর লড়াই চালিয়ে গেছেন। বোর-আইনস্টাইনের লড়াই-এর অন্যতম সাক্ষী ছিলেন এরেনফেস্ট। বহু বছর ধরে তিনি সামনে বসে দু'জনের আলোচনা ও বিতর্ক শুনেছেন। কিন্তু কিছুতেই বুঝে উঠতে পারেন নি কে ঠিক। এ নিয়ে মনে মনে খুব কষ্ট পেতেন। অনেকের ধারণা, ১৯৩৩ সালে তাঁর আত্মহত্যার পেছনে এই মনোকষ্টের একটা ভূমিকা ছিল।

১৯৪৮ সালে ম্যাক্স বর্ন লিখেছিলেন—"পদার্থবিদ্যার সূত্রের

পরিসংখ্যানগত পটভূমিটি পূর্বগামীদের চেয়ে যিনি অনেক বেশি স্পষ্ট দেখতে পেয়েছিলেন তিনি আইনস্টাইন। কোয়াণ্টাম ব্যাপারের উষরতা জয়ের সংগ্রামে তাঁর ছিল পথিকৃতের ভূমিকা। পরবর্তীকালে তাঁর কাজ থেকে বেরিয়ে আসে পরিসংখ্যানগত ও কোয়াণ্টাম নিয়মের সংশ্লেষণ এবং তা প্রায় সব পদার্থবিজ্ঞানীর কাছেই গ্রহণীয় বলে মনে হয়। কিন্তু ঠিক তখনই তিনি নিজেকে সরিয়ে নিলেন, হয়ে উঠলেন সংশয়বাদী। আমাদের অনেকের কাছে এ এক বেদনাদায়ক ঘটনা—ট্র্যাজিডি। ট্র্যাজিডি তাঁর পক্ষে যিনি একাকী পথ হাতড়াচ্ছেন, ট্র্যাজিডি আমাদের পক্ষে কারণ আমরা হারিয়েছি আমাদের নেতা ও পতাকাবাহককে।"

এর আগে আইনস্টাইনের কাছ থেকে একটা চিঠি পেয়েছিলেন বর্ন। তাতে লেখা ছিল—"বৈজ্ঞানিক প্রত্যাশার দিক থেকে আমরা রয়েছি দুই বিপরীত মেরুতে। আপনার বিশ্বাস সেই ঈশ্বরে যিনি পাশা খেলেন, আর আমার বিশ্বাস বস্তুনিষ্ঠ জগতের নিখুঁত নিয়মে এবং আমি তা আয়ত্ত করতে চেষ্টা করি দূরন্ত কল্পনায়।"

এই শতকের বিশের দশকে তত্ত্বীয় বিজ্ঞানের অগ্রগতি মৌলিক গবেষণার জন্য আরও বেশি পরিমাণে সংস্থাগত স্বাধিকার দাবী করল। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রেও এ ধরনের মৌলিক গবেষণা সংস্থার প্রয়োজন অনুভূত হল। ১৯৩০ সালে লুই বম্‌বার্জার এবং তাঁর বিধবা বোন ফেলিক্স ফাল্ড নতুন একটা গবেষণা ইনস্টিটিউট স্থাপনের বিষয়ে আব্রাহাম ফ্লেক্সনারের পরামর্শ চাইলেন। ডঃ ফ্লেক্সনার ছিলেন আমেরিকার শিক্ষাব্যবস্থার অন্যতম সংস্কারক। তিনি বললেন যে, যুক্তরাষ্ট্রে ইতিমধ্যেই যথেষ্ট সংখ্যায় সাধারণ ধরনের গবেষণা ইনস্টিটিউট রয়েছে। কাজেই প্রয়োজন হল নতুন ধরনের একটা সংস্থা গড়ার। তখন সারা পৃথিবী জুড়ে চলছে এক অভূতপূর্ব আর্থিক মন্দার অবস্থা। কিন্তু ফ্লেক্সনারের সহযোগিতায় বিদ্যোৎসাহী বম্‌বার্জার এবং ফাল্ড বিপুল

উদ্যম ও অধ্যবসায়ের সঙ্গে এগিয়ে চললেন। প্রস্তাবিত সংস্থার প্রধান সংগঠক হলেন স্বয়ং ফ্লেক্সনার এবং এর নাম দেয়া হল 'ইনস্টিটিউট ফর অ্যাডভান্সড স্টাডিজ।'

ফ্লেক্সনারের আইডিয়া অনুযায়ী ঠিক হল যে, একদল বিশিষ্ট বিজ্ঞানী সবরকম শিক্ষাদান, প্রশাসন ও স্থূল বিষয়চিন্তা থেকে মুক্ত হয়ে মৌলিক সমস্যাদির সমাধানে আত্মনিয়োগ করবেন। প্রস্তাবিত ইনস্টিটিউটের এঁরা হবেন মধ্যমণি। আর এঁদের চারধারে সমবেত হবেন বিশ্বের সব প্রতিভাধর তরুণ স্কলারেরা। যত্র বিশ্ব ভবত্যেক নীড়ম্। বিজ্ঞানীদের আমন্ত্রণলিপিতে ইনস্টিটিউটের উদ্দেশ্য এবং লক্ষ্য ব্যাখ্যা করে জোর দেয়া হল কাজ করার স্বাধিকারের ওপর। ফ্লেক্স-নারের নিজের কথায়—"It should be a haven where scholars and scientists may regard the world and its phenomena as their laboratory without being carried off in the maelstrom of the immediate."

ফ্লেক্সনার ঠিক করলেন, প্রথমে গণিতধর্মী বিজ্ঞানের স্কলারদের নিয়ে ইনস্টিটিউটের 'কেন্দ্র'-কে গড়ে তুলবেন। প্রিন্সটন বিশ্ব-বিদ্যালয়ের সুন্দর ক্যাম্পাসের গথিক স্টাইলের গণিত-বিল্ডিং-এর নাম 'ফাইন হল'। ঐ ফাইন হলের একাংশে সাময়িকভাবে ইনস্টিটিউট চালু করা হল। পরে ১৯৪০-এ এটি চলে যায় বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্জনতর আর একটি বিল্ডিং-এ। এটি ছিল ক্যাম্পাসের বাইরে এবং প্রিন্সটন থেকে দূরে। হাঁটাপথে প্রায় আধ ঘণ্টা।

১৯৩২-র জানুয়ারী। শ্রুতকীর্তি পদার্থবিদ্ মিলিকান প্যাসা-ডেনায় অভিমত প্রকাশ করলেন যে, ইনস্টিটিউট অব্ অ্যাডভান্সড স্টাডিজ-এর পরিকল্পনা নিয়ে ফ্লেক্সনার যেন অবশ্যই আইনস্টাইনের সঙ্গে আলোচনা করেন। আইনস্টাইন তখন ক্যালিফোর্নিয়ায়। প্রথম দিকে ফ্লেক্সনার আইনস্টাইনের কাছে যেতে ইতস্তত করছিলেন। শেষে যখন গেলেন তখন তাঁর আন্তরিক মিশুকে প্রকৃতিতে একেবারে

সম্মোহিত হয়ে যান। পরে দু'জনের আবার দেখা হয় ইংল্যাণ্ডের অক্সফোর্ডে। এবারে ফ্লেক্সনার আইনস্টাইনকে তাঁর ইনস্টিটিউটে অধ্যাপকরূপে যোগ দিতে সরাসরি আমন্ত্রণ জানালেন। পাকাপাকি কিছু হল না বটে, তবে দুজনেই ব্যাপারটি নিয়ে কথাবার্তা চালিয়ে যেতে সম্মত হলেন।

ইতিমধ্যে আইনস্টাইনের কাছে স্পষ্ট হয়ে গেছে যে, জার্মানীতে আর থাকা চলবে না। অবশ্য, ফ্লেক্সনারকে তিনি বললেন—'আশা করছি, অন্তত বছরের কিছুটা সময় বার্লিনে কাটাতে পারব।"

১৯৩৩-এর শরৎকালে আইনস্টাইন প্রিন্সটনে এলেন এবং ইনস্টিটিউট অব্ অ্যাডভান্সড স্টাডিজে যোগ দিলেন। নেহাতই রাজনৈতিক কারণে য়ুরোপ ছেড়ে আইনস্টাইনের এই আমেরিকা যাত্রায় তাঁর বিশিষ্ট বন্ধু বিজ্ঞানী লাঁজভা মন্তব্য করেন—"ব্যাপারটা পোপের প্রাসাদকে রোম থেকে নতুন জগতে সরিয়ে নেয়ার সামিল। পদার্থবিজ্ঞানের পোপ রোম ছেড়ে চলে গেলেন। এখন থেকে আমেরিকাই হবে পদার্থবিজ্ঞানের কেন্দ্র।" যা হোক, এক হিসেবে ইনস্টিটিউটের পদ নিয়ে তিনি মোটেই সন্তুষ্ট ছিলেন না। তিনি প্রায়ই বলতেন—গবেষণা কাজের জন্য বেতন নেয়া ঠিক নয়। অধ্যাপনার কর্তব্যমুক্ত গবেষণায় ত নয়ই। গবেষণা হল অন্তরের প্রেরণার জিনিস। লেকচার, সেমিনার, পরীক্ষার সেশন, সভাসমিতি ইত্যাদির মাঝে যেটুকু অবকাশ বস্তুত তাকেই তিনি নিজস্ব সময় বলে ভাবতেন। এ হিসেবে বার্লিনে তাঁর কাজ ছিল প্রাগ বা জুরিখের তুলনায় হাল্কা। আর প্রিন্সটনে তা শূন্যে এসে দাঁড়াল। নিজের কৌতূহল মেটানোর সঙ্গে সঙ্গে সমানমনা কয়েকজন তরুণ স্কলারের সঙ্গেও তিনি সহযোগিতা করতেন। এঁদের মধ্যে ছিলেন—ওয়াল্টার মেয়ার। ইনি ১৯২৯-৩৪ পর্যন্ত তাঁর সহকারী ছিলেন; আইনস্টাইনই এঁকে বার্লিন থেকে সঙ্গে এনেছিলেন। প্রিন্সটনে ১৯৪৮-এ ইনি মারা যান। ছিলেন নাথান

রোজেন ( ১৯৩৪-৩৫ ); পিটার জি. বার্গমান ( ১৯৩৭-৩৮ ) এবং ভ্যালেন্তিন বার্গম্যান ( ১৯৩৮-৪৩ )। দুই বার্গমানের নামের মিল প্রিন্সটনে বহু রসিকতা ও ভুল বোঝাবুঝির কারণ হয়েছিল। আর ছিলেন আর্নস্ট জি. স্ট্রাউস ( ১৯৪৪-৪৭ ), জন জি. কেমেনি ( ১৯৪৮-৪৯ ), রবার্ট ক্রেচনান ( ১৯৫০ ) এবং ব্রুরিয়া কাউফমান ( ১৯৫১-৫৫ )। কাউফমান ছিলেন উদীয়মান পদার্থবিদ। এক ইহুদী কীবুজে ( Kibbutz ) ইনি লেখাপড়া করেন। এঁর স্ফটিক-স্বচ্ছ চরিত্রের জন্য আইনস্টাইন এঁকে শ্রদ্ধার চোখে দেখতেন। ১৯৩৬-৩৮-এ আইনস্টাইনের সহযোগী ছিলেন লিওপোল্ড ইনফেল্ড। এই ইনফেল্ডের স্মৃতিচারণা থেকে ইতিপূর্বে আমরা বহু উদ্ধৃতি দিয়েছি। প্রবীণ সহকর্মিদের সঙ্গে প্রিন্সটনে আইনস্টাইনের যোগাযোগ ছিল না বললেই চলে।

নিছক বৈজ্ঞানিক কাজকর্মের জন্য দক্ষিণাগ্রহণে আইনস্টাইনের বিব্রতবোধ করার কথা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। এ ভাবটির পেছনে, যদিও সম্ভবত অবচৈতন্যে, গভীরতর কারণ রয়েছে। তিনি মনে করতেন, জীবনধারণের ব্যবস্থাটুকু গবেষণা ছাড়া অন্য কোন পেশার মাধ্যমে করা উচিত। যেমনটি করতেন বিশিষ্ট দার্শনিক স্পিনোজা। স্পিনোজার উদাহরণ আইনস্টাইনকে খুব আকৃষ্ট করেছিল। হীরে কাটার কাজ করে স্পিনোজা তাঁর স্থূল জীবনযাত্রা নির্বাহ করতেন। আইনস্টাইনও তাই অন্ততপক্ষে অধ্যাপনার কাজ করে বেতন নেয়া সঙ্গত মনে করতেন। আর শুধু একান্ত নিজস্ব সময়েই গবেষণায় ব্যাপৃত থাকা উচিত বলে ভাবতেন। এটা তাঁর স্বাধীনতাপ্রীতির অভিব্যক্তি। ইনস্টিটিউটের প্রযোজকবৃন্দ অবশ্য বৈজ্ঞানিকদের পূর্ণ স্বাধীনতা সম্পর্কে বারবার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। তবু আইনস্টাইন স্পিনোজার অবস্থার কোন আধুনিক রূপের সাহায্যে স্বাধীনতাকে নিশ্চিত করা বেশি পছন্দ করতেন।

কিন্তু আসলে তা মোটেই সম্ভব ছিল না। একীভূত ক্ষেত্রতত্ত্বের

সমস্যায় তিনি তখন বিভোর। এতে তাঁর সমস্ত সময়টুকু ঢেলে দেবার যে সুযোগ তিনি পেলেন তা প্রত্যাখ্যান করতে পারেন নি। প্রতিদিন সকালে চলে যেতেন ইনস্টিটিউটে, সেখানে গিয়ে প্রথমেই সহকর্মিদের নিয়ে বসতেন। তাঁদের কাজের অগ্রগতি, অসুবিধা এবং অন্বেষণের আশাপ্রদ ধারা নিয়ে শুরু হত আলোচনা। তারপর চলে যেতেন নিজের জন্য নির্দিষ্ট ঘরটিতে এবং অনেকটা অনুরূপ সমস্যা সমাধানে আত্মনিয়োগ করতেন।

তবে তাঁকে নানা বিক্ষিপ্ততারও শিকার হতে হত। সারা যুক্তরাষ্ট্রের মানুষ ক্রমাগত উপদেশ, সাহায্য, জনসভায় বক্তৃতা ইত্যাদি নানা অনুরোধে-উপরোধে তাঁকে পীড়িত করতেন। প্রায়ই তাঁরা যা চাইতেন তা পেতেনও। এর পরিণতি হল এই : যে বিজ্ঞানী মানসিক দিক থেকে ছিলেন সর্বদা নির্জনতাপিপাসু তিনি অন্যান্য বিশ্বখ্যাত বিজ্ঞানী-দের চেয়ে ক্রমাগত বেশি করে জনসংযোগে বাধ্য হলেন। এজন্য বাইরের অবস্থাই যে শুধু দায়ী তা নয়, আইনস্টাইনের বিশ্বদৃষ্টিও সমভাবে দায়ী।

একবার লণ্ডনে আইনস্টাইনকে এক সভায় বক্তৃতা করতে হয়। সভার একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল জার্মান থেকে পালিয়ে-আসা বিজ্ঞানীদের কাজ পাইয়ে দেয়া এবং আর্থিক সাহায্য করা। তিনি তাঁদের পরামর্শ দিলেন : বাতিস্তম্ভের রক্ষকের চাকরি একটা চমৎকার জিনিস হবে। এটা কোন রকম ঠাট্টা বা রসিকতা ছিল না। লাইটহাউসের নির্জনতা আইনস্টাইনকে খুব টানত। গবেষণার পক্ষে তিনি এটাকে আদর্শস্থান বলে ভাবতেন। দৈনন্দিন ছোটখাট ব্যাপারগুলো তাঁকে বিজ্ঞানের কাজ থেকে বিচ্যুত করত এবং তা নিয়ে তিনি অভিযোগও করতেন। আর একটা গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার ছিল নিজের কাজে তাঁর পুরোপুরি স্বাধীনতার প্রয়োজনীয়তা।

ইনফেল্ডের বক্তব্যও এ কথার সাক্ষ্য দেয়। তিনি লিখেছেন—"উনি বহুবার আমায় বলেছেন, নিজ হাতে কাজ করে দৈনন্দিন রুটির

ব্যবস্থা করায় তিনি মোটেই কিছু মনে করবেন না। কিছু একটা প্রয়োজনীয় কাজ করে রুজির ব্যবস্থা, যেমন জুতো তৈরি, আর সেই সঙ্গে হবি হিসেবে পদার্থবিত্থার চর্চা—এই হল আদর্শ। বিশ্ববিত্থালয়ে পদার্থবিজ্ঞান পড়িয়ে টাকা উপার্জনের চেয়েও এ আকর্ষণীয়। তাঁর এই মনোভাবের পেছনে গভীর কিছু একটা লুকানো আছে। একটা ধর্মীয় অনুভূতি—তার সঙ্গে জড়িয়ে বৈজ্ঞানিক কর্মসাধনা। এ যেন প্রথম যুগের খ্রীস্টীয় যোগীদের কথা মনে করিয়ে দেয়। পদার্থ-বিজ্ঞান নিঃসন্দেহে মহান ও গুরুত্বপূর্ণ। তা থেকে অর্থোপার্জন ভাল, কিন্তু আরও ভাল হল জীবনযাত্রা চালাতে অন্য কিছু একটা করা। যেমন লাইটহাউসের রক্ষণাবেক্ষণ বা জুতো তৈরি, এবং পদার্থবিজ্ঞানকে দূরে পরিচ্ছন্ন ও পবিত্র করে রাখা। এটাকে হাস্যকর সারল্য বলে মনে হতে পারে, কিন্তু আইনস্টাইন চরিত্রের সঙ্গে এর বিলক্ষণ মিল রয়েছে।”

জার্মানী ছেড়ে যুক্তরাষ্ট্রে যাওয়ার অনেক আগে আইনস্টাইন বুঝতে পেরেছিলেন যে, বিজ্ঞানের ট্র্যাজিডি দ্রুত ঘনিয়ে আসছে। ধ্বংসাত্মক কাজে শীগগিরই এর চূড়ান্ত অপব্যবহার হবে। নতুন নতুন বিস্ফোরক, বিমান আক্রমণ, ট্যাঙ্ক এবং বিষাক্ত গ্যাস নিয়ে প্রথম বিশ্ব-যুদ্ধ (১৯১৪-১৮) ছিল তাঁর কাছে এক তিক্ত অভিজ্ঞতা। পদার্থবিজ্ঞান ও রাসায়নিক অগ্রগতির আরও মারাত্মক প্রয়োগের কথা ভেবে তিনি অফিসিয়াল বিজ্ঞানের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করাই পছন্দ করছিলেন। অন্যান্য চিন্তার কথা বাদ দিলেও ইতিমধ্যে তিনি বিজ্ঞানের ব্যবহারে-অপব্যবহারে বিজ্ঞানীর দায়িত্ব উপলব্ধি করেছেন। পরবর্তীকালে এ মনোভাব থেকে তিনি বিজ্ঞান ও কারিগরি গবেষণায় সক্রিয় হস্তক্ষেপ করেন এবং ভবিষ্যৎ ট্র্যাজিডির বিরুদ্ধে সকলকে সচেতন হতে আবেদন জানান।

অসংখ্য দেখা-শোনা এবং অনুরোধ-উপরোধ রাখতে গিয়ে গবেষণার জন্য আইনস্টাইনের হাতে খুব অল্প সময়ই অবশিষ্ট থাকত। তাঁর

কাছে এ সব থেকে নিষ্কৃতি পাওয়ার এক আদর্শ জায়গা ছিল লাইট-হাউস। জনতার প্রতি আইনস্টাইনের যে ভালবাসা তা মোটেই বিমূর্ত ভালবাসা ছিল না। মানবজাতির ভাগ্যকে ব্যক্তি-মানুষের অবস্থার চিন্তাদ্বারা আচ্ছন্ন হতে দেয়ার মানুষ তিনি ছিলেন না। এ ছিল তাঁর কাছে এক দায়স্বরূপ। কারণ, তাঁর মন প্রাত্যহিক স্থূলতার অনেক উর্ধ্বে বিরাজ করত এবং নিজের মধ্যে কাজ করার প্রেরণা ছিল খুবই দৃঢ়।

ইনফেল্ড লিখেছেন—“যদিও বৈজ্ঞানিক নানা আইডিয়া এবং পদার্থবিজ্ঞান তাঁর প্রাণপ্রিয় ছিল তবু যখনই বুঝেছেন কোন ব্যাপারে তাঁর সাহায্য প্রয়োজন এবং তা কার্যকরী হতে পারে তখনই তিনি নির্দ্বিধায় সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন। তিনি হাজার হাজার সুপারিশ পত্র লিখেছেন, শত শত ব্যক্তিকে উপদেশ দিয়েছেন। এক পাগলের সঙ্গে শুধু এই কারণে ঘণ্টার পর ঘণ্টা আলাপ করেছেন যে, তার পরিবারের লোকজনের বিশ্বাস একমাত্র আইনস্টাইনই তাকে সারিয়ে তুলতে পারেন। তিনি ছিলেন সদয়, সদাহাস্যময় ও সমঝদার। সাক্ষাৎপ্রার্থীদের সঙ্গে আলাপমুখর, অথচ ধৈর্যের সঙ্গে সেই মুহূর্তটির জন্য অপেক্ষারত যখন নিজের কাজে আপনাতে আপনি বিভোর হয়ে থাকবেন।”

আইনস্টাইনের বিবিক্ততা কিন্তু অপেক্ষমান বৈজ্ঞানিক সমস্যায় ভারাক্রান্ত মানসিক একাকীত্বের আস্বাদন-আকাঙ্ক্ষা থেকে উদ্ভূত নয়। তাঁর মনোভাবের অন্তর্দর্শনের সন্ধান মেলে তাঁর “The world as I see it” প্রবন্ধে। সেখানে তিনি বলেছেন—“আমার গভীর সামাজিক ন্যায়বিচার ও দায়িত্ববোধ এবং সেই সঙ্গে বিভিন্ন ব্যক্তি ও মানবসমাজের সঙ্গে আমার প্রত্যক্ষ যোগাযোগ স্থাপনের প্রয়োজন বন্ধন থেকে মুক্তি-কামনা একেবারেই খাপ খায় না। চলার পথে আমি নিঃসঙ্গ পথিক। নিজের দেশ, ঘর, বন্ধুবান্ধব, এমন কি, একান্ত অন্তরঙ্গ পরিবারের সঙ্গেও আমি সর্বান্তঃকরণে একাত্ম হতে পারিনি। এসব বন্ধন-

ডোরের সামনেও আমি একরোখা সম্পৃক্তভাব ও নিভৃতি-পিপাসা প্রকাশ করতে কখনও ছাড়িনি। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে দেখছি এ মনোভাব আরও বাড়ছে। অন্য লোকের সঙ্গে হৃদয় বিনিময় এবং সহানুভূতির সম্পর্ক স্থাপনের পথে এ যে কতো বড় অন্তরায় সে বিষয়ে আমি যথেষ্ট সচেতন। তবে এজন্য আমার কোন খেদ নেই। নিঃসন্দেহে, এ রকম লোকের সংবেদন বৃত্তি কিছুটা সঙ্কুচিত হয়। তার মনোবীণায় লঘু সুরের দোলা লাগে না। অন্যদিকে, এতে সঙ্গীসাথীর চিন্তাধারা, অভিমত ও অভ্যাসের প্রভাব থেকে বহুলাংশে মুক্ত থাকা যায় এবং এ রকম ক্ষণভঙ্গুর বুনিয়াদের ওপর নির্ভর করার প্রলোভন বর্জন করা চলে।"

এক নির্জনতা-পিপাসু নিঃসঙ্গ ধ্যানী এবং সেই সঙ্গে সামাজিক ন্যায়বিচারের এক উৎসাহী প্রবক্তা। এক খোলা অন্তঃকরণ এবং লোকসংসর্গে এক নিষ্ঠাময় উদ্বেল আনন্দ, সেই সঙ্গে নিজ অন্তর্জগতে একাকীত্বের অদম্য বাসনা। এই হল আইনস্টাইনের ভাবমূর্তি। বস্তুত, এ ভাবমূর্তি দৃশ্যত পরস্পরবিরোধী হলেও এর অন্তরালে সুগভীর সামঞ্জস্যের এক ফল্গুধারা প্রবহমান।

প্রথমত, 'ধ্যানী' কথাটা আইনস্টাইনের ক্ষেত্রে কিছুটা শর্তাধীনে গ্রহণ করতে হবে। এমন কি নিছক বিবরণের প্রবক্তাও কখন একেবারে প্রপঞ্চময় অবস্থানে থাকতে পারেন না। আর আইনস্টাইন ত ছিলেন 'কঠোর পরীক্ষা'র একজন বিশেষজ্ঞ। প্রকৃতির কাছ থেকে বৈজ্ঞানিক ধারণাসমূহের সক্রিয় দিকগুলো তিনি তৃতীয় স্তরের জেরার মাধ্যমে বের করে নিতেন। তিনি নিছক সাধারণ অর্থে 'ভাবুক' ছিলেন না। প্রত্যক্ষণীয় স্বতঃসিদ্ধতা বর্জন এবং কেবল সক্রিয়-পরীক্ষামূলক যাচাই-এ মূল্যায়ন সম্ভব এমন প্রক্রিয়ার জগতে প্রবেশ—বলতে গেলে এই ত আপেক্ষিকতা। আইনস্টাইনের কাছে জ্ঞান বা অবধারণ হল প্রকৃতিতে একটা হস্তক্ষেপ। যুক্তি ও বৈজ্ঞানিক ভিতের ওপর মানবজীবনকে নতুন রূপ দেয়া এর কাজ।

তন্নিষ্ঠ যৌক্তিকতা, সুসমঞ্জসতা, বিধিনিয়ম এবং নিখিল বিশ্বে কার্যকারণত্বের অনুসন্ধান থেকে মনে ইচ্ছে জাগে যে, মানবসমাজও প্রতিষ্ঠিত হোক যুক্তির ভিতে। বিশ্বসুষমার আবেগচালিত অনুসন্ধান থেকেই জন্ম নেয় সামাজিক ন্যায়পরায়ণতা, সামাজিক দায়িত্ববোধের আবেগময় ধারণা। অবশ্য, এজন্য নিত্য জনসংযোগ আদৌ জরুরী নয়। ইতিমধ্যে আইনস্টাইনের নিভৃতি-পিপাসা তাঁর অসংখ্য সামাজিক ক্রিয়াকলাপের সঙ্গে একত্রেই চলতে থাকল।

প্রিন্সটনে তাঁর পরিবেশের অব্যবহিত নির্জনতা এসব ক্রিয়াকাণ্ডে মোটেই ব্যাহত হয় নি। বৃহত্তর সামাজিক জগতে আইনস্টাইনের কৌতূহল এবং সমবেদনার ফলে শত্রু-মিত্র দুই সৃষ্টি হল। অবশ্য তাঁর অব্যবহিত পরিবেশকে তাঁরা খুব একটা প্রভাবিত করতে পারেন নি। মোটের উপর বিজ্ঞানী-সমাজ এমন স্তরে পৌঁছান নি যেখানে বৈজ্ঞানিক ও সামাজিক কৌতূহল একত্রে মিলতে পারে। বিজ্ঞানের নতুন সামাজিক মূল্য সম্পর্কে বিজ্ঞানীরা তখনও সচেতন হন নি। নিছক ভৌত-সমস্যার ক্ষেত্রে যেমন, তেমনি এক্ষেত্রেও বিশ ও ত্রিশের দশকে আইনস্টাইনের ভূমিকাটি ছিল অগ্রদূতের। যে সব চিন্তাধারার সঙ্গে তিনি পরিচিত ছিলেন তা পদার্থবিদদের মাত্র এই শতকের দ্বিতীয়ার্ধে সচেতন করে তোলে।

যে তাৎক্ষণিক সমস্যাবলী নিয়ে অধিকাংশ পদার্থবিদ সে সময় ব্যস্ত ছিলেন, আইনস্টাইন প্রিন্সটনের পুরো সময়টা ধরে তা থেকে ক্রমে দূরে সরে যান। একীভূত ক্ষেত্রতত্ত্বের ভিত্তিস্থাপনের উদ্দেশ্যে জটিল গাণিতিক রূপকল্পের সৃষ্টিতে তিনি তখন আত্মনিয়োগ করেন। ঐ তত্ত্বে কণিকাগুলোর ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া, এমন কি তাদের অস্তিত্বও এক সাধারণ ব্যাপক সূত্র থেকে লাভ করা চলবে। যেভাবে আইন-স্টাইন সমস্যার সম্মুখীন হতে চাইছিলেন তাতে অধিকাংশ পদার্থবিদ তাঁর সঙ্গে একমত ছিলেন না। অদীক্ষিতের কাছে এটা ছিল একেবারে দুর্বোধ্য এবং আইনস্টাইন নিজেও তত্ত্বটা নিয়ে খুশি ছিলেন না। তাঁর

তরফ থেকে তাই ক্রম-সংশোধন ও বিকশন প্রচেষ্টার অন্ত ছিল না। যা হোক, সমাধানগুলোর জটিলতা সত্ত্বেও, সামগ্রিক প্যাটার্নটি ছিল খুব আকর্ষণীয়। প্যাটার্নটির ভিত্তিতে ছিল সমরূপ (uniform) ভৌতবিধি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত এক যৌক্তিক একীভূত বিশ্বের ধারণা। প্যাটার্নটির বয়নে-বুননে ব্যাপকভাবে ভৌত ও গাণিতিক রূপকল্প ব্যবহৃত হয়েছিল। আয়তন ও জটিলতা দু-দিক থেকেই এগুলো ছিল হতবুদ্ধিকর। তবু বৈজ্ঞানিক পেশা থেকে দূরের মানুষের কাছে এর একটা নিজস্ব অপ্রতিরোধ্য আবেদন ছিল।

এই ব্যাপক অনুগামীর দল সমস্যার গভীরতা এবং সূক্ষ্মতায় প্রবেশ না করেই বিশ্ব-সুষমার ধারণাকে সর্বান্তঃকরণে গ্রহণ করেছিলেন। আইনস্টাইনকে ঘিরে ক্রমে তাঁদের সংখ্যা বাড়তে লাগল। অন্যদিকে সমমনস্ক লোকের সঙ্গে তাঁর যে অন্তরঙ্গ বৃত্তটি ছিল তা ক্রমে ছোট হয়ে এল। নিজ নিঃসঙ্গতায় আইনস্টাইন তাই গভীরভাবে সংবেদনশীল ছিলেন।

প্রিন্সটনে আসার অল্প কিছুদিন পরে আইনস্টাইন-গৃহিনী এলসাকে ফিরে যেতে হয় য়ুরোপে। বড় মেয়ে ইলসের শয্যাপার্শ্বে। ইলসে তখন প্যারিসে মৃত্যুশয্যায়। আত্মভোলা স্বামীর ভার দিয়ে যান ডক্টর ও মিসেস বাকি এবং সেক্রেটারি হেলেন ডুকাসকে। রোড-আইল্যাণ্ডে বাকি পরিবারের অতিথি হয়ে দিন কাটাচ্ছেন আইনস্টাইন। সঙ্গী বলতে দুই কিশোর। কোলাহলমুখর জগৎ থেকে দূরে নিরবচ্ছিন্ন নিরুপদ্রবে দিন চলছে তিন অসমবয়সী শিশু ও বৃদ্ধের; রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্বে আছেন মিসেস বাকি ও মিস ডুকাস।

ওদিকে প্যারিসে ইলসে মারা গেল। ইলসের মৃত্যু এলসার কাছে এক নিদারুণ আঘাত। বেদনায় তিনি একেবারে ভেঙে পড়লেন এবং হঠাৎ খুব বুড়িয়ে গেলেন। ছোট মেয়ে মার্গটকে সঙ্গী করে ফিরে এলেন প্রিন্সটনে, সঙ্গে বড় মেয়ের চিতাভস্মের আধার।

এরপর শুরু হল য়ুরোপ থেকে আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধুবান্ধবের আগমন। এলেন রুডলফ কাইজের—ইলসের স্বামী, যাকে ছেড়ে বাবার কাছে এল হান্স-আইনস্টাইন, এলেন ডাক্তার প্লেখ।

ইতিমধ্যে ১১২ নম্বর মার্সার স্ট্রীটে তাঁদের নিজস্ব বাড়ি প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। ভেতরের সাজসজ্জা এবং নতুন বাড়িকে সাজিয়ে-গুছিয়ে তোলার পুরো তদারকি করলেন এলসা নিজে। কিন্তু মেয়ের মৃত্যুতে যে মানসিক আঘাত পান তা থেকে কিছুতেই আর সেরে উঠতে পারলেন না। দেখা দিল প্রচণ্ড হৃদ্‌রোগ। সেই সঙ্গে মূত্রাশয়ের ব্যাধি। কিছুদিন নিউইয়র্কে কাটিয়ে মার্গট বাড়ি ফিরে দেখেন মা একেবারে শয্যাশায়ী, শরীর অত্যন্ত দুর্বল। আইনস্টাইন তাকে বললেন—"She has practically given up the fight"। আইনস্টাইনকে খুবই মলিন ও ভগ্নোদ্যম দেখাচ্ছিল, চোখেমুখে এক গভীর বিষাদের ছাপ।

এলসার অবস্থা ক্রমে খারাপ হতে লাগল। এ সময় ভ্যালেন্তিনাকে এক চিঠিতে এলসা লেখেন—"I would never have thought that I meant that much to him, and I'm very happy to know this now."।

এলসার স্বাস্থ্যোদ্ধারের জন্য গ্রীষ্মে আইনস্টাইন কানাডার মন্ট্রিলের কাছে এক হ্রদের তীরে সুদৃশ্য একটি পুরনো বাড়ি ভাড়া করলেন। বাড়ির চারপাশে সুন্দর বনরাজিনীলা। নতুন পরিবেশে এলসা বেশ ভাল বোধ করলেন। আইনস্টাইন নিজেও আবার শুরু করলেন নৌকোভ্রমণ। এলসার সব ভাবনা-চিন্তা এখন স্বামীকে ঘিরে। ভ্যালেন্তিনাকে লিখলেন—"He is in fine trim and has lately solved some problems. It will be a long time though, before these are understood and utilized. He himself thinks this is the best of his achievements."।

এলসা আর ভাল হলেন না। ১৯৩৬-এর ডিসেম্বরে মারা গেলেন।

আইনস্টাইন আগের ধাঁচেই জীবন কাটাতে লাগলেন। লাল লাল ইঁটের বাড়ি-ঘেরা প্রিন্সটনের রাস্তা দিয়ে তিনি যখন হাঁটতেন তখন জেগে উঠত ইংল্যাণ্ডের স্মৃতি। পাঠকক্ষে বসে আরব্ধ একীভূত ক্ষেত্র-তত্ত্বের গাণিতিক কাজ চলতেই লাগল। তবু তিনি এখন অনেক পাল্টে গেছেন। এলসার অভাব যেন কিছুতেই পূরণ করতে পারছিলেন না। এক সময় প্রিন্সটনে এলসা বলেছিলেন—"সময়ের সঙ্গে আমরা সবাই পাল্টে যাই কারণ পরিবেশ, কামনা-বাসনা বা অন্যান্য প্রভাবের দ্বারা আমরা নিয়ন্ত্রিত। ব্যতিক্রম শুধু আলবার্ট। যখন ছোট্ট বালক ছিল তখন যেমনটি ছিল, প্রবীণ হয়ে এখনও ঠিক তেমনি আছে।" কিন্তু মহাকাল এখন তাঁরও পরিবর্তন ঘটাল। এতখানি নিঃসঙ্গতা আগে আর কখনও বোধ করেন নি। দেহমনে আইনস্টাইন বৃদ্ধ হয়ে উঠলেন। বলতেন—"বড় ক্লান্ত লাগে, চিন্তা করার শক্তি কমে আসছে, সহজে আর অঙ্ক কষতে পারিনে।......প্রিন্সটনে ওরা আমায় বুড়ো-হাবড়া ভাবছে।"

১৯৪৯-র মার্চে আইনস্টাইনের সত্তর বছর পূর্তি হল। এই উপলক্ষে বন্ধুদের কাছ থেকে তিনি বহু অভিনন্দন বার্তা পেলেন। প্রত্যুত্তরে তিনি তাঁদের যা লিখলেন সেগুলোয় নিঃসঙ্গতাবোধ এবং বিষাদের ছাপটি স্পষ্ট। গুরুতর পেটের অপারেশন থেকে তিনি তখন সদ্য সেরে উঠেছেন। আশঙ্কা করা হয়েছিল পাকস্থলীর ক্যান্সার। সৌভাগ্যক্রমে তা ভিত্তিহীন প্রমাণিত হয়েছে। তবে শরীর বড় দুর্বল। কিন্তু এ অবস্থাতেও তাঁর রঙ্গরস, স্ফূর্তি এবং মানুষের প্রতি কৌতূহল একটুও কমেনি। এমন কি, একীভূত ক্ষেত্রতত্ত্বের মূল সমস্যার সমাধানে মনঃসংযোগ করাতেও স্বাস্থ্য বাধা হয়ে ওঠেনি। কিন্তু তা সত্ত্বেও তাঁর মনোভাবে সর্বদাই একটা বিষাদের ছাপ বিরাজ করত। এ প্রসঙ্গে ১৯৪৯-র মার্চের শেষ দিকে সোলোভিনকে লেখা

চিঠিটির উল্লেখ করা যেতে পারে।

"তোমার স্নেহমাখা চিঠিখানা পেয়ে আমি অভিভূত। এ দুঃসময়ে যে অসংখ্য চিঠি আমি পেয়েছি তাদের সঙ্গে তোমার চিঠির কী দুস্তর পার্থক্য! নিজ জীবনের কর্মকাণ্ডের দিকে আমি গভীর আত্ম-প্রসাদে পেছন ফিরে তাকাই বলে হয়ত তোমাদের ধারণা। আরও ঘনিষ্ঠভাবে দেখলে ব্যাপারটা কিন্তু অত উজ্জ্বল দেখাত না। এমন একটা ধারণাও পাচ্ছিনে যার সম্পর্কে আমি খুব নিশ্চিত। এমন কি, আমি যে ঠিক পথে চলেছি সে সম্পর্কেও অনিশ্চয়তা রয়েছে। সমসাময়িকেরা আমায় একজন বিরুদ্ধবাদী এবং প্রতিক্রিয়াশীল বলে মনে করেন। বলতে গেলে, এই প্রতিক্রিয়াশীল ব্যক্তিটি আজ নিজেকে ছাড়িয়ে বেঁচে আছে। অবশ্য প্রথাসিদ্ধতা এবং দূরদৃষ্টি এই দুয়ের অভাবই এর কারণ। তবে নিজেও তৃপ্ত নই। সত্যি বলতে কি, যদি তোমার সূক্ষ্ম মানসিকতা থাকে, যদি সৎ হও এবং যদি তোমার রসবোধ এবং নম্রতা এমন সাম্যভাব সৃষ্টি করতে পারে যা বাহ্যিক প্রভাবে প্রভাবিত হয় না তবে এ ছাড়া আর কিছু ঘটাও মুস্কিল।"

চিঠিতে আইনস্টাইনের তৎকালীন মানসিকতার ছাপ ফুটে উঠেছে ; সেই সঙ্গে আইনস্টাইনের ব্যক্তিত্বের কিছু বৈশিষ্ট্যও। এতে একীভূত ক্ষেত্রতত্ত্ব নিয়ে নিজের কাজ সম্পর্কে যেমন অতৃপ্তির প্রতিফলন রয়েছে, তেমনি রয়েছে সাধারণভাবে তাঁর বিজ্ঞানী-চরিত্রের গভীরতার পরিচয়। আগেই বলা হয়েছে, আইনস্টাইন কখনও চরম সত্যের প্রকাশক দৈবজ্ঞরূপে নিজেকে জাহির করেন নি। তাঁর বৈজ্ঞানিক আইডিয়াগুলোর বিষয়বস্তুই চরম ধারণার পরিপন্থী। এর সঙ্গে তাঁর সূক্ষ্ম মন, সততা, বিনয় এবং রসবোধের পূর্ণ সামঞ্জস্য রয়েছে। এ গুণগুলো যে কোন মতান্ধতার বিরোধিতা করে থাকে। তাই তাঁর থিয়োরীর প্রভাব এত বেশী। জীবনের মূল্যবোধগুলোর পুনর্মূল্যায়ন যখন চলছিল তখনই এটি প্রকাশিত হয়।

পুনর্মূল্যায়নের অর্থ কিন্তু মূল্যবোধের বিসর্জন বা বর্জন নয়। এবং রিলেটিভিটিকে চরম মনে করারও কোন কারণ নেই। নম্রতা এবং রসবোধসিক্ত সূক্ষ্ম বিচারশীল মন কখনও সংশয়বাদিতা বা সব কিছুতে অবিশ্বাসের নেতিবাদে আচ্ছন্ন হয় না। যে মন মতান্ধতার বিরোধী সে কখনও নঙর্থক অন্ধবিশ্বাসের জন্ম দেয় না। এ সৃষ্টি করে শাশ্বত মূল্যবোধ। অপরিবর্তনীয় অর্থে শাশ্বত নয়, ক্রম-পরিবর্তিতরূপে চিরস্থায়ী অর্থে শাশ্বত।

আইনস্টাইনের মনোভাব ছিল মূলত গভীর আশাবাদী। কিন্তু তাতে অবশ্যম্ভাবীরূপে মুদ্রিত ছিল ইতস্ততোতা, সন্দেহ আর অনিশ্চয়তা। এগুলো সবই জীবন্ত কৌতূহলী মনকে একটা আচ্ছন্ন ও মৃত মন থেকে পৃথক করে। মোটের ওপর, একটা দ্ব্যর্থহীন প্রাঞ্জল বিশ্বরূপ-কে আইনস্টাইন পছন্দ করতেন। বিশ্বচিত্রে যে অস্পষ্টতা, ধোঁয়াটে এবং কুয়াশাচ্ছন্ন ভাব আছে সে সম্পর্কে তিনি সচেতন ছিলেন। এবং এটি মোটেই তাঁর পছন্দসই ছিল না। তিনি চাইতেন যে, বিশ্বছবি হবে স্পষ্ট, দ্ব্যর্থতামুক্ত এবং যথাযথ। রিলেটিভিটি পরিবেশিত স্পষ্ট বিশ্বছবির সঙ্গে কোয়াণ্টাম পদার্থবিজ্ঞানের বিশ্বচিত্রের অনিশ্চয়তার যে বিরোধ তার মনস্তাত্ত্বিক ভিত্তিটি এখানেই নিহিত।

চল্লিশ দশকের শেষদিকে এবং পঞ্চাশের দশকের গোড়ায় কিছু ঘনিষ্ঠ বন্ধুর মৃত্যুতে আইনস্টাইনের মানসিক সুরটি অনেকাংশে কেটে যায়। প্রতিটি নতুন মৃত্যুতে ভেসে ওঠে সহযোগী সেই সব বন্ধুর স্মৃতি যাঁরা তিরিশের দশকে মহাপ্রস্থান করেছেন। প্রিন্সটনে আইনস্টাইন যাঁকে প্রায়ই স্মরণ করতেন তিনি হলেন বন্ধুবর পল এরেনফেস্ট। ১৯৩৩-এ ইনি আত্মহত্যা করেন। এ কথা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। বিজ্ঞানীর কাছে বিজ্ঞান যে সমস্যা উপস্থিত করে এবং বিজ্ঞানী তার যে সমাধান পান—এ দুয়ের মধ্যে একটা দ্বন্দ্ব বা বিরোধ রয়েছে। আইনস্টাইন এরেনফেস্টের আত্মহত্যাকে অংশত সেই দ্বন্দ্বের অভিব্যক্তি বলে মনে করতেন। আত্মহত্যার আশু কারণ নিছক

ব্যক্তিগত হলেও গভীরতর কারণ হল জীবনের শেষ বছরগুলোতে তিনি ট্র্যাজিক অতৃপ্তির শিকার হয়েছিলেন।

১৯৩৪-এ এক 'শোক-লেখা'য় আইনস্টাইন মানুষ ও বিজ্ঞানী এরেনফেস্টের মূল্যায়ন করেন। তিনি লেখেন—"উচ্চগুণের অধিকারী মানুষেরা প্রায়ই এ জীবন স্বেচ্ছায় ছেড়ে চলে যাবেন। জীবনের নতুন ও কঠিনতর বাইরের পরিবেশের কাছে আত্মসমর্পণের অপারগতা বা অনিচ্ছা থেকে এ মনোবৃত্তি জাগে। নিজের অসহ্য অন্তর্দ্বন্দ্বের দরুন স্বাভাবিক জীবনযাত্রা নির্বাহে অস্বীকৃতি সুস্থ মনের অধিকারীর কাছে আজও এক বিরল ঘটনা। শুধু মহত্তম এবং নৈতিকতার উচ্চ-শিখরবাসী ব্যক্তিত্বের পক্ষেই এ সম্ভব। আমাদের বন্ধু পল এরেনফেস্ট ঠিক এ রকম এক ট্র্যাজিক অন্তর্দ্বন্দ্বের শিকার হন। যাঁরা তাঁকে ভালভাবে জানতেন ( সে সুযোগ আমার হয়েছিল ) তাঁরা জানেন যে, এই নিষ্কলঙ্ক ব্যক্তিত্ব মূলত সেই বিবেকের বিরোধের শিকার। বিশ্ব-বিদ্যালয়ের পঞ্চাশোর্ধ্ব অধ্যাপকমাত্রেই কোন-না-কোন ভাবে এই বিবেক দংশনে ভুগছেন।"

যে সমস্যার উপস্থাপনে বিজ্ঞান তাঁকে কণ্টকিত করেছে তার সমাধানে অপারগতা থেকে এ বিরোধের জন্ম। এসব সমস্যা সম্পর্কে এরেনফেস্টের স্বচ্ছ ধারণা ছিল। কিন্তু মননশীল সামর্থ্যের চেয়ে নিজের গঠনমূলক সামর্থ্যে তিনি কম আস্থাশীল ছিলেন। আইনস্টাইন লিখছেন—"শেষের কয়েক বছর এ অবস্থা খুব প্রকট হয়ে ওঠে। কারণ তত্ত্বীয় পদার্থবিজ্ঞানের সাম্প্রতিক সেই অদ্ভুত বিক্ষোভপূর্ণ বিকাশ—যা নিজ অন্তর দিয়ে পুরোপুরি গ্রহণ করা যায় না—তার অধ্যয়ন এবং অধ্যাপনা সর্বদাই একটা গুরুতর ব্যাপার। বিশেষ, যে মনের কাছে পরিচ্ছন্নতাই সব কিছু সেই গোঁড়া সৎ মনের অধিকারীর কাছে আরও গুরুতর। আবার সেই সঙ্গে রয়েছে নতুন চিন্তাধারাকে মেনে নেয়া বা খাপ খাইয়ে নেয়ার ক্রমবর্ধমান কাঠিন্য। পঞ্চাশোর্ধ্ব পাঠকও এর দ্বারা পীড়িত। এ পংক্তিগুলোর ক'জন পাঠক সেই

ট্র্যাজিডি পুরোপুরি হৃদয়ঙ্গম করতে পারবেন আমি জানি না। তবে মূলত এই ট্র্যাজিডির জন্যই তিনি জীবন থেকে স্বেচ্ছামুক্তি নিলেন।"

আইনস্টাইনের কাছে বিজ্ঞানের দাবী—একটা একীভূত ক্ষেত্র-তত্ত্ব এবং একটা স্পষ্ট দ্ব্যর্থহীন উত্তর পাওয়ার সম্ভাবনার মধ্যে যে বিরোধ তা—অতটা ট্র্যাজিক ছিল না। কিন্তু লোরেনৎস ও এরেনফেস্টের কাছে এ বিরোধ ছিল অনেক বেশি ট্র্যাজিক। আইনস্টাইন ছিলেন আজন্ম আশাবাদী। বিশ্ব-সুষমা এবং বিশ্বপরিজ্ঞেয়তায় অবিচলিত আস্থার ফলে এ আশাবাদিতা আরও পরিপুষ্ট হয়। সাধারণ আপেক্ষিক তত্ত্ব গড়ে তুলতে আইনস্টাইন প্রচণ্ড কাঠিন্যের সম্মুখীন হন এবং দীর্ঘ কয়েক বছরের অমানুষিক পরিশ্রম এবং মনীষায় ১৯১৯ সালে তা দূর হয়। আর একীভূত ক্ষেত্রতত্ত্ব গড়তে তিনি প্রচণ্ডতর, বলতে গেলে অলঙ্ঘ্য, কঠিনতার অভিজ্ঞতা অর্জন করেন। নিঃসন্দেহে, যথেষ্ট দুঃখাবহ সেই অভিজ্ঞতা। কিন্তু এর অন্তস্তলে ছিল তাঁর সুদৃঢ় প্রত্যয় যে, যত কঠিন ও ঘোরালোই হোক না কেন, বিজ্ঞানের পথ শেষ পর্যন্ত প্রকৃত বিশ্বসুষমার বিশ্বস্ত জ্ঞানের দিকে মুখ করা।

বাইরে থেকে আইনস্টাইন ছিলেন শান্ত এবং অচঞ্চল। কিন্তু তাঁর অন্তরে চলত বিরামহীন, আত্মনিষ্পেষক, প্রচণ্ড প্রভঞ্জন। একমাত্র যাঁরা ঘনিষ্ঠ তাঁরা ছাড়া আর কেউ এর সন্ধান রাখতেন না। বহিস্তরের ঠিক নিচেই চলত ঝড়ের নিত্য দাপাদাপি। মহাকবি গ্যেটে-কে বর্ণনা করা হয় শান্ত-দেবত্বের প্রতীকরূপে। আইনস্টাইন সে ধরনের শান্ত-দেবত্বের প্রতীক ছিলেন না। একীভূত ক্ষেত্রতত্ত্ব গড়ে তুলতে 'নিদারুণ গাণিতিক যন্ত্রণা'র কথা তিনি নিজেও লিখে গেছেন। এর পরে রয়েছে আরও দুর্গম পথের অস্তিত্ব! দুর্গং পথস্তৎ। সেটি হল তত্ত্বটিকে এমন পর্যায়ে নিয়ে যাওয়া যাতে পর্যবেক্ষণে এর সত্যতা যাচাই করা চলে। এ সম্পর্কে যখন নিজের অপারগতার কথা বলেন তখন বস্তুত তিনি এই বোধের দ্বারা নিষ্ঠুরভাবে পীড়িত হচ্ছিলেন যে, সমস্যাগুলো সব স্পষ্ট জানা আছে অথচ সমাধানে কী অপারগতা! শুধু দ্বিতীয়

এক আইনস্টাইনই এ অসহ্য বেদনার অংশীদার হতে পারেন।

প্রিন্সটনে আইনস্টাইন বারবার এরেনফেস্ট ট্র্যাজিডির উল্লেখ করতেন। ভ্যালেন্তিনের সঙ্গে কথোপকথনেও মন্তব্য করেছিলেন—নতুন প্রজন্মের সঙ্গে বিরোধ এরেনফেস্টকে একেবারে ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে দেয়।

ভ্যালেন্তিন লিখছেন—"কথাগুলো আইনস্টাইন আমায় বললেন আবেগ এবং সমর্পণের ভঙ্গিতে। কারণ তাঁকেও এই বিরোধের ভেতর দিয়ে যেতে হয়েছে। সমসাময়িক বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারার সঙ্গে যুক্ত থাকার সুখময় বছরগুলোতে যে নাটকের জন্ম সেটা এখন আরও গভীর হল। দুই প্রজন্মের যে স্বাভাবিক বিরোধ—একের সাহসী কল্পনা এবং অন্যের পথপ্রান্তে-পড়ে-থাকা পাথরের টুকরোর মতো পুরাতনী ধারণা—এ ঠিক তা নয়। তাঁর নাটক মানুষের নাটক—যে মানুষ বয়স হওয়া সত্ত্বেও নিজের পথে পদচারণা করেন। এ সেই পথ যা ক্রমে জনবিরল হয়ে আসে, বন্ধুবান্ধব ও তরুণের দল যে পথকে নিতান্ত ভ্রান্ত বলে ভাবেন এবং যা কোনদিন কোন গন্তব্যস্থলে পৌঁছে দেয় না।"

আইনস্টাইনের চিন্তাসূত্র যে বারবার প্রয়াত বন্ধুদের প্রতি ফিরে ফিরে গেছে তার কারণ এই অনুভূতি। এঁদের অন্যতম হলেন মেরী স্ক্লোডাওয়াস্কা কুরি। তাঁর মৃত্যুতে আইনস্টাইন লিখেছিলেন—"কোন প্রজন্মের এবং ইতিহাসের গতিপথের পক্ষে তার নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিত্বদের বৌদ্ধিক গুণাবলীর চেয়ে নৈতিক গুণাবলীই সম্ভবত বেশি তাৎপর্যপূর্ণ। এমন কি যা সচরাচর ভাবা হয় তার চেয়েও অনেক বেশি পরিমাণে প্রথমোক্তগুলো চারিত্রিক উন্নতির উপর নির্ভরশীল।"

প্রয়াত বন্ধুবর্গের স্মৃতি এবং তাঁদের আবেগমুখর জীবননাট্য তাঁর কাছে শুধু যে শান্ত, আত্মসমর্পিত বেদনার উৎস ছিল তা নয়। এ জীবননাটক মহান নৈতিক নির্মলতা, সত্য এবং মানুষের প্রতি অনুকম্পায় অচঞ্চল নিষ্ঠার সাক্ষ্য বহন করে। এ গুণগুলোই বিজ্ঞান এবং মানবসমাজের ভবিষ্যতকে লালিত ও পরিপুষ্ট করে।

আইনস্টাইন বলে চলেন—"আমার পরম সৌভাগ্য, দীর্ঘ বিশ বছর ধরে মহত্তম এবং অনাবিল বন্ধুত্বে আমি ম্যাডাম কুরির সঙ্গে যুক্ত ছিলাম। যত দিন গেছে তাঁর মানবিক মহত্ত্বের প্রতি আমার শ্রদ্ধা তত বেড়েছে। তাঁর মতো শক্তি, সঙ্কল্পের সততা, কঠোর আত্মসংযম, বস্তুনিষ্ঠা এবং ন্যায়বিচারের ক্ষমতা ব্যক্তিবিশেষের আধারে কদাচিৎ একত্রে দেখা গেছে। প্রতিটি মুহূর্তে নিজেকে সমাজের একজন সেবক বলে তিনি মনে করতেন। তাঁর গভীর নম্রতা তাঁকে আত্মতুষ্টির কোন অবকাশ দেয় নি। সমাজের রুক্ষতা এবং অবিচার বরদাস্ত করার বোধে তিনি মর্মে মর্মে পীড়িতা ছিলেন। এজন্য, অন্তরঙ্গ না হলে, বাইরের কঠোরতায় সহজেই তাঁকে ভুল বোঝার অবকাশ ছিল। এ হল এক অদ্ভুত কঠোরতা। শিল্পীসুলভ সুরের টানেও একে ব্যক্ত করা সম্ভব নয়!"

১৯৪৭-র মুখে পল লাঁজভা মারা গেলেন। বিজ্ঞানে শহীদদের তালিকায় যুক্ত হল উন্নত নৈতিক আদর্শবাদিতার আর একটি প্রতীক। এক চিঠিতে আইনস্টাইন সোলোভিনকে লিখলেন—"উনি ছিলেন আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধুদের একজন, এক অনন্য প্রতিভাধর মূর্তিমান সত্ত্ব।"

পরপারে-চলে-যাওয়া বন্ধুবান্ধব এবং বৈজ্ঞানিক সহকর্মিদের থেকে আইনস্টাইনের চিন্তা শেষ পর্যন্ত চলে যেত এলসার স্মৃতিচারণে। উনি কিছুতেই তাঁকে ভুলতে পারছিলেন না।

জীবনের অন্তিম বছরগুলোতে আইনস্টাইনের বিধিলিপি ছিল তাঁর একমাত্র বোন মাজার মৃত্যু-পথযাত্রার সাক্ষী হয়ে থাকা। সেই ছোট্ট মাজা, মিউনিখে তোলা ফোটোতে যাঁকে ভাই-এর অবিকল প্রতিরূপ বলে বোধ হত। ১৯৩৯-এ মাজা এবং তাঁর স্বামী ইতালীর ফ্লোরেন্স থেকে চলে আসেন প্রিন্সটনে। ফ্যাসি রাজত্বের অত্যাচারী পরিবেশ তাঁদের আর সহ্য হচ্ছিল না। স্বামী সাময়িকভাবে সুইজারল্যাণ্ড গেলে মাজা এলেন প্রিন্সটনে, দাদা আইনস্টাইনকে দেখতে। ভাই-বোনের চেহারার অপূর্ব সাদৃশ্যে প্রিন্সটনের বহু লোক বিস্মিত

হন। এমন কি, মাজার বাচনভঙ্গি, কণ্ঠস্বর, প্রতিটি বক্তব্যের বালসুলভ অথচ সংশয়বাদী গঠন অদ্ভুতভাবে ভাই-এর বাখ্বিখির সঙ্গে হুবহু মিলে যেত।

১৯৪৭-এ আইনস্টাইন সোলোভিনকে চিঠিতে লিখলেন—'বাহ্যত আমার বোন ভালই বোধ করছে। কিন্তু যে পথে গেলে কেউ আর ফিরে আসে না, সে সেই পথের প্রায় প্রান্তে পৌঁছে গেছে। সমবয়স্কা অন্যান্যদের তুলনায় সে অতি দ্রুত ভেঙে পড়ছে।" পরবর্তী চিঠি-গুলোতেও রয়েছে বোনের স্বাস্থ্যহানির কথা। রোগক্লিষ্টা বোনের শিয়রে বসে আইনস্টাইন প্রতিদিন বহুক্ষণ ধরে পুরনো ধ্রুপদী সাহিত্য এবং অন্যান্য বই উচ্চ কণ্ঠে বোনকে পড়ে শোনাতেন। ১৯৫১-র গ্রীষ্মকালে পৃথিবীর মায়া কাটিয়ে মাজা চলে গেলেন। স্মৃতিভারে পড়ে রইলেন আইনস্টাইন। তাঁর ঘনিষ্ঠ পারিবারিক বৃত্তে এখন রইল শুধু সৎ মেয়ে মার্গট এবং একান্ত সচিব হেলেন ডুকাস।

আগেই বলা হয়েছে, প্রিন্সটনে আইনস্টাইন থাকতেন ইনস্টিটিউট অব্ অ্যাডভান্সড স্টাডিজের কাছে ১১২ নম্বর মার্সার স্ট্রিটের দোতলা বাড়িতে। যদি অসংখ্য ফটোগ্রাফে বাড়ির ভেতরটা মোড়া না থাকত তবে অন্যান্য অধ্যাপকের বাড়ি থেকে এ বাড়িটিকে আলাদা করে চেনা যেত না। ঐ ফটোগুলোই বাড়িটিকে সারা বিশ্বের কাছে সুপরিচিত করে তুলেছিল।

দরজা পর্যন্ত যে রাস্তা সেটি গেছে সযত্নে-ছাঁটা এক সার ঝোপড়া গাছের মাঝখানের ফাঁকা জায়গা দিয়ে। ভেতরে প্রবেশ পথের বাঁ দিক দিয়ে চলে গেছে কাঠের সিঁড়ি—একেবারে দোতলা পর্যন্ত, একটা দেয়াল বরাবর। দেয়ালটা আবার শুকনো ভুট্টোর কাঠি দিয়ে সুন্দর করে সাজানো।

আইনস্টাইনের পাঠকক্ষটি ছিল একটা বাগানের ওপর ঝুঁকে পড়া। বাগানে বেশ কয়েকটা সুন্দর গাছ। দরজার বিপরীত দেয়ালের প্রায় সবটা জুড়ে একটা জানালা। পেছনে আর বাঁ

দিকের দেয়াল জুড়ে সারিবদ্ধ বই-এর তাক। জানালার বাঁ দিকে ছোট্ট একটু জায়গা জুড়ে ঝুলছে একটা ছবি। সেটা মহাত্মা গান্ধীর। প্রবেশপথের ডান দিকে একটা দরজা। ওটা দিয়ে একটা চত্বরে যাওয়া যায়। আর একটা দরজা একেবারে সোজা পৌঁছে দেয় আইনস্টাইনের শয়নকক্ষে। কক্ষের দেয়ালে ঝোলানো রয়েছে অপূর্ব কয়েকটি ক্যানভাস—শিল্পী জোসেফ শার্ল, ফ্যারাডে ও ম্যাক্সওয়েলের।

জানালার সামনে বিরাট একটা ডেস্ক। ডেস্কের পাশে ছোট্ট টেবিল। টেবিলের ওপর কিছু পাইপ, একটা অস্ট্রেলিয়ান বুমেরঙ। প্রবেশ পথের কাছেই একটা গোল টেবিল এবং ইজি চেয়ার। ইজি চেয়ারে বসে হাঁটুর ওপর কাগজ রেখে আইনস্টাইন লিখতেন। লেখা কাগজগুলো রাখতেন নিজের চারধারে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে।

রোজই বেশ সকালে উনি বাড়ি থেকে বেড়িয়ে পড়তেন। হেঁটে চলে আসতেন ইনস্টিটিউটে। মার্সার স্ট্রীট ধরে ছায়াঘেরা গলিপথ দিয়ে ঢুকতেন প্রিন্সটনের সুদৃশ্য ক্যাম্পাসে। মনমাতানো নানা রকমারি গাছে ক্যাম্পাসের সে কী মনোহর শোভা! ম্যাপল, লিণ্ডেন্স ও আরো কত কী গাছ! শরতের ঝরা-আপেলে গলিপথটি একেবারে আকীর্ণ হয়ে যেত। কয়েকটি গলিপথকে দেখে মনে হত যেন টানেলের ভেতর দিয়ে গেছে। লিণ্ডেন্সের পরস্পর অদ্ভুত মিলনে এই টানেলের সৃষ্টি আর মাথার ওপরে প্লেন গাছের শিরোপা।

যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন আড্ডায় আইনস্টাইন সম্পর্কে বিভিন্ন মত পোষণ করা হত। প্রতিক্রিয়াশীলেরা তাঁকে বলতেন 'a red' অর্থাৎ কম্যুনিস্ট। যাজক পরিবারের কর্তারা এই 'refugee'র জনসমক্ষে ভাষণের বিরোধিতা করে কাগজে প্রতিবাদ পাঠাতেন। এ রেফিউজী নাকি ব্যক্তিগত ভগবান থেকে আমেরিকানদের বঞ্চিত করার ব্যবস্থা করছেন। কিন্তু সাধারণ নাগরিকেরা তাঁর প্রতি অত্যন্ত শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। তাঁর প্রতিটি বক্তব্যে তাঁরা উৎসাহ দেখাতেন এবং সেগুলোর মধ্যে অনেক জটিল ও গুরুত্বপূর্ণ সমস্যার সমাধান খুঁজতেন।

এ ব্যাপারে প্রিন্সটনের অধিবাসীরাও ছিলেন যুক্তরাষ্ট্র তথা সমগ্র বিশ্বের প্রতিরূপ। আইনস্টাইনকে ঘিরে প্রিন্সটনে যে পরিবেশের সৃষ্টি হয়েছিল তা সত্যি উল্লেখযোগ্য। ইনস্টিটিউট থেকে বাড়ি এবং বাড়ি থেকে ইনস্টিটিউট-এর ছায়াছন্ন পথে আইনস্টাইনের পদচারণার মূর্তিটি ক্রমে প্রিন্সটনের ল্যাণ্ডস্কেপের অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে দাঁড়ায়। কফি হাউসের মালিক ও আগন্তুক উভয়েই আইনস্টাইনের খাদ্যরুচি এবং অভ্যাস সম্পর্কে জানতেন। দিনের ঐ সময়টুকু প্রিন্সটনবাসীরা আইনস্টাইনের সঙ্গে ভাবের আদান-প্রদানে ব্যয় করতেন। কালক্রমে এটি প্রথায় দাঁড়িয়ে যায়। অন্যদিকে, প্রিন্সটনবাসীরা তাঁর মধ্যে 'বিশ শতকের রূপকথার অন্যতম নায়ককে' দেখতেন। এ বিষয়ে ব্রিটিশ কলম্বিয়ার সেই স্কুল ছাত্রীটির সঙ্গে তাঁদের কোন প্রভেদ ছিল না। ছাত্রীটি আইনস্টাইনকে লিখেছিল— "আপনি সত্যি বাস্তবে আছেন কিনা তা জানার উদ্দেশ্যেই আমার চিঠি লেখা (I am writing to you to find out if you really exist)।" আইনস্টাইন সম্পর্কে পথের লোকের আইডিয়াও ছিল অনুরূপ। 'Something tremendous in loftiness, scope and paradoxicity' এবং সেই সঙ্গে 'based on ordinary human intuition'। বিশ্বখ্যাত বহু বিজ্ঞানী প্রিন্সটনে বাস করে গেছেন। কিন্তু তাঁদের কেউ এতটা 'সাধারণ' এবং সেই সঙ্গে এতটা 'উপকথার নায়ক' ছিলেন না। ঘুরে ফিরে আবার সেই একই প্রশ্ন এসে গেল। সেটি বিশ শতকের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যরূপে আইনস্টাইনের জনপ্রিয়তার প্রশ্ন।

আইনস্টাইন যে কয়েক বছর প্রিন্সটনে কাটান সে বছরগুলো প্রশ্নটির এক স্পষ্ট উত্তর দেয়া সম্ভব করেছে। অধিকাংশ পদার্থবিদ্ তাঁর বৈজ্ঞানিক কৌতূহলে অংশ নিতেন না। জনসাধারণের মধ্যেও সেগুলো স্বভাবত অপরিজ্ঞাত ছিল। কিন্তু তবু সাধারণ মানুষ সেই বিশের দশক থেকে যা অনুভব করেছেন তাই দৃঢ়ীভূত হয়েছে তাঁর

প্রিন্সটনের কাজে। তা হল: আইনস্টাইনের উদ্দেশ্য ছিল সব রকম মনুষ্যকেন্দ্রিকতা এবং মিস্টিকতা-মুক্ত এক যুক্তিগ্রাহ্য ও বস্তুনিষ্ঠ বিশ্বচিত্র উপস্থাপিত করা এবং প্রকৃতির মধ্যে যুক্তির সাম্রাজ্য আবিষ্কার করা। বিজ্ঞানের যুক্তিনিষ্ঠাকে জনসাধারণ সোল্লাসে যুক্তিনিষ্ঠ সামাজিক আদর্শের সঙ্গে অভিন্নভাবে দেখেছে। যিনি কসমসে ( cosmos ) সুসমঞ্জস সাম্রাজ্য আবিষ্কারের সন্ধানে ছিলেন এবং পৃথিবীতেও তার প্রতিষ্ঠা চেয়েছিলেন তিনি ত সাধারণ মানুষের মতোই হবেন। প্রিন্সটনবাসী যাঁরা তাঁকে প্রত্যহ দেখেছেন তাঁরা আইনস্টাইনের 'historic exploit' সম্পর্কে জানতেন। আর যাঁরা তাঁকে আদৌ দেখেন নি, কিন্তু তাঁর কাজ সম্পর্কে ধারণা ছিল, তাঁরা আইনস্টাইনের ব্যক্তিত্বের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে অনুমান করে নিয়েছিলেন।

আপেক্ষিক তত্ত্বের প্রয়োগে নিউক্লীয় পদার্থবিজ্ঞানে দু-রকম পারমাণবিক বিক্রিয়ার কথা ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছিল। ভারি পরমাণু কেন্দ্রকের বিভাজন বা হাল্কা পরমাণুর কেন্দ্রকের সংযোজন—ফিশন ও ফিউশন। উভয় ক্ষেত্রেই এক ধরনের পরমাণু অন্য পরমাণুতে রূপান্তরিত হয়। নবলব্ধ পরমাণুর ভর প্রাথমিক পরমাণুদের ভরের তুলনায় কম। ভরের এই হ্রাসে উভয় ক্ষেত্রেই শক্তির উদ্ভব ঘটে। উৎপন্ন শক্তির পরিমাণ ভর-হ্রাস × (আলোর বেগ)$^2$-এর সমান এবং অবিশ্বাস্য রকমের বেশি। সম-পরিমাণ পদার্থের দহনে উৎপন্ন তেজের চেয়ে শতসহস্রগুণ বেশি।

ভর ও শক্তির সমীকরণটি ( $E=Mc^2$ ) যখন বিশ শতকের প্রথম দশকে জার্মানী, সুইজারল্যাণ্ড বা চেকোশ্লোভাকিয়ায় তিনি ব্যাখ্যা করে বলতেন যে, সামান্য ভরের পরিবর্তে প্রচণ্ড শক্তির উদ্ভব ঘটবে তখন অনেকে জানতে চাইতেন কিভাবে এ শক্তিকে পাওয়া যাবে। উত্তরে আইনস্টাইন জানাতেন—"এ প্রাপ্তি আমাদের জীবদ্দশায় সম্ভব

নয়।" কিন্তু সে অসম্ভবও সম্ভব হল।

১৯৩০-র দশকের শেষ দিকে নিউট্রন দিয়ে য়ুরেনিয়ম পরমাণুর বিদারণ প্রক্রিয়া আবিষ্কৃত হল। এসব ভারি পরমাণুর কেন্দ্রক-কে নিউট্রন দিয়ে আঘাত করলে এরা দুটি ভিন্ন মৌলের পরমাণুতে রূপান্তরিত হয়। পর্যায় সারণীতে মৌল দুটির অবস্থান সারণীর মাঝামাঝি অঞ্চলে। শীগগিরই দেখা গেল যে, য়ুরেনিয়মের বিভাজনকালে নিউট্রনেরও উদ্ভব ঘটছে। আর ঐ উদ্ভূত নিউট্রন আবার সন্নিহিত য়ুরেনিয়ম পরমাণুর বিদারণ ঘটাচ্ছে। এভাবে একটা শৃঙ্খল প্রক্রিয়ার সৃষ্টি হয় এবং একবার চালু হলে এটি ক্রমে য়ুরেনিয়মের সামগ্রিক ভরে ব্যাপ্ত হয়ে পড়ে। ফ্রান্সের জোলিও-কুরি এবং ইতালীর এনরিকো ফের্মি তাঁদের গবেষণায় এই ফলাফল লাভ করেন। ফের্মি য়ুরেনিয়ম বিদারণের কাজ শুরু করেছিলেন মাতৃভূমি ইতালীতে। কিন্তু পরে মুসোলিনীর রাজত্বে বাধ্য হয়ে যুক্তরাষ্ট্রে পালিয়ে যান—এ কথা আগেই বলা হয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রে তখন এ বিষয়ে গবেষণা করছিলেন লিও জিলার্ড ও তাঁর সহকর্মীরা।

পরমাণু বোমার অভ্যুদয়ের প্রাক্কালে রাজনীতির আকাশে দেখা দিল কালো মেঘের ঘনঘটা। নাৎসীদের অধীনে জার্মানী তখন সামরিক ক্ষমতা ক্রমাগত বাড়িয়ে চলল। পদার্থবিজ্ঞানের গবেষণার সম্ভাব্য প্রয়োগ নিয়ে আইনস্টাইনের মনে তখন খুব শঙ্কা। তিনি বুঝলেন, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ আর খুব বেশি দূরে নয়। ইনফেল্ড লিখছেন যে, স্পেনের ঘটনাবলীর গুরুত্ব সম্পর্কে আইনস্টাইন অবহিত ছিলেন। প্রজাতন্ত্রের বিরুদ্ধে আক্রমণ ছিল মূলত সামগ্রিক ফ্যাসিবাদী আগ্রাসনের ড্রেস রিহার্সাল। মনেপ্রাণে তিনি প্রজাতন্ত্রের জয় কামনা করতেন। "যখন বললাম সান্ধ্য দৈনিকগুলোতে লয়্যালিস্টদের জয়ের সংবাদ বেরিয়েছে তখন তাঁর চোখে যে দীপ্তি দেখেছিলাম তা এখনও আমার মনে পড়ে"—লিখেছেন ইনফেল্ড।

বললেন—"That sounds like an angel's song."।

চোখেমুখে সে কী অদৃষ্টপূর্ব উদ্দীপনা!

দু'বছর যেতে না যেতেই শুরু হল যুদ্ধ। ১৯৩৯-র গ্রীষ্মকালে আইনস্টাইন এক জরুরি ও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সমস্যার সম্মুখীন হলেন।

ঐ বছর জুলাই মাসে পদার্থবিদ্ উইগনার ও জিলার্ড এলেন আইনস্টাইন সন্দর্শনে লঙ্ আয়ল্যাণ্ডের উত্তর উপকূলে এক জায়গায়। বছরে গরমের সময়টা আইনস্টাইন এখানে কাটাতেন। ঐ দুই পদার্থবিদের মিশন সম্পর্কে 'Brighter than a thousand súns' গ্রন্থে রবার্ট জুঙ্ লিখেছেন—

"আইনস্টাইনের বাড়ির খোঁজে অনেকক্ষণ ধরে দুজনে মিলে গাড়ি করে খুব ঘোরাঘুরি করলেন। হঠাৎ জিলার্ড চীৎকার করে উঠলেন—'ছেড়ে দাও, বাড়ি চল! অদৃষ্ট হয়ত চায় না এটা ঘটুক। এ রকম একটা ব্যাপারে সরকারী কর্তৃপক্ষের কাছে আবেদনের জন্য আইন-স্টাইনের সাহায্য নিলে আমরা হয়ত মারাত্মক ভুল করব। সরকার একবার কিছু পেলে ত আর ছাড়তে চায় না।'

"আপত্তি জানালেন উইগনার—'কিন্তু এ পদক্ষেপ গ্রহণ করা যে আমাদের কর্তব্য! এ সাংঘাতিক দুর্বিপাক এড়াতে এটা আমাদের করতেই হবে।'

"যে 'সাংঘাতিক দুর্বিপাক' এঁরা এড়াতে চাইছেন তা হল নাৎসী সরকারের পরমাণু বোমা উৎপাদন। যে সব খবর পাওয়া যাচ্ছিল তা থেকে জিলার্ড ও অন্যান্য পদার্থবিদদের ধারণা হয় যে, নাৎসী সৈন্যদের হাতে শীগগিরই পরমাণু বোমা তুলে দেয়া হবে। এ বিপদ সম্পর্কে যুক্তরাষ্ট্রকে সতর্ক করতে জিলার্ড দুয়ারে দুয়ারে ঘুরলেন। বড় বিজ্ঞানী বটেন, কিন্তু ক্ষমতাবানদের কাছে নেহাত অপরিচিত। তাঁদের সঙ্গে তাঁর কোনই যোগাযোগ ছিল না। তা ছাড়া, nuclear binding energy (পরমাণু কেন্দ্রের বন্ধনশক্তি) বা nuclear fission (কেন্দ্রক-বিভাজন) প্রভৃতি কথাগুলো, মনে হল, প্র্যাকটিক্যাল কাজের সঙ্গে সম্পর্কহীন। শেষ পর্যন্ত জিলার্ড সিদ্ধান্ত নিলেন:

সবচেয়ে ভাল হবে আইনস্টাইনের শরণ নেয়া এবং সেই সঙ্গে বেলজিয়ামের রানী এলিজাবেথের কাছে আবেদন করা। বেলজিয়ামে রয়েছে য়ুরেনিয়ম আকরিকের বিরাট সম্ভার। সেগুলো যাতে জার্মানদের হাতে না পড়ে জিলার্ড সেজন্যও সচেষ্ট হতে চাইলেন। তিনি ভাবলেন, য়ুরেনিয়ম বোমার সমস্যার প্রতি US-সরকারী কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে আইনস্টাইন সবচেয়ে উপযুক্ত ব্যক্তি। জিলার্ড অত্যন্ত গুরুভার দায়িত্ব বহন করছিলেন এবং নিজ উদ্দেশ্যের পথে ছোটখাট বাধাবিপত্তিকে অনেকটা দৈবের হাত বলে ভাবছিলেন। এই ঐতিহাসিক যাত্রার প্রতিটি খুঁটিনাটি তাঁর মনে গাঁথা ছিল।

"শেষে জিলার্ড ও উইগনারের সাহায্যে এগিয়ে এল সাত বছরের একটি বালক। বলল, আইনস্টাইনকে সে বিলক্ষণ চেনে এবং তিনি কোথায় থাকেন তা দেখিয়ে দিল।

"জিলার্ড লিখেছেন—'য়ুরেনিয়মে শৃঙ্খল প্রক্রিয়ার সম্ভাবনার কথা আইনস্টাইনের মনে আদৌ উদিত হয় নি। কিন্তু যেই এ সম্পর্কে বলতে শুরু করলাম, তক্ষুনি বুঝে ফেললেন এর সম্ভাব্য পরিণাম কী হতে পারে! এবং তৎক্ষণাৎ আমাদের সাহায্য করার প্রতিশ্রুতি দিলেন। কিন্তু, মনে হল, এ পর্যন্ত যা ভাবা হয়েছে সে সম্পর্কে বেলজিয়াম সরকারকে কিছু বলার আগে ওয়াশিংটন স্টেট ডিপার্টমেণ্টকে জানান সঙ্গত …। লঙ্ আয়ল্যাণ্ডে আইনস্টাইনের বাড়ি ছেড়ে যখন আমি এবং উইগনার চলে আসছি তখন অবস্থাটা এই রকম ছিল।'

"পরমাণু বিভাজনের এই নতুন চেহারা দেখে আইনস্টাইন খুব বিস্মিত হলেন। বারবার বললেন, 'আমার ধারণায় এটি আসেনি।' এ সময়ে বোর-ও আইনস্টাইনের সঙ্গে দেখা করতে আসেন এবং প্রসঙ্গটি নিয়ে আলোচনা হয়। বোর-কে আইনস্টাইন বললেন—'আমার জীবদ্দশায় এ শক্তি পাওয়া যাবে, কল্পনাও করিনি।'

"ওদিকে বন্ধুবান্ধব অনেকের সঙ্গে শলাপরামর্শ করলেন জিলার্ড। শেষে রুজভেল্টের বন্ধু ও প্রভাবশালী অর্থনীতিবিদ তথা বেসরকারী

পরামর্শদাতা ডঃ আলেকজাণ্ডার সাশের (Sachs) সঙ্গে দেখা করলেন। সাশ চট করে সংবাদের গুরুত্ব অনুধাবন করলেন। ঠিক হল, আইনস্টাইন সরাসরি প্রেসিডেন্টকে চিঠি লিখবেন এবং সাশ সেটা প্রেসিডেন্টের কাছে পৌঁছে দেবেন। চিঠির একটা মুসাবিদাও করা হল।

"২রা অগাস্ট। জিলার্ড আইনস্টাইনের সঙ্গে আবার দেখা করলেন। এ যাত্রায় তাঁর সঙ্গী ছিলেন হাঙ্গেরীয় বিজ্ঞানী ও কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক এডুওয়ার্ড টেলর (Teller)। উইগনার ইতিমধ্যে West coast-এ রওনা হয়ে গেছেন। সংশ্লিষ্ট সবাই ব্যাপারটির গুরুত্ব ও দায়িত্ব উপলব্ধি করেন এবং তখন এ সম্পর্কে সমস্ত খুঁটিনাটি, বিশেষ, চিঠির শেষ পর্যায়ের মুসাবিদায় উপযুক্ত শব্দ জোগানে কে কে অংশ নিয়েছিলেন তার রেকর্ড রাখার চেষ্টা হয়।

"জিলার্ড লিখেছেন—'যদ্দূর মনে পড়ে, আইনস্টাইন জার্মান ভাষায় টেলরকে চিঠিটির ডিক্টেশান দিলেন। ঐ চিঠির ভিত্তিতে আমি আরও দুটো চিঠি মুসাবিদা করলাম। একটা ছোট, অন্যটা কিছু দীর্ঘ। দুটোই প্রেসিডেন্টকে উদ্দেশ করে লেখা। আইনস্টাইনের উপরই ছেড়ে দিলাম কোন্‌টি তাঁর পছন্দ। বড় চিঠিটি তিনি পছন্দ করলেন। অনুসঙ্গরূপে আমি একটা স্মারকপত্র তৈরি করলাম।'

"কিন্তু টেলর বলেন যে, তাঁরা একটি চিঠি নিয়ে যান এবং আইনস্টাইন তাতে সই দেন মাত্র। আইনস্টাইনের নিজের অভিমতও তাই।" এ ঘটনার উল্লেখ করে পরবর্তীকালে আইনস্টাইন বলেন—"আমি শুধু টাইপকরা চিঠির নিচে সই করেছিলাম। দায়িত্ব আমার, তবে রচনাটি নয়।"

চিঠি লেখার এই কৃতকর্মের দরুন জীবনের শেষদিন পর্যন্ত তিনি অনুশোচনায় দগ্ধ হয়েছেন, মানবজাতির অস্তিত্ব বিলুপ্তির আশঙ্কার বিরুদ্ধে অকুতোভয়ে সংগ্রাম করে গেছেন। সে কথা এখন থাক। এই সেই চিঠি যার ফলাফল ছিল বিজ্ঞান তথা সভ্যতার ইতিহাসে এক সুদূরপ্রসারী ঘটনা।.

এফ. ডি. রুজভেল্ট
আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট
হোয়াইট হাউস
ওয়াশিংটন ডি. সি.

আলবার্ট আইনস্টাইন
ওল্ড গ্রোভ রোড
নাসাও পয়েন্ট
পেকোনিক, লং আয়ল্যাণ্ড
আগস্ট ২, ১৯৩৯

মহাশয়,

ই. ফের্মি ও এল. জিলার্ড-এর সাম্প্রতিক কাজের কিছু বিবরণ পাণ্ডুলিপি আকারে আমার কাছে পাঠান হয়েছে। তা থেকে ধারণা হচ্ছে, অদূর ভবিষ্যতে য়ুরেনিয়ম মৌল এক নতুন ও গুরুত্বপূর্ণ শক্তি-উৎসরূপে আত্মপ্রকাশ করবে। পরিস্থিতির কিছু কিছু দিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন। দরকার হলে, প্রশাসনকে দ্রুত সক্রিয় ব্যবস্থা নিতে হবে। তাই নিচের তথ্য ও সুপারিশগুলো আপনার গোচরে আনা আমার দায়িত্ব মনে করছি।

গত চার মাসে ফ্রান্সে জোলিও এবং আমেরিকায় ফের্মি ও জিলার্ডের কাজের ফলে একটা বিষয় সম্ভাবনাময় হয়ে উঠেছে। তা হল, বেশ কিছু পরিমাণ য়ুরেনিয়ম ভরের সঞ্চয়ের মধ্যে নিউক্লীয় শৃঙ্খল বিক্রিয়া চালু করা সম্ভব এবং তাতে বিপুল শক্তি ও প্রচুর রেডিয়ম-জাতীয় মৌল সৃষ্টি হবে। এখন এটা প্রায় অবধারিত মনে হচ্ছে যে, অদূর ভবিষ্যতে এটা ঘটতে চলেছে।

নতুন প্রক্রিয়াটি বোমা তৈরিতেও ব্যবহৃত হতে পারে। খুব নিশ্চয় করে বলা না গেলেও, মনে হয়, এভাবে এক নতুন ধরণের প্রচণ্ড শক্তিশালী বোমা তৈরি করা সম্ভব হবে। এ রকম একটা বোমা কোন জলযানে থাকলে বা বন্দরে বিস্ফোরিত হলে অনায়াসে পুরো বন্দরসহ আশেপাশের কিছু অঞ্চল একেবারে ধ্বংস করে ফেলতে পারবে। বিমানে বয়ে নিয়ে যাওয়ার পক্ষে অবশ্য এ বোমা খুব ভারি হবে।

শুধু নিকৃষ্টমানের কিছু য়ুরেনিয়ম আকরিকের সঞ্চয় যুক্তরাষ্ট্রে আছে। কানাডায় ও পূর্বতন চেকোশ্লোভাকিয়ায় কিছু উন্নত য়ুরেনিয়ম পাওয়া যায়। তবে য়ুরেনিয়মের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উৎস হল বেলজিয়াম কঙ্গো।

এই পরিপ্রেক্ষিতে শৃঙ্খল প্রক্রিয়া নিয়ে গবেষণারত আমেরিকার পদার্থবিদদের সঙ্গে প্রশাসনের স্থায়ী যোগাযোগ থাকা আপনি হয়ত দরকার মনে করতে পারেন। তা করার একটা সম্ভাব্য উপায় হল: আপনার বিশ্বাসভাজন এবং যিনি সম্ভবত বেসরকারী মর্যাদায় কাজ করতে পারবেন এমন কাউকে দায়িত্ব দেয়া। তাঁর কাজ মোটামুটি এ রকম হতে পারে:

(ক) সরকারী বিভাগগুলোর সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করা, কাজের অগ্রগতি সম্পর্কে তাদের অবহিত রাখা এবং যুক্তরাষ্ট্রের জন্য য়ুরেনিয়ম আকরিক সংগ্রহের সমস্যার প্রতি বিশেষ নজর রেখে সরকারকে কখন কী পদক্ষেপ নিতে হবে সে বিষয়ে সুপারিশ করা।

(খ) বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণাগারগুলোর সীমিত বাজেটে পরীক্ষামূলক যে কাজকর্ম চলছে তাকে প্রয়োজনে অর্থ-সাহায্যে ত্বরান্বিত করা। আর্থিক সাহায্যের জন্য সহযোগিতায় ইচ্ছুক ব্যক্তিদের সঙ্গে তিনি যোগাযোগ করবেন। সম্ভবত, সেই সঙ্গে প্রয়োজনীয় উপকরণে সমৃদ্ধ শিল্পসংস্থার ল্যাবরেটরীগুলোর সহযোগিতাও তিনি নেবেন।

মনে হয়, জার্মানী তার অধিকৃত চেকোশ্লোভাকিয়ার খনিগুলো থেকে য়ুরেনিয়ম বিক্রি কার্যত বন্ধ করে দিয়েছে। আগেই বোঝা গিয়েছিল যে, এ ব্যাপারে সে তড়িঘড়ি ব্যবস্থা নেবে। কেননা, জার্মান আণ্ডার সেক্রেটারী অব্ স্টেটের ছেলে ফন ভাইজেকার বার্লিনের কাইজার ভিলহেলম ইনস্টিটিউটের সঙ্গে যুক্ত। ওখানে এখন য়ুরেনিয়ম সংক্রান্ত মার্কিনী কাজগুলোর কিছু কিছুর পুনঃপরীক্ষা চলছে। ইতি—

ভবদীয়

আ. আইনস্টাইন।

*     *     *     *     *

আইনস্টাইনের এ হস্তক্ষেপ বহির্জগতের প্রতি তাঁর দৃষ্টিভঙ্গির দীর্ঘ ক্রমাভিব্যক্তির স্বাভাবিক পরিণতি। তা ছাড়া, কাজটি ছিল পারমাণবিক যুগের সূচনাবাহী।

আইনস্টাইন কী ধরনের স্কলার ছিলেন? গজদন্ত-মিনারবাসী, না ইতিহাসের মিছিলে সক্রিয় অংশগ্রহণকারী? আর্নস্ট কুনো ফিশার একদা স্পিনোজা ও লাইবনিজ এই দুই মহান দার্শনিকের তুলনা করেছিলেন। স্পিনোজা কখন ক্ষমতার দিকে ঝোঁকেন নি। ক্ষমতা থেকে তিনি সর্বদা দূরে দূরে থাকতেন। নির্জনে স্বাধীন চিন্তার জন্য বেছে নিয়েছিলেন হীরে কাটার কাজ। আর লাইবনিজ ছিলেন একেবারে বিপরীত প্রকৃতির। রাজ-উপদেষ্টা, অসংখ্য রাজনৈতিক ও প্রশাসক যোজনার উদ্ভাবক : তাঁর পত্র-ঐতিহ্য সংখ্যায় ১৫,০০০। এঁদের পার্থক্য শুধু ব্যক্তিগত পছন্দ-অপছন্দেই নয়। বিভিন্ন সময়ে প্রয়োজনের যে দাবী এঁদের ওপর চাপান হয় তাতে এবং সাধারণ ধ্যানধারণায়ও বিস্তর পার্থক্য রয়েছে। ফলে একজন জীবনের প্রাত্যহিক হৈ চৈ থেকে সদাপলায়নপর, অন্যজন জনসাধারণের বিষয়ে সতত সক্রিয়ভাবে যুক্ত।

আইনস্টাইনের দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে স্পিনোজার সাদৃশ্যই বেশি। তিনি প্রায়ই বলতেন—একজন স্কলারের পক্ষে আদর্শ পেশা হল শ্রমিক, মেকানিক বা লাইটহাউস রক্ষকের পেশা। দীর্ঘকাল তিনি অন্যের ব্যাপারে জড়িয়ে পড়া থেকে সবলে বিরত থেকেছেন। সযত্নে এড়িয়ে গেছেন জনসভাকে। নিজের বিশ্ববিদ্যালয়, শহর, দেশ বা পৃথিবীর ঘটনাবলীকে প্রভাবিত করার চেষ্টা থেকে বিরত থেকেছেন। বিজ্ঞান—বিশুদ্ধ বিজ্ঞান (শব্দটির যথার্থ অর্থে)—ছিল তাঁর একমাত্র ধ্যান, জ্ঞান এবং সাধনা।

অথচ কদাচিৎ আর কোন বিজ্ঞানী তাঁর চেয়ে বেশি সক্রিয়ভাবে এবং সাফল্যের সঙ্গে পার্থিব ব্যাপারে অংশ নিয়েছেন। আর এর

আরম্ভ ১৯৩৯ সালে নয়—আরও প্রায় পঁচিশ বছর আগে। প্রথম মহাযুদ্ধের সময় থেকে। খ্যাতির চূড়ায় ওঠার কালে, বিশ্বপরিক্রমার সময়, নাৎসীদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে—বস্তুত সারাজীবন ধরে—তিনি ক্রমেই বেশি করে নিজেকে বিশ্বের কার্যাবলীর সঙ্গে একাত্ম হয়ে পড়লেন। এখন ত তিনি মানুষের ব্যাপারে বিজ্ঞানের হস্তক্ষেপের জন্য পথ তৈরি করতে বিধিনির্দিষ্ট। আর এ হস্তক্ষেপ এমন এক পর্যায়ের বিশ্ব-ইতিহাসে যার কোন জুড়ি নেই।

অবশ্য পর পর যে সব ঘটনা ঘটল সেজন্য কাউকে দায়ী করা চলে না। আইনস্টাইনকে ত নয়ই। রুজভেল্টকে লেখা চিঠিতে তাঁর সই প্যাণ্ডোরার বাক্সের চাবিকাঠি ছিল না। কিন্তু যতটুকুই হোক, য়ুরেনিয়ম বিভাজনের ওপর পরীক্ষামূলক কাজ চালু করার ব্যাপারে তাঁর অংশগ্রহণ এবং পরে পরমাণু শক্তির সামরিক প্রয়োগের বিরুদ্ধে তাঁর সংগ্রাম ছিল কার্যত একটি যুগলক্ষণ। শুধু এজন্য নয় যে, ভর ও শক্তির তুল্যতা সূত্রটি আইনস্টাইনের আবিষ্কার। জনতার পাদপ্রদীপের আলোয় উদ্ভাসিত হলেও এমন একদিন ছিল যখন আপেক্ষিক তত্ত্ব ছিল মানুষী ক্রিয়াকর্ম ও স্বার্থ থেকে বহুদূরের একটা কিছুর প্রতীক।

আর এখন? নিছক তত্ত্ব ছাড়া আইনস্টাইনের কাজে যে আরো কিছু ছিল সেই স্বজ্ঞালব্ধ ধারণার যথার্থতা প্রমাণিত হচ্ছিল। মানুষ এক ঐতিহাসিক দিকচিহ্নে উপস্থিত হল যার ওপারে মানুষের সবচেয়ে সমুজ্জ্বল আশা এবং সবচেয়ে বড় ভীতির উৎস হয়ে উঠল বিজ্ঞান। এই সন্ধিক্ষণে কেউ যদি সংগ্রামে নিজের ভূমিকা পালনে অস্বীকার করেন তবে তার অর্থ বিজ্ঞানের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা। বিজ্ঞানের বস্তুনিষ্ঠা, যুক্তিবাদ এবং সত্যান্বেষণ দাবী করল যে, নিছক অস্তিত্বের জন্যই মানুষের ভয়কে দূর করতে হবে, আশাকে করে তুলতে হবে যথার্থ।

আইনস্টাইনের সামনে ছিল অ্যাটম বোমা হাতে বলদর্পী হিটলারের ছায়ামূর্তি। কিন্তু আমেরিকার প্রশাসন চক্রের উপরও তাঁর কোন আস্থা ছিল না। বরং আস্থাহীনতা এত বেশি ছিল যে, ইতিমধ্যে ১৯৪০-র সেপ্টেম্বরে আইনস্টাইন বলতে শুরু করেন, রুজভেল্টকে লেখা চিঠি তাঁর জীবনের সবচেয়ে দুর্ভাগ্যজনক ব্যাপার। তাঁর কাজের স্বপক্ষে একমাত্র যুক্তি ছিল যে, জার্মানী পরমাণু বোমা তৈরি করে ফেলতে পারে।

বস্তুত, হিটলারের পক্ষে যুদ্ধ শেষ হওয়ার আগে পরমাণু অস্ত্র হাতে পাওয়া কখন সম্ভব ছিল না। প্রথমত, ইতিহাস তাঁকে যে সময়-সীমা বরাদ্দ করেছিল তা নেহাতই অল্প। ১৯৪২-র শরৎকাল থেকে শুরু হয় সোভিয়েত লালফৌজের দূরন্ত অগ্রগতি এবং সেই সঙ্গে প্রচণ্ড বিমান আক্রমণ। এ অবস্থায় জার্মানীতে পরমাণু-চুল্লী তৈরির ব্যবস্থা করা ছিল অবাস্তব। তা ছাড়া, জার্মানীতে বৈজ্ঞানিক সমাজের পার্জিং এবং বহু প্রথম সারির বিজ্ঞানীর পলায়নে দেশে গবেষণার মান দ্রুত নেমে যায়। আর বহু পদার্থবিদ্ যাঁরা জার্মানীতে থেকে যান তাঁরাও বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের চেয়ে বেশি ব্যস্ত ছিলেন কি করে নাৎসীদের হাত থেকে বাঁচা যায়। য়ুরেনিয়ম বিভাজন সংক্রান্ত শৃঙ্খল প্রক্রিয়া নিয়ে কাজ করছিলেন বিজ্ঞানী ফ্রিৎশ হাউটারমান্স। লব্ধ ফলাফল তিনি গোপন রেখেছিলেন। একই কাজে হাইজেন-বার্গ এবং ভাইসেকার-ও নিযুক্ত আছেন শুনে তিনি অত্যন্ত বিচলিত হয়ে পড়েন। ম্যাক্স ফন লাওয়ে তখন তাঁকে আশ্বস্ত করে বলে-ছিলেন—"My dear colleague, no one ever invents any-thing he doesn't really want to"। তা ছাড়া, প্রয়োগধর্মী আবিষ্ক্রিয়ার উৎসরূপে তত্ত্বীয় পদার্থবিজ্ঞান সম্পর্কে হিটলার ও তাঁর চক্র খুব সন্দিগ্ধ ছিলেন। অতীন্দ্রিয় অনুপ্রেরণায় ফুয়েরারের বিশ্বাস ছিল। তাই তত্ত্বীয় পদার্থবিজ্ঞানের যুক্তিধর্মী এবং বস্তুনিষ্ঠ প্রকৃতি তাঁর কাছে বিজাতীয় বলে বোধ হত।

অবশ্য, এসব ভাবনা দিয়ে জার্মানীতে পরমাণু বোমার আবির্ভাবের সম্ভাবনা উড়িয়ে দেয়া যায় না। বড় জোর, এগুলো প্রয়োজনীয় গবেষণাকে বিলম্বিত করতে পারে। প্রকৃতই যা বাধা হয়ে দাঁড়াল তা হল ১৯৪২ সালে যুদ্ধের আকস্মিক গতি-পরিবর্তন। এ প্রশ্ন এবং সেই সঙ্গে অন্যান্য প্রাসঙ্গিক প্রশ্নের মীমাংসা হয়ে গেল ভল্গার তীরে। নাৎসী জার্মানীর পরাজয়ে বিশ্ববাসী হিটলারের হাতে অ্যাটম বোমা থাকার ভয়ঙ্কর বিপত্তি থেকে মুক্তি পেল।

আইনস্টাইনের পক্ষে ১৯৩৯ সালে এসব জানা অর্থাৎ ভবিষ্য-দর্শন সম্ভব ছিল না। তাঁর মাথায় নাৎসী অ্যাটম বোমার ছবি ঘুরতে শুরু করে আরও অনেক পরে।

আইনস্টাইনের চিঠিটি দেয়া হল আলেকজাণ্ডার শাসকে। উনি রুজভেল্টের হাতে চিঠিটি দিলেন ১১ই অক্টোবর, ১৯৩৯। চিঠি পেয়ে প্রেসিডেন্ট তেমন গা করলেন না। পরদিন প্রাতরাশের সময় স্বয়ং সাশ রুজভেল্টকে চিঠিটি পড়ে শোনালেন এবং একটা গল্প বললেন: ইংল্যাণ্ডে অবতরণ করার জন্য নেপোলিয়ন যখন বাষ্পীয় পোতের একটা ফ্লীট গড়ার প্রস্তাব নিয়ে ফরাসী সম্রাটের সঙ্গে দেখা করেন তখন নাকি রবার্ট ফাল্টনকে তিনি অন্যত্র পাঠিয়ে দেন। সাশ বললেন—"Had Napolean shown more imagination and humility at that time, the history of the nineteenth century would have taken a very different course."। নেপোলিয়ন যদি সে সময় আর একটু কল্পনাশক্তি ও বিনয়নম্রতা দেখাতেন তবে হয়ত উনিশ শতকের ইতিহাসের গতিপথ সম্পূর্ণ অন্য রকম হত।

এতে কাজ হল। গল্পটি শোনার পর রুজভেল্ট একটা চিরকুট লিখে প্রাতরাশ-পরিবেশকের হাতে দিলেন। অল্পক্ষণ পরে সে ফিরে এল নেপলিয়ঁ-ঐতিহ্যের এক বোতল ফরাসী ব্র্যাণ্ডি নিয়ে এবং তাই দিয়ে

ভরে দিল তাঁদের গেলাস। রুজভেল্ট তাঁর সামরিক উপদেষ্টা জেনারেল ওয়াটসনকে ডেকে পাঠালেন। চিঠিটি তাঁর হাতে দিয়ে বললেন—"ডাভ, দেখ ত, মনে হচ্ছে ব্যাপারটা গুরুতর।" চালু হল পরমাণু-বোমা তৈরির মেশিনের গীয়ার। অবশ্য, ভরবেগ অর্জন করল ধীরে, অতি ধীরে। লিম্যান জি. ব্রিগস-এর সভাপতিত্বে প্রেসিডেন্ট একটা কমিটি করলেন—ব্রিগস কমিটি। জেনারেল ওয়াটসন হলেন সংযোগ রক্ষাকারী অফিসার। ব্রিগস কমিটির কাজ হল পারমাণবিক বিস্ফোরণের সম্ভাব্য দিকটা খুঁটিয়ে দেখা। ডঃ শাসের ওপর ভার পড়ল কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞানীদের সঙ্গে সরকারী শাসকদের সহযোগিতা করা। আর ভ্যানেবার বুশ-এর নেতৃত্বে ন্যাশানাল ডিফেন্স রিসার্চ কমিটি একটা পরমাণু বোমা তৈরির ভার নিলেন। অর্থ বরাদ্দ হল দুই বিলিয়ন ডলার। কোন কমিটির সঙ্গেই আইনস্টাইন সোজাসুজি নিজেকে জড়ালেন না, নানা অজুহাতে এড়িয়ে গেলেন।

রুজভেল্টের সমর্থন সত্ত্বেও, সরকারী কর্তৃপক্ষ ও বাণিজ্যিক চক্রের ঢিলেমির জন্য কাজের অগ্রগতি বেশ ব্যাহত হচ্ছিল। জিলার্ড এতে অখুশি। ইতিমধ্যে পরমাণু বিভাজন নিয়ে আরও কাজ হয়েছে। জিলার্ড নিজেও এ বিষয়ে উল্লেখযোগ্য কাজ করেছেন। পরমাণু বোমা তৈরিতে আরও এক ধাপ এগিয়ে যাওয়া সম্ভব হয়েছে। জিলার্ড এবং প্রজেক্ট-সংশ্লিষ্ট অন্যান্যের স্মৃতিচারণায়, মনে হয়, ঐসব সার্কেল তত্ত্বীয় চিন্তাধারাকে তেমন গুরুত্ব দিয়ে গ্রহণ করেনি। প্রজেক্টের সাফল্যের পেছনে ছিল প্রধানত সংশ্লিষ্ট পদার্থবিদ্ ও ইঞ্জিনিয়ারদের উৎসাহ-উদ্দীপনা। একমাত্র তাঁরাই ছিলেন মূল উদ্যোক্তাদের নাৎসী-বোমার ভীতি এবং তত্ত্বীয় গণনায় আস্থার অংশীদার।

জার্মানের পরাজয়ে সেই ভীতি দূর হল। কিন্তু আবির্ভাব ঘটল আরও ভয়ঙ্কর এক নতুন বাস্তব বিপদের।

জিলার্ড পরে লিখেছিলেন—"In 1945, when we ceased worrying about what the Germans might do to us, we

began to worry about what the Government of the United States might do to other countries."

জিলার্ড আবার এলেন আইনস্টাইনের কাছে। এবার জাপ-শহরগুলোয় অ্যাটম-বোমা ফেলা থেকে নিবৃত্ত করতে রুজভেল্টের কাছে স্মারকলিপি পেশের সমর্থনে তাঁর নাম নিতে। আইনস্টাইন চিঠিটি পাঠালেন বটে, কিন্তু প্রাপকের কাছে তা কোনদিনই পৌঁছল না। ১৯৪৫ সালের ১২ই এপ্রিল রুজভেল্ট হঠাৎ মারা গেলেন। সেদিন দেখা গেল তাঁর ডেস্কে চিঠিটি পড়ে আছে এবং তখনও সেটি খোলা হয় নি।

হিরোশিমা-নাগাসাকির ট্র্যাজিডি ছিল আইনস্টাইনের কাছে এক চরম পরীক্ষা। এ সম্পর্কে একবার আইনস্টাইন-ভ্যালেন্তিন কথোপ-কথনও হয়। ভ্যালেন্তিন লিখছেন—"আইনস্টাইন মন্তব্য করলেন, 'আমার আসল ভূমিকা ছিল স্রেফ ডাকবাক্সের। চিঠিটি লিখে আমার কাছে আনা হয়। আমার কাজ ছিল শুধু ওতে সই করা।' প্রিন্সটনের বাড়িতে তাঁর স্টাডিতে আমরা বসেছিলাম। বড় জানালা দিয়ে ধূসর আলো এসে তাঁর ভাঁজপড়া দুটি গাল এবং চোখে ঠিকরে পড়ছিল। মনে হচ্ছিল, তাঁর মাথায় চোখ দুটো যেন জ্বলছে। বোবা প্রশ্নে ভারি হয়ে গেল পরিবেশ। কেমন এক নৈঃশব্দ্য। তাঁর চিরোজ্জ্বল চোখ দু-খানি তিনি আমার দিকে ফেরালেন। আমি বললাম: 'তবু আপনিই ত বোতাম টিপেছিলেন ( It's you who pressed the button )।' দ্রুত মুখ ফিরিয়ে নিলেন। তাকিয়ে রইলেন জানালা-পথে বাইরের দিকে—মরুপ্রায় উপত্যকা পানে, আর উজ্জ্বল সবুজ লনের দিকে। একসার পুরনো গাছের আড়ালে দিকচক্ররেখা হারিয়ে গেছে। তারপর, যেখানে তাঁর উদাস দৃষ্টি আটকে আছে সেই বৃক্ষশীর্ষকে উত্তরদানের ভঙ্গিতে শান্তস্বরে, চিন্তামগ্নভাবে, প্রতিটি শব্দ

যতিচিহ্ন সহ উচ্চারণ করে বললেন,—'হ্যাঁ, আমিই বোতাম টিপেছিলাম'।"

কিন্তু 'আমিই বোতাম টিপেছিলাম'—এ কথার অর্থ কি? হতে পারে রুজভেল্টকে লেখা চিঠিকে তিনি হিরোশিমা-নাগাসাকি ট্র্যাজিডির কারণ বলে ভাবছেন। আজও সে ট্র্যাজিডি বিশ্বের মাথায় ঝুলছে।

বোতাম-টেপার এ অর্থের সঙ্গে ভ্যালেন্তিনা একমত। কিন্তু আইনস্টাইনের একান্ত সচিব হেলেন ডুকাস এ ব্যাপারে সম্পূর্ণ ভিন্ন মত পোষণ করেন। বহু বছর ধরে আইনস্টাইনের আন্তর-চিন্তার সঙ্গে তিনি পরিচিত ছিলেন। তিনি বলেন—মানব সমাজের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণে ব্যক্তির ভূমিকা সম্পর্কে আইনস্টাইনের ধারণার সঙ্গে 'আমিই বোতাম টিপেছিলাম' কথাটি মোটেই খাপ খায় না। প্রধান প্রধান ঐতিহাসিক উৎক্ষেপ ( upheavals ) বিখ্যাত ব্যক্তিবর্গ বা 'ইতিহাসের জনকদের' সঙ্কল্প বা খেয়ালে নিয়ন্ত্রিত হয়—এ ধারণাকে আইনস্টাইন আমল দিতেন না। যা হোক, তিনি কখনও নিজেকে ঘটনার জনকদের একজন বলে মনে করতেন না। নিজেকে এভাবে ভাবা এবং বিজ্ঞান ও ইতিহাসে তাঁর ভূমিকা সম্পর্কে চিন্তাভাবনা কখনও তাঁর মনে ওঠেনি। টলস্টয়ের green wand-ই ছিল তাঁর জিজ্ঞাস্য। কেননা, তাঁর আন্তর-জগতের অন্যতম গুণ হল আর্থিক এবং নিছক ব্যক্তিগত ব্যাপার থেকে মুক্তি পাওয়া।

এ সম্পর্কে আরো একটা কথা বলা দরকার। যাঁরা পরমাণু গবেষণার ইতিহাসের সঙ্গে পরিচিত তাঁদের চোখে রুজভেল্টকে লেখা চিঠিকে 'আমিই বোতাম টিপেছিলাম' বলে মোটেই ধরা চলে না। ১৯৪৫ থেকে জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত যে মানসিক যন্ত্রণায় তিনি ক্লিষ্ট ছিলেন আইনস্টাইন-জীবনের সেই ট্র্যাজিডির জন্য চিঠির ঘটনাকে মোটেই দায়ী করা যায় না।

যে মানসিক যন্ত্রণায় তিনি বহু বছর ভুগেছেন তার চরম প্রকাশ অ্যাটম বোমার ট্র্যাজিডি। পৃথিবীর সব কিছু খারাপের জন্য তিনি নিজে

ব্যক্তিগতভাবে দায়ী—এই বিশিষ্ট মানসিকতা তাঁর ছিল। তাই মানব মনের অপূর্ব সৃষ্টি ও কীর্তিগুলো যুগযুগ ধরে অন্ধ, অযৌক্তিক এবং সংহারশীল শক্তির দ্বারা যেভাবে অপব্যবহৃত হচ্ছে সেই বিরাট ট্র্যাজিডি সম্পর্কে তিনি গভীরভাবে ভাবিত ছিলেন। প্রকৃতিতে মন খোঁজে ছন্দ এবং অন্তঃস্থ প্রকৃতিবশে সমাজকে সুষমা বা ছন্দের দিকে পরিচালিত করে। ফলে সমাজে জন্ম নেয় যুক্তিসমৃদ্ধ সংস্থা। বিদ্বেষ বা বৈরিতাদীর্ণ সমাজে যুক্তির মিষ্টফল রূপ পায় বিষফলে। যুক্তিহীন শক্তির হাতে প্রতিটি বৈজ্ঞানিক আইডিয়া বা আবিষ্ক্রিয়া মারণাস্ত্রের রূপ নিতে পারে। আইনস্টাইন বারবার এ রকম মনোভাব বা সেন্টিমেণ্ট প্রকাশ করেছেন। আলোচ্য ঘটনা আপেক্ষিক তত্ত্বের মূল অনুসিদ্ধান্তগুলোর প্রয়োগের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বলে আইনস্টাইন নিজেকে দায়ী মনে করতেন। তবে, এ দৃষ্টিভঙ্গি থেকে নয় যে, তিনিই আপেক্ষিক তত্ত্বের জনক। কেননা, নিজেকে তিনি কখনও স্রষ্টার ভূমিকায় ভাবতেন না। তাঁর চিন্তাধারার প্রকৃতি তাঁকে এ ধরনের আত্ম-মূল্যায়ন করতে দেয় নি। মানবজাতির সামূহিক যুক্তিচেতনার সঙ্গে আইনস্টাইন নিজেকে এক করে দেখতেন। সামগ্রিকভাবে বিজ্ঞানের জন্য তাঁর গভীর দায়িত্ববোধ ছিল। ফলে বৈরিভাবাপন্ন সমাজে বৈজ্ঞানিক সৃষ্টির সুদীর্ঘ ট্র্যাজিডির শেষ অঙ্কে তিনি এতটা বিচলিত হয়ে পড়েন। তবে মানবজাতির প্রতি তিনি কখনও আস্থা হারান নি। ইচ্ছে করলে মানবসমাজ পরমাণু যুদ্ধের ভীতি দূর করে সৃষ্টিধর্মী কাজে এর ব্যবহারের সুফল ভোগ করতে পারে—এ বিশ্বাস তাঁর ছিল। নিছক পরমাণুশক্তি মানবসমাজের বিপদের কারণ নয়। বিপদ নিহিত প্রকৃতির এই নতুন শক্তির অপব্যবহারে। আইনস্টাইন লিখেছেন—"পারমাণবিক শৃঙ্খল প্রক্রিয়া আবিষ্কারের মধ্যে মানবসমাজের ধ্বংসের যে বিপদ তা দেশলাই আবিষ্কারে নিহিত বিপদের চেয়ে বেশি নয়। এতে যে শক্তি আমরা পাচ্ছি তার সম্ভাব্য অপব্যবহার দূর করাই হল আসল কথা।"

আইনস্টাইন স্পষ্ট নির্দেশ করলেন যে, পরমাণুশক্তির ফলে পুরনো সমস্যাই আরও জরুরি ও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দেখা দিল। ১৯৪৫-র নভেম্বরে তিনি লিখলেন—"পরমাণু শক্তির উদ্ভবে কোন নতুন সমস্যার সৃষ্টি হয় নি। যে সমস্যা রয়েছে এ শুধু তার সমাধানের প্রয়োজনীয়তাকে আরও জরুরি করে তুলেছে।" বৈজ্ঞানিক আবিক্রিয়ার আগ্রাসী ও ধ্বংসাত্মক কাজে নিয়োগের সম্ভাবনার মধ্যে সমস্যাটি নিহিত। আইনস্টাইন বিশ্বাস করতেন, এমন দিন আসবে যখন এই পুরনো সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে, যুক্তির ভিত্তিতে সমাজের পুনর্বিন্যাস ঘটবে এবং বৈজ্ঞানিক আবিষ্ক্রিয়া শুধু মানুষের উপকারে ব্যবহৃত হবে।

এ বিশ্বাসে অবশ্য ট্র্যাজিডির অবসান ঘটল না। হিরোশিমার অদৃষ্টকে আইনস্টাইন কিছুতেই ভুলতে পারলেন না। অন্য কোন শহরে যে এ ট্র্যাজিডির পুনরাবৃত্তি হবে না তাতেও নিশ্চিত হওয়া গেল না। ফলে বিজ্ঞানের অপব্যবহার সম্পর্কে তিনি নিজের নৈতিক দায়িত্বের হাত থেকে মুক্তি পেলেন না। সারাজীবন ধরেই সামাজিক স্ববিরোধিতার সঙ্গে তিনি আপোষ করতে অস্বীকার করেছেন। তিনি কোনদিনই এগুলো ভুলতে পারেন নি। ফলে সামাজিক বা নৈতিক ভাবলেশহীনতা, ঔদাসীন্য বা আপোষী মনোভাব কখনও তাঁর মধ্যে জাগেনি।

বিজ্ঞানীদের মধ্যে যাঁরা সাচ্চা তাঁদের বৈশিষ্ট্য হল, আপোষহীন সামাজিক এবং নৈতিক সততা ( integrity )। বিজ্ঞানকে সেবা করতে গেলে এ রকম স্বাধীনতা, দৃঢ়তা ( consistency ), সততা এবং সাহসের বড় প্রয়োজন। আর এগুলোই নৈতিকতার ক্ষেত্রে আপোষের সঙ্গে সঙ্গতিবিহীন। ব্যক্তিগত বা সামাজিক সুবিধাবাদ অধিকাংশ ক্ষেত্রে বিজ্ঞানে আদর্শগত সুবিধাবাদ এবং, অংশত বা পূর্ণত, সাচ্চা বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান বিসর্জন দেয়ার পূর্বরাগ ( a prologue )। বৈজ্ঞানিক এবং নৈতিক মানদণ্ড সব বিজ্ঞানীর মধ্যেই পরস্পর

বিজড়িত ( interwined )। আর আইনস্টাইনের ক্ষেত্রে এরা হল একেবারে অভিন্ন ( fused )।

সে যুগের অন্যান্য বিজ্ঞানীর তুলনায় আইনস্টাইন বিজ্ঞানের আগ্রাসী ও সামরিক প্রয়োগের ট্র্যাজিডি সম্পর্কে গভীরভাবে সচেতন ছিলেন। 'গভীরভাবে' কথাটি তাৎপর্যপূর্ণ। কেননা, পরমাণু বোমার উৎপাদনে প্রথম অংশগ্রহণকারীদেব কাছে হিরোশিমার ট্র্যাজিডি অন্যের তুলনায় অনেক বেশি মর্মন্তুদ এবং শোকাবহ ছিল। আইনস্টাইনের কাছে প্রশ্নটি ঠিক তেমন ছিল না। কেননা, এ ব্যাপারে তিনি কোন অংশই নেন নি। তাঁর কাছে প্রশ্নটি ছিল সামগ্রিক বিজ্ঞানঘটিত। এদিকে যুক্তরাষ্ট্রের পরমাণু কর্তৃপক্ষের কার্যাবলীতে প্রকট হল যে, বিজ্ঞান কতটা অযৌক্তিক শক্তির অধীন। যুদ্ধবিভাগ, শিল্পসংস্থা, বিশ্ববিদ্যালয় বা তার অধীনস্থ ইনস্টিটিউট—যেখানেই হোক না কেন—দেখা গেল, সব সভাসমিতির রিপোর্টের মধ্যেই যুক্তিহীনতার পুরনো দৈত্যটি উঁকি মারছে। দৈত্যটি এখন আর বিজ্ঞানকে শুধু অভিশাপ দেয় না, সে তাকে চাকর বানিয়ে ছেড়েছে। দূরকল্পী চিন্তার শীর্ষ থেকে আইনস্টাইন দেখলেন—সত্যের প্রতি নিঃস্বার্থ সেবার চিন্তা যাদের কাছে বিজাতীয় এবং বৈরিতামূলক সেই চক্রের কাছে বিজ্ঞান কী ভয়ঙ্কর ভাবেই না আত্মসমর্পণ করেছে। আইনস্টাইনের কাছে বিজ্ঞান ছিল চিন্তার স্বাধীনতার সঙ্গে সমার্থক। নিজস্ব যৌক্তিক আত্মার বিরুদ্ধাচারণ না ক'রে বিজ্ঞান প্রয়োগিক সেবায় নিযুক্ত হয়। সমাজ এবং প্রকৃতির পুনর্বিন্যাস বা নব কলেবর দান যখন প্রায়োগিক সেবার লক্ষ্য তখনই এ আত্মার পূর্ণ বিকাশ ঘটে। এ বিন্যাস যুক্তি এবং বিজ্ঞাননির্ভর। এবং কাজেই সত্য ও ন্যায়ের পথ বরাবর। একটা যৌক্তিক, সুষমাময় সামাজিক ব্যবস্থা স্বাধীন ও সুসমঞ্জস যৌক্তিক চিন্তার ভিত্তি। বৈরিভাবাপন্ন সমাজ ব্যবস্থার কাজ হল সত্যের বিরোধিতা করা। ফলে, বিজ্ঞানের পক্ষে তা অচল এবং জবরদস্তিমূলক এক শর্ত।

বিজ্ঞানের সামরিকীকরণ এবং আগ্রাসী বিদেশ নীতির ফলে আইনস্টাইন বাধ্য হয়ে ১৯৫০-র ফেব্রুয়ারীতে এক টিভি-প্রোগ্রামে যুক্তরাষ্ট্রের যুদ্ধোত্তর অবস্থায় মূল্যায়ন করে বললেন—"আমেরিকার বিদেশ নীতিতে প্রতিটি কাজ শুধু একটি মাত্র দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে নিয়ন্ত্রিত হয়। তা হল: যুদ্ধ বাধলে কি করে আমরা প্রতিপক্ষের উপর সর্বোচ্চ প্রভুত্ব বিস্তার করব? দেশের বাইরে: বিশ্বের সব সম্ভাব্য সামরিক গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় সামরিক ঘাঁটি স্থাপন ক'রে, ক্ষমতাধর মিত্র দেশগুলোকে মারণাস্ত্রে এবং আর্থিক দিক দিয়ে শক্তিশালী ক'রে। আর দেশের ভেতরে: মিলিটারির হাতে অমিত অর্থ কেন্দ্রীভূত ক'রে, যুব সম্প্রদায়ের সামরিকীকরণে এবং এক পুলিশী শক্তির সাহায্যে। রোজই যা প্রকটতর হচ্ছে তা হল নাগরিকদের, বিশেষ চাকুরিয়াদের, আনুগত্যের উপর নজরদারি, স্বাধীন চিন্তার মানুষদের ভীতি প্রদর্শন। রেডিও, খবরের কাগজ এবং প্রেক্ষালয়-গুলোর মাধ্যমে সূক্ষ্মভাবে জনসাধারণের মগজ ধোলাই।"

যে কোন প্রকার 'আনুগত্য পরীক্ষা'র বিরুদ্ধে আইনস্টাইন ছিলেন আজীবন প্রতিবাদমুখর। ব্রুকলীনের এক শিক্ষক উইলিয়ম ফ্রাওয়েনগ্লাস ১৯৫৩-র মে মাসে আইনস্টাইনকে একটি চিঠি লেখেন। আন্তর্জাতিক যোগাযোগের সমর্থনে মত প্রকাশ করায় তিনি কংগ্রেস কমিটির সামনে উপস্থিত হওয়ার শমন পান। নিজের রাজনৈতিক মতাদর্শ সম্পর্কে বলতে ফ্রাওয়েনগ্লাস অস্বীকার করেন। এ ধরনের কাজ ছিল তখন অত্যন্ত বিপজ্জনক। ১৬ই মে আইনস্টাইনের জবাব এল। ১৯৫৩-র ১২ই জুন সেটি New York Times-এ প্রকাশিত হয়। চিঠির অংশবিশেষ এই রকম:

"যে সমস্যার দ্বারা এ দেশের বুদ্ধিজীবিরা পীড়িত তা বড়ই গুরুতর। . প্রতিক্রিয়াশীল রাজনীতিকেরা জনসাধারণের চোখের সামনে বাইরের এক জুজুকে ক্রমাগত ঝুলিয়ে রেখে তাঁদের মধ্যে বৌদ্ধিক কর্মকাণ্ড সম্পর্কে সন্দেহ জাগিয়ে তুলতে পেরেছেন। এতটা সাফল্যের

পর এখন শিক্ষাদানের স্বাধীনতাকেও তাঁরা দমন করতে চাইছেন। যাঁরা এ ব্যাপারে আনুগত্য দেখাবেন না তাঁদের চাকরি থেকে বরখাস্ত করা হবে। অর্থাৎ তাঁদের ভাতে মারবেন।

"এ উৎপাতের বিরুদ্ধে সংখ্যালঘু বুদ্ধিজীবিরা কী করবেন? অকপটে বলছি, একমাত্র পথ হল গান্ধীজি প্রদর্শিত অসহযোগের বিপ্লবী পন্থা। কমিটির সামনে আনুগত্য পরীক্ষার জন্য যাঁদের উপস্থিত হতে বলা হবে সেই সব বুদ্ধিজীবির প্রত্যেকে তা অস্বীকার করবেন। অর্থাৎ তাঁকে কারাবরণ এবং আর্থিক বিলুপ্তির জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে। সংক্ষেপে, স্বদেশের সাংস্কৃতিক উন্নতির স্বার্থে ব্যক্তিগত উন্নতিকে বলি দিতে তৈরি থাকা চাই।

"তবে এ অস্বীকৃতি যেন সম্ভাব্য আত্ম-অপরাধের বিরুদ্ধে পঞ্চম সংশোধন বিধির দোহাই পেড়ে পরিচিত পলায়নী-মনোবৃত্তি-কেন্দ্রিক না হয়। অস্বীকৃতি হবে এই ঘোষণাভিত্তিক যে, নির্দোষ নাগরিকের পক্ষে এ রকম অনুসন্ধানের কাছে আত্মসমর্পণ লজ্জাকর। এবং এ ব্যবস্থা সংবিধানের মূল উপজীব্যের পরিপন্থী।

"যদি পর্যাপ্ত সংখ্যক বুদ্ধিজীবি এ চরম ব্যবস্থা নিতে প্রস্তুত থাকেন তবে তাঁরা নিশ্চিত জয়ী হবেন। অন্যথায়, এ দেশের বুদ্ধিজীবিদের কপালে দাসত্বের যে ব্যবস্থা কায়েম হচ্ছে তার চেয়ে ভাল কিছুর তাঁরা উপযুক্ত নন।"

১৯৩৬-এ পোল্যাণ্ডের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি ক্রমশ মাথা চাড়া দিচ্ছিল। সেই পোলিশ ছাত্র লিওপোল্ড ইনফেল্ড, ১৯২০-এ যিনি আইনস্টাইন সন্দর্শনে এসেছিলেন, এ সময়ে ছিলেন পোল্যাণ্ডের Lvov বিশ্ববিদ্যালয়ের লেকচারার। তিনি বুঝলেন, শীগগিরই পরিস্থিতি এমন হবে যে, বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়তে বাধ্য হবেন। এ আশঙ্কা করে তিনি কাজের জন্য প্রিন্সটনে আইনস্টাইনকে চিঠি

লিখলেন। জবাবে আইনস্টাইন তাঁকে প্রিন্সটনে আসার আমন্ত্রণ জানালেন এবং সামান্য একটা ফেলোশিপের ব্যবস্থাও হল। আইন-স্টাইনের অধীনে তত্ত্বীয় গবেষণায় নিজেকে যুক্ত করতে ইনফেল্ড স্বদেশ ছাড়লেন। যথাসময়ে প্রিন্সটনে পৌঁছে ইনফেল্ড 'ফাইন হল'-এর ১০৯ নম্বর ঘরের দরজায় টোকা দিলেন। তখন ফাইন হলে ছিল Institute of Mathematics and Physics। দীর্ঘ ষোল বছর পর উভয়ের সাক্ষাৎ হচ্ছে। ইনফেল্ড দেখলেন, সময়ের তুলনায় আইন-স্টাইন অনেক বুড়িয়ে গেছেন। তবে চোখ দুটিতে রয়েছে বরাবরের সেই গভীরতা এবং তা থেকে জ্যোতি ঠিকরে বেরুচ্ছে।

ইনফেল্ড ভেবেছিলেন, প্রথমে হয়ত সংক্ষিপ্ত ব্যক্তিগত কথাবার্তা হবে, কি করে য়ুরোপ পার হলেন সে সম্পর্কে প্রশ্ন করবেন, ইত্যাদি। কিন্তু সে রকম কিছু হল না। কোন্ সমস্যা নিয়ে তিনি কাজে ব্যস্ত আছেন তাই দিয়ে কথা শুরু করলেন। এ কিন্তু বড়-র প্রতি ছোট-র উপেক্ষা বা ঔদাসীন্য নয়। ইনফেল্ডও তা বিলক্ষণ জানতেন। কারণ আইনস্টাইনের বন্ধুত্ব ও শুভেচ্ছার যথেষ্ট প্রমাণ তিনি ইতিপূর্বে পেয়েছেন। তাঁর ব্যক্তিত্বের জাদু ও আকর্ষণ অনুভব আবারও করলেন। আইনস্টাইন তখন অধিব্যক্তিকতায় পুরোপুরি ডুবে আছেন। যে তৎপরতা ও খোলা মন নিয়ে তিনি অন্যের সঙ্গে নিজের সমস্যা নিয়ে আলোচনা করতেন সেটা তাঁর ঐ জাদুরই অংশ। য়ুনিফায়েড ফিল্ড থিয়োরী নিয়ে তাঁর কাজের ফলাফল কী হল আইনস্টাইন ইনফেল্ডকে তাই বলছিলেন। ঠিক সেই মুহূর্তে ঘরে ঢুকলেন লিভি-সিভিটা। সাধারণ আপেক্ষিক তত্ত্বে আইনস্টাইন যে গাণিতিক পদ্ধতি প্রয়োগ করেন লিভি-সিভিটা তার অন্যতম প্রবর্তক। লিভির বয়স তখন ষাটের কোঠায়, ছোট্ট-পাতলা গড়নের মানুষ। বিশ্ব-বিদ্যালয়ের অধ্যাপকদের ফ্যাসিস্ট শপথবাক্য পাঠের ব্যবস্থা হল ইতালীতে। আর ঐ শপথ বাক্য পাঠে অস্বীকৃতি জানিয়ে তিনি ইতালী ছাড়লেন।

আইনস্টাইনকে ইনফেল্ডের সঙ্গে আলাপরত দেখে লিভি-সিভিটা ফিরে যাচ্ছিলেন। অবশ্য, মুখে না বলে সে কথা ইশারায় জানালেন। কেননা তাঁর ধারণা: তাঁর যা ইংরেজী তার চেয়ে আকার-ইঙ্গিত অনেক বেশি বোধগম্য হবে। আইনস্টাইন তাঁকে ডাকলেন এবং আলোচনায় অংশ নিতে বললেন। এর আগে ইনফেল্ডের সঙ্গে তাঁর কী কথাবার্তা হয়েছে সংক্ষেপে তাঁকে তা জানালেন। লিভি-সিভিটার অ্যাংলো-ইতালীয় ভাষা বোঝা যাচ্ছিল শুধু এই কারণে যে, তার অধিকাংশই গাণিতিক ফর্মুলা। ইংরেজীর ওপর আইস্টাইনের দখলও তখন তথৈবচ। তবে ধীরে ধীরে, থেমে থেমে, ভাবজ্ঞাপক স্বরে তিনি কথা বলতেন এবং নিজের আইডিয়াগুলো স্পষ্ট ও নিখুঁতভাবে তুলে ধরতেন। ফলে, তাঁকে বুঝতে কারও কোন কষ্ট হত না।

ইনফেল্ড লিখছেন—"আমি দেখতে লাগলাম একদিকে শান্ত ও ইমপ্রেসিভ আইনস্টাইন, আর অন্যদিকে ছোট্ট পাতলা গড়নের অঙ্গভঙ্গকারী লিভি-সিভিটা। ব্ল্যাকবোর্ডের ফর্মুলার দিকে তাঁরা পরস্পরের দৃষ্টি আকর্ষণ করছিলেন। যে ভাষায় তাঁরা কথা বলছিলেন তাকে দুজনেই ইংরেজী বলে ভাবছিলেন। কয়েক সেকেণ্ড অন্তর অন্তর আইনস্টাইন তাঁর ঢোলা ট্রাউজার্সটি টেনে তুলছিলেন। দৃশ্যটি একই সঙ্গে কমিক ও ইমপ্রেসিভ। জীবনে এটি আমি ভুলতে পারব না। হাসি চাপতে প্রাণপণ চেষ্টায় স্বগতোক্তি করলাম—'বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানীর সঙ্গে পদার্থবিজ্ঞান নিয়ে তুমি এখানে আলোচনা করছ। আর তিনি সাসপেণ্ডার ব্যবহার করেন না বলে কিনা হাসতে চাইছ!' এতে কাজ হল। নিজেকে সংযত করে ফেললাম। আগের বছর সহকারী রোজেনের সঙ্গে কী কাজ হয়েছে তা নিয়ে তাঁর সর্বশেষ এবং তখনও অপ্রকাশিত গবেষণাপত্রটি সম্পর্কে আইনস্টাইন বলতে লাগলেন।"

এ মজাদার দৃশ্যটি আইনস্টাইনের জীবনের দিক থেকে খুবই চিত্তাকর্ষক। কোন ব্যক্তির জীবনকথা সাধারণ ঘটনাপঞ্জী এবং

ব্যক্তিগত বিশদ বিবরণের মধ্যে সীমিত থাকতে পারে না। আইনস্টাইনের ক্ষেত্রে ত নয়ই। নিছক ব্যক্তিগত কাহিনীগুলোও আইনস্টাইন-জীবনের বৈশিষ্ট্যধর্মী প্রবণতাকে জোরের সঙ্গে তুলে ধরে। প্রবণতাটি হল: দৈনন্দিন সাধারণ ঘটনাবলী থেকে তাঁর পলায়ন। সাসপেণ্ডার ব্যবহারে অস্বীকৃতি ভারি মজার, কিন্তু বিষয়টি হাস্যকর নয়। হাসি হয়ত পেতে পারে, কিন্তু ব্যাপারটি ওপর-ওপর সম্ভ্রমতা দেখানোর প্রতি উদাসীন এক গভীর বৌদ্ধিক জীবনের অভিপ্রকাশ।

একবার এক ব্যক্তি ইনফেল্ডকে জিজ্ঞেস করেন—আচ্ছা, আপনাদের আইনস্টাইন লম্বা লম্বা চুল রাখেন কেন বলুন তো! কেনই বা অদ্ভুত চামড়ার জ্যাকেট পরেন? মোজা, সাসপেণ্ডার, কলার ইত্যাদির বালাই নেই কেন?

এতে ইনফেল্ড মন্তব্য করেন—"এর উত্তর খুব সোজা। তাঁর একাকীত্বের প্রেরণা এবং বাইরের জগতের সঙ্গে ঢিলেঢালা যোগসূত্র রাখার বাসনার মধ্যেই রয়েছে প্রশ্নটির উত্তর। আইডিয়াটি হল প্রয়োজনকে সীমিত রাখা ও তার মাধ্যমে স্বাধীনতাকে বাড়িয়ে তোলা। আমরা শত লক্ষ জিনিসের দাস। আর এ দাসত্ব ক্রমবর্ধমান।…… আমরা বাথরুম, ফ্রিজ, গাড়ি, রেডিও এবং অন্যান্য লক্ষ জিনিসের দাসত্ব করি। আইনস্টাইনের সচেতন চেষ্টা ছিল কি করে এদের সংখ্যা একেবারে কমিয়ে ফেলা যায়। লম্বা চুল নাপিতের প্রয়োজন কমায়। জীবন ত মোজা ছাড়াই চলতে পারে। কোট-সমস্যার দীর্ঘমেয়াদী সমাধান হয়ে যায় একটি মাত্র চামড়ার জ্যাকেটে। সাসপেণ্ডার নেহাত অপ্রয়োজনীয়, যেমন নাইট শার্ট আর পাজামা। জীবনে যেটুকু একান্ত দরকার আইনস্টাইন তার সমাধান করেছেন। জুতো, ট্রাউজার্স, শার্ট, জ্যাকেট—এগুলো একান্তই প্রয়োজনীয়। এদের আর কাটছাঁট করা খুব কঠিন।

"গোর্কি তাঁর ছোটগল্পে একটা চরিত্র এঁকেছেন। তাতে দেখা যায় কোটের ফ্ল্যাপকে নিচু রাখার জন্য লোকটি জোরাল হাওয়ার বিরুদ্ধে

ব্যর্থ চেষ্টা করছে। আমি তাঁর দিকে তাকালাম। মনে হল, ছোট-খাট বিরক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে কী প্রচণ্ড শক্তিই না লোকেরা ব্যয় করে। দৈনন্দিন তুচ্ছতার দুষ্টক্ষতের নোংরা পোকাগুলোর দ্বারা যদি আমরা বিব্রত না হতাম তবে বড় বড় দুর্ভাগ্যের বিষাক্ত সাপ-গুলোকে সহজেই গুঁড়িয়ে দিতে পারতাম।"

আইনস্টাইন চেয়েছিলেন জীবনকে সরল করতে এবং প্রয়োজনকে সীমিত রাখতে। তাঁর তীক্ষ্ণ সামাজিক ন্যায়বোধ এ বাসনার উৎস।" 'The world as I see it'-এ তিনি লিখেছেন—"প্রত্যহ শতাধিক বার আমি নিজেকে এ কথা মনে করিয়ে দিই যে, আমার অন্তরলোক এবং বাহ্যজীবন জীবিত ও মৃত বহু ব্যক্তির শ্রমে পরিপুষ্ট। আমি মনে করি যে, তাঁদের কাছ থেকে যেভাবে গ্রহণ করেছি এবং করছি, সেভাবে নিজেকেও আমার বিকীর্ণ করে দেয়া উচিত। সরল জীবন-যাত্রার প্রতি আমার তীব্র আকর্ষণ। মাঝে মাঝে এ ভাবনা আমায় পীড়িত করে যে, সাথীভাইদের অনেকটা শ্রম আমি অন্যায়ভাবে আত্মসাৎ করছি......। আমার মতে, সরল জীবনযাত্রা দৈহিক ও মানসিক দু-দিক থেকেই সকলের পক্ষে মঙ্গলকর।"

আইনস্টাইনের এই সাধারণের-চেয়েও-সাধারণ পোশাক-পরিচ্ছদ ব্যবহার, যুক্তি ও আবেগের দিক থেকে, তাঁর অন্তর জীবনের মূল বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে ওতোপ্রোতভাবে যুক্ত। আইনস্টাইন চরিত্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল: জীবনের প্রতিটি খুঁটিনাটি ব্যাপার, হাবভাব এবং মানসিকতা, শেষ বিশ্লেষণে, তাঁর মূল আদর্শের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। এবং এজন্য এগুলো তাঁর ভাবমূর্তির উল্লেখযোগ্য সততার ইমপ্রেশনবাহী।

লিভি-সিভিটা চলে গেলে আইনস্টাইন ইনফেল্ডকে নিয়ে বাড়ি এলেন। কোয়ান্টাম বলবিদ্যা নিয়ে তাঁদের মধ্যে আলোচনা হল। নান্দনিক দিক থেকে বিষয়টি তৃপ্তিকর নয় কেন, আইনস্টাইন তা ব্যাখ্যা করলেন। ইনফেল্ড লিখছেন—"তিনি আমায় তাঁর পাঠ-কক্ষে নিয়ে গেলেন। বিরাট জানালা দিয়ে উজ্জ্বল সবুজ রঙের

মনোহর বাগানখানি দেখা যাচ্ছিল। পদার্থবিজ্ঞানের বাইরে তাঁর প্রথম ও একমাত্র মন্তব্য হল—'এ জানালা দিয়ে খুব সুন্দর দৃশ্য দেখা যায়'।"

মন্তব্যটি সরাসরি পদার্থবিজ্ঞানের নয়। ঠিক। তবে একেবারে সম্পর্কবিহীনও নয়। আইনস্টাইনের কাছে বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের সৌন্দর্যমাত্রেই প্রকৃতির অন্তর্লীন সৌন্দর্যের প্রতিফলন। এইমাত্র তিনি কোয়ান্টাম বলবিদ্যার নান্দনিক ত্রুটির কথা বলছিলেন। কোয়ান্টাম বলবিদ্যা সম্পর্কে তাঁর এ সমালোচনা মূলত স্বজ্ঞালব্ধ। তিনি বলতেন—"I can only call on my little finger as a witness."। কোন বৈজ্ঞানিক থিয়োরীর নির্বাচনে তিনি স্বজ্ঞাকেই নান্দনিক মানদণ্ডের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত করেছিলেন। কোয়ান্টাম বলবিদ্যার নান্দনিক ত্রুটি সম্পর্কে তাঁর মন্তব্যের যে গভীরতা এ থেকে তার পরিচয় মেলে।

ইনফেল্ডের সঙ্গে আইনস্টাইন গতীয় সমীকরণ নিয়ে কাজ করেন। ক্লাসিকাল পদার্থবিজ্ঞানে ক্ষেত্রীয় সমীকরণের অস্তিত্ব আছে। ক্ষেত্রের উৎস জানা থাকলে ঐ ক্ষেত্রের কোন বিন্দুতে তীব্রতা কত তা মাপা চলে। যেমন, তড়িৎক্ষেত্রে কোন বিন্দুতে একক তড়িৎ আধান ( charge ) রেখে তার ওপর ক্ষেত্র কতটা বল প্রয়োগ করছে তা-ই ঐ বিন্দুতে তড়িৎক্ষেত্রের তীব্রতা। আহিত বস্তুর আকার বা গঠন জেনে, যে কোন বিন্দুতে রাখা আধান কি পরিমাণ বল-এ আকৃষ্ট বা বিকৃষ্ট হবে ক্ষেত্রীয়-সমীকরণের ( তড়িচ্চুম্বকীয় ) সাহায্যে তা গণনা করা যায়। ঐভাবে ক্লাসিকাল মহাকর্ষীয় ক্ষেত্র-সমীকরণগুলো দিয়ে কোন বিন্দুতে মহাকর্ষ-বল মাপা চলে। অবশ্য, এজন্য মহাকর্ষীয় ভরগুলোর আকার বা গঠন জানা থাকা চাই। ক্লাসি-কাল পদার্থবিজ্ঞানে ক্ষেত্রীয় সমীকরণের সঙ্গে গতীয় সমীকরণেরও অস্তিত্ব আছে। ঐ সব গতীয় সমীকরণে ক্ষেত্রের তীব্রতা একটা প্রদত্ত রাশি হিসেবে থাকে। তীব্রতা জেনে, গতীয় সমীকরণ ব্যবহার

ক'রে বস্তুর তাৎক্ষণিক অবস্থান নির্ণয় করা যায়। ক্লাসিকাল পদার্থ-বিজ্ঞানে ক্ষেত্রীয় এবং গতীয় সমীকরণ পরস্পর নির্ভরশীল নয়—নিরপেক্ষ বা স্বাধীন। অন্যদিকে, আইনস্টাইনের মহাকর্ষ তত্ত্বে, ক্ষেত্রীয় এবং গতীয় সমীকরণগুলোকে পরস্পর নিরপেক্ষভাবে আদৌ চিন্তা করা যায় না। তবে, ক্ষেত্রীয় সমীকরণ থেকে গতীয় সমীকরণ পাওয়া চলে। কিন্তু কাজটি অত্যন্ত দুরূহ। তিরিশের দশকের শেষ দিকে আইনস্টাইন এই দুরূহ কাজটি ইনফেল্ডের সহযোগিতায় সম্পন্ন করেন। এজন্য প্রয়োজন ছিল এক বিশেষ ভৌত স্বজ্ঞার—ভৌতবিশ্বের চিত্রগত কনসেপ্ট-এর পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ সমস্যার এক আবছা আইডিয়া।

সাধারণ আপেক্ষিকতা অনুসারে, মহাকর্ষ-ক্ষেত্র বা দেশকাল বক্রতা যে সব ভৌতবস্তুর জন্য দায়ী তাদের দেশকালিক অস্তিত্ব ঐ ক্ষেত্র বা বক্রতাকে নিয়ন্ত্রিত করে। ক্ষেত্রীয় সমীকরণ দেশকাল বক্রতা বা ক্ষেত্রের তীব্রতার পরিমাণটি আমাদের জানায়। অবশ্য, দায়ী উৎসগুলো জানা থাকা চাই। কোন মহাকর্ষ-ক্ষেত্রে সঞ্চরণশীল একটি বস্তুকণা ধরা যাক। এর গতীয় সমীকরণ যদি ক্ষেত্রীয় সমীকরণের ওপর নির্ভর না করে তবে দুটি সম্ভাবনা দেখা দেয়। প্রথমত, ক্ষেত্র; দ্বিতীয়ত, ক্ষেত্রে সঞ্চরণশীল বস্তুরাজি—যারা ঐ ক্ষেত্রের উদ্ভব ঘটিয়েছে। সমীকরণগুলো যদি পরস্পর নির্ভরশীল হয়, তবে বাস্তব বলতে শুধু ক্ষেত্রটি। শেষ বিশ্লেষণে, বস্তুকণার গতি যদি কেবল ক্ষেত্রীয় সমীকরণের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় তবে ঐ কণিকাগুলোকে 'ক্ষেত্রীয় ফোকাস বিন্দু'-রূপে ভাবা চলে।

অবশ্য ক্ষেত্রীয় সমীকরণ থেকে গতীয় সমীকরণ পাওয়ার সমস্যার সঙ্গে এ রকম চিন্তাধারা তাৎক্ষণিকভাবে যুক্ত নয়। কিন্তু সম্ভবত, আইনস্টাইনের কাছে ব্যাপারটি কিছুটা এ রকম অর্থই বহন করত। তথাকথিত 'নিষ্ফল' বছরগুলোতে আইনস্টাইনের আইডিয়ার যে বিবর্তন ঘটে তার সঙ্গে এর যোগাযোগ আছে।

হেরমান ভাইল এক সময় লেখেন—ক্লাসিকাল বিজ্ঞান 'দেশ' বা space-কে এমন এক ধরনের ভাড়াটে বাড়ি বলে ভাবত যা ঐ 'দেশ'-এ সংঘটিত ঘটনাবলী দ্বারা মোটেই প্রভাবিত হয় না। অ-ইউক্লীডীয় জ্যামিতি দেখাল, 'দেশ'-এরও বিচিত্র সব ধর্ম থাকা সম্ভব। আর সাধারণ আপেক্ষিকতায় জানা গেল, 'দেশ'-স্থ বস্তুরাজি অর্থাৎ মহাকর্ষীয় ফোকাস বিন্দুগুলোর উপস্থিতি ঐ সব ধর্মের নিয়ামক। ভাড়াটে বাড়িটি ভাড়াটেদের দ্বারা ক্রমাগত পুনর্গঠিত হচ্ছে। কিন্তু দেশ ও বস্তুর নতুন ধারণাকে দৃষ্টান্তায়িত করতে ভাইলের তুলনা আর উপযোগী নয়। কেননা, কোন সৌধের স্থাপত্য-সৌন্দর্যের অংশরূপে ঐ সৌধের ভাড়াটেদের চিত্রিত করা খুব কঠিন।

১৯৩৬ এবং ১৯৩৭। এ দুটি বছর প্রায় প্রত্যহই ইনফেল্ডের সঙ্গে আইনস্টাইনের সাক্ষাৎ হত। প্রিন্সটন এবং তার আশেপাশে বহুদূর এঁরা একত্রে হাঁটতেন। এ সম্পর্কে ইনফেল্ডের যে স্মৃতিচারণ তা বিশের দশকে আমাদের পরিচিত আইনস্টাইন-আলেখ্যকে অনেক নতুন তুলির টানে রাঙিয়ে তোলে। আইনস্টাইনের ক্রমভঙ্গহীন মানসিক প্রচেষ্টার বিস্ময়কর তীব্রতাকে বোঝাতে ইনফেল্ড এক অসাধারণ তুলনার আশ্রয় নিয়েছেন।

ইনফেল্ড লিখছেন—"জীবনে আমেরিকায় গিয়ে আমি প্রথম নিগ্রো নাচ ও নাটক দেখলাম—কী অগ্নিময় আর জীবনীশক্তিতে ভরপুর! হার্লেমের শ্যাভয় নাচঘর হঠাৎ যেন রূপ নিল জ্বলন্ত সূর্যের দীপ্তিতে ঝলসান শ্যামলিমাময় আফ্রিকার জঙ্গলে। হলের বাতাসে উত্তাল আন্দোলনের ঢেউ। উচ্চসঙ্গীত আর আবেগময় নৃত্য থেকে জীবনীশক্তি যেন সবেগে ঝলকে ঝলকে উপচে পড়ছে। দেখতে দেখতে সমস্ত পরিবেশের সে কী অলৌকিক রূপ হল। তুলনায়, শ্বেতাঙ্গদের মনে হল অর্ধজ্যান্ত, হাস্যকর, হতাদর ও অপমানক্লিষ্ট। তাদের প্রেক্ষাপটে নিগ্রোদের আদিম এবং নিঃসীম জীবনীশক্তি আরও উজ্জ্বল এবং ভাস্বরতর বলে মনে হল। কোনরূপ যতি বা বিরতি যেন

নেহাতই অপ্রয়োজনীয়। গতির এ প্রচণ্ড উদ্দামতা যেন অনন্তকাল ধরে চলতে পারে।

"আইনস্টাইনকে যখন কর্মরত দেখতাম তখন এ চিত্রটি প্রায়ই আমার মনে ভেসে উঠত। অবিরাম ক্রিয়াচঞ্চল রাখতে তাঁর মস্তিষ্কে অত্যন্ত সক্রিয় একটা ব্যবস্থা রয়েছে। এ হল ঊর্ধ্বায়িত (sub-limated) জীবনীশক্তি। কখন কখন এটা দেখতেও কষ্ট হয়। আইনস্টাইন হয়ত রাজনীতি নিয়ে কথা বলছেন, অন্যের অনুরোধ আগ্রহভরে শুনছেন, প্রশ্নের যথাযথ উত্তর দিচ্ছেন। কিন্তু স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে যে, বাইরের এই কর্মোদ্যমের পেছনে বিরামহীনভাবে তাঁর মস্তিষ্কের যন্ত্রপাতি কাজ করে চলেছে বৈজ্ঞানিক সমস্যা নিয়ে, সতর্ক মনোনিবেশে। এ এক অন্তহীন অব্যয় গতি। কোন কিছুই একে স্তব্ধ করতে পারে না।"

বিশ্ব নিয়ে আইনস্টাইনের চিন্তনক্রিয়া ছিল বেগবতী স্রোতোস্বতীর মতো। অপেক্ষাকৃত তুচ্ছ ঘটনাবলী, বা এমন কি সবচেয়ে দুঃখাবহ ব্যক্তিগত বা সামাজিক ঘটনাও এ গতিকে স্তব্ধীভূত বা ভিন্নখাতে পরিচালিত করতে অক্ষম। তা বলে, এতে কিন্তু কোন ব্যক্তিক বা সামাজিক ঔদাসীন্য সূচিত হয় না। প্রতিবেশী ও পরিজনদের অভিজ্ঞতা সম্পর্কে আইনস্টাইন যথেষ্ট সচেতন ছিলেন। সামাজিক সংঘাতগুলোও তাঁর কাছে ব্যক্তিগত ট্র্যাজিডির আকার নিত। তবু পরিপূর্ণ অভিনিবেশে তিনি সর্বদা নিজের কাজ করে গেছেন। এলসা যখন মৃত্যুশয্যায় তখনও আইনস্টাইনের জীবন ও কর্ম সম্পর্কে ইনফেল্ডের স্মৃতিচারণা আছে। প্রিন্সটনের বাড়ির একতলা তখন হাসপাতালের রূপ নিয়েছে। ওপরে দোতলায় বসে আইনস্টাইন কাজ করছেন। প্রিয়তম জীবনসঙ্গিনীর আসন্ন বিয়োগ-আশঙ্কায় গভীর ব্যাথাতুর। কিন্তু আগের মতোই গভীরভাবে কাজে লিপ্ত। শেষ রক্ষা হল না। এলসা মরলোক ছেড়ে চিরদিনের জন্য চলে গেলেন।

মৃত্যুর কয়েক দিন পর। আইনস্টাইন এলেন ফাইন হলে। আবারও কাজে যোগ দিলেন। তাঁকে খুব ক্লান্ত ও মলিন দেখাচ্ছিল, গায়ের রঙও অনেক ম্লান। এসেই শুরু করলেন আলোচনা, গতীয় সমীকরণ প্রতিষ্ঠার সমস্যা নিয়ে আলোচনা। আইনস্টাইনের কাছে চিন্তনক্রিয়া ছিল শ্বাস-প্রশ্বাসের মতোই জরুরি।

ইনফেল্ড তাঁর স্মৃতিকথায় আইনস্টাইনের মানবিক কারুণ্যের 'বৌদ্ধিক' এবং 'মানসিক' উৎসগুলোর প্রশ্ন নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করেছেন। ইতিপূর্বে আমরা দেখেছি, আইনস্টাইনের নৈতিক গুণাবলী স্পষ্টত দৃশ্যমান না হলেও, তাঁর ইন্টেলেক্টের বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে গভীরভাবে সঙ্গতিপূর্ণ। এতটা অনুভূতি-সংপৃক্ত মনের অধিকারী বিজ্ঞানী, অধি-ব্যক্তিক এবং প্রকৃতির নান্দনিক আস্বাদনের প্রতি এতো আবেগময় ও উন্মুখ বৈজ্ঞানিক সত্যি বিরল। অন্যদিকে, এমন লোকের দেখা কদাচিৎ মেলে যাঁর মধ্যে দয়া, প্রেম এবং লোকের প্রতি দায়িত্ববোধ তাঁর চিন্তনধারা থেকে এতো সরাসরি উৎসারিত হয়।

আইনস্টাইন-চরিত্রের এ বৈশিষ্ট্যের নিখুঁত ছবি ইনফেল্ড আমাদের উপহার দিয়েছেন। "পদার্থবিদ্যার ক্ষেত্রে আইনস্টাইনের কাছ থেকে আমি অনেক কিছু শিখেছি। কিন্তু তাঁর সংস্পর্শে বিজ্ঞানের চেয়ে আমি মানবিক ক্ষেত্রে যে শিক্ষা পেয়েছি তাকেই বেশি মূল্য দিই। আইনস্টাইন বিশ্বের সবচেয়ে দয়ালু, দরদী এবং সাহায্যকারী মানুষ। তবে এ সাধারণ বাক্যটি যেন একেবারে আক্ষরিক অর্থে না নেয়া হয়।

"মানবীয় দয়ার অন্যতম উৎস সমবেদনা বা করুণাবোধ। প্রতি-বেশিদের প্রতি এবং চারদিকের দুর্দশা ও মানুষের দুঃখকষ্টের প্রতি এ করুণাবোধ আমাদের আবেগকে সহানুভূতিতে অনুরণিত করে তোলে। জীবন ও জনের প্রতি নিজেদের আসক্তি ও বাইরের জগতের সঙ্গে আমাদের বন্ধনের আবেগময় উদ্দীপনায় আমরা গণ্ডিজীবনের বাইরে জীবনযুদ্ধ ও দুঃখকষ্টের প্রতি সচেতন হই। কিন্তু এ ছাড়া, মানবিক

দয়ার আর একটি সম্পূর্ণ ভিন্ন উৎস আছে। তার উৎপত্তি পরিচ্ছন্ন ও একান্ত চিন্তার ওপর ভিত্তি করে নিরাসক্ত কর্তব্যবোধ থেকে। সৎ এবং পরিচ্ছন্ন চিন্তা থেকেও দয়া ও অনুরাগ জন্মায়। কেননা, তা-ই জীবনকে সরল, পূর্ণাঙ্গ এবং উজ্জ্বলতর করে এবং পরিমণ্ডলে. কাজেই জীবনে, সংঘাত ও অ-সুখকে কমায়। এ দুই ভিন্ন উৎস থেকে একটা গভীর সামাজিক মনোবৃত্তি, সহযোগিতা, বন্ধুত্ব, দয়া জন্ম নিতে পারে। শারীরস্থান-এর দিক থেকে একটির উৎস হৃদয় এবং অন্যটির মস্তিষ্ক। বয়স যত বেড়েছে, পরিচ্ছন্ন চিন্তা-প্রসূত দ্বিতীয় প্রকার শোভন নম্রতাকে আমি তত বেশি মূল্য দিতে শিখেছি। যে আবেগ পরিচ্ছন্ন চিন্তা-সমর্থিত নয় তা ধ্বংসাত্মক না হলেও যে কত অকেজো হতে পারে, তার ভুরি ভুরি দৃষ্টান্তের আমি সাক্ষী।"

আইনস্টাইনের পরিচিত বহু লোক প্রায়ই জিজ্ঞাসা করতেন— তাঁর মস্তিষ্ক ও হৃদয়েয় মধ্যে কোন্‌টি বড়! নিঃসীম মহাবিশ্বের গঠন সম্পর্কে খোঁজ নিতে সমর্থ সেই সুমহান মস্তিষ্ক, না মানুষের দুঃখ-বেদনা ও সামাজিক অন্যায়ের প্রকাশে মুহূর্তে সংবেদনশীল সমুন্নত উদার হৃদয়? প্রিন্সটনে আইনস্টাইনের জীবন নিয়ে সেখানকার অনেকের স্মৃতিচারণা আছে। সেগুলোর মধ্যেও প্রশ্নটির উল্লেখ দেখা যায়। ডাঃ গুস্তাভ বাকি ছিলেন আইনস্টাইনের চিকিৎসক। তিনি লিখছেন—আইনস্টাইনের আইডিয়াগুলো ছিল অত্যন্ত গভীর এবং অস্বাভাবিকতার অপূর্ব ইমপ্রেশনবাহী। তা সত্ত্বেও 'মানবিক দয়াই ছিল তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ এবং নাড়া-দেয়ার-মতো আশ্চর্য ব্যাপার।' বাকি আরও বলেন—প্যর্‌ট্রেটের জন্য বসে থাকাকে আইনস্টাইন ঘৃণা করতেন। কিন্তু তাঁকে রাজি করানোর ব্যাপারে একটা যুক্তির ওপর খুব নির্ভর করা চলত। আর্টিস্টকে শুধু বলতে হবে, এ প্যর্‌ট্রেট তাঁর আর্থিক অবস্থার উন্নতি ঘটাতে সাহায্য করবে। ব্যস, তা হলেই অভাবী আর্টিস্টের জন্য আইনস্টাইন তৎক্ষণাৎ ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসে থাকতে রাজি হয়ে যাবেন। রাস্তায় আইনস্টাইন বেরিয়েছেন—

শুধু এ দৃশ্যটিই পথিকের মুখে প্রসন্নতার স্নিগ্ধ হাসি আনার পক্ষে যথেষ্ট ছিল।

ইনফেল্ড লিখছেন—"এমন কি প্রিন্সটনেও প্রত্যেকে হাঁ করে, বিস্ময়বিমূঢ় চোখে, আইনস্টাইনকে দেখতেন। যখন একত্রে হাঁটতাম তখন বাধ্য হয়ে জনাকীর্ণ রাজপথ ছেড়ে আমরা হয় মেঠোপথ, নয়তো বহুদিনের পরিত্যক্ত রাস্তা দিয়ে চলতাম। একদিন হঠাৎ একটা মোটরগাড়ি এসে আমাদের পথরোধ করল। গাড়ি থেকে নামলেন মধ্যবয়সী এক ভদ্রমহিলা। হাতে দামি সুদৃশ্য ক্যামেরা। সলজ্জ উত্তেজনায় বললেন—

"প্রফেসর আইনস্টাইন, অনুগ্রহ করে আপনার একটা ফোটো নিতে দেবেন?

"হ্যাঁ, হ্যাঁ, নিশ্চয়ই।"

এ কথা বলেই তিনি দু-এক সেকেণ্ড চুপ করে দাঁড়ালেন। তারপর আবার শুরু করলেন আলোচনা। ফোটো-তোলা ব্যাপারটির অস্তিত্ব আর তাঁর কাছে রইল না। আমি নিঃসন্দেহ, ব্যাপারটা যে আদৌ ঘটেছিল কয়েক মিনিট পরে তা-ই তিনি ভুলে গেছেন।

একবার প্রিন্সটনে আমরা দুজনে একত্রে সিনেমা দেখতে যাই। এমিল জোলার জীবনী। টিকিট কাটার পর আমরা গেলাম জনাকীর্ণ প্রতীক্ষালয়ে অপেক্ষা করতে। বুঝলাম, অন্তত আরও মিনিট পনের আমাদের অপেক্ষা করতে হবে। বাইরে গিয়ে কিছুক্ষণ হেঁটে আসার প্রস্তাব করলেন আইনস্টাইন। বেরিয়ে যাওয়ার মুখে গেটম্যানকে আমি বললাম:

"আমরা মিনিট কয়েক পরেই আবার ফিরে আসছি"।

কিন্তু আইনস্টাইনকে খুব চিন্তান্বিত দেখলাম। আমার কথার সঙ্গে নিরীহভাবে যোগ করলেন:

"আমাদের কিন্তু আর টিকিট নেই। চিনতে পারবেন ত।"

আমরা তাঁর সঙ্গে মজা করছি ভেবে লোকটি হাসলেন। বললেন—"হ্যাঁ, প্রফেসর আইনস্টাইন, নিশ্চয়ই পারব।"

১৯৩৭-র প্রথম দিকে ইনফেল্ড উভয়সঙ্কটে পড়লেন। প্রিন্সটনে তাঁর ফেলোশিপ ছিল এক বছরের জন্য। আইনস্টাইনের সুপারিশ সত্ত্বেও ফেলোশিপের মেয়াদ কিছুতেই বাড়ান গেল না। কি করে ইনফেল্ড এখন আইনস্টাইনের কাজ চালিয়ে যাবেন? অবশেষে সঙ্কট মোচনের পথ বাতলালেন ইনফেল্ড নিজেই। আইনস্টাইনের সঙ্গে একত্রে জনপ্রিয় একটা বিজ্ঞান-বই লিখলে কেমন হয়! গ্রন্থকার হিসেবে আইনস্টাইনের নাম থাকবে এমন বই ছাপার অনুরোধে প্রকাশকমাত্রেই আগ্রহ দেখাবেন। রয়্যালটির অর্ধেকও অগ্রিম পেলে ইনফেল্ডের পক্ষে অনায়াসে আর এক বছর প্রিন্সটনে কাটানো চলবে। অনেক দ্বিধা-সঙ্কোচের পর ইনফেল্ড আইনস্টাইনের কাছে প্রস্তাব পাড়লেন। শান্তভাবে, মনোযোগের সঙ্গে, আইনস্টাইন সব শুনলেন। পরে বললেনঃ "আইডিয়াটা মন্দ নয়। আদৌ মন্দ নয়।" তারপর উঠে দাঁড়িয়ে হাত বাড়িয়ে দিলেন ইনফেল্ডের দিকে। বললেন—"আমরা এটা করব।"

রিলেটিভিটির ওপর জনপ্রিয় বই লেখার কোন ইচ্ছেই আইন-স্টাইনের ছিল না। যৌক্তিক ক্রমবিকাশ অনুসারে পদার্থবিজ্ঞানের প্রধান প্রধান ধারণাগুলো উপস্থিত করাই ছিল তাঁর আইডিয়া। এতে থাকবে স্রেফ পদার্থবিজ্ঞানের নির্ভেজাল মূল ধারণাগুলো। থাকবে না গাণিতিক আলোচনার কোন কণ্টক। এটা হবে ঐতিহাসিক বিবরণীর মতো। কীভাবে ভৌত চিত্রগুলো জন্ম নেয়, গাণিতিক ফর্মালিজমের পোশাকে শোভিত হওয়ার আগে কীভাবে তারা বিকশিত হয়ে ওঠে তার কাহিনী। ঐতিহাসিক উপস্থাপনার স্টাইলে দেখান হবে অনুসন্ধানের অ্যাডভেঞ্চার এবং সেই সঙ্গে আইডিয়ার সংগ্রাম।

প্রস্তাবিত বইটি সম্পর্কে আইনস্টাইনের মন্তব্য—"এটা হল একটা নাটক, আইডিয়ার নাটক। বিজ্ঞানকে যাঁরা ভালবাসেন তাঁদের প্রত্যেকের কাছে এটাকে অত্যন্ত মনোজ্ঞ ও চিত্তাকর্ষী হতে হবে।"

সুদৃঢ় ব্যাখ্যা দেয়ার আগে স্বজ্ঞা বা অর্ধস্বজ্ঞা-লব্ধ যে ছবি তাঁর মনে আসে তাতেই আইনস্টাইনের ইন্টারেস্ট। ভৌত ছবিগুলোকে 'আইডিয়ার নাটকরূপে' দেখা তাঁর জ্ঞানতত্ত্বীয় ধারণা থেকে সরাসরি উৎসারিত। যদি কোন ছবি ভেসে ওঠে তবে, তত্ত্বত, থিয়োরীটিকে পরীক্ষায় যাচাই করা যাবে। কেবল বিচারবুদ্ধিমূলক বিবৃতির প্রয়োজন হবে না। বিজ্ঞান যদি জ্ঞানে অনুস্যূত (কাণ্ট) বিচারমূলক অঙ্গীকারসমূহের দ্ব্যর্থহীন যৌক্তিক বিকাশ বা মুক্তপ্রথার (পঁয়কার) ফলশ্রুতি হয়, তা হলে সে আর যা হোক নাটক নয়। আর বিজ্ঞান যদি হয় একগুচ্ছ বাহ্য ব্যাপারের নিছক বিবরণ অথবা মানসিক বা আত্মবাদী 'অভিজ্ঞতা'র ফল (মাক), তবে এটা আর 'স্বতঃসিদ্ধতা থেকে পলায়ন' হবে না। এতে থাকবে না কোন প্যারাডক্স বা আইডিয়ার সংঘর্ষ যা বিজ্ঞানকে নাটকে পরিণত ক'রে ইতিহাসে চিহ্ন রেখে যায়।

বইটি সম্পর্কে আইনস্টাইনের আইডিয়া এর উপস্থাপনায় বিধৃত। সেটি হল : বিষয়বস্তুর দিক থেকে যেগুলো ভাসাভাসা সে সবের প্রভাব এবং অলঙ্কারকে একেবারে বিদূরিত করা। বিশ্বের দানবীয় বিস্তার (মাত্রা) এবং লক্ষ লক্ষ আলোক-বৎসরের আন্তর্নাক্ষত্রিক দূরত্বকে পারমাণবিক মাত্রার সঙ্গে তুলনা ক'রে কল্পনাকে হতবুদ্ধি করতে তাঁরা চান নি। তা ছাড়া, এমন ধারণার সৃষ্টি করতেও তাঁরা চান নি যে, বিজ্ঞান সাধারণ জ্ঞান থেকে বিচ্যুত বিশেষ একটা কিছু। বিজ্ঞান যদি নিছক কনসেপচুয়াল স্কীম-এর বিকাশের প্রতিনিধিত্ব করে, তবে দৈনন্দিন অভিজ্ঞতালব্ধ যে কনসেপশান তার সঙ্গে এর কোন মিল থাকে না। বৈজ্ঞানিক চিন্তার 'রাজপথ' আর দৈনন্দিন জীবনের সাধারণ জ্ঞানের 'রাস্তা' একই। প্রথম দৃষ্টিতে যেগুলো কমনসেন্সের কাছে প্যারাডক্সিক্যাল বলে প্রতিভাত হয়, বিজ্ঞান কেবল সেগুলো

সম্পর্কে নতুন নিয়ম-নিয়ন্ত্রিত রাজ্যের গভীরে ডুব দেয়। এই অঙ্গীকার আইনস্টাইনের ভিত্তিতে নিহিত।

The Evolution of Physics প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৩৮ সালে। মুখবন্ধে গ্রন্থকারদ্বয় লিখলেন—"বইটি লিখতে গিয়ে আমরা এর পাঠককে নিয়ে সুদীর্ঘ আলোচনা করেছি। তাঁর সম্পর্কে আমাদের দুশ্চিন্তাও কম ছিল না। পদার্থবিজ্ঞান এবং গণিত সম্পর্কে বাস্তব জ্ঞানের অভাব দূর করতে আমরা তাঁর ওপর বেশ কিছু গুণ আরোপ করেছি। তাঁকে আমরা ভৌত এবং দার্শনিক আইডিয়া সম্পর্কে অত্যন্ত আগ্রহশীল দেখেছি। যে অসীম ধৈর্য নিয়ে অল্প চিত্তাকর্ষী এবং কঠিন অনুচ্ছেদগুলোর ওপর দিয়ে তিনি হোঁচট খেতে খেতে চলেছেন আমরা তার প্রশংসা না করে পারিনি।

এ কথা বলতে হবে, আমাদের এ পাঠক এতটা আদর্শায়িত নন যে, তাঁকে বাস্তবে পাওয়া যাবে না। The Evolution of Physics পড়তে কোন বিশেষ জ্ঞানের প্রয়োজন নেই। তবে যা আবশ্যিক তা হল বুদ্ধি, বিমূর্ত বিচারক্ষমতা এবং দার্ঢ্য। অবশ্য এজন্য প্রধানত প্রয়োজন মানুষের আদর্শগত বিবর্তনের প্রতি গভীর অনুরাগ। এ যুগের অন্যতম লক্ষণ এই যে, পৃথিবীতে এ ধরনের বাস্তব লোক এত আছেন যে, আদর্শায়িত এ পাঠক তাঁদের প্রোটোটাইপ। অসংখ্য লোক আজ বিজ্ঞানের ইতিহাসের সমসাময়িক সমস্যাদির উত্তর খুঁজে বেড়াচ্ছেন। 'বিশ্ব ছন্দোময় এবং এ বিশ্বকে জানা চলে'—মূল উত্তরটি এই কথাগুলোর মধ্যে প্রকাশিত হয়েছে।

"আমাদের তত্ত্বীয় কনস্ট্রাকশান-এর দ্বারা বস্তুবিশ্বকে জানা চলে এবং বিশ্বের অন্তস্তলে ছন্দোময়তা বিরাজ করছে—এ বিশ্বাস ব্যতিরেকে বিজ্ঞান সম্ভব নয়। সব রকম বৈজ্ঞানিক সৃষ্টির মূলে আদি-প্রেরণা হল এই বিশ্বাস। এবং চিরদিনই তা থাকবে। আমাদের সমস্ত প্রচেষ্টায়, পুরনো ও নতুন সব মতবাদের নাটকীয় সংগ্রামে এবং

জানার চিরন্তন-আকাঙ্ক্ষায় আমরা বিশ্বের ছন্দোময়তায় আমাদের চিরদৃঢ় প্রত্যয়ের অস্তিত্বকে মেনে নিই।"

আলোচ্য অনুচ্ছেদটির আগে গ্রন্থটিতে সংক্ষিপ্ত একটা বিবরণ আছে। এটি বৈজ্ঞানিক বিশ্বছবি বিকাশের সেই বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে যা থেকে বিশ্বের ছন্দোময়তা এবং পরিজ্ঞেয়তার আইডিয়াটি পাওয়া যায়।

মূল ধারণাগুলো হল: ভর, বল এবং বলাধীন অবস্থায় গতি—যে গতি ধাবমান কাঠামোয় ঘটনার গতিকে প্রভাবিত করে না। এ ধারণাগুলোর সাহায্যে বিশ্বের যান্ত্রিক চিত্রটি গঠন করা হয়: কণাগুলোর মধ্যে বল ক্রিয়াশীল এবং বলের মান শুধু মধ্যবর্তী দূরত্বের ওপর নির্ভরশীল। 'বস্তুগুলোর আচরণ নয়, তাদের মধ্যবর্তী কিছু একটার আচরণ অর্থাৎ ক্ষেত্রই ( field ) হয়ত ঘটনাবলী বুঝতে এবং তাদের পারম্পর্য নির্ণয়ে একান্ত প্রয়োজন। বিষয়টি পুরোপুরি বুঝতে একটা সাহসিক বৈজ্ঞানিক কল্পনার প্রয়োজন ছিল!' পরবর্তীকালে চরম 'সময়'-এর ধারণা পরিত্যক্ত হয় এবং শুধু তখনই ইনার্শিয়াল কাঠামোয় আপেক্ষিক গতির সীমাবদ্ধতাকে কাটিয়ে ওঠা গেল। সব রকম কাঠামোতেই ঘটনাপুঞ্জ বস্তুগুলোর আপেক্ষিক সরণে পর্যবসিত হল। ঘটনাবলীর পশ্চাৎপট আর শুধু একমাত্রিক সময় এবং ত্রিমাত্রিক দেশসন্ততি নয়। পশ্চাৎপটটি হল এক চতুর্মাত্রিক দেশকালসন্ততি ( four dimensional spacetime continuum )। পরিশেষে, "আবার কোয়ান্টাম তত্ত্ব এসে বাস্তবতার নতুন ও প্রয়োজনীয় এক ফিচার সৃষ্টি করল। Discontinuity দখল করল continuity-র স্থান।" পদার্থবিজ্ঞানের লক্ষ্য কিন্তু প্রতিটি পর্যায়ে একই থেকে গেল: পরিদৃশ্যমান তথ্যারণ্যে তন্নিষ্ঠ ছন্দোময়তার আবিষ্কার। এ ছন্দোময়তার অস্তিত্ব এবং উপলব্ধির মধ্যে বৈজ্ঞানিক ইতিহাসের ফলাফল নিহিত। "আমাদের বাস্তবতার যে ধারণা তা থেকে পর্যবেক্ষণলব্ধ সত্য এক যৌক্তিক অনুসিদ্ধান্তরূপে দেখা দিক—আমরা তা-ই চাই।"

এ অভিলক্ষ্যের ভিতের ওপরে আইনস্টাইনের বৈজ্ঞানিক তথা

জীবনের ইণ্টারেস্টগুলোর কেন্দ্রবিন্দুটি সুস্থিত। যুক্তিবাদ এবং পারম্পর্যের ক্রমভঙ্গহীনতায় স্পিনোজার দর্শনের সঙ্গে এর সংযুক্তি এবং বিগত তিন শতকের বৈজ্ঞানিক প্রকৃতি ও চর্চার ফলে যে উৎকর্ষতা তাতে এটি একটি সাধারণ রূপ পরিগ্রহ করেঃ আদর্শ ক্ষেত্রে, বৈজ্ঞানিক চিন্তনের লজিক আমাদের পৌঁছে দেয় পরীক্ষায় পর্যবেক্ষণক্ষম ভৌত সম্বন্ধরাজির সামগ্রিকতায়। ক্রমোন্নতির সঙ্গে সঙ্গে বিজ্ঞান যে এ আদর্শের দিকে এগোচ্ছে তাতে প্রমাণ হয়, পৃথিবীতে নৈশ্চিত্যবাদের রাজত্ব চলছে। বিশ্বকে আলিঙ্গন ক'রে যে কার্যকারণ শৃঙ্খল রয়েছে বৈজ্ঞানিক চিন্তনের লজিক তাকেই প্রতিফলিত করে।

এই মূল আইডিয়ার ওপর ইণ্টারেস্ট এবং মানসিক ক্ষমতার সর্বোচ্চ অভিনিবেশ আইনস্টাইনের জীবন ও কর্মের প্রধান ফিচার।

বইটির প্রতি আইনস্টাইনের মনোভাবটিও বেশ বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত। প্রস্তুতির পর্বে পর্বে তিনি সক্রিয় ভূমিকা পালন করলেন। কিন্তু যেই পাণ্ডুলিপি তৈরি শেষ হয়ে গেল, অমনি তাঁর সব আগ্রহ মুহূর্তে মিলিয়ে গেল। এমন কি, বইটির কোন প্রুফও তিনি তাকিয়ে দেখেন নি। প্রকাশক যাতে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে না পড়েন এজন্য ইনফেল্ড তাঁদের বলতেন—ফিনিশ্‌ড কপিটি আইনস্টাইনের খুব পছন্দ হয়েছে। আসলে কিন্তু বইটি তিনি খুলেও দেখেন নি।

হাইফায় থাকতেন আশি বছরের এক বৃদ্ধ ডাক্তার। ডাঃ হান্স মুহ্‌সাম। দীর্ঘ পনর বছর ধরে পক্ষাঘাতে পঙ্গু ও শয্যাশায়ী। একটা চোখ পুরোপুরি দৃষ্টিহীন। তাঁর সমস্ত সম্পত্তি নাৎসী দস্যুরা দখল করে নিয়েছে। ছোট ভাই এরিক ছিলেন বিশিষ্ট শান্তিবাদী লেখক। ওরানিয়েনবার্গের কনসেণ্ট্রেশান ক্যাম্পে অকথ্য নির্যাতন করে নাৎসীরা ১৯৩৪-র ১৩ই জুলাই তাঁকে হত্যা করে।

মুহ্‌সামের সঙ্গে আইনস্টাইন বার্লিনে প্রায়ই একত্রে বহু দূরপথ হাঁটতেন। দুজনের মধ্যে খুব হৃদ্যতা ছিল। মুহ্‌সাম আইনস্টাইনের

মধ্যে খুঁজে পেয়েছিলেন এক অপূর্ব কথককে। জীববিজ্ঞানের বিশেষ সমস্যা নিয়ে তাঁর সঙ্গে প্রায়ই আলোচনা করতেন। এমন কি, প্রিন্সটনে চলে আসার পরও আইনস্টাইন-মুহ্‌সাম পত্রালাপ অক্ষুন্ন ছিল।

এলসাকে হারিয়ে আইনস্টাইনও তখন একেবারে নিঃসঙ্গ জীবন যাপন করছেন। ১৯৪২-র গ্রীষ্মে ওঁকে আইনস্টাইন লিখলেন— "আমি এখন এক নিঃসঙ্গ বৃদ্ধে পরিণত হয়েছি। এক পিতৃসম ব্যক্তিত্ব—যার পরিচিতির প্রধান কারণ সে মোজা পরে না, বহু সময়ে এক অদ্ভুত দ্রষ্টব্য বস্তু হিসেবে তাকে দেখান হয়। তবে নিজের কাজে আগের চেয়ে আমি ঢের বেশি গোঁড়া হয়ে পড়েছি। আমি সত্যি আশা করি যে, বিভিন্ন ভৌত ক্ষেত্রগুলোর মধ্যে ঐক্য বিধানের পুরনো সমস্যাগুলো সমাধান করেছি। এ যেন এক বায়ুযানে বসে থাকা! মেঘের মধ্যে সহজে ঘুরে বেড়ানো চলে অথচ কি করে বাস্তবের মাটিতে অর্থাৎ পৃথিবীতে ফিরতে হবে তা স্পষ্ট বোঝা যায় না।"

পাদপ্রদীপের আলোয় আসা দূরে থাক, নিজের সম্পর্কে সব কিছু পশ্চাৎপটে রেখে আত্মগোপন করাই ছিল আইনস্টাইনের অননুকরণীয় বৈশিষ্ট্য। নিজেকে এত গুরুত্বহীন মনে করতেন যে, নেহাৎ অনিচ্ছাসত্ত্বে কদাচিৎ কখন নিজের শরীর সম্পর্কে ডাক্তার বন্ধুদের কাছে উল্লেখ করতেন। নিজের দেহকে বলতেন 'corpse' বা শব।

যকৃতের রোগের দরুন তিনি ধূমপান ছাড়তে বাধ্য হন। আহারেও হতে হয় নিরামিষাশী।

১৯৪৭-র ২৪শে জুলাই হাইফায় এক চিঠি লিখলেন—"এ অবিশ্বাস্য জটিল যন্ত্রপাতি যে এখনও কাজ করছে এবং এতো বছর ধরে একটানা করেছে—এটা আমার কাছে পরম বিস্ময়! আমাদের সমস্ত বিজ্ঞান ব্যাপারটা যে কতো আনাড়ি-আদিম তা বুঝতে 'জীবন' সম্পর্কে অনুধাবনই যথেষ্ট। আরও গভীরে প্রবেশ করলে দেখা যায়, গণিত-ও হার মানে। মূল সমীকরণগুলোতে যা ব্যঞ্জিত তখন তাকে ধরাও অসম্ভব হয়ে ওঠে।"

অসুস্থ দেহের বিরুদ্ধে যখন তিনি নীরবে সংগ্রাম করে চলেছেন তখনও তাঁর বৌদ্ধিক সজীবতা তাঁকে ছেড়ে যায় নি। ১৯৪৮-র নববর্ষের পর থেকে আইনস্টাইন বুঝেছিলেন, যে কোন সময়ে জীবনের শেষ মুহূর্তটি আসতে পারে। কেননা, ব্রুকলীনের ইহুদী হাসপাতালের প্রফেসর নিশেন যে অপারেশন করেন তাতে দেখা যায় যে, ধমনীর স্ফীতি ইতিমধ্যেই আঙ্গুর ফলের আকার নিয়েছে। ফুটো হয়ে যাওয়া শুধু সময়ের ব্যাপার। এ সত্ত্বেও কিন্তু আইনস্টাইন পরম প্রশান্তিতে ইনস্টিটিউট এবং বাড়িতে নিরন্তর কাজ করে চলেছেন।

পঞ্চাশের দশকে আইনস্টাইনের লেখা চিঠিগুলোতে জীবনের প্রতি একটা ক্লান্তি ও অবসাদবোধের উল্লেখ দেখা যায়। যেমন বর্নকে একবার লিখলেন—"অপরিচিতের তকমা এঁটে ছিন্নমূল মানুষের মতো এখানে-ওখানে চিরকাল শুধু ঘুরেই বেড়ালাম। জানলাম না কিছুই।" আবার লিখলেন ১৯৫২-য়—"আমার কাজ নিয়ে বিশেষ কিছু বলার নেই। কোন রেজাল্ট আর পাচ্ছি না। এখন আমার ভূমিকা হল বর্ষীয়ান রাজনীতিবিদ আর জুইস সাধুসন্তদের।" জীবন-সায়াহ্নে অধিকাংশ মানুষ হিসেব মেলানোর কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়েন। কী পেলেন, আর কী পেলেন না, ব্যর্থতা ও সার্থকতার তৌলে কোন্ দিক গুরুতর হল সেই হিসেব। আর এগুলোর লিপিবদ্ধ রূপের নাম 'আত্মজীবনী'—অটোবায়োগ্রাফী।

নদী যেমন তার অন্তিম গতিতে ব-দ্বীপ রচনা করে এ-ও তেমনি। উচ্চগতিতে উপলখণ্ডের বাধাকে সবলে অতিক্রম ক'রে সে সৃষ্টির ঢল নামায় মধ্যগতিতে—শস্যশ্যামলা করে তোলে দু-কূলের জনপদ। তারপর ঐ অন্তিমগতি। মানুষের জীবন নদীও ঠিক তেমনি বয়ে চলে। লোকচক্ষুর অন্তরালে উচ্চাবচ পথপরিক্রমায় জীবনের সূত্রপাত—বাধাবিপত্তি অতিক্রম ক'রে মধ্যগতিতে বাসন্তিক শ্যাম-শোভার সৃজনলীলা। তারপর রুদ্ধগতি জীবন-নদীর ব-দ্বীপ রচনা।

তবে কি পঞ্চাশের দশক থেকে আইনস্টাইন জীবনের হিসেব মেলাতে শুরু করেন? কিন্তু আইনস্টাইনের লেখায় ত হিসেব-নিকেশের কথা পাওয়া দুষ্কর! একীভূত ক্ষেত্রতত্ত্বের পতন-অভ্যুদয়ে বন্ধুর ও পিচ্ছিল পথে তখনও তিনি একাকী পদচারণা করে চলেছেন। সূক্ষ্ম রসবোধ, আশাবাদী দৃষ্টিভঙ্গিমায় বা কাজ-পাগল মনে বার্ধক্যের এতটুকু পরশ লাগেনি। আত্মঠাট্টার ছলে পুরনো এক বন্ধুকে এ সময় লিখছেন—"তুমি ধারণা করতে পারবে না আমি এখানে কতটা পেছিয়ে আছি। বিশেষ করে, চিঠিপত্রের ব্যাপারে। আমাকে ইহুদীদের জন্য সন্তের কাজ করতে হয়, সবাই-কে দিতে হয় আশীর্বাণী। কাজেই চিন্তাভাবনা এবং কাজ করার জন্য আমাকে কার্যত পাকা চোরের মত সময় চুরি করতে হয়।" তবে কেন, কেন বারবার ঐ অবসাদের কথা? কোন কোন প্রশান্ত সন্ধ্যায় ব্যক্তিবিশেষকে যেমন নিঃসঙ্গতায় পেয়ে বসে এ-ও কি তাই?

আত্মজীবনীমূলক লেখা বলতে যা বোঝায় আইনস্টাইন তা লিখেছেন বৈকি! সে কথায় পড়ে আসছি। নিজের ক্রমবর্ধমান খ্যাতি সম্পর্কে পঞ্চাশের দশকে তিনি যেন আরও উদাসীন ও বিনয়নম্র হয়ে পড়েন। ১৯৫২-র জুন। মুহ্সামকে লিখলেন—"আমি যখন অঙ্ক কষতে ব্যস্ত থাকি এবং দেখি একটা পোকা আমার কাগজের ওপর হেঁটে বা উড়ে বেড়াচ্ছে তখন অনুভব করি আল্লাহ্ কতো মহান! অনুভব করি, আমাদের সব রকম বৈজ্ঞানিক চমৎকারিত্ব সত্ত্বেও মহাসমুদ্রে অবজ্ঞাত বারিবিন্দু ছাড়া আমরা কিছুই নই।"

শুধু পঞ্চাশের দশকেই নয়। আইনস্টাইন ছিলেন আজন্ম বিনয়ী। বলতেন—"আমার কোন বিশেষ প্রতিভা নেই। আছে শুধু তীব্র কৌতূহল।" একবার অক্সফোর্ড কলেজে ভোজের আসরে তিনি উপস্থিত। তাঁকে ঘিরে ছাত্র-অধ্যাপকদের মধ্যে কী দারুন উৎসাহ-উত্তেজনা, কতো ছোটাছুটি! এসব দেখে সরলভাবে আইনস্টাইন

জিজ্ঞেস করলেন—"আজ কি কোন বিশেষ ব্যাপার আছে?"

১৯০৯। আইনস্টাইনের ছেলে এড্‌ওয়ার্ডের বয়স তখন ন' বছর। সাধারণ আপেক্ষিক তত্ত্বের সাফল্যে আইনস্টাইন তখন খ্যাতির তুঙ্গে। ছেলে এসে বাবাকে জিজ্ঞেস করল—"Daddy, why are you so famous? বাবা, তুমি এতো বিখ্যাত কেন।" আইনস্টাইন হাসলেন। তারপর বেশ সিরিয়াসভাবে ব্যাখ্যা করে বললেন—"You see, son, when a blind bug crawls along the surface of a sphere it doesn't notice that its path is curved. I was fortunate enough to notice this!"

তবে আইনস্টাইনের এ বিনয়নম্রতা কোন সচেতন বিনয়নম্রতার অভিব্যক্তি নয়। এর সঙ্গে ওতোপ্রোতভাবে জড়িত ছিল তাঁর একাকীত্ব ও বিচ্ছিন্নতা। এই একাকীত্ব অর্থাৎ ভিড়ের সঙ্গে না চলা ছিল তাঁর সৃষ্টির বৈশিষ্ট্য। বিপুল খ্যাতির সময় তাঁকে ঘিরে কত কোলাহল হত! কিন্তু তাঁর মানসবিবিক্তৃতায় তিনি এতই নির্লিপ্ত ও তন্মনস্ক ছিলেন যে, তাঁর মনের একাগ্রতা কিছুতেই ক্ষুণ্ণ হত না। ফলে তাঁর বাইরের আচার-আচরণে স্বাভাবিকভাবেই বিনয়নম্রতার ছাপটি ফুটে উঠত।

তাই নিজ 'অবিচুয়ারিতে' তিনি কত্তো কিছুর উল্লেখ করেছেন, কিন্তু নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তির কোন উল্লেখ তাতে নেই। নোবেল পুরস্কার নিয়ে কোন রকম মানসিক আলোড়ন তাঁর ছিল না। ইনফেল্ডের কথায়—"আইনস্টাইন যেদিন নোবেল পুরস্কার পাওয়ার কথা শোনেন, সেদিন রাতে যদি না ঘুমোতে পেরে থাকেন তবে তার কারণ কোন বৈজ্ঞানিক সমস্যা নিয়ে তিনি গভীরভাবে ভাবিত ছিলেন। খুব সম্ভব, নোবেল পুরস্কারের পদকটি তিনি নিজে কোনদিন ভাল করে দেখেনও নি।"

ইনফেল্ডের এ কোন কল্পনাবিলাস নয়। একটা ঘটনার কথা বলি। বিশ্বের গণিতজ্ঞ ও বিজ্ঞানীদের দানে একটা তহবিল গড়া হয়েছিল।

উদ্দেশ্য, ম্যাক্স প্লাঙ্কের নামে বিশেষ একটা পদক দেবার ব্যবস্থা করা। প্রথম যিনি এই পদক প্রাপ্তির জন্য মনোনীত হন, তিনি আইনস্টাইন। ঠিক হয়েছে, বিকেল পাঁচটায় Institute of Physics-এ এক বিশেষ অনুষ্ঠানে পদকটি দেয়া হবে। সেদিন সকালে আইনস্টাইন নিজের ঘরে বসে কিছু কাজকর্ম করলেন, দুপুরে লাঞ্চে গেলেন ব্যক্তিগত চিকিৎসক ডাঃ ইয়ানোস প্লেখের বাড়িতে। সেখানে কার্যকারণ তত্ত্বের সঙ্কট নিয়ে আলোচনা হল। তারপর বিকেল চারটে পর্যন্ত ঘুমলেন।

ঘুম থেকে উঠে টেবিলের সামনে বসতেই হাতের কাছে পেয়ে গেলেন জুতোর দোকানের একটা রসিদ। সেই রসিদটির উল্টো পিঠের সাদা অংশে মিনিট কুড়ি ধরে অনেক কিছু লিখলেন। তারপর গিয়ে হাজির হলেন Institute of Physics-এর আনুষ্ঠানিক সভায়। জনাকীর্ণ সভাগৃহ। যথারীতি ম্যাক্স প্লাঙ্ক মঞ্চে আসীন। নিয়মমাফিক কিছু বক্তৃতাও হল। তারপর আইনস্টাইনের হাতে তুলে দেয়া হল পদকটি। এবারে আইনস্টাইনের বক্তৃতা করার পালা। আইনস্টাইন উঠে বললেন—"আমি জানতাম এমনি এক সম্মান লাভ করলে আমি খুবই বিচলিত হব। তাই আপনাদের ধন্যবাদ জানাবার জন্য আমার বক্তব্য লিখে এনেছি। তারপর পকেট থেকে বের করলেন সেই জুতোর দোকানের রসিদ এবং পড়ে গেলেন কার্যকারণ তত্ত্ব সম্পর্কে তাঁর বক্তব্য। সভাশেষে ডাঃ প্লেখ তাঁর জুতোর রসিদখানা ফেরৎ চাইলেন। সঙ্গে সঙ্গে আইনস্টাইন রসিদটি ত ফেরৎ দিলেনই, ফাউ হিসেবে দিয়ে দিলেন প্লাঙ্কের মূর্তি বসানো নিরেট সোনার মেডেলটি! জীবনে আর কোনদিন সে পদকটির দিকে তিনি ফিরেও তাকান নি।

১৯৫৫-র ১৪ই মার্চ। আইনস্টাইনের ৭৬তম জন্মদিন। এ দিনটি তিনি বাড়িতেই একান্তে বিশ্রাম নিলেন। সঙ্গে রইলেন শুধু সৎ মেয়ে মার্গট এবং একান্ত সচিব হেলেন ডুকাস। মার্গটকে আইনস্টাইন

নিজের মেয়ের মতোই ভালবাসতেন। আর দীর্ঘ পঁচিশ বছর একটানা আইনস্টাইন-সান্নিধ্যে হেলেন ডুকাস-ও এক অনুকরণযোগ্য চরিত্রের মহিলা হয়ে ওঠেন, এ কথা আগেই বলা হয়েছে। জন্মদিন উপলক্ষ্যে সাংবাদিক ও চিত্রশিকারীর দল হন্যে হয়ে তিন দিন ধরে আইন-স্টাইনের বাড়ি কার্যত অবরোধ করে রাখলেন। লোভী সংবাদপত্রের জন্য 'কপি' হিসেবে তাঁকে ধরে রাখা ছিল ঐ অবরোধের উদ্দেশ্য। কিন্তু নিজেকে জনসাধারণের দ্রষ্টব্য করে তোলার চেয়ে বন্দিদশাই তিনি শ্রেয়তর মনে করলেন। তবে জনজীবন থেকে তিনি কখনও, এমন কি বার্ধক্যেও, নিজেকে একেবারে গুটিয়ে নেন নি। বিধি-নিয়ম এবং শালীনতা সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক সমস্যার প্রশ্ন উঠলে এ পুরনো সিংহ সর্বদাই তাঁর গুহা থেকে বেরিয়ে এসেছেন—কখনও গর্জমান, কখনও বা শান্ত, অচঞ্চল।

এ রকম একটা পরিস্থিতি ঘটল ১৯৫৪-র মার্চে। মার্কিন প্রেসিডেন্ট আইজেনহাওয়ারের এক আদেশে ইনস্টিটিউট অব্ অ্যাডভান্সড্ স্টাডিজের ডিরেক্টর বিশ্ববিশ্রুত নিউক্লীয় বিজ্ঞানী রবার্ট ওপেনহাইমারকে 'কম্যুনিস্ট' অভিযোগে পরমাণু গবেষণার সমস্ত সরকারী পদ থেকে সরাসরি বরখাস্ত করা হল। বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারায় আইনস্টাইন ও ওপেনহাইমার ছিলেন দুই বিপরীত মেরুর লোক। কিন্তু তাতে কী! ক্ষুদ্রতার মালিন্য কোনদিন তাঁকে স্পর্শ করেনি। যে রাতে আইনস্টাইন এই নতুন witch-hunt এর খবর পেলেন সে রাতেই ম্যাকার্থিবাদের বিরুদ্ধে এবং ওপেনহাইমারের সমর্থনে উঠে দাঁড়ালেন। মাত্র কয়েকদিন আগে জন্মদিনে যে প্রেসকে সচেষ্টভাবে এড়িয়ে গেছেন, স্বয়ং সেই প্রেসকে ডেকে জানিয়ে দিলেন যে, সহকর্মীর চারিত্রিক সততা সম্পর্কে তিনি সাক্ষ্যপ্রমাণ দেবেন। মার্কিনীদের এই রুশভীতির হিস্টিরিয়াকে আইনস্টাইন কাপুরুষতা বলে অভিহিত করতেন। বস্তুত, স্বাধীনতা দমনের অগণতান্ত্রিক এ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে জীবনের শেষদিন পর্যন্ত তিনি সংগ্রাম করে গেছেন।

১৯৫২-য় মুহ্সামকে লিখেছিলেন—"দমন ও শোষণ হল মানবিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে সবচেয়ে ঘৃণ্য ঘটনা। এ জন্য রাশিয়ার এক নায়কতন্ত্রকেও তিনি ঘৃণা করতেন। একবার প্রস্তাব দিয়েছিলেন, মস্কোর মার্কস-লেনিন ইনস্টিটিউটের প্রবেশদ্বারের মাথায় এই কথা ক'টি উৎকীর্ণ করা হোক: "In the realm of truth there is no human authority. Whoever attempts to play the autocrat incurs the laughter of God"।

বার্লিনে এক সময় কাগজের ছোট্ট টুকরোয় এক তরুণের জন্য আঁকিবুকিতে জীবনের অন্যতম স্বতঃসিদ্ধটি তিনি লিখে দেন—"A good and resolute character is worth more than understanding and scholarship."। অজ্ঞদের দ্বারা বৌদ্ধিক স্বাধীনতার কণ্ঠরোধ তাঁর কাছে ছিল অসহ্য!

১৯৫৪-র শরতে The Reporter কাগজ তাঁকে চিঠি লিখে জানতে চান বিজ্ঞানীদের বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে তাঁর মতামত। উত্তরে তিনি লেখেন —"আজ যদি তরুণ হতাম এবং কীভাবে রোজগার করব সে সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নিতে হত, তবে আর বিজ্ঞানী হবার চেষ্টা করতাম না। অ্যাকাডেমিশিয়ান বা শিক্ষকও নয়। আমি বরং ছুতোর মিস্ত্রী বা হকার হতাম। তা হলে, বর্তমান অবস্থায়ও যেটুকু স্বাধীনতা পাওয়া সম্ভব অন্তত তা রক্ষা করার আশা করা চলত।"

স্বাধীনতা ও শান্তি: এই দুই আদর্শের জন্য জীবন-সায়াহ্নেও তাঁর হৃদয় তারুণ্যে স্পন্দিত হত। যে সংস্থা সব জাতির মধ্যে ক্রমাগত সমঝোতার কথা বলত, সেই আন্তর্জাতিক World Federation-এ তাঁর কথা ছিল বেদবাক্য। United World Federatists-দের গুরুত্বপূর্ণ আমেরিকান গোষ্ঠী ঐ সংস্থার সঙ্গে যুক্ত ছিল। ইজরায়েলে আরবদের জন্য তিনি পূর্ণ সাম্যের দাবী করেন এবং অভিমত দেন যে, তাদের সঙ্গে সমাজের অনুগত সদস্য হিসেবে

ব্যবহার করতে হবে। কেননা গণতন্ত্রের অন্যতম মূলনীতি হল সংখ্যালঘুদের প্রতি সম্ভ্রম দেখানো। তিনি বলতেন: এঁরা আরবদের সঙ্গে কতটা শোভন ব্যবহার করেন শুধু সেই অকাট্য মানদণ্ডে নবজাত রাষ্ট্রটিকে নৈতিক দিক থেকে বিচার করতে হবে। মৃত্যুর কিছু দিন আগে তিনি ভারতের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরুর কাছে আবেদন জানিয়েছিলেন যে, কঠিন কঠিন সমস্যার শান্তিপূর্ণ সমাধানে যেন পাঁচ বছর মেয়াদী যুদ্ধবিরতির প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়।

এবারে ফেরা যাক আইনস্টাইনের আত্মজীবনীমূলক লেখায়। মার্চ, ১৯৫৫। জীবনের শেষ বসন্ত। জুরিখ পলিটেকনিকের শত-বার্ষিকী উপলক্ষে প্রকাশিত হল স্মারক পত্রিকা। তাতে লিখলেন কয়েক পৃষ্ঠার এক autobiographical sketch। তাঁর জুরিখ পলিটেকনিকে ভর্তির চেষ্টা, আরাও ক্যান্টনাল বিদ্যালয়ে এক বছরের সুখস্মৃতির কথা, সেখানকার স্বাধীন ও মুক্ত পরিবেশের কথা, আর তখনকার সেই মানস-পরীক্ষার কথা—'যদি আলোর বেগে ছুটে চ'লে কেউ একটা আলোকরশ্মিকে ধরতে চায় তা হলে কী হবে?' তার কাছে আলোকতরঙ্গ স্থির বলে প্রতিভাত হবে। স্থির আলোক-তরঙ্গ! কী অর্থ তার? আপেক্ষিক তত্ত্বের সঙ্গে এ ছবির অসঙ্গতিতে তাঁর মগ্নচৈতন্যে সে সময় যা কিছু উদিত হয়েছিল তাই শেষ পর্যন্ত আত্মপ্রকাশ করল ১৯০৫-র বিখ্যাত গবেষণাপত্র 'On the Electrodynamics of Moving Bodies'-এ। তারপর বর্ণনা করেছেন তাঁর ছাত্রজীবনের কথা, গণিতের প্রতি তাঁর মনোভাবের কথা, সহপাঠী মার্শেল গ্রসমানের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি, বার্নের পেটেণ্ট অফিসের কাজের স্মৃতিচারণ এবং বৈজ্ঞানিক গবেষণার পক্ষে ওখানকার অনুকূল পরিবেশপ্রসঙ্গ।

আত্মজীবনার ছেঁড়াপাতায়, সামান্য হলেও, বিশেষ আপেক্ষিক তত্ত্বের উল্লেখ আছে। আর আছে সাধারণ আপেক্ষিকতার ওপর

বিশদ আলোচনা—ঠাসবুনোট প্রায় তিন পৃষ্ঠা জুড়ে। দীর্ঘ সাধনার এক জাজ্বল্যমান বিবরণ। এর পরিণতি ১৯১৬ সালে সাধারণ তত্ত্বের অবতারণায়। একীভূত ক্ষেত্রতত্ত্বের ওপর এই ক'টি কথা বলে আত্মজীবনী শেষ করেছেন—"মহাকর্ষ তত্ত্ব সম্পূর্ণ হওয়ার পর দীর্ঘ চল্লিশ বছর কেটে গেছে। মহাকর্ষ তত্ত্বের সাধারণীকরণ এবং সমগ্র পদার্থবিজ্ঞানের ভিত্তিরূপে গ্রহণযোগ্য একটি ক্ষেত্রতত্ত্ব উদ্ভাবনার একান্ত উদ্দেশ্য নিয়ে এই বছরগুলো ব্যয়িত হয়েছে। আরও অনেকে ঐ একই লক্ষ্যে পৌঁছনোর চেষ্টা করেছেন এবং বহু ধারণার বিকাশ ঘটেছে। প্রথম দিকে সেগুলো বেশ আশার সঞ্চার করেছিল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত পরিত্যক্ত হয়েছে। তবু বিগত দশ বছরে একটা তত্ত্ব বিকশিত হয়েছে এবং আমার কাছে তা বেশ স্বাভাবিক ও কার্যকরী বলে মনে হচ্ছে। অবশ্য, শেষ পর্যন্ত এটি পদার্থবিজ্ঞানের প্রয়োজন মেটাতে পারবে কিনা জানিনে। এ অনিশ্চয়তার কারণ দুর্লঙ্ঘ্য গাণিতিক বাধা। অরৈখিক ক্ষেত্রতত্ত্বমাত্রেই এ বাধা স্বাভাবিক। তা ছাড়া, এ ক্ষেত্রতত্ত্ব থেকে পদার্থ ও বিকিরণের পারমাণবিক গঠন এবং কোয়ান্টাম ঘটনারাজি প্রমাণ করা যাবে কিনা তাতেও সংশয় আছে। এ বিষয়ে অধিকাংশ পদার্থবিদের প্রতিক্রিয়া হল: একটা জোরালো 'না'! কারণ, তাঁদের মতে, কোয়ান্টাম সমস্যাগুলোর সমাধান নীতিগতভাবেই সম্পূর্ণ ভিন্ন পথে করতে হবে।"

এর পরে লেসীং-এর সেই বিখ্যাত উক্তি—"The search for truth is more precious than its possession. !" সত্যের সন্ধান সত্যকে লাভ করার চেয়ে অনেক বেশি মূল্যবান। লক্ষ্যণীয় যে, কথা ক'টি দিয়ে তিনি শুধু ক্ষেত্রতত্ত্ব নয়, তাঁর autobiographical sketchটিও শেষ করেছেন। লেসীং-এর কথাই আইনস্টাইনের জীবনদর্শন।

আইনস্টাইনের কাছে 'সত্য' হল বস্তুনিষ্ঠ জগতের 'সত্য', তন্নিষ্ঠ বিশ্বচিত্র। এ এমন একটি চিত্র যা আদর্শ, যেখানে কার্যকারণ

ব্যাখ্যার সঙ্গে সম্পর্কশূন্য কিছুর বালাই নেই। আদর্শকে পাওয়ার অনন্তযাত্রায়, বিকাশের পর্বে পর্বে বিজ্ঞানের একটা নির্দিষ্ট আপেক্ষিক সত্য থাকে এবং তা ক্রমাগত পরিশীলিত হয়। এ অনন্তযাত্রাই হল 'সত্যের সন্ধান' বা 'search for truth'। আর 'সত্যকে লাভ করা' বা 'possession of truth' হল এক নির্দিষ্ট নিশ্চিত কোন বিশ্বচিত্রের প্রাপ্তি।

সমসাময়িক-জ্ঞানের সীমাবদ্ধ গণ্ডিতে বিজ্ঞান পরিদৃশ্যমান বিশ্বের বিশেষ একটা রূপরেখা বা স্কীম উপস্থাপিত করে। এ রকম প্রতিটি ছবি পরবর্তী পর্বের বিশ্বছবি দ্বারা অপসৃত বা নিশ্চিহ্ন হলেও এরা নিরর্থক নয়। বিশ্ব-স্বরূপের নতুন ধারণার জন্য এগুলো রেখে যায় ঐতিহাসিক অব্যয় উপাদান। তাদের আর পরিমার্জন হয় না। তা ছাড়া, বিকাশের প্রতিটি পর্বে কতকগুলো অন্তরশায়ী ও প্রেরণাদায়ী বল বিজ্ঞানে সক্রিয় ওঠে। বস্তুত, এ বল হল সেই সব সমস্যা যার সমাধানে বিজ্ঞান উত্তরপুরুষকে দায়াবদ্ধ করে রেখে যায়। বিজ্ঞানের এই আন্তর বল সাধারণত দৃঢ় অবয়ব গ্রহণ করে না। কিন্তু যে বিরোধিতা এক যুগে দৃষ্টির আড়ালে থেকে পরবর্তীযুগে আত্মপ্রকাশ করে তাই অগ্রবর্তী যুগের তত্ত্বের সঙ্গে পরবর্তী যুগের বিকাশের যোগসূত্র। বিজ্ঞানে ক্রমোন্নতির বেগ অনেকটা এর ওপর নির্ভরশীল। একটা তত্ত্ব যখন আরেকটির দ্বারা স্থানচ্যুত হয় তখনই শুধু বিরোধিতা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। বিজ্ঞানকে এ ভঙ্গিতে দেখার অর্থ হল সুষ্ঠু থেকে সুষ্ঠুতর, ব্যাপক থেকে ব্যাপকতর ধারণার অন্তহীন এক মিছিলকে দেখা। বিজ্ঞানে 'সত্য' বলতে এর ক্রমভঙ্গহীন, ক্রমবিকাশশীল এবং প্রসারণধর্মী সমস্যাবলীকে বোঝায়। ফলে নিত্য নব নব এবং সঠিক থেকে সঠিকতর সাধারণ সমাধান বের করা সম্ভব হয়। এ সমাধান-গুলোই হল বিজ্ঞানের অমরত্বের ভিত্তি। Search for truth বা সত্যানুসন্ধানের অর্থ হল : পুরাতনীকে হটাতে নবীনার আবির্ভাব ঘটবে —the old order changeth yielding place to the new—

আর ঐ পুরাতনীই নবীনার আগমন সম্ভাবনার পথটি প্রস্তুত করবে। বিজ্ঞানের তত্ত্ব এবং তাদের স্রষ্টার এই হল ললাটলিপি।

আইনস্টাইন কখন মনে করতেন না যে, তাঁর একীভূত ক্ষেত্রতত্ত্ব বিশ্বগঠনের দ্ব্যর্থহীন 'একমেবাদ্বিতীয়ম্' ব্যাখ্যা। নিজ তত্ত্বের সাময়িক চরিত্র সম্পর্কে তিনি সচেতন ছিলেন। তার অকুণ্ঠ স্বীকৃতি ওপরের ঐ উধ্বৃতি। তিনি সত্যকে করতলগত করেছেন এমন নয়, তবে একীভূত ক্ষেত্রতত্ত্ব বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে নিঃসন্দেহে এক শক্তিশালী ধারার প্রবর্তক। তত্ত্বীয় বিজ্ঞানকে এ তত্ত্ব সবলে ঠেলে নিয়ে গেছে আপেক্ষিকতা ও কোয়াণ্টাম ধারণাবলীর সমন্বয়ের দিকে। এ সমন্বয় দুই ভিন্নধর্মী এবং এখনও পর্যন্ত পরস্পর সম্পর্কহীন (এমন কি পরস্পর বিরোধী) ধারণার সমন্বয়। এদিক থেকে একীভূত ক্ষেত্রতত্ত্ব বিজ্ঞানের মূলধারারই ধারক। চল্লিশ ও পঞ্চাশের দশকে এ তত্ত্বের আইনস্টাইনকৃত বিশেষ রূপটি হয়ত রূপকারের সঙ্গেই চলে যাবে। কিন্তু এর অন্তর্নিহিত প্রবণতা উত্তরাধিকাররূপে চিরদিন বিরাজ করবে। রূপকারের মৃত্যুর পর তা যেন আরও স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। মৌল-কণার রূপান্তরণে কোয়াণ্টাম-আপেক্ষিক ধারণার বিকাশকে ধন্যবাদ! কেননা, এর মধ্যে বিভিন্ন ধরনের ক্ষেত্রের পারস্পরিক ক্রিয়াটি মূর্ত হয়ে উঠেছে। বিজ্ঞানের এ প্রবণতায় প্রকাশ পেয়েছে 'search for truth', নাই বা হল 'its possession'।

একদিকে বিজ্ঞানের ক্রমভঙ্গহীন কালাতীত উপজীব্য, অন্যদিকে কালক্ষীয়মান আধেয়—এ দুয়ের জীবন্ত সূত্রটি আইনস্টাইন গভীরভাবে অনুধাবন করেছিলেন। বিজ্ঞানে এ দুয়ের ভূমিকা কোহেন-আইনস্টাইন সাক্ষাৎকারে বিশেষ প্রাধান্য পেয়েছিল। ফ্রাঙ্কলিন ও নিউটনের জীবনীকার বার্নার্ড কোহেন হলেন হারভার্ডের অধ্যাপক, বিজ্ঞানের ইতিহাসবিদ্। মৃত্যুর মাত্র দু সপ্তাহ আগে তিনি আইনস্টাইনের কাছে এসেছিলেন তাঁর সাক্ষাৎপ্রার্থী হয়ে।

*                    *          *          *

১৯৫৫-র এক রোববার সকালে কোহেন এসে উপস্থিত হলেন সবুজ রঙের শার্সি দেয়া আইনস্টাইনের সেই ছোট্ট বাড়িটিতে। তাঁকে সাদর অভ্যর্থনা জানালেন সেক্রেটারি হেলেন ডুকাস। নিয়ে গেলেন দোতলায় প্রফেসরের পাঠকক্ষে। এ কক্ষের বিবরণ আমরা আগেই দিয়েছি। কোহেন লিখছেন—"গোটা কামরায় সবচেয়ে বেশি করে যেটি চোখে পড়ে তা হল বিশাল একটা জানালা। আর তার বাইরে সবুজ সুন্দর দৃশ্যাবলী। দেয়ালের খালি জায়গায় টাঙানো ফ্যারাডে ও ম্যাক্সওয়েলের দুটো ছবি। তড়িচ্চুম্বকীয় তত্ত্বের দুই অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা।" ঘরের জানালার কাছে বৃহদায়তন টেবিলটির কথা কোহেন বিশেষ করে উল্লেখ করেছেন। কাগজে, প্যাডে-পেন্সিলে, বই-এ বই-এ, আর বহু পুরনো পাইপের সংগ্রহে সমাকীর্ণ সেই ঐতিহাসিক টেবিল!

ঘরে ঢুকলেন আইনস্টাইন। মিস ডুকাস তাঁর সঙ্গে কোহেনকে পরিচয় করিয়ে দিলেন। অভ্যর্থনা জানিয়ে আইনস্টাইন হাসলেন। তারপর ক্ষণিকের জন্য চলে গেলেন ঘর ছেড়ে। পাইপে তামাক ভরতে ভরতে ফিরে এলেন। এসে বসলেন ইজি-চেয়ারটিতে। তাঁর পোশাক পরিচ্ছদ অতি সাধারণ ও সাদাসিধে। পরনে বুকখোলা শার্ট, তার ওপর নীলরঙের সোয়েটার, ছাইরঙের ফ্লানেলের ট্রাউজার্স। আর পায়ে চামড়ার চপ্পল। বসন্তকালের গোড়ার দিক বলে দিনটা কিছু ঠাণ্ডা ছিল। আইনস্টাইন পায়ের ওপরে একটা কম্বল চাপিয়ে নিলেন।

কোহেন লিখছেন—"আমি তাঁর মুখের দিকে তাকালাম। ভারি সুন্দর ও অসাধারণ একটি মুখ। ধ্যানগম্ভীর মুখমণ্ডলে চিন্তাকুল বিষণ্ণতা, আর গভীর বলিরেখা। কিন্তু ঝকঝকে চোখ দুটি দেখলে মনে হয় বয়স তাঁর কাছে হার মেনেছে। চোখ দিয়ে অবিরত জল গড়াচ্ছে। এমন কি, যখন হাসছেন তখনও হাতের চেটোর পেছন দিয়ে

মুছে নিচ্ছেন জল।" ইংরেজিতে আইনস্টাইনের দখল দেখে কোহেন বিস্মিত। কিন্তু সবচেয়ে বিস্ময়কর তাঁর মৃদুস্বরের বাক্যালাপ আর সেই সঙ্গে গড়ানো হাসির রোলের অদ্ভুত বৈপরীত্য।

কোহেনের নিজের ভাষায়—"মৃদুস্বরে, স্পষ্টভাবে তিনি কথা বলছিলেন। ইংরেজিতে তাঁর অসাধারণ দখল। অবশ্য উচ্চারণে লক্ষ্যণীয় জার্মান-ছাপ। ...মৃদু বাক্যালাপ আর অনুরণিত হাসির মধ্যে ফারাকটা ছিল বিরাট। ঠাট্টা-তামাসা বেশ উপভোগ করছিলেন। যখনই মনের মতো কিছু বলতে পারছিলেন বা শুনছিলেন তখনই হা-হা করে হাসিতে ফেটে পড়ছিলেন। ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হয়ে সে হাসি দেয়াল থেকে দেয়ালে গিয়ে আছড়ে পড়ছিল। সে এক অসাধারণ ব্যাপার। তাঁকে কী রকম দেখব, তাঁর পরনে কী থাকবে, ছবি দেখে সে সম্পর্কে আমার একটা পূর্বধারণা ছিল। তাঁর পাঠকক্ষের বিবরণও আমি জানতাম। কিন্তু এ অট্টহাসি, সহৃদয় এবং সর্বগ্রাসী এই হা-হা হাসি-র জন্য আমি আদৌ প্রস্তুত ছিলাম না।"

আলোচনার অধিকাংশ সময় ব্যয়িত হল বিজ্ঞানের ইতিহাস আর তার দর্শন নিয়ে। তাঁর এবং মাক-এর ধারণার মধ্যে মূল প্রভেদটি কোথায় সে কথা বললেন। মাক-এর সঙ্গে ভিয়েনায় তাঁর সাক্ষাতের বিশদ বিবরণ দিলেন। তারপর হঠ প্রণিধানযোগ্য একটা মন্তব্য করলেন—"To-day physicists are almost all philosophers, যদিও, they are apt to be bad philosophers."। আজকাল প্রায় সব পদার্থবিদই দার্শনিক, যদিও দার্শনিক হিসেবে তাঁদের মন্দ হওয়ার প্রবণতাই বেশি। উদাহরণ হিসেবে, logical positivism বা যৌক্তিক দৃষ্টবাদের কথা পাড়লেন। মাক-এর একদল ছাত্র, বিশেষ করে 'ভিয়েনা গোষ্ঠী' এ মতবাদের সমর্থক। মাক-এর বিশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গতিহীন হলেও এঁরা কিন্তু ইন্দ্রিয়লব্ধ ধারণার সঙ্গে সাক্ষাৎ সম্পর্কহীন বিষয়কেও প্রবেশ-অধিকার দিচ্ছেন। মূল জ্ঞানতত্ত্বের প্রশ্নে এঁরাই আবার মাক-এর মতানুসারী হয়ে ইন্দ্রিয়জ

জ্ঞান ও পর্যবেক্ষণের পেছনে যে বস্তুনিষ্ঠ অস্তিত্ব তাকে অস্বীকার করছেন।

সাক্ষাৎকারের একটা বড় অংশ জুড়ে ছিল নিউটন ও তাঁর আবিষ্ক্রিয়া। বিজ্ঞানের ইতিহাসের প্রতি আইনস্টাইনের ছিল নিজস্ব একটা মনোভাব। বিজ্ঞানের প্রতি তাঁর ধারণার সঙ্গে এটি অতিমাত্রায় সংশ্লিষ্ট। কোহেন লিখছেন—"আইনস্টাইনের দৃষ্টিতে ইতিহাসের দুটি রূপ। একটা অন্তর-রূপ, স্বজ্ঞাধর্মী ইতিহাস। অন্যটি বাইরের রূপ, প্রামাণিক ইতিহাস। প্রথমটি অনেক চিত্তাকর্ষী, দ্বিতীয়টি অনেক বস্তুনিষ্ঠ। ঐতিহাসিক স্বজ্ঞার উদাহরণ দিতে আইনস্টাইন বিশ্লেষণ করলেন কী করে নিউটন 'ঈথর' ধারণায় পৌঁছলেন। বস্তুহীন দেশ বা মহাশূন্যের ভেতরে দূরস্থ বিন্দুতে তাৎক্ষণিক ক্রিয়ার (action at a distance ) ধারণা থেকে নিউটন যৌক্তিক, অবচেতন ও নিছক মনস্তাত্ত্বিক প্রেরণাবশে চিন্তার শৃঙ্খল বেয়ে বেয়ে 'ঈথরে' এসে উপস্থিত হন। বাইরে থেকে নিউটনের চিন্তাসূত্রগুলো দেখা যায়, কিন্তু আইনস্টাইনের জিজ্ঞাস্য: "এই স্বজ্ঞা-কে কি প্রামাণিক করে তোলা যায়? এবং গেলে কতদূর পর্যন্ত?"। আইনস্টাইন বিশ্বাস করতেন, বিজ্ঞানের চিন্তনক্রিয়া সম্পর্কে ঐতিহাসিকের অন্তর্দৃষ্টি সম্ভবত বিজ্ঞানীর চেয়ে অনেক বেশি।

ইনফেল্ডের সহযোগিতায় লেখা তাঁর Evolution of Physics গ্রন্থে তিনি বলেছেন, ভৌতস্তরের স্বজ্ঞাজাত ধারণাগুলো পূর্বাহ্নেই গাণিতিক সম্পর্ক বুঝতে পারে। এমন কি, কখন কখন তাদের ব্যাখ্যাও দেয়। এ সব ধারণার ঘাত-প্রতিঘাতে 'drama of ideas'-এর জন্ম। আইনস্টাইনের দৃষ্টিতে ধারণাগুলো ধরে রাখা এবং বিজ্ঞানে এদের দ্বন্দ্ব ও সংগ্রামই হল বড় কথা। এগুলো ঐতিহাসিক কোন পরিণতি পেল কিনা বা নতুন কোন ইতিহাস সৃষ্টি করল কিনা তা বড় নয়। অলক্ষ্যে অনাদৃত পড়ে থাকলেও এরা বিজ্ঞানে সর্বদাই জীবন্ত অবস্থায় বিরাজ করে।

কোহেনের সঙ্গে আলোচনায় আইনস্টাইন আরও বলেন, বিজ্ঞানের ইতিহাসে কতবার বড় বড় সমস্যার সমাধান হয়ে গেছে বলে মনে হয়েছে। কিন্তু নতুন অবয়বে তারা ফিরে ফিরে এসেছে। পদার্থ-বিজ্ঞানের বৈশিষ্ট্যই বোধ হয় তাই। তাঁর মতে, হয়ত কিছু মূল প্রশ্ন আমাদের চিরসাথী হয়ে থাকবে। আইনস্টাইন তাই সমাধানের কথা বলেন না। বলেন সমস্যার কথা, সংঘর্ষের কথা, বিরোধিতার কথা। এগুলোই ইতিহাসকে drama of ideas-এ পরিণত করে। সমাধান সত্ত্বেও যখন সমস্যা থাকে, তখন বুঝতে হবে সমাধানটি আপেক্ষিক, একটা আসন্ন সমাধান, কালাতীত কিছু নয়। এ সমাধান সমস্যাকে দূর করে না। বিশ্বছবিতে একটা সদর্থক ও ঐতিহাসিক দিক থেকে অব্যয় আধেয় ঢুকিয়ে দেয় মাত্র। এ সমাধান সমস্যাকে বাড়তে দেয়, আধুনিক করে তোলে, শেষে নবরূপে পুনরাবির্ভাবের প্রস্তুতি জোগায়।

বস্তুকণার গতীয় অবস্থার বিচারকালে শুধু তার অবস্থান জানলে চলে না। বেগও জানা প্রয়োজন। বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারার বিকাশের বিচারেও তেমনি ঐ চিন্তাধারা কোথায় পৌঁছেছে এবং বিভিন্ন সমস্যার কী কী সমাধান দিয়েছে তা জানাই যথেষ্ট নয়। এর বেগও জানা চাই। ঐ বেগেই নিহিত থাকে নতুন প্রশ্ন, পুরনো প্রশ্নের পুনর্বিন্যাস ও বিস্তৃতি এবং সমাধান লাভের পরও ভবিষ্যতের গর্ভের সব কিছু। তবে বস্তুকণার বেগের মতো শুধু বাইরের বলের প্রভাবে বিজ্ঞানের অগ্রগতি ঘটে না। ভেতরের অসামঞ্জস্য ও বিরোধিতাও বিজ্ঞানের যথেষ্ট বিকাশ ঘটায়।

বিজ্ঞানের ইতিহাস এবং সুস্থিত, (দৃশ্যত) স্বপ্রকাশ ও (মূলত) অচঞ্চল ধারণাগুলোকে যদি ভবিষ্যত প্রশ্নাবলীর সঞ্চয়, বিস্তৃতি ও রূপ পরিবর্তনের পদ্ধতিরূপে দেখা যায় তবে ইতিহাসকে ভূতাপেক্ষ দৃষ্টিতে দেখার অর্থ এ যুগের বেড়া ডিঙিয়ে যুগান্তরের বিজ্ঞানীদের সঙ্গে আলোচনা করা। পূর্বতন যুগের জ্ঞানতাপস, বিশেষ করে,

নিউটন সম্পর্কে আইনস্টাইনের মনোভাব এ রকমই ছিল। নিউটনকে উদ্দেশ করে তাই তিনি লিখলেন—"You find the only way which, in your age, was just about possible···"। যে পথের সন্ধান আপনি দিয়েছিলেন, সে যুগে তাই ছিল একমাত্র সম্ভাব্য পথ। তারপর, পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা জুড়ে, সমসাময়িক সব সমস্যা নিয়ে আলোচনা। মুখবন্ধে ক্ষমা প্রার্থনা—"Newton, forgive me."।

আইনস্টাইনের দৃষ্টিতে নিউটন ছিলেন সপ্তদশ শতকের এক যুগন্ধর জ্ঞানতাপস। তাঁর দেয়া সমাধানগুলো ছিল সে যুগের এবং পরবর্তী দুই শতকের মহান সম্পদ। কিন্তু যে প্রশ্নগুলোর 'মেলেনি উত্তর' সেগুলো, এবং স্ববিরোধগুলো ঐ যুগকে ছাড়িয়ে অনাগত ভবিষ্যতেও বিস্তৃত। ঐ সমস্যাগুলোই নিউটনের অমরত্বের কারণ। আজও তাই তাঁকে জীবন্ত ভেবে বিশ্বসমস্যা নিয়ে তাঁর সঙ্গে আলোচনা করা সম্ভব।

অমর ব্যক্তিদের সঙ্গে যিনি কথা বলতে পারেন তিনিও অমরত্ব লাভ করেন। অতীতের বিশ্ব-আবিষ্কারকদের সঙ্গে জীবন্ত সহযোগিতার এই ধারণাবশে আইনস্টাইন তাঁর আবিষ্কৃত বস্তুবিশ্বের মূলবিধিগুলো কী রূপ নিল সে সম্পর্কে উদাসীন ছিলেন। তাঁর একীভূত ক্ষেত্র-তত্ত্ব যে এক অদ্বৈত ভৌততত্ত্বের মর্যাদা না পেয়েই মিলিয়ে যেতে পারে সে সম্পর্কে তিনি সচেতন ছিলেন। অন্বেষার বিরল প্রচণ্ডতা সত্ত্বেও নিজ আবিষ্ক্রিয়াগুলোর সমস্যাধর্মী প্রকৃতি সম্পর্কে আইন-স্টাইনের ছিল প্রশান্ত দৃষ্টিভঙ্গি। তিনি জানতেন, সমস্যার সামাধান মিলবে, কিন্তু জটিলতররূপে তার পুনরাবির্ভাবও ঘটবে। বিশেষ একটা সমাধান হয়ত মিলিয়ে যাবে, কিন্তু সত্য বেঁচে থাকবে এবং তা ক্রমবিস্তৃতি লাভ করবে। "সব তত্ত্বই একদিন ভুল বলে জানা যায়, ভুল প্রমাণিত হয়—এটাই ট্র্যাজিডি। তবু, যে সত্য তার মধ্যে বেঁচে থাকে তার ক্ষয় নেই, লয় নেই। সে চিরপ্রবহমান।" হার্বার্ট স্পেন্সারের এ উক্তিটি তিনি বারবার উল্লেখ করতেন।

বিজ্ঞান ছিল আইনস্টাইন-জীবনের এক অবিচ্ছেদ্য সত্তা। অদৃষ্ট, জীবন ও মৃত্যুর প্রতি তাঁর মনোভাব বস্তুত বিজ্ঞানের প্রতি তাঁর মনোভাবের প্রতিফলন মাত্র। জীবনে কী পেলেন, আর কী পেলেন না, এ হিসেব মেলাতে তাঁর মন কোনদিনই রাজি ছিল না। একবার এক সাক্ষাৎপ্রার্থী তাঁকে প্রশ্ন করেছিলে—"আপনার জীবন কী সার্থক, না ব্যর্থ—মৃত্যুশয্যায় কেউ এ প্রশ্ন করলে আপনার উত্তর কী হবে?'। প্রশ্নের অন্তঃসারশূন্যতায় ভ্রূক্ষেপ না করে যথারীতি সরল ও অকপটে আইনস্টাইন বললেন—"মৃত্যুশয্যাতেই হোক বা অন্য সময়েই হোক, এ ধরনের প্রশ্নে আমি মোটেই উৎসাহবোধ করব না। কেননা, আমি বিশ্বের ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র কণিকা বৈ ত কিছু নই।"

মৃত্যুর প্রতি আইনস্টাইনের মনোভাব আরও অনেক ঘটনায় জানা যায়। ১৯১৬-তে একবার তিনি গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েন। অবস্থা এমন হল যে, জীবনসংশয় দেখা দিল। একদিন তাঁকে দেখতে এলেন বিশ্ববিশ্রুত বিজ্ঞানী ম্যাক্স বর্নের স্ত্রী ফ্রাউ বর্ন। মিসেস বর্ন এসে দেখেন, নিজের সম্ভাব্য মৃত্যু নিয়ে আইনস্টাইন শয্যাপার্শ্বে উপস্থিত আগন্তুকদের সঙ্গে আলাপ করে চলেছেন। যে নিরাসক্ত ও নিস্পৃহ ভঙ্গিমায় তিনি কথা বলছিলেন তা দেখে ত মিসেস বর্ন বিস্মিত। আইনস্টাইনকে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন—"আপনি কী মৃত্যুভয়ে ভীত?" উত্তরে আইনস্টাইন বললেন—"না। আমি জীবিত সব কিছুর সঙ্গে নিজেকে এতো ওতপ্রোতভাবে জড়িত বোধ করি যে, চিরবহমান জীবনস্রোতে ব্যক্তিবিশেষের ধরা-ছোঁয়া অস্তিত্বের আরম্ভ বা সমাপ্তি আমার কাছে কোন মূল্যই বহন করে না।"

এ কথার কথা নয়। মন্তব্যটি থেকে বোঝা যায় যে, তিনি নিজেকে মানুষের সেই মিছিলের সঙ্গে একাত্ম করে ভাবছেন যার যাত্রা শুরু হয়েছিল কোন্ অজানা অতীতে। সেই মানুষের উদ্দেশেই তাঁর সমগ্র জীবন এবং প্রকৃতির ছন্দোময়তার অন্বেষণে তাঁর জীবনব্যাপী

সাধনা নিবেদিত হয়েছিল। এ একাত্মবোধ শুধু তখনই আসে যখন ব্যক্তিজীবনের উত্তরণ ঘটে extra-personal বা অধিব্যক্তিক জীবনে, আর বস্তুনিষ্ঠ বিশ্ববিধানের সন্ধানে জেগে ওঠে উৎসাহ-উদ্দীপনা। এ একাত্মতা সমস্ত বিশ্বের সঙ্গে, বিকশিত সমস্ত প্রাণের সঙ্গে, মানুষের সঙ্গে, আর সেই সব ব্যক্তিবিশেষের সঙ্গে যাঁরা বংশপরম্পরায় প্রকৃতি সম্পর্কে জ্ঞানের বৃত্তটিকে বাড়িয়ে চলেছেন, বাড়িয়ে চলেছেন প্রকৃতির ওপর প্রভুত্ব বিস্তারের ক্ষমতা এবং মানবসমাজের অস্তিত্বে জোগাচ্ছেন যুক্তিনিষ্ঠ এক কাঠামো। হৃদয়ের বদলে মস্তিষ্ক থেকে উৎসারিত মানুষের প্রতি আইনস্টাইনের এ মনোভাবে প্রমাণ হয় যে, তাঁর মস্তিষ্ক ও হৃদয় ছিল এক সুরে বাঁধা, দুয়ের মধ্যে কোন বিরোধ ছিল না।

বিজ্ঞানী ইনফেল্ডের সঙ্গে আলোচনা প্রসঙ্গে তিনি একবার বলেছিলেন—"এ জীবন বড় উদ্দীপনাময়ী এক ঘটনা! বড় ভাল লাগে আমার! বড় চমৎকার! কিন্তু যদি জানতাম, আর মাত্র তিন ঘণ্টার মধ্যে জীবনের অবসান ঘটবে তা হলেও বিচলিত হতাম না। শুধু চিন্তা হত কী করে শেষ তিন ঘণ্টার সদ্ব্যবহার করি। তারপর শান্তভাবে কাগজপত্র গুছিয়ে নিয়ে শুয়ে পড়তাম চিরশান্তির কোলে।"

১৯৫৫-র এপ্রিলে কোহেন যখন আইনস্টাইনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন সে সময় আইনস্টাইন বেশ ভালই ছিলেন। এর কিছুদিন পরে প্রিন্সটনের এক বন্ধুকে নিয়ে আইনস্টাইন গেলেন হাসপাতালে, কন্যা মার্গটকে দেখতে। মার্গট তখন সায়াটিকায় শয্যাশায়ী। হাসপাতাল থেকে ফেরার পথে দুই বন্ধু হাঁটতে শুরু করলেন। মৃত্যু নিয়ে উভয়ের মধ্যে চলল আলোচনা। বন্ধু বললেন: মৃত্যু তাঁর কাছে 'both a fact and a mystery—একই সঙ্গে কঠোর বাস্তব এবং চরম রহস্য'। সঙ্গে সঙ্গে আইনস্টাইন যোগ করলেন—'আর এক পরমা শান্তি—and a great relief'। এ কোন নতুন কথা নয়। আইন-স্টাইন জীবনকে ভালবাসতেন ঠিকই, কিন্তু মৃত্যুকেও দূরে ঠেলতে চাইতেন না। এক চিঠির শেষ পংক্তিতে একবার লিখেছিলেন—

'death is no so bad, either! মৃত্যুও এমন কিছু খারাপ নয়'। এতে জীবনের প্রতি অনীহা সূচিত হয় না। বরং তার প্রতি একটা মমত্ববোধ, একটা ভালবাসা, আর সেই extra-personal জীবনা-দর্শকে বোঝায়।

এক সপ্তাহ পরে। ১৩ই এপ্রিল। আইনস্টাইনের সঙ্গে দেখা করতে এলেন ইজরায়েলের রাষ্ট্রদূত আব্বা ইবান ও কনসাল রয়বেন ডাফনী। একদা এই ইজরায়েল রাষ্ট্রেরই প্রেসিডেণ্ট পদ গ্রহণের অনুরোধ এসেছিল তাঁর কাছে। সবিনয়ে অস্বীকৃতি জানিয়ে বিজ্ঞানীপ্রবর —বলেছিলেন "প্রকৃতির তবু কিছু কিছু বুঝি, মানুষের রহস্যের কিছুই বুঝিনে।" যা হোক, শারীরিক অসুস্থতা সত্ত্বেও তিনি ওঁদের অভ্যর্থনা জানালেন। ইজরায়েল রাষ্ট্রের সপ্তম প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে নিপীড়িত জাতির আবাসরূপে রাষ্ট্রটিকে রক্ষা করা বিশ্ববিবেকের কর্তব্য—এই মর্মে ১৬ই এপ্রিল আইনস্টাইনের নামে টিভি-তে একটি ঘোষণা সম্প্রচারিত হবে। তা নিয়ে তাঁদের সঙ্গে তিনি আলোচনা করলেন। তাঁকে জানান হল: সম্ভবত ছ' কোটি লোক প্রোগ্রামটি শুনবেন ও দেখবেন। এ কথায় রসিকতা করে বললেন—'তা হলে দেখছি এখনও world-famous হওয়ার চান্স আছে আমার।' অতিথিরা বিদায় নিলেন।

এরপর আইনস্টাইন দারুণ ক্লান্তিবোধ করতে লাগলেন। সন্ধ্যের দিকে অবস্থা গুরুতর হয়ে পড়ল। তলপেটের ডানদিকে অসহ্য ব্যথা। পিত্তথলীর প্রদাহ? তক্ষুণি ডেকে পাঠান হল তাঁর বিশ্বস্ত ব্যক্তিগত চিকিৎসক এবং বার্লিন-জীবনের বন্ধু ডাক্তার ডীনকে। এলেন প্রফেসর গুস্তাভ বাকি ও নিউকোল্‌ন হাসপাতালের জেনারেল মেডিসিন বিভাগের প্রাক্তন ডিরেক্টর রুডলফ এরমান। ওঁদের অনুরোধে এলেন একজন বিশিষ্ট হৃদ্‌রোগ বিশেষজ্ঞ। পরীক্ষায় জানা গেল, হৃদ্‌পিণ্ডের পাশে মহাধমনীর আচ্ছাদন প্রচণ্ড ফুলে উঠেছে। যে কোন মুহূর্তে ফেটে গিয়ে বিপদ ঘটতে পারে। সিদ্ধান্ত হল: অস্ত্রোপচার করা হবে।

মৃত্যু নিকটে জেনেও কিন্তু আইনস্টাইন অস্ত্রোপচারে রাজি হলেন না। বললেন— "ধমনী ফাটে ফাটুক। মৃত্যুর সময় হয়ে থাকলে মৃত্যুই হোক না, ক্ষতি কী। বয়সে যে ন্যুব্জ, মৃত্যু তার কাছে আসবে পরিত্রাণরূপে।" একজন কাছের লোককে শান্তকণ্ঠে বললেন —"Don't look so upset. Everybody has to die someday"। শুধু জিজ্ঞেস করলেন, তাঁর মৃত্যু কি খুব কষ্টকর এবং ভয়ঙ্কর হবে? উত্তর পেলেন—"আভ্যন্তরীণ রক্তক্ষরণে নিশ্চয় করে কিছু বলা যায় না। এক মিনিটও স্থায়ী হতে পারে, আবার কয়েক ঘণ্টা, এমন কি, কয়েকদিনও চলতে পারে।"

শেষে ব্যথা একেবারে অসহ্য হয়ে উঠল। ১৫ই এপ্রিল, শুক্রবার। প্রতিবেশিদের সাহায্যে মিস ডুকাস আইনস্টাইনকে প্রিন্সটন হাসপাতালে ভর্তি করলেন। প্রচণ্ড যন্ত্রণা নিয়েও হাসপাতালের পথে জনৈক তরুণ পলিটিক্যাল ইকনমিস্ট তথা রেডক্রশ স্বেচ্ছাসেবকের সঙ্গে তিনি সোৎসাহে আলাপ-আলোচনা করলেন। হাসপাতালে তাঁকে ইনজেকশান দেয়া হল। ইনজেকশানের মাধ্যমে কিছু পথ্যও। ফলে ব্যথা বেশ কমে গেল। এতটা চাঙা বোধ করলেন যে, মার্সার স্ট্রিটে সেক্রেটারীকে ফোন করে গাণিতিক কাজকর্ম করার জন্য কিছু কাগজপত্র এবং ইজরায়েলের প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে তাঁর লেখার খসড়া আর চশমা-জোড়াটি আনতে বললেন। সময়ের অপচয়ে কী লাভ!

হাসপাতালে কেবিনে শুয়ে শুয়ে শেষ করতে লাগলেন রাসেলের জন্য বিশ্বশান্তি ইস্তেহারের খসরা লেখাটি। ১৭ই এপ্রিল। অপরাহ্নে সহযোগী বিজ্ঞানী বন্ধুরা দেখা করতে এলেন। তাঁদের মধ্যে আলোচনা চলল বৈজ্ঞানিক বিষয় ও রাজনীতি নিয়ে। বৈজ্ঞানিক বিষয় বলতে তাঁর সেই চিরকাঙ্ক্ষিত তত্ত্ব—'একস্মিন্ বিজ্ঞাতে সর্বং বিজ্ঞাতং ভবতি' সেই একীভূত ক্ষেত্রতত্ত্ব—মহাকর্ষ আর তড়িচ্চুম্বকীয় ক্ষেত্রের মিলনে বিশ্বসুষমার প্রকাশ—যা দিয়ে, 'নিউ ইয়র্ক টাইমস'-এর ভাষায়, ব্যাখ্যা করা যাবে 'গ্রহের চক্রগতি, ভরের দরুন আলোর পথের বিচ্যুতি,

পড়ন্ত পাথরের ওপর পৃথিবীর টান, হীরের ঔজ্জ্বল্য, রেডিয়মের অস্থিরতা, হাইড্রোজেনের লঘুভার, সীসের গুরুভার, তারের ভেতর দিয়ে বিদ্যুতের প্রবাহ, আর বস্তু-শক্তি-সময়-স্পেসের শত লক্ষ প্রকাশ'। আর রাজনৈতিক বিষয় হল: শান্তির জন্য সব শিবিরে বুদ্ধিজীবিদের একত্র করা। স্পিনোজার উক্তি উধৃত করলেন—"Amor Dei Intellectualis। ভগবান বুদ্ধিমানদের ভালবাসেন।" কিন্তু ভালবাসা ত একতরফা হতে পারে না। বুদ্ধিমানদেরও ভালবাসতে হবে ভগবানের এই পৃথিবীকে। মারণাস্ত্রের প্রতিযোগিতায় বিশ্বব্যাপী যে সর্বনাশা আগুন জ্বলতে চলেছে সেটি এড়াতে বুদ্ধিজীবী ও বিজ্ঞানীদের সমবেত করতে রাসেলের প্রচেষ্টায় তিনি শরিক হন। রাসেলকে বলেন—"আপনি সেনাপতি, আমরা সৈন্য। শান্তির জন্য আমরা আপনার সঙ্গে আছি, পেছনে আছি।" এই প্রচেষ্টা থেকে জন্ম নেয় পাগওয়াশ আন্দোলন।

পিতার অসুস্থতার সংবাদে বড় ছেলে আলবার্ট উড়ে এসেছেন বার্কলে থেকে নিউইয়র্ক। শনি ও রোববার ছেলের সঙ্গে অনেক গল্পগুজব করলেন আইনস্টাইন। তা ছাড়া ছিলেন অর্থনীতিবিদ্ বন্ধু ডঃ অটো নাথান। বহু বছর ধরে আইনসংক্রান্ত এবং অন্যান্য বৈষয়িক ব্যাপারে ইনি তাঁকে নানা পরামর্শ দিয়েছেন। দুর্বিসহ যন্ত্রণা সত্ত্বেও আইনস্টাইন মাঝে মাঝে দু-একটা সরস মন্তব্যও করছিলেন। রোববারে ওঁরা যখন তাঁর কাছ থেকে বিদায় নিলেন তখন ভাবলেন, হয়ত এ যাত্রা বেঁচে গেলেন। বিছানার পাশে পড়েছিল পাণ্ডুলিপির কয়েকটি পাতা। আশা ছিল, ব্যাথার তীব্রতা না থাকলে পরদিন হয়ত আরও কিছু কাজকর্ম করবেন।

একই হাসপাতালে কয়েক ঘর ওধারেই রয়েছেন সৎ-মেয়ে মার্গট। সন্ধ্যায় হুইলচেয়ারে করে তাঁকে বাবার শয্যাপার্শ্বে আনা হল। প্রথমে মার্গট আইনস্টাইনকে মোটেই চিনতে পারেন নি। তাঁকে এতই বেদনাদীর্ণ ও ফ্যাকাশে দেখাচ্ছিল! তবু আইনস্টাইন তখন

একটু ভাল বোধ করছেন। মার্গটিকে হুইলচেয়ারে দেখে রসিকতা করে বললেন—"What an elegance there is in your movements! তোমার চলাফেরা কী চমৎকার!" অনেকক্ষণ ধরে পিতাপুত্রীতে এ ধরনের সরস কথাবার্তা চলল। তারপর শান্তকণ্ঠে বিজ্ঞানী বললেন মানবজীবনে নিয়তির অলঙ্ঘ্যতার কথা, শিয়রে মৃত্যুর পদধ্বনির কথা। বললেন, এই ত স্বাভাবিক। তারপর, পরপর দু'বার উচ্চারণ করলেন—"Here on earth I have done my job। এ পৃথিবীতে আমার কাজ শেষ।" কথাটিতে খেদ বা ভাবপ্রবণতার লেশমাত্র ছিল না। ভাবনায় তিনি তখন মহাবিশ্বের তরঙ্গের সঙ্গে একাত্মবোধে নেচে নেচে চলেছেন। তারপর পিতাপুত্রী পরস্পর 'শুভরাত্রি' বিনিময় করলেন। হাসপাতাল থেকে আগেই বিদায় নিয়ে গেছেন সেক্রেটারি হেলেন ডুকাস। মাঝরাতে ডঃ ডীন এসে তাঁকে দেখে গেলেন। আইনস্টাইন তখন অঘোরে ঘুমচ্ছেন।

হঠাৎ মাঝরাতের কিছুপরে কর্তব্যরত নার্স আলবার্টা রোজসেল দেখলেন, ঘুমের মধ্যে আইনস্টাইন অস্বাভাবিক জোরে জোরে শ্বাস নিচ্ছেন। ভয় পেয়ে দ্রুত ছুটলেন দরজার দিকে, ডাক্তারকে খবর দিতে। অস্ফুটে জার্মান ভাষায় কী যেন বলে উঠলেন আইনস্টাইন। নার্স রোজসেল তার বিন্দুবিসর্গও বুঝলেন না। জানা গেল না, বিজ্ঞানীপ্রবর কী বলতে চেয়েছিলেন বা বলেছিলেন। ত্রস্তপদে রোজসেল ফিরে এলেন আইনস্টাইনের শয্যাপার্শ্বে। ঘড়িতে রাত তখন একটা বেজে পঁচিশ মিনিট। তারিখ, ইংরেজি মতে, ১৮ই এপ্রিল, সোমবার। সব শেষ! আপেক্ষিক তত্ত্বের জনক, পরমাণুযুগের পথিকৃৎ জীবনের সব কর্তব্য শেষ করে মরলোক ছেড়ে চিরপ্রস্থান করেছেন অমৃতধামে। চিরদিনের জন্য নিভে গেছে তাঁর 'পরিশ্রান্ত পরিক্ষীণ মর্তজন্মশিখা'।

সকাল ন'টায় মার্গটের শয্যাপার্শ্বে মিললেন বড় ছেলে আলবার্ট, সেক্রেটারি হেলেন ডুকাস এবং ডঃ নাথান। উদ্দেশ্য: মৃত্যুসংবাদ প্রেসে দেয়ার আগে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তগুলো সম্পর্কে আলোচনা সেরে নেয়া।

প্রয়াত বিজ্ঞানীর ইচ্ছানুসারে তাঁরা শব-ব্যবচ্ছেদে রাজি হলেন।

১৯৫৪-র ১২ই অগাস্ট তিনি এক চিঠিতে মৃত্যুর পর শবদেহের বিলিব্যবস্থা সম্পর্কে উল্লেখ করেন। চিকিৎসা বিজ্ঞানের গবেষণায় দেহটি কাজে লাগুক—এই ছিল তাঁর ইচ্ছে। "ডাক্তারদের আমি সানন্দে আমার দেহকে কাটাছেঁড়া করতে দিতে রাজি। কিন্তু, ভয় হয়, লোকেরা এটাকে অতিনাটকীয়তা বলে না ভাবেন। আমি ত এখন এক ধরনের সাধুসন্ত হয়ে পড়েছি। তবু সমস্ত 'tabu' ব্যাপারটাই আমার কাছে অবাঞ্ছিত, এমন কি, জঘন্য মনে হয়।" অনেক ইতস্তত করে বড় ছেলে রাজি হলেন বাবার মস্তিষ্কের ডাক্তারি পরীক্ষায়। তবে একটি শর্তে। লিখিত চুক্তিপত্রে প্যাথলজিস্টরা সই করলেন যে, পরীক্ষার ফলাফল বৈজ্ঞানিক পত্রিকায় প্রকাশ করা হবে।

মৃত্যুর ন' ঘণ্টা পরে ডঃ টমাস হারভে শব ব্যবচ্ছদ করলেন। জানা গেল, তলপেটের ধমনী ফেটে রক্তক্ষরণই মৃত্যুর অব্যবহিত কারণ। হারভে মত দিলেন যে, অপারেশন করলেও কোন লাভ হত না। প্রফেসর নিশেনও ব্যক্তিগতভাবে স্বীকার করেন যে, ছিয়াত্তর বছর বয়সে aneuirisma sac অপারেশন করে সংবহন নালিকার প্রতিস্থাপন কখনও সফল হতে চায় না। কিডনী-আর্টারির শাখা-প্রশাখার নৈকট্যই এর কারণ।

সকালেই আইনস্টাইনের উইল পড়ে শোনান হল। তাতে তিনি অনুরোধ করেছেন, তাঁর অন্ত্যেষ্টিতে যেন কোন রকম ধর্মীয় আচার বা সরকারী অনুষ্ঠান না করা হয়। যেন কোন রকম অবিচুয়ারি স্পীচ না থাকে, না কোন মনুমেন্ট বা টুম্বস্টোন। কিছু কাছের লোক ছাড়া অন্ত্যেষ্টির স্থান ও কাল সম্পর্কে যেন কঠোর গোপনীয়তা রক্ষা করা হয়।

হলও তাই। বিকেলে নিউজার্সির ট্রেনটন শ্মশানে যখন তাঁকে দাহ করা হয় তখন জনকয়েক আত্মীয়স্বজন ও বন্ধুবান্ধব ছাড়া আর কেউ উপস্থিত ছিলেন না। এক্সিকিউটিভ ডঃ অটো নাথান

সামান্য দু-এক কথা বললেন। এই ট্রেনটন শ্মশানেই তাঁর দ্বিতীয়া স্ত্রী এলসা ও ছোট বোন মাজাকেও দাহ করা হয়েছিল। আইনস্টাইনের ইচ্ছানুসারে, তাঁর চিতাভস্ম নদীজলে নিক্ষেপ করা হল।

মনে পড়ে যায়, দু'শ বছরেরও আগের একটি দিনের কথা। সেদিন মারা যান মহামতি নিউটন। সরকারী মর্যাদায় তাঁর দেহ শায়িত। উদ্দেশ্য : শোকার্ত জনতাকে অন্তিম দর্শনের সুযোগ দেয়া। তারপর লণ্ডন মহানগরীর কেন্দ্রস্থলে যেখানে ইংল্যাণ্ডের মহান সন্তানেরা চিরনিদ্রায় শায়িত সেই ওয়েস্টমিনস্টার অ্যাবে-তে রাজকীয় অনুষ্ঠানের মাধ্যমে তাঁকে সমাহিত করা হল। দু'য়ে কী দুস্তর ব্যবধান!

যা হোক আইনস্টাইনের লেখা শান্তিবাদের খসরাটি হারিয়ে যায়। শেষ লেখা তাই জানা গেল না, জানা গেল না তাঁর শেষ বক্তব্য বা কোথায় ছড়িয়ে আছে তাঁর দেহের শেষ স্মৃতি। শান্তিবাদের খসড়াটি পরে অবশ্য প্রকাশ করা হয়, তবে সন্দেহ থেকে যায় এটাই তাঁর বক্তব্য কিনা।

ইতিমধ্যে মৃত্যু সংবাদ দ্রুত ছড়িয়ে পড়েছে। রাশি রাশি শোক-বার্তার টেলিগ্রাম এসে পৌঁছতে লাগল। নেহরু তাঁর বার্তায় বললেন —"Humanity had lost one of its noblest representative : a ray of light in a world whose shadows grow ever darker."। রাসেল বললেন—"তিনি শুধু বিরাট বিজ্ঞানী ছিলেন না। ছিলেন বিরাট মানুষও। যুদ্ধের দিকে ভেসে চলা এক জগতে তিনি শান্তির পক্ষে দাঁড়িয়েছিলেন। উন্মত্ত জগতে তিনি ছিলেন প্রকৃতিস্থ, মতান্ধদের জগতে উদারনৈতিক।" শুধু বিরাট ব্যক্তিত্বরাই নন, বিশ্বের সাধারণ লোকেরাও এ সংবাদে গভীর মর্মবেদনায় কাতর হয়ে পড়েন। মহান কবি, সাহিত্যিক বা রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের তিরোধানেই এতদিন জনসাধারণ শোকে এমন মুষড়ে পড়েছেন। বিজ্ঞানীর তিরোভাবে এই প্রথম জনসাধারণকেও শোকার্ত দেখা গেল। "গ্যালিভার যখন বেঁচেছিলেন তখন রাতে

লিলিপুটেরা সর্বক্ষণ তাঁর হৃদ্স্পন্দন শুনতে পেত। লিলিপুট জনসাধারণ এদ্দিন এই কথা জেনে যুক্তির ক্ষমতায় আর অমরত্বে আস্থাবান ছিলেন যে, একজন গ্যালিভার তাদের মধ্যে বেঁচে আছেন। সেই বিরাটের হৃদ্স্পন্দন আজ চিরতরে থেমে গেল।" একটি জীবনের শেষে একটি যুগের অবসান ঘটল। চিরদিনের জন্য মৌন হয়ে গেল সেই সূর্যপথিক নিঃসঙ্গ সন্ধানী চারণিকের 'চরৈবেতি' বা এগিয়ে চলার পদধ্বনি।

* * * * *

"জীবনে প্রবেশ অর্থ

পায়ে পায়ে যাত্রা সাঙ্গ অমোঘ মৃত্যুতে।

দশজনে তিনজন আকুল-আগ্রহী জীবনের লাগি,

দশজনে তিনজন সমান-ব্যাকুল মরণের তরে;

দশজনে তিনজন জীবনে আগ্রহী, তবু

ধেয়ে চলে মৃত্যুপথ পানে।

কেন? কারণ সকলেই লোভাতুর জীবনের প্রতি।

জীবনের অর্থবোধ অবশিষ্ট দশমেই শুধু,

নির্ভয়ে বাঁচেন তিনি, ব্যাঘ্র কিংবা 'ইউনিকর্ন'

কিছুতেই শঙ্কা নাহি তাঁর,

একাকী সংগ্রামরত, অস্ত্রে নাহি কোন প্রয়োজন।

স্থান খুঁজি নাহি পায় তীক্ষ্ণশৃঙ্গে বিদারিতে 'ইউনিকর্ন' তাঁরে;

ব্যর্থ ব্যাঘ্র খুঁজে ফেরে কোথা তাঁরে বসাবে নখর;

শত্রু নাহি খুঁজে পায় অসি লয়ে হানিবার স্থান।

কেন? কারণ মৃত্যুঞ্জয় দশমের উত্তরণ জীবনের

ঊর্ধ্বে এক অমৃত জীবনে।"

—লাও ৎসে

শেষ